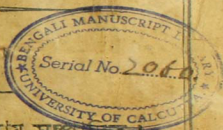


কম্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা ।

চতুর্থ বৎসর

২২৯৬



শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ।

কম্পনা কার্যালয়,

৭৮ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ।

মূল্য ডাকমাণ্ডুল সমেত দুই টাকা ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অতীতের কথা	শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	৭৫
অনুষ্ঠান	" বশব্দ মিত্র	১১১, ১৩০, ১৪৮
অক্ষয়কুমার দত্ত	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৩০
আকাজকা	শ্রীমুক্ত গিরীন্দ্রা প্রদত্ত রায় চৌধুরী	২২
আকামর্যাকা	" গোবিন্দলাল দত্ত	৮২
আকস্মিক কবিতা বা গীতি কবিতা	" নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৫১
আমরা কি বিবেচী ?	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১৭
আমার কন্যানায়	মোপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৭৮
অঁধার না আলোক	মহেন্দ্রনাথ মিত্র	৪২০
ঐশ্বরের রূপ পরিগ্রহ সম্বন্ধে } রামমোহন রায়	চন্দ্রশেখর বসু	
উদ্ভাস ছন্দ	" প্রিয়নাথ সেন	৬০
উষা	শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেন	৪৬১
কনকাকুলি	শ্রীমুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	১৭৫
কবি কীটনের প্রতি	সত্যীশচন্দ্র ঘোষ	২৮
কলি	চন্দ্রশেখর বসু	১৩
কল্পনার গান	সম্পাদক	১
কানন	ঐ	৫৫২
কি কি সংস্কার করিতে হইবে ?	শ্রীমুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত	৬৫৫
কৃষিকথা	সম্পাদক	২১২, ৩৭০
কেন ও কেমন	" বশব্দ মিত্র	৪৩৫
কোথায় গেল ?	" নগেন্দ্রনাথ বসু	২২২
গান	বিহারীলাল চক্রবর্তী	১৬২
গৃহ	" নগেন্দ্রনাথ বসু	৫০১
গোপাল	" অক্ষয়কুমার বড়াল	২০৬
জাই	শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	১৮২
ডাক্তারদের মতের সমালোচনা	শ্রীমুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১১
হারিষ ও কর্ণকল	বশব্দ মিত্র	২৮৫
দেবদেবীর পূজা ও প্রসঙ্গ	চন্দ্রশেখর বসু	৪১, ৬৫
দ্রব্যগুণ সংগ্রহ	শরচ্চন্দ্র রায়, কবিরাজ	৫২, ২৫, ১৩০, ২০৪, ২২২, ৪৪০
নবজীবন	প্রিয়নাথ সেন	৩১৫
নিশা সন্ধ্যা	বিহারীলাল চক্রবর্তী	২২৭
নিশীথ স্রোত	নগেন্দ্রনাথ বসু	১৩১
পৃথিবীর বিবাহ হওয়া কি উচিত ?	গোবিন্দলাল দত্ত	২৩২
দর্পণ ও বঙ্গীয় কবি	মোপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২০

প্রেমদাসের জীবন নাটকের এক অঙ্ক	প্রেমদাস	৩৩৩
কৌটো ও দিলক	সম্পাদক	৬৩৫
নবমহাভারত	জীহুক অক্ষয়কুমার বড়াল	২৬১
বনের ভায়া	ব্রাহ্মনাথ ঠাকুর	১৬৫
বনমহা	নগেন্দ্রনাথ বহু	৭০
বিশ্ব-বিজ্ঞান	প্রকাশচন্দ্র ঘোষ	৪২১
বিভিন্নম ও চিত্রা	বি. নগি চট্টোপাধ্যায়	২৭
বিবিধ	নগেন্দ্রনাথ বহু	১১২
বিভিন্ন বিদ্যা	জী	৫২৭
বুদ্ধিবৃত্তি	.. অক্ষয়কুমার বড়াল	৪১৮
ভয়ে ভয়ে	শ্রীমতী শ্রীমতীমোহিনী বানী	৩৭১
ভারতে ইংরেজাধিকার	জীহুক ব্রহ্মবীরাভ চন্দ্র	৭১১
মধুরায়	.. অক্ষয়কুমার বড়াল	২৮
মহাভারত	শ্রীমতী শ্রীমতীমোহিনী বানী	২৭৩
	জীহুক প্রিয়দর্শিনী সেন	৫১০
দ্বীপ-বাণ	অক্ষয়কুমার বড়াল	৩৭৩
দুগধর্ষ	পণ্ডিত কানাইলাল শাস্ত্রী ৩৭৭৭১২, ৪২৮	
দ্ব্যর্থার্থী সংকলিত বিদ্যা	জীহুক জীবনোত্তম শাস্ত্রী ২০৭, ২৫৪, ৩২৮, ৩৭৪, ৪৪২	
রমণী মন্তি	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০
একাক্ষরিক বুদ্ধোপাধ্যায়	গোবিন্দলাল দত্ত	৭১৭
রামবহু	গোবিন্দলাল দত্ত	১০৪
শিবস্বত্ব	পণ্ডিত কানাইলাল শাস্ত্রী	৫১৪
শিবোন্মিত্তি বিদ্যা	মোহনচন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৩, ২৩৭, ৩২৭	
শিব রমায়ণ	রামচন্দ্র মলিক	৩০
শিবস্বত্ব	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১৫
শিব	নগেন্দ্রনাথ বহু	৫৭২
শ্রীমতী মাহিলা	নীলকণ্ঠ মজুমদার	৫৪২
সংসার	গোবিন্দলাল দত্ত	৩২৭
সংসার বিদ্যা	ব্রহ্মবীরাভ ঠাকুর	৫০৪
সংসার অত্যাচার	সম্পাদক	২
সনাতনোচনা	(সাহিত্য লাইব্রেরী)	১৭১, ১৮৭, ৩৩৩
সাহিত্য	সম্পাদক	৭৬২
সাহিত্যের অন্তর	জীহুক নগেন্দ্রনাথ বহু	৫৭৩
সপ্ত সঙ্গীত	বেনোয়ারলাল গোস্বামী	৫০০
হিন্দু আচার ব্যবহার	ননোমোহন বহু ১১৬, ১৫১, ৩০২, ৩৫৫	
হৈমচন্দ্র	সম্পাদক ২১, ২৩, ৮৭, ১২৭, ১৬২, ২৩৪, ৪০৪, ৪৭৩, ৫১৫	

কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা ।

চতুর্থ বৎসর

কল্পনার গান ।

(রাশিবি চিত্রাঙ্গিনী ।)

কল্পনে গা' লো আবার ।

ভারতীর কোলে বালিকা তুই, গা' লো আবার ।

জিভি মুক্ত মেয়ে তুই, আধ-কোট ভাব,

কথা কহিতে যায় জড়ায়ে ;

বালিকাপরাণ তোর না আনি কেনন,

হুলটি হুটিলে

চাঁদটি উঠিলে

আকাশে হেরিলে ডাঙা ডাঙা মেঘ,

ভাবের বুকেতে তনে শুয়ে কত

স্বপনের মত

অকুট ভাবার

'হাসি-কান্না-মাথা গান গা'স ধীরে ধীরে ।

তুই লো সারিকা সাহিত্য-কন্যেনে

নীরবতা তোর সাজে কি লো কহু ?

কল্পনে গা' লো আবার ।

ভারতীর কোলে বালিকা তুই গা' লো আবার

ছিড়িয়াছে তার, বাণা বাণেশ্যাক আন
 অযতনে তাই খেবেচ দেলিয়ে,
 লহ ওড়াইয়া অই, দাগ গিরা
 কর দেখি দীরে আত্মনা আঘা
 ওঠে না বুঝু না—গোটে না ক হুঁর
 গিরেতে ভাণিয়ে,
 যে গান মনে নাহি আর;
 ত'ক মেনে গর,
 চেয়ে দেখ অই
 বসন্ত পবনী খাতি লো এ
 জোড়া ঘরে ছের খেলিয়াছে চাক,
 আনন্দে আভি লো গাহিনার দিন,
 গায়িতেছে পিক,
 গায়িতে ভরসা,
 তুই কি লো হুঁর থাকিসি নীরবে?
 কখনে গা' লো আবার,
 গুড় ঘেবে—কুড় শক্তি ভোর—গা' লো আবার ।
 ভারতীর কোলে নালিকার বোলে গা' লো আবার ।

সত্যতার অত্যাচার ।

সত্য আগে আমরা বুঝি ছিলাম, বুঝি বা ছিলাম না । কিন্তু সে দিব
 অনেক কথা ; সে সব কথার কাণ নাই । কোন কালে কবে কি ছিলাম
 না ছিলাম তাহা লইয়া আফসান করিলে বর্তমান অবস্থার পূরণ হইয়া না ।
 কোন দিন পেট ভরিয়া খাইয়া ছিলাম তাহা বলিলে আত্মিকার দুখা ঘোটে

সত্যতার অত্যাচার।

মান্য বর্ধমান জুলিয়া অতীত কাহিনী কহিয়া স্পষ্ট করা যুগের ক' আশ কাল দেখিতে পাই ইহার বিপরীত একটা চেউ উঠিয়াছে—ন কাহ্নেই আর অতীতের দোহাই আরম্ভ হইয়াছে। বিফলনা।

অতীতের কথাটা না তোলাই বুদ্ধি ভাল চিন। সে দোহাই মিলে এ প্রস্তাবের যে কিছু গুরুত্ব বাড়িবে এমন ভরসা নাই, বরং উল্টোপন্থি হই বাইবে সম্ভাবনা। আনাদের অতীত ইতিহাসের সন্নিতি "আর্য" কথাটির বড়ই বনিষ্ট সম্বন্ধ। পুরাকালের সে কথা সুমিলে হইলে আনাদিগকে "আর্য-সন্তান" বলিয়া পরিচয় দিতেই চাইবে, না মিলে চলে না। আর "আর্য-সন্তান" ইহাই আমাদের স্পষ্টার পবাকারী—এই কথাটিতেই প্রেমের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি; কিন্তু আর এ কথা চলে না। ইহার উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া যে আনাদিগের প্রাচীনতম সত্যতার বিষয় বহির্ভূত বাইবে আনকালের বাজারে সে বাতুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পণ্ডিত-প্রধান Maxmüller স্পষ্টই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, আর্য শব্দ ক' পড়ে হইতে নিষ্পন্ন, স্ব দাতুর অর্থ চারু করা, সুতরাং আর্য অর্থে মন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখিতে পাই, চাষার আর সত্যে বিস্তার প্রভেদ—আর্য্য পাভাল তখন। যে আর্য চারু ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার ইতিহাস পরিয়া আমরা সন্তুষ্ট হিলাম কি না হিলাম—তাহার বিচার করা যুগের কাল নয় যে আর কি বলিব? তাই বলিতেছিলাম, অতীতের কথাটা না তোলাই বুদ্ধি ভাল ছিল।

২. বাহ্যিক, আর কাল আমরা যে ভারি একটা মতা হইয়াছি—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আরম্ভে পড়িয়া অসত্যতার নিরন্তর হইতে তামিৎ জাগিয়া উঠিয়াছি—প্রভেদের অন্ধকার হইতে যুগের আলোকে আনিয়াছি ইহা আমাদের মনে মনে বড়ই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের আমরা এতদূর বশ হইয়া পড়িয়াছি যে ইহা আমাদের প্রাবদ্য, হইয়া উঠিয়াছে সত্যতা ভিন্ন বাহ্য কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহা আমরা কখনই উঠিতে পারি না। "অসত্য" এই কথাটা শুনিতেই শিহরিয়া উঠে, অসত্যতা কামিরা উঠে। সে স্থান হইতে দূরে পলাইবার অর্থ বাস বাইরা পড়ি। অন্য পথে ক' কথা, পিতারও অসত্যতা দেখিলে তাহাকে পণিত্যগ

করিয়া অন্যত্র বাইবার চেঁচা দেদি। এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উচ্চতম আন্দোলন যখন অনেকের অসভ্যতা বুজিল না, তখন দেখিয়া চমকিত হই; হতভাগ্য ভারতের অদৃষ্টে যে কত দুঃখ আছে তাহা তাহারা মর্মে মর্মে ব্যথিত হইয়া থাকি। তখন ধর্মশক্তি মঠে, মন্দিরে, চর্কে, স্তম্ভে, জিন্দে, পুস্তিকে কি বেদান্তে অথবা গুপনপ্রকারে যেখানে পারি পাড়াইয়া জনগণের নরনারীর জন্য আত্মল জ্বলিয়ে প্রার্থনা করি।

আমরা যে এতদূর করি সে কেবল আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভাংরা প্রকৃত সত্য হইয়াছি, আর অন্যে সেইরূপ সত্য হইতে পারিল না টেঁহাই রূপ। আমাদের নিজেদের সভ্যতার উপর যে বিশ্বাস তাহা বিশ্বাস যাতেই অবলম্বিত থাকে না, জীবনের প্রত্যেক কার্যে তাহাকে পরিণত করিয়া থাকি। একজন সেকেন্দ্রে লোককে দাঁড় করাত্ত আর আমাদের মুখে একজনকে দাঁড়াইতে বল, প্রভেদ এখনই বুঝিতে পারিবে। সে সত্য সে সকল বিষয়েই সত্য। কিসে নয়? আমরা এখন কেশে সত্য, মেনে সত্য, চলিতে সত্য, বলিতে সত্য, হাসিতে সত্য, কানিতে সত্য, দানে সত্য, ধ্যানে সত্য, কণ্ঠে সত্য, ধর্ম্মে সত্য, স্বাধীনতার সত্য, অস্বাধীনতার সত্য, আহায়ে সত্য, বিহারে সত্য, আচারে সত্য, নিচারে সত্য, বিচারে সত্য, বুদ্ধিতে সত্য, অধিক কি আপনাদের নামগুলি পর্য্যন্ত আগে সভ্যতার দাপরে পাড়াইয়া তাহা হইতে সেই গৈরিক স্বাক্ষরলা বাদ দিয়া তবে ব্যবহার করিয়া থাকি। আর সে অসত্য? ছিঃ তাহার কথা আর কান্না নাই।

কিন্তু জনগণের কেমনই অসম্পূর্ণ অবস্থা, কোন কিছুই যেন পূর্ণ হইতেই পারে না। পূর্ণ হইলেও, কতকগুলি ক্ষেত্রে যেন এমন প্রতিজ্ঞা তাহাকে কোন মতে পূর্ণ বলিতে দিবে না। কাহারও ভাল তাহারা দেখিতে পারে না, দেখিলে চোক টাটাইয়া উঠে, তৎক্ষণাত্ তাহাতে নানা রকমের কথা আনিয়া উপস্থিত করে। এমন যে এই উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনময় সভ্যতা, ইহাতেও লোকে কত কথা কর। অসত্য বুদ্ধগণ—স্বলবিশেষের প্রতি এই বর্তমান সভ্যতা Old fool বলিয়া বলায় তত্বসী প্রবর্তন করিয়া থাকে—কাহারও ভৌতিকবৈজ্ঞানিক, তাহাদের কথা না হয় ধরিলাম না, কিন্তু বাহ্যিকগত

মানুষের মত বলিয়া ভাবি, তাহারও যে আবার কি সব কথা বলিয়া দেড়ানু।
এই এক জন তো “একাল ও নেকাল” বলিয়া এক ধান্য একাও বই-ই
লিখিয়া কেলিলেন। সকলের অপেক্ষা বেশি হুংস এই যে, যে উচ্চশিক্ষা এই
সভ্যতার একমাত্র প্রতীকী, কেহ কেহ সেটুকু গাড়ে দেহের পূর্ববর্তমান
বোকাচাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে-সে লোকে নয়। স্পেন্সর *
তাহারাই একজন প্রধান নেতা। কথার অর্থ কি ?

কখন কখন তাই ভাবি, কথটা বুঝি মিথ্যাই নিরর্থক নয়, আমাদের
শিক্ষার গোড়ার বুঝি কিছু বৃত্ত আছে, বুঝি আমাদের এ সভ্যতা আসল
খাটি সভ্যতা নয়। যে ভিনিষটা খাটি তাহাতে কলত ধরিতে পার না।
আমাদের এই সভ্যতা যদি খাটি হইত তবে ইহারই মধ্যে, ইহারে এত
কম দূরিত না। তবে বলিতে পার, লোকে জোর করিয়া ধাইতেছে—
উপায় কি ? কিন্তু যদি তাহাই হইবে, তবে ইহা অসহন্য : সমালোচনার
ভীত আত্মনে পুড়িয়াও আজিও আপনার খাটি বজায় রাখিতে পারিতেছে
না কেন ? লোকে বলে, আসল অপেক্ষা নকল চাচ্চিক্য অধিক, খাটি
মোণা অপেক্ষা যে মোণার ডানা ভাঁজান থাকে তাহার উচ্ছলতা বেশি !
কিন্তু আসল কি নকল, খাটি কি ভাঁজান-দেওয়া ব্যবহারে তাহা ধরা পড়ে।
এও কি হবে তাই ?

যাহাই বলি, দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এ সভ্যতার উপর একটা সন্দেহ
হয় বটে। সকল বিষয়েই কিছু দেখি-শুনিয়া বুঝিয়া উঠা যায় না, ব্যবহার
করিয়া তাহার ফলাফল দেখিয়া তবে সেটা ভাল কি মন্দ তাহা স্থির করা
যায়। দৃষ্টান্ত অনেক ভিনিষের ব্যবহারেও অনেক বুঝ করিয়া গেলে, কিন্তু
তাহার অন্তরের তথ তাহার সহিত না মিলিলে বুঝিয়া উঠা বড়ই দুষ্কর।
বোধহয়, আমাদের এ সভ্যতার বাহ্য-শোভা খুব জাঁকাল। বাহ্য কিছু

And this it is which determines the character of our education.
Not what knowledge is of most real worth, is the consideration ; but
what will bring most applause, honour, respect—what will most conduce
to social position and influence—what will be most imposing.

H. SPENCER'S Education.

এদেশে ছিল না, সভ্যতা মতে নব্বই ভের নদী পার হইতে তাহা একেদে
 আনিয়া দিয়াছে। কোট পেটালুন, কুণ্ণাউন, বুট মোদা, ষিহু চণমা
 চেন চুহুট—হরেক রকম ভাল ভাল জিনিষের আমদানি হইয়াছে।
 Freedom, Fraternity, Female Emancipation, Mass-Education
 প্রভৃতি লক্ষ্যচোড়া অনেক কথা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এ দেশে উপনিবিষ্ট
 হইয়াছে। দেখিতে ওনিতে নহই ভাল। কিন্তু ইহাই কি একান্ত সভ্যতা ?
 ‘লক্ষশটিপটাবৃত’ হইয়া কথায় কথায় ইংরাজির তীব্র রসাল নহন সুখি ব্যবসার
 দরাকৈই কি যথার্থ সভ্যতা বলে ? বাহা শোভায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক দিন
 ইহার উপাসনা করিয়াছি ; করিয়া এতদিনে বুঝিয়াছি, যেন ইহা সভ্যতা
 নহে—যেন—এমন আর কিছুই নহে—কেবল সাহেবিয়ানা মাত্র।

সভ্যতাই হউক, আর সাহেবিয়ানাই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া
 বাইত না, যদি ইহার ফল উপকারক হইত। আশে বুঝিতে পারি নাই,
 ওখন কলেজের উচ্চ মস্তিষ্ক সংসার-বায়ু-হিম্মলে শীতল হয় নাষ্ট, এখন
 রক্ত পাতলা হইয়া আসিয়াছে, এখন বুঝিতে পারিতেছি, এ সভ্যতা নহন বৈ
 ভাল নয়, ইহাতে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নাই, ইহার উপকারের কথা চুলায় যাক,
 ইহার অত্যাচারে প্রাণ যায়। দেখিতেছি, দিন দিন ইহার অত্যাচার বাড়িয়া
 ইষ্টিতেছে। পুত্র পিতাকে মানে না, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে শেলিয়া যায়,
 পত্নী পতির উপর প্রভুত্ব করে। দেখিতেছি সকলই বিচিتر। ধার্মিক
 ধ্যান করেন ঘড়ি ঘুণিগণ, পাছে ঘড়ির কাঁটাটা মিক্রনিত সময়ের এক দেকও
 এদিক ওদিক হয় ; নাতা ধান করেন সংবাদপত্রে তাঁহার নাম ঘোষিত
 হইবে বলিয়া ; বন্ধ বন্ধকে দেখিলে আলাপ না করিয়া একবার ঈষৎ
 ঘাড়টি নাড়িয়া চলিয়া বান—তিনি সময়ের মূল্য বুঝেন, অনর্থক বাক্যব্যয়ে
 পরস্পরের মূল্যবান সময় অপব্যয় করিতে চাহেন না ; একান্তই পরিচ্ছদের
 প্রথা উঠাইয়া বেণুয়া হইয়াছে, যে এই প্রকার পক্ষপাতী ক্ষেত্রের বৃথ,
 সে Political Economy কিছুই বুকে না।। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে যে
 শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া বাহারা ‘হমবগ’ বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, আবার তাহাই
 Madame Blavatsky যখন তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ
 করিতেছেন তখনই তাহা বিপের তাক লাগিয়া যাইতেছে। দেখিতেছি—

সভাতার অভ্যাস।

হেলেন হলো। বাপের হৃদয়েই টেরি কাটে। ছুড়িগুলো খুট পায়ে দিচ্ছে
 ছট করে ছুটিয়া বেড়ায়; গৃহিণীর আর গৃহকার্যে মন নাই, মাগীধরী,
 বুকজালা, মনভার সহিয়াই তো বিরত, শরীরটা কি ভাষা, তা কখন
 পরিব্রন্থ কখন? যদি বা একটু সদর হইল ও নাটক নজেল, কাটা কারপেট
 বা সোপ ডোয়ালে সহিয়াই দেখিতে দেখিতে নিমটা কাটিয়া যায়। ইহা
 অপেক্ষা আবার যে বাড়ীর অন্তর মহলে—হার তাহারকে অন্ধর কেন
 বনি, সে তো সদর অপেক্ষা অন্ধর আরও আশ্রয় আলোময়—
 সেখানে সভাতার বেশী প্রাচুর্য, সেখানে—সেখানে আর কি বসি।—
 সেখানে সে ত স্ত্রী নয় “যেন পুন্নিব!” প্রকৃতির ভাবিয়া
 ফেলিয়া মেয়েগুলো পুরুষের সম্বন্ধ কখন করিতে চাহে। আগেই হইবে
 আপনাদের নামগুলো “সারদা সুন্দরী কাঞ্চিনাল, উপুন্দা, মাসচটক
 ইত্যাকারে কিছুকিমানকার কবিতা ফেলে। ওদিকে আবার হস্তিন
 পরামণিকের ছেলের নিতাই N. Biswas হইয়া লাতি হাতিয়া
 দিয়াছে, আপিসে আপিসে টো টো করিয়া ঘুরিয়া তাহার চাকরি মেলে না
 তাহার বুড়া বাপ আর সংসার চালাইতে পারে না, ওদাপি সে আত্ম
 ব্যবসা করিবে না, অথবা গৈড়ক যে ছই এক ছুড়ো ছুই তাহার
 চাস আবাদে মনু বিব্রন না; সে সভা করে, বক্তৃতা দেয়, আর বলিয়া বেড়ায়
 “আমরা সকলেই বখন এক পিতার সন্তান, তখন ব্রাহ্মণ ও যে খানি ও সে,
 ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের এক পংক্তিতে বসিয়া পাইতে দোষ কি?”
 তুমিতেছি সে শাস্ত্রই নাকি “ব্রাহ্মণদুঃখেন্দ্রিনী” না কি এমন একটা
 নামে একখানা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক। আবার তুমিতেছি, অনেক নাকি
 মিলিয়া একটা বর্ষষট করিয়াছে যে, বখন আমরা সকলেই এক পিতার
 সন্তান তখন আবার বাবা কে? সেই অনন্ত অগীম অপরিমেয় পরম পবিত্র
 প্রেমময় পিতাকে সন্তান আনিয়াও আবার পার্থক্য পিতাকে প্রণাম করা
 সে জেই বনের অবমাননা—সে তো ঘোর নাস্তিকতার পরিচয় মাত্র! এ
 হলো কি? ইহাই কি সভাতার ফল? ইহা ভাবিলে ভয় হয়, শরীর শিহরিয়া
 উঠে, মীমাংসা কি? তবিত্যক্তি তাবিয়া অস্তরাশা আহুন হইয়া পড়ে।

কিত কেন এমন হইল? একগ হইবার একটা কারণ তুমিতে পারি।

নাতে পারি, বাহা কিছু অকালপক তাহা কখনই ভাল হয় না। যেটা ছেলেকে কেহই দেখিতে পারে না, তাহার দৌরাগো লোকে খালাপাখা হইয়া তাঁহা কাঠাল ইত্যাদি পানিলে তাহার স্বাদ পাওয়া যায় না, খাইলে অকারণে কষ্ট পাইতে হয়। আমাদের এ সভ্যতা কেবল অকালফল্য-প্রদ। বাহা যুগ যুগান্তের কাঙ্ক্ষ তাহা আমরা পকাশ বৎসরের মধ্যেই শেষ করিয়া কেলিতে চাচি। সকল বিষয়ই কালপাপেক্ষ! আবার সেই কালের মধ্যে নিয়মটিকে লালনপালন করিয়া তবে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হয়। চারি শতাব্দীর পর দিন তাহাতে কল জন্মে না। সময়ের আবশ্যক হয়। সেই সময়ের ভিতর আবার তাহাকে যতনে বর্ধিত করিতে হয়। গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়, ভাল সেচন করিতে হয়, বাহাতে আলোক ও উত্তাপ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এত করিলে তবে সে চারাব্বি কালে একগু-পাহ হইয়া ঐঙ্গিত কল প্রদান করে। কোন ভিনিষই তাহার ঠিক সময়টি না আসিলে কলোপধারী হয় না। বরং অসময়ে সংস্কার-চেষ্টার নিপনাত ফলই কলিয়া থাকে। এই জন্যই ফ্রান্স ও জার্মানিতে সংস্কারকরণ স্বাধীনতা প্রচার করিতে গিয়া পরাধীনতাকে অধিকতর দৃঢ়ত্ব দিয়াছিলেন, উপ-ধর্মকে লোপ করিতে গিয়া তাহাকে পূর্বাগেচ্ছা দৃঢ়ত্ব করিয়া কেলিয়া-ছিলেন।* সময়ে আপনাপ্রিয়কে কোনও কাব্যের জন্য উপযোগী করিয়া না তুলিয়া যে কোন কাজ কর তাহা কখনই হসিক হইবে না। ভূতপূর্ব শাসনকর্তা লর্ড ডেলহৌসি (Lord Dalhousie) যখন ভারতবর্ষের শাসন-ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন হন, তখন তাহার গৃহ মধ্যে তাহার বিবিত এক খামি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সেখানি খামের ভিতর মোড়া। তাহার উপর লেখা, "ইহা নিষবৎসরের মধ্যে কেহ খুলিও না।" সেই পত্রের ভিতর কি লেখা ছিল? তাহার মধ্যে শসিন-প্রণালীর পরিবর্তনোপযোগী-কড়কগুলি নূতন নিয়ম লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু

* Thus for instance, in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthened tyranny, it is the enemies of superstition who have made superstition more permanent.

ডেপুটিসি মানিডেন, বিশ বৎসরের মধ্যে সে একবার পাবলিক কখনও কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না, হইলেও তাহাতে তত ফল উৎপন্ন হইবে না। তাই তিনি তাহার বাতের উপর বড় বড় শব্দে ঐকম নিবেদন-বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কথটা উদ্ভট। দাঁটার নহে। উপযোগী না হইলে কিছুই করা যায় না। জীবন শতাব্দীর শেষভাগে দু'দশ কেন আপনার স্বাধীনতা হারাষ্ট্রা নেপোলিয়ানের একমাত্রকর শুলকে নিবন্ধ হইয়া পড়িল? এক করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিল না কেন? সেও কি এই জন্য তখন আপনি তেমন উৎসাহ হইতে পারেন নাই? বলিয়াছি তো ইংল্যান্ড না হইলে কিছুই করিয়া উঠা যায় না। ইহা একত্রির নিষয়। কণা পরিণতিবাসনে মূলতক। যে ইহা না বুকে, সে আপনিই ঠেকে। কাঠালকে পাঠিবার সময় না দিয়া, ছোর করিয়া যে ইটোড়ে পাকাইয়া গঠিতে যায়, তাহার কাঠাল খাওয়া হয় না সে কেবল নিজাতাই ভুড়িই চোখে।

আর একটি কথা আছে। আমরা বাহাকে "সত্যতা-সত্যতা" করিয়া আজকাল পাগল হইয়াছি, মূল ধরিতে গেলে, ইহা আমাদের বৈদেশিক মিত্রদের সংসর্গকৃত ফল মাত্র। কোনও সমাজে হঠাৎ এইরূপ একটি সংসর্গ উৎপন্ন হইলে আর এইরূপই হইয়া থাকায় বটে। এই সমাজ-বিষট্টনের মধ্যে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। একটি নাপক-শক্তি, আর একটি গঠন শক্তি। একটি ভাঙে, আর একটি গড়ে। যে ভাঙে, সে কেবলই ভাঙিতে থাকে; কোন্টা ভাগ, কোন্টা মন, কোন্টা রূপ উচিত কোন্টা ভাঙা উচিত, ততটা বিষয়ের অবসর কখনও থাকে না; অথবা নে-খেয়ালই তাহার নাই। যে যে-রিনিষ সে ভাঙিয়া ফেলে, তাহার ক্ষয়স সমাজের মূল হইবে কি অবশ্যই হইবে, তাহার স্থান যার একটি কিছু গড়া উচিত কি না, সে সব বিষয়ে ইহার জ্ঞান নাই। ক্ষয়স করাই

France failed through the want of that moral preparation for liberty without which the blessing cannot be secured. She was not ripe for the good she sought.

CHANNING.

ইহার উদ্দেশ্যে অসংকল্পিত ইহার তৃপ্তি। আর যে শক্তি পড়ে, সে সেই ভাড়াচোর। আরগার নতুন ভিনিস গড়িতে চেষ্টা করে, শূন্যস্থান পূরণ করিতে উদ্যোগী হয়। ইহারও দুটি সেই এক দিকে; লক্ষ্য সেই এক। কিন্তু এই শক্তিটি বড় দুর্বল ও চিরজিহ্ন। কার্যে বড়ই দীর। একদিনে যাঁহা ভাড়া যায়, তাঁহা হয়তঃ বহুপণেও গড়িয়া উঠা যায় না। কোন অণু-সমষ্টিকে সমলে ভিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যত সহজ, সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পরমাণু হইতে সেইরূপ একটি অণুসমষ্টি স্থাপিত করা কখনই তত সহজ নহে। ধীরে ধীরে ধীরে এই গঠনশক্তি সমাজে আপনার কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সমাজের লোকেরা অসহিষ্ণু হইয়া, ইহার এই চিরজিহ্নতার উল্লেখ হইয়া ইহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে, তখন ইহা নিতান্তই নাজিহ্নের পরিচয়। আপনার পতন্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া, তাহার অক্ষয়বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তখন ইহা বাহ্য করে, তাঁহা ভাল কি মন্দ তাঁহা লক্ষ্য থাকে না, অনিষ্টের স্থানে ইষ্ট করিতেছে, কি ইষ্টের স্থানে অনিষ্ট করিতেছে সে বিষয়ে মন দেয় না, উন্নতি অবনতির বিবেচনা দৃষ্টিপাত নাই—তখন ইহার একমাত্র চেষ্টা কিসে আপনার কার্য্য সাধিতে পারিবে। সে সম্বন্ধে যাঁহা যায়, তাঁহাই লইয়া কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি শূন্য স্থানগুলি পূরাইতে চেষ্টা পায়। সুতরাং তখন যে নৃতনের সংঘর্ষে পূরাভনের লয় হইতেছিল, এই শক্তি সেই নৃতন লইয়াই আপনার কার্য্য আরম্ভ করে। নৃতনের কোনটা ভাল কোনটা মন্দ ততটা বিচার তখন করে না। তাহাতে হয় কি? তাহাতে প্রায়ই দেখিতে পাও, দেব গড়িতে বাক্সন হইয়া পড়ে। পরিচালকের কর্তা নহে। সাক্ষী ইহার ইতিহাস। প্রথম চার্লসের (Charles I.) সময়ে যখন পিউরিটানপন্থ সমাজে যোত্র রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, আর সেই বিপ্লবে নাস্তিকতা যখন চারিদিকে আপনার ভৈরব নৃত্য প্রদর্শন করিতেছিল—রাজা কোথায়?—পেপুস কে?—হোয়াইট হলের রাজমুক একজন কৃষকের পদখুলিতে হুসরিত—তখন এই গঠনশক্তি দীরভাবে আপনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। সে কার্য্যের কল কবে-কি প্রকারে কলিত বলিতে পারি না; কিন্তু বিপ্লবকারীপন তখন উন্নত, সে দীরচেষ্টা সহিতে পারিত না। তখন হইল কি? রাজার ঘোড়াচারিতার জীবন ক্রীড়া আরম্ভ হইল।

এই বর্ষন শক্তিরে আপনার ভাবে কার্য করিতে না শিলে প্রায় এইরূপই
ঘটিয়া থাকে। তবে যে এ শক্তি আপনার ভাবে কার্য করিলে অন্য
ভাবে সকল সময়েই তাই বৈ মন্দ গড়িলে না, ইহা বৈ অনিষ্ট তথ্যে
মত স্থির করা যাইতে পারে না। তবে এটা স্থির যে, শ্রমের জন্য ভোগ
ভাল হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রকৃতি ইহাই চায়। নদীর একদিক
ভায়ে, একদিক গড়ে। সমাজেরও সেইরূপ একদিক ভাঙিলে, অন্যদিক
গড়িতে আরম্ভ হয়। তবে একই সময় আবশ্যক করে বটে; কিন্তু যেমন
অষ্টমেরো কাঙা কাওশূনা হইয়া কার্য করিলে কার্য কতি ?

হুঃপের বিষয়, যার ক্ষতি সে ক্ষতি কি বুদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারে না।
বুদ্ধিতে পারিলেই না এমন কথা যুক্তিবে কেন ? সে তখন উন্নত হইয়া গড়ে
যাহা ছিল ভগ্নন বাহা নাই। সে অভাবে কষ্ট বোধ করে। তখন উন্ন-
ত্বের ন্যায় সম্মুখে বাধা পায় তাহা দিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা
পায়। পুরাতন ভাল গাছটির স্থানে নী ইউর, কাটা গাছটিরও বাকী হয়ত
নুতন একটি কাটা গাছ পুতিয়া বসে। ভাল গাছটির বদলে কাটা গাছ
হইলে তাহার তো কথাই নাই। যদি কাটা গাছের বদলেও হয় তাহা হইলে
অশেষ যত্ননা। পুরাতন গাছটির কাটা নোয়া আমাদের লক্ষ্য অভ্যাস প্রভেদ,
ভাঙাতে কত অধিক হইত হয় না, কিন্তু নুতনটির কাটার হুড়ে আঁচড়ে খেয়
আলোয় আঁড়ির হইয়া পড়িতে হয়। সেই জানা বতকন না করে বতকন
চেষ্টা হয় না। ততক্ষণ বুদ্ধিতে পারে না, কি হইতে কি হইয়াছে,
কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিয়াছে। এমন লোকও হয় তা আছে, ইহা
বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। অন্যে বুঝাইতে গেলে চটিয়া যায়। হয়ত
বলিয়া বসে “জানো ইউর বন্ধু ইউর, সে যার ভারই আছে, অপরের
তাহাতে কি হে বাপু ?” উক্ত কথা। কিন্তু অপরের মাথা বাধা হইত না,
যদি সে অন্য অপরের ভূমিতে না হইত—যদি তাহার একের কাঁধের
ফলাফলে সমাজে ভাল মন্দ না ঘটিত। জানা উচিত, এ প্রকার কাঁধের
ফল আপনার ভা। আপনার পক্ষপাতমণ্যেই নিবদ্ধ থাকে না, ইহা সমাজে
উপপন্ন হইয়া অত দিনের মধ্যেই সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে আপনার কাঁধ
করিতে পারা যায়। জানা উচিত, মানুষ আপনার শরীর ও মনের উপরই

২৬৬। আধিপত্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার কার্যের জন্য অপরকে ফলভোগী করিবার তাহার কোনও অধিকার নাই। মিল (Mill) যে এত স্বাধীনতার খণ্ড প্রার্থিতাছেন, তিনিও এ কথা স্বীকার করেন-স্বীকার করিয়া দিয়াছেন।* তাঁর কাঁটার আঁচড়ে তিনি আপনিই জলুন বা বাহাই হউন, কিন্তু অগ্রসর আলাইবার তিনি কে ?

আর কেনই বা আমরা এরূপ করিতে যাই ? আমাদের অভাব কিমেন ? আমাদের বাহা আছে, আমাদের ঘরই তাহা না থাকে, তবেই কি আমরা সেটা একটা তারি অভাব বলিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য একেবারে লাগানিত হইয়া পড়িব ? বানরের যে একটা খন্ড বিশেষ বেনী আছে আমাদের তাহা নাই বলিয়া সেই অভাবটার জন্য বিশেষ আকুল হইয়া তাহা পূরণের জন্য কাহাকেও তো বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। আমাদের এ বিল্যক্তি সভ্যতা না-ই বা হইল। বাহা ছিলাম তাহাই থাকিলে দোষ কি ? এ সাহেবিয়ানা কেন ? এ সভ্যতার অভ্যাসে যে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলি, হে-সমাজ-সংস্কারক, হে সজ্জনসম্মানপক্ষপাতি, তোমার ও সংস্কারের পক্ষে আগে বুঝ, তুমি কে, তোমার সমাজ কি, তোমার সংস্কারের প্রয়োজন কি ? আর যদি তোমার সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনই বুলিগা থাক, তবে আঁঠে-জামিতে চেঁচা কর, যাহা সংস্কার করিতে হইতেছে তাহা কি, পুরাতনের পরিবর্তে যে নতুন পড়িতে উল্যত হইয়াছে তাহাই বা কি, এবং তোমার এ সংস্কারে ফল ফলিবে কি নু ফল উৎপন্ন হইবে, এ নববোধিত বুকের ভারিই বেহ শীতল হইবে, কি ইহার কটকাবাহে সর্পিগ জতবিকৃত হইয়া যাইবে, জানিতে চেঁচা কর, সংস্কার ও হঠকারিতা কত প্রভেদ, পুষ্পরঞ্জে ও কটকলতার কত তফাৎ, সভ্যতার ও সাহেবিয়ানার কত অন্তর। এখনও যদি না বুঝ, এখনও যদি অগপ-চাঁৎ ভাবিয়া, বিচারশক্তি বশুরক্ষী হইয়া না চল, তবে

* That part of the conduct of any one, for which he is amenable to society, is that which concerns others. *** Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.

S. MILL. Liberty.

বেশপরিমাণে কি হইবে তাবিষ্টা উঠিতে পারি না । দিন দিন যুদ্ধ
উঠিতেছে, তর হর, এইরূপে চলিলে আর শতাব্দী পরে জানি কি হইবে
কিছুই থাকিবে না, সকলেই মার্মেদ হইয়া যাইবে । হায়, যে কি ভয়ানক
বিনষ্ট আসিবে তাবিষ্টে আতঙ্ক হয় । এ আশঙ্কা কালানিষ্ট নহে ! মাতের
কথা—“পর্যতো বহুমান দুঃখ ।”

কলি ।

অক্ষর দিনমানের নাম কর । প্রতিকরে এক চতুর্থাংশ
হর, অর্থাৎ ১০০০ সভ্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর এবং কলি
একবার সভ্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি হইয়া আবার পুর্নবৎ সভ্য, ত্রেতা, দ্বাপর,
কলি হয় । এইরূপে ১০০০ বার এই চতুর্থাংশ পরিবর্তিত হইলে পর শেষ-
কলিযুগের অবসানে কল্যাত হয় । বলবান কাল, প্রকৃতির পবিত্রতানীশ
সভাব, ভোজের কর্মশীল বাহু, জ্ঞানধর্মের সূচীত বশতঃ প্রতিদিন ধর্ম, সভ্য,
ভাষিতা, দয়া, ক্রমা, আশ্র, বল, স্মৃতি, ভোগ প্রকৃতি ত্রয়ঃ প্রাসাদর ইয়া
কলিযুগকে উপস্থিত করে । “অন্যে কতদূর্থে ধর্ম্য” (মহা ১৮৫) ইত্যাদি
কানে কলিকট কহিয়াছেন, “যুগোপচরানুরূপে ধর্ম্মবৈলক্ষণ্যঃ ।” যুগের
অপচরাহ্মারে ধর্ম্মেরও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে । প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা এই
মূল মগতের কল্যাতহ্মারী পরমাধ্বকালের মধ্যে কলিযুগসমূহ প্রকৃতির শরীরের
ব্যাপ্তরূপ । এই ব্যাপ্তি কল্যাতকালে সংহার-মূর্তি ধারণপূর্বক প্রকৃতির
বাক্যবিক্রে দিনষ্ট করিয়া কেলে ।

প্রকৃতির সূক্ষ্মমূর্তিরূপ এই চিত্তভাষক সংসার প্রত্যেক চতুর্থাংশের
মধ্যে এই কলিনানক মহারাগকে দেখমানে ১২০০ এবং মনবমানে ৪৩২০০০
বর্ষ জেদ কর । এই কালসংখ্যা যোগবলে নির্ণীত হইয়াছে এবং উহাই
কলির পরিমাণ । এই বর্তমান কলিযুগের আরম্ভ ৪৩২০০০ বর্ষ কালের মধ্যে

কেবলমাত্র ১২৮৪ খ্রীঃ পূঃ হইয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট ৪২৭০১৬ খ্রীঃ পূঃ পুনঃ সভাপূরণ প্রবর্ত্ত হইবে। সভাপূরণের পরিদর্শনই এইরূপ। উন্নতির পূরণ অনন্ত, অসমাপ্ত পূরণ উন্নতি। এখন ধর্ম ও ভোগবিষয়ে অপরোহন অনন্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সমাপ্ত না হইলে সহসা উন্নতি হইবে না। তাহা কাল-সাপেক্ষ। ঋগিরা তাহার যথার্থ কালটী যোগবলে জানিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহার যুতাহার প্রতি ভূমি কেবল সন্দেশই করিতে পার, তত্ত্ব ভোগের বিদ্যাপুষ্টির সমস্ত অভিমানের সহিত আর কিছুই করিতে পার না।

এই কলিযুগের পূর্ববর্তী সভা, তেতা, ঋগির যুগের সংখ্যা লইয়াও নিজের বিবাদ। এক দিকে পাশ্চাত্য-বিদ্যা সম্প্রদায় কালসংখ্যা গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে আনন্দের বুদ্ধিমত্তারপূর্ণ পদ্ধিকাও চলিতেছে। পদ্ধিকার রূপ বেত্তব্রাহ্ম কল্যাণ, কলির সংখ্যা এবং কলির পদ্ধিকা দেখিয়া নবোরা কেবলোই অধিগম করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা কল্পনা নহে। প্রথমকালের পদ্ধিকারের সহিত তাহার যদি কোন সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে, সে সকল গণনা এখন ছুঁড়াপা। কিন্তু যুগ ও কল্পসংখ্যা যোগবলক—এ কথাই আমাদের উত্তর নাট।

বিগত সভা তেতা ঋগির এবং কলির গত অংশে এই ভারতবর্ষে কত রাজা হইয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ভারতবর্ষে আজিকার নহে। ইচ্ছাই সমস্ত মানবকুলের বীজভূমি। পাশ্চাত্য বিদ্যা তাহা হয়তো ক্রমে ক্রমে সীমার করিবে। ভারতের শতনামুখ সময়ে ইওরোপের যত্নসহ হইয়াছিল। এত আধুনিক হইয়াও যদি ইওরোপ আপনায় কারত্ব কালের অজ্ঞা ছিন্ন করিতে না পাবেন, তবে পুরাতন নাই বলিয়া তাহার ভারতকে কেন দোষ দেন? অগতঃ ইহা একবারও মনে ভাবেন না যে, ভারতের পৌরাণিক তত্ত্বসমূহ হইতে উপাধান সংগৃহীত হইয়া পরম্পরা ভাষাভাষের বাইবেল-শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ সংরচিত হইয়াছিল। সুমান্য যোগে ইহাও সর্গশেষ-শাস্ত্র পুরাণসমূহ। সেই পুরাণসমূহও ৪০০০ বর্ষের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও দর্শনের তো কথাই নাই। এই সকল শাস্ত্র-বেদাদিগণের তাহা সামান্য বুদ্ধিতে ছিন্ন হইতে পারে না। ঋগিরা

সেধনানে এইমাত্র নিকূপন করিয়াছেন যে, কি বেদান্ত, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি পুরাণ, সকল শাস্ত্রই বেদার্থজ্ঞাপক এবং নিত্য। উৎসাহিত, প্রত্যেক মহাযুগে-প্রবাহরূপে প্রণীত হইয়া থাকে।

সত্যযুগে দ্বাপর ও কলিযুগের যেরূপ দীর্ঘকাল সংখ্যা, তাহাতে বৃহৎকাল সমস্ত রাজাদিগের নাম ও রাজ্যকাল প্রকৃতি সহস্রত সম্পূর্ণ সাংসারিক পুরাত্ত প্রভাসন করা অসম্ভব। কথিতা এখনকার অনুমানী ও অল্প ব্যক্তিদিগের ন্যায় সাংসারিক অর্থশাস্ত্র ও অনর্থক রাজ-শাসন-বিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহারা অনিত্য জানিয়া যে সমস্ত তুচ্ছ করিয়াছিলেন এবং এখনও ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ তাহা হেয় করিয়া থাকেন। হুতরাং যেরূপ শাস্ত্র লিখিলে রাজাদিগের দৃষ্টান্তে বেদার্থ প্রচারিত হয় তাহারা তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। নতুবা, তুমি পারমা অথবা ইংরাজি বিদ্যাত পণ্ডিত হইয়া তোমার সাংসারিক কচিৎক্ষণিক ইতিহাস বা পুরাত্ত অন্বেষণ করিলে, তাহার প্রতি তাহারা দূরিপাত করেন নাই।

সত্য যুগে দ্বাপর এই তিন যুগের পরিমাণ মানদীর্ঘ ৩৮৮০০০ বর্ষ। কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে ইক্ষাকু অবধি কৌরবসেনাপতি বৃহৎকাল পর্যন্ত স্বর্গানুগামী কেবল ৯৬ পুরুষমাত্র পাওয়া যায়। ইক্ষাকু সত্যযুগে প্রথম রাজা ছিলেন এবং বৃহৎকাল কলির আরম্ভেই কুরুদিগের একজন সেনাপতি হন। হুতরাং সত্য যুগে দ্বাপর এই তিন যুগে উক্ত ৯৬ পুরুষ মাত্র হয় যদি শাস্ত্র না বুদ্ধিরা সহসা ঐ মূলটী লইয়া কাল নিকূপন কর, তবে তোমার গণনা স্বার্থে হইবে না। কেহ বলিতে পারেন যে, প্রতি পুরুষে উক্ত গড়ে ৬০ বর্ষের হিসাবে ঐ ৯৬ পুরুষের রাজ্যকাল অর্থাৎ সত্য যুগে দ্বাপর এই যুগদ্বয়ের স্বর্গসংখ্যা, ৫৭৬০ বর্ষ অথবা বড় উক্ত ৬০০০ বর্ষ হয়। কিন্তু এরূপ গণনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। কেমনা জানিতে হইবে যে, উপরি উক্ত বংশাবলিতে কেবল কতিপয় প্রধান প্রধান রাজার নামমাত্র দৃষ্ট হইয়াছে, তন্নির অপরিকল্পিত বৈদিক দৃষ্টান্তের অযোগ্য, সমুদয় নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যথা—বিষ্ণু-পুরাণে (৪.৪) ইক্ষাকু অবধি বৃহৎকাল পর্যন্ত স্বর্গানুগামী যুগসংখ্যার কীৰ্ত্তন-পূর্বক পরিচয় করিতেছেন—“বৃহৎকালঃ যোহিহঁদবনয়নোভিমুখোভারতযুগে কল্যাণীয়াঃ। এতেহীকাকুপালা প্রাধান্যেন যোগোদিতাঃ। এতেষাকল্পিতাঃ।

সুদূর সমুদ্র-তীরে প্রবচিতে ।" অর্থাৎ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে নীচ অক্ষয়নগর প্রতিষ্ঠা। এই (স্বর্ষাবংশীয় শেখ রাজা) বুদ্ধদলকে বিনাশ করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট ইক্ষাকুবংশীয় প্রধান প্রধান ভূপালগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কহিলাম। যিনি এই সমুদ্র রাজগণের চরিত্র-বর্ণন করেন তিনি সমুদ্র পাশ হইতে যুদ্ধ করেন। মহাদি পাবানরের "প্রাধান্যোন রয়োদিতা" উক্তি-তেই প্রমাণ হইতেছে যে, অপ্রধান সমস্ত রাজগণের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও ইক্ষাকুবংশের বিবরণ স্মরণ করিয়া কহিয়াছেন "এতে নৈবস্বতে বংশে রাজানো ভূবিদক্ষিণাঃ। ইক্ষাকুবংশ-প্রভবাঃ প্রাধান্যোন একাধিতা।" এই আমি আপনাদের নিকটে বৈদ্যুত মহাবংশীয় ইক্ষাকুবংশের ভূবিদক্ষিণ রাজগণের বিবরণ প্রদানমতঃ কীৰ্ত্তন করিলাম। এপ্রবক্তা কির হইতেছে যে, সত্য হোতা দাপরে যত রাজা স্বর্ষা বা চন্দ্রবংশে হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহাদের মধ্যে কেবল কতিপয় ভূবিদক্ষিণ ও বৈদিক দৃষ্টান্তের উপযোগী প্রধান প্রধান রাজার নাম স্মরণ আছে। অবশিষ্ট সমুদ্রের পতিতাক হইয়াছে।

পুরাণশাস্ত্রের এতাদৃশ স্মৃতি উল্লিখিত পুরাণের লিখিত পুঙ্খ-সংখ্যার আত্মনামিক পরমাত্মর স্বাক্ষর ভারতের কাল-নিরূপণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ মানবের ১০০ বর্ষ পরমায়ু ক্রতিগিরি কল্পেও তাহা কেবল দাব্যক বাস্তবিকের প্রতি প্ররোপ হইবে। কেমন পূর্বকালে ভারতে যোগাচারের অত্যন্ত প্রচার ছিল। অনেক রাজা যোগবলম্পন্ন থাকার কীর্তনের বিদ্যমান-জনক-দেবপরমায়ু ছিল। সুতরাং পরমাত্মর গড়-চিহ্নের সংলগ্ন হইবে না। যাহাদের বাহ্যিক অঙ্গদ্বারে স্তম্ভের মতাকা ৬০০০ বর্ষমান তাহার ভারতের সত্য হোতা দাপরে এবং কলিযুগে অংশকে বহুদূর পাবেন তাহারই মধ্যে সন্দেহ করেন, ইহা শোভা-পন্ন; কিন্তু কোটি কোটি বর্ষের সূন্যতা ভারতমাত্মের ধীর সম্মানরক্ষা করাই পরমার্থ। এই সত্য ধারণ করা উচিত যে, যিনি বহুই গুণনা করেন, মানবসমাজ অসীম কাল হইতে-প্রবাসিত আছে। "প্রচুর ফল লবো পূর্ণ, গঙ্গা, বিহু, বঙ্গপুত্র প্রভৃতি-সমন্বী বাহ্য-উৎসর্গ, বিদ্যার প্রভাব, অর্থিক, উপত্যকা, গিরিপুত্র এবং গিরিপুত্র-সিমানয় বাহ্য শোভিতা তাহাই সেই সমাজের অঙ্গদ্বার।" আদি প্রজাপতিগণের শুভাকাঙ্ক্ষা

অনুসারে ঐ বর এই স্থানকে তাঁহাদের দশাবিধ কার্যে নিৰ্ব্বাচন করিয়াছিলেন। ইরান বা পারস্যদেশ হইতে আৰ্য্যগণের ভারতে আগমন হইয়াছিল বলিয়া যে একটা আধুনিক রব উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

৩১৩ খৃঃ পূঃ হইতে, ভারতের কালনিরূপণে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে। এষ্ট কলিযুগের ৪৯৮৪ বর্ষ গত হইয়া গিয়াছে। এই এক কল্পিত নং। পত্রিকার সৃষ্টি ভাষ্য হয় নাই। ভাগবতসমাজের প্রায়ো-চনীর্ কার্য্য নিৰ্ব্বাহার্থে উচ্চাঙ্গনাটন হইতে চলিয়া আনিতেছে। কলিযুগের আরম্ভ হইতেই পত্রিকাতে বর্ষে বর্ষে উচ্চর অব লিখিত হইয়া আনি-তেছে। উচ্চাতে উচ্চ অক্ষপাত সম্বন্ধে ভ্রম ও ভ্রমণ স্থান পাইতে পারে না। বিশেষতঃ কতিপয় সর্কবাদীদ্বয়ত ঘটনা কলিগত্যাকাটকে প্রমাণ করিতেছে। বিখ্যাত রাজহরসিংহী গ্রন্থে আছে, “শতেন্দু বটেন্দু সাংগেদু জ্যোতিষেদু ভূতলে। কালেন্দেদু বর্ষানামভবনু কৃৎপাণ্ডবাঃ কলির ৪৫৩ বৎসর গত হইলে কৃৎপাণ্ডবগণ অস্ত্রগ্রহণ করেন। পুরাণে আছে (বিঃ পুঃ ৪। ২৪, ভাঃ বঃ ১২। ৩) সপ্তদ্বিংশতি ১০০ বর্ষ করিয়া প্রতি নক্ষত্র ভোগ করে এবং পরীক্ষিতের রাজ্যকালে উহা মধ্যমস্থানে ছিল। কালিন্দ্যের জ্যোতির্বিদ্যাত্তরনে আছে “আগন্ মধ্যম্ যুগম্ শাসতি পৃথিবীঃ পৃথিবীয়ে কৃপতো। বহুবিন্দু পঞ্চদ্বিংশত শকঃ কালজ্যোতিষস্য।” পৃথিবীর রাজ্য-সময়েও সপ্তদ্বিংশ মবাত্তেই ছিল। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল পৃথিবীর অব ২৪২৬ ছিল। তখন সপ্তদ্বিংশত পুনর্কল্প নক্ষত্রে থাকে। অতঃপর হইতেছে। মধ্য হইতে পুনর্কল্প পঞ্চবিংশ। সুতরাং ২৪২৬ বর্ষই হই-তেছে। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে লক্ষ্য আদিত্য। এখন সময় ১৯৩৩ অব। উভয়ের ঘোলে এখন ৪৪৬২ পৃথিবীরাক হইতেছে। পৃথিবীর সময় ৬৪৩ বর্ষ পূর্বে কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দুই অতের সমষ্টি ৫১২২ বর্ষ হইতেছে। কিন্তু এখন কলিগত্যাকাট ৪৯৮৪ অতিবিক্ত ১০৬। এই অতিরিক্ত ১০৬ বর্ষ হয় সপ্তদ্বিংশতের নক্ষত্রভোগ কাল গণনার ন্যূনাধিক্যের অন্য কোন কারণবশতঃ পত্রিকা হইতে পরিভ্রান্ত হইয়া থাকিলেও কলিগত্যাকার অক্ষপাত যে অসঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখনও ৪৯৮৪ বর্ষ কলির স্থিত ক। এই পৃথিবী কালিকালের প্রবেশে

ধর্ম, শান্তি, শক্তি, মেধা প্রভৃতি মানসিক প্রকৃতি ; বল, আয়োগ্য, গৌরব, পরমায়ু, ধোম প্রভৃতি দৈহিকী প্রকৃতির এবং শস্য, ফলবানু, গৃহপাশিত পত্র, ভোতাভোজ্যের ভোগদা শক্তি প্রভৃতি বাহ্যপ্রকৃতি ; এ সমুদয় ক্রমে করজোস্ত হইতে চলিল । আর সমস্ত পুরাণেই কলিযুগে একই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী সকল দৃষ্ট হয় । যথা—কলিযুগে ক্রমে বর্ণাসম্পদহীন হইবে, দেবীকা উঠিয়া যাইবে, সকল ব্যক্তির শাস্তি নান্দত্বা হইবে, অর্থশ্রম শাস্ত্রের অর্থ্যতা থাকিবে না, কেনই জীলোকের দৌর্ভাগ্যবাহী হইবে, গৃহনির্মাণেই ধনসঞ্চয় বলিয়া মনে হইবে, ধনোপার্জনমার্গ সকলে বাজী ফেলবে, উপার্জিত ধন নিজ উপভোগেই পর্যাবসিত হইবে, জ্ঞানধর্মের উপার্জনে মতি থাকিবে না, অতিবিসংকার উঠিয়া যাইবে, আশ্রম শূদ্রে ভেদ থাকিবে না, মানবগণ জ্ঞান না করিয়াই ভ্রোজন করিবে, জীলোকেরা বহু সম্ভান জ্ঞানবান পুত্রক হইয়া যাবতী হইবে, শুক্লবর্ণ ও উজ্জ্বল অংগেরা বহু ভ্রোজন করিবে, তাহারা বিলাসপ্রিয়, সঞ্চারণী, মিষ্ট্র ও মিথ্যাভাবিনী হইবে, প্রচারণা শুদ্ধবর্ণের ও করভার পীড়িত হইবে, যাত্রা সে বাবলা নৈতহা ভ্রাগ করিবে, অনেকে কাককোষপন্যবী হইবে, যে সকল দেশে যব ও গোমুখ প্রভৃতি ফল বঙ্গে মানবগণ সেই সকল ফল আশ্রয় করিবে, অন্নবরসে নারীগণের সম্ভান হইবে, পাণ্ডুগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, গড়ক হু বিলম্বিত হইবে, মেঘ সকলে অন্ন প্রটি হইবে, বধাকাল উপস্থিত হইলে কেবল বায়ু গবাহিত হইয়া মেঘ সকল বিস্তারিত পারবে এবং মেঘ হইতে ইচ্ছাকৃত ফল বর্ষিত হইবে, মেঘে এমন আকর্ষ্য বর্ণণ করিবে যে, বলিবর্দের এক শৃঙ্গ সিক্ত ও অপর শৃঙ্গ শুষ্ক থাকিবে । মণিলাভের নিমিত্তে লোকে নদী বেগ রোধ করিবে, ভূমিমালাই উদয় ও নীরস হইবে, শস্যসমূহে অন্ন ফল হইবে, ফল শস্যের আবাদ ও ভেদ অন্ন হইবে, বৃকসমূহ আর নিষ্ফল হইবে, ধানাদমূহ অগুণী হইবে, গাভীগণের অভাব হইবে, জাগরু প্রকৃতি হইবে, পুণ্ডরিক পত্রই শুষ্ক হইবে, শ্যালকই পরম দ্রুত হইবে, পুণ্ডরিক প্রিয়ামালাকে অবজ্ঞা করিবে, পুণ্ডরিক পিতৃদিককে এবং বহু ব্রহ্মবিদকে অস্বস্তি নিয়োগ করিবে, শস্য শস্যের বৃদ্ধি বাবলুত হইবে, কেবল ব্রহ্মবিদই ব্রাহ্মণের ঠিক মাত্র হইবে, ব্রহ্মণী সকলেই এক জ্ঞান বলিবে, কার্যে নিয়োজিতপরাশর

ধাতিবে, সকলেই অতচ্ছাত্তোজী, মিলজ, নিম্পদ ও অতিভেদিত
হইয়া উঠিবে, ব্যাকোচ চপলতাই পাণ্ডিত্য মাত্র হইবে, পবিত্র পোষণ
মক্ষতা হইবে, ঘৃণার মতই মর্দ্যাবৃত্তি হইবে, প্রায়ই অন্যত্বের ভর উপস্থিত
হইবে, মধো মধো চর্চিক দেখা দিবে, ঘোরতর সুক, প্রবল কটিকা ও তরঙ্গ
অভিবৃষ্টি হইবে, এই প্রকার কমে কমে সকল মর্দ্য, সকল সুখ, সকল ভেদ,
সকল ভোগ ক্ষয় হইয়া আসিলে কলির শেষ হইবে । অতঃপর অবনতির
পর উন্নতি সীমাবদ্ধ । তাহা ইশবের নিয়ম । ঘোরতর ক্রোধ হইলে যেমন
কড়ি মুষ্টি উপস্থিত হয়, তাহার স্তায় ধরনীতে অধর্মের একশেষ হইলেই
প্রকৃতির শুভধর্মের পূর্ণকাল উপস্থিত হইয়া থাকে । তখন সেই শুভ
পূর্ণতা যেমন ভগবানের দামোদরাম মূর্তি বরুণে উদ্ভূত হয় । অতএব
কলিও যাচ্ছে যে, সেই সময়ে ভগবান অষ্টাবর্ষ উপস্থিত হইয়া মনু মূর্তির
কলিকলুহনাশক ককী নামে অবতীর্ণ হইবেন । তিনি সেই যোগেশ্বর
সুগন্ধ ও অমর-প্রাণের মধ্যে শুভ সময় সূচক ক্ষণিকায় দেবদত্ত ভূতসম
আভোগ ও ক্ষেত্র ভ্রমোন্মত্ত করাল ভবনাদি ধারণ পূর্বক প্রত্যক্ষোজী
মুগ্ধচৈতন্য কোটি কোটি ভ্রমোন্মত্তান সূক্ষ ও কলহ প্রিয় চন্দ্রাঙ্গণে
নিহত করিয়া সমগ্র প্রজাতির মনকে পবিত্র ও শান্ত করিবেন । পূর্ণ সত্য-
বাদের আবির্ভাব প্রকাশে শুধুমাত্র হইবে আবার সার্বিক প্রশা সকল প্রবৃত্তি
হইবে, সত্যসুখ আভাস হইবে, প্রজাতির জী, শান্তি, কোপ, পরমা, বদা,
বীর্ষ্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । তখন সেই পূর্ণসব মূর্তির শুভাঙ্গমন প্রকাশে
আলে পূর্ণতা বর্ণন করিবে, বস্তুকরা শস্যপূর্ণ হইবে, গাভী সকল দুগ্ধ
হইয়া সুমধুর দুগ্ধদান করিবে, এক সকল সলভত্রে অক্ষয় হইবে, পবিত্রভাব
কথিব্য বসুন্ধর, সামগ্ৰিক ও যাবৎ যাবৎ যাবৎ যাবৎ করিবে ।

এই এক প্রকার পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত সত্যবর্ণন বিশিষ্ট পার্শ্বভুক্তকর পূর্ণকাল
আগমনের প্রথম ৪২৭-১৬ বর্ষ অবশিষ্ট আছে । প্রকৃত প্রস্তাবে এখন
কলির প্রত্যেক কাল মাত্র ৮ শাস্ত্রে আছে (বিঃ পূঃ ২২৩১) তাঃ বঃ ১০
১০) “যদাচক্রক মর্দ্যাক্ত তথাপিবা বৃহস্পতি । এক রাশী সমেবান্তি
ভবিষ্যতি তদাকৃতঃ ।” যে সময় চক্র মর্দ্য ও বৃহস্পতি এক রাশিতে থাকিবে
পূর্ণকাল প্রাপ্ত হইবে, সেই সময়ে সত্যসুখের আবির্ভাব হইবে ।

এ সময়ও কলিযুগের যোগবলজক থখনা। সামান্য জ্যোতিষে তাহার প্রকরণ যদি কখনও থাকিয়া থাকে, তাহা একদা দুশ্চিন্ত।

কলিযুগটি তমোগমী। সত্যযুগারম্ভ যেমন সত্যযুগের উদয়যুগে সন্ধিকাল, কলিযুগারম্ভ সেইরূপ তমোগুণে ব্যক্তি হইতে আরম্ভ হয়। সন্ধিকাল, কলির শেষ সেইরূপ তমোগুণের অন্ত হওয়ার সন্ধিকাল। সত্য যুগটারই উদয়, ভোগকাল ও অন্তকাল আছে। প্রত্যেকালে যুগের উদয়, সময় দিন তাহান ভোগ, দিবান্তে অন্ত। তাহার পর রজনীর তমোমুষ্টি তদন্তে পুনঃ প্রাতঃসন্ধি। এইরূপ নিয়মে দিব্যাক্রি, পুষ্ক, বড়বহু, বর্ষ, যুগাদি, বজ্র, কল্যাণ চক্রের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে; ই রূপ নিয়মে সময়ও ও তমোগুণ, ব্যক্তি ও সমষ্টিভাবে জীবনমাত্রকে অবিকার করিতেছে; প্রাতে ম'নের ধাতু সত্যপ্রধান, মধ্যাহ্নে রজঃপ্রধান, এবং রজনীতে তমোগুণপ্রধান, সেইরূপ সত্যযুগে সাক্ষাৎভৌমিক মানবীর ধাতু সত্যগুণে পুষ্ট হয়, ক্রমে কলিযুগে তমোগুণবলি করে এবং পুনঃ সত্যযুগে সত্যগুণের সাহিত আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগ প্রকাশ-ধর্মীবিধায় তাহা শুদ্ধ বর্ণ বলিয়া কল্পিত হয়, রজোগুণ কামনা-প্রধান বিধায় তাহা রক্ত ও পীতবর্ণরূপে গৃহীত হয়, এবং তমোগুণ অগ্নিশক্তি ও প্রণয়-ধর্মী হেতু তাহা অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণরূপে বর্ণিত হয়।

সাক্ষাৎভৌমিক সমষ্টি যুগদ্বয় এই রূপে শুদ্ধ সত্যের সহিত সমুদ্ভূত হইয়া, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের রক্তিম ও পীত বর্ণ ধারণ রাগরঞ্জন প্রদর্শন পুঙ্খক কলিতে কৃষ্ণ রাক্ষস রূপে তমোগুণে পর্যাবসিত হয়। সেই সমষ্টি-যুগদ্বয় যুগভেদে ও বর্ণভেদে ভগবানের বেহ ও বর্ণ ধারণ। কেননা ভগবানই সমষ্টি চৈবিক ধর্মের আশ্রয় স্থান। অতএব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে “খাসন, বর্ণাহর্যোহ্যস্য যুগ্যতাঃসুখং তনুঃ। শুক্রোবক্তৃত্বা পীতং হৃদ্যানি কৃষ্ণত্যাগতঃ”। শুক্রবান বাহুবোব স্কল যুগেই কণেবর পরিগ্রহ করেন। ত্রিভুত সত্য, ত্রেতা যুগে যথাক্রমে ভীষ্মের শুক্র, রত্ন ও পীত এই তিন প্রকার বর্ণ ছিল। এখন এই কলিযুগে তিনি কৃষ্ণ বর্ণ ধারণাছেন। প্রকৃত যুগেই ত্রিভুত বর্ণ ও যুগের অতীত তেবল মানবের যুগধর্মের আশ্রয়রূপে এই কলিযুগের অস্তিত্বের তাহার রূপগ্রহণ।

হেমচন্দ্র ।

প্রথম খণ্ড ।

দশ পরিচ্ছেদ ।

এই মাত্র এক পল্লী দুটি হইয়া গিয়াছে, অকারণে এখনও পুষ্কিনের দশ নাট, এখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া হই এক কোটা দুটি পড়িতেছে। দশটা বাজিয়াছে। পাড়ারারে দশটা রাত্রি—নীলব, নিক্কিন, নিস্তক। আর ভয়মানের লাড়ানো নাই। অনেকেরই বাড়ী কলকার—অনেকেরই প্রাণ একত্রে হইয়া গেল। কেবল সন্নিহার বলিয়া তখনও দুই একটি প্রাণ অলিঙেছিল, কলিকা হইতে পানীর আগমন-প্রতীক। দশ ক্রিষ্টবৎসর দুই একটি দুবড়ী উল্লুফগবাক্ষে বসিয়া উৎসুক মনে ও চকম-চকম তখনও রাত্রি অগিতোছিল। আ ছি ছি ছি! এত গাংবেও কি বান সাংবেত আছে না? দুটির গোড়ার মুখ।

সেই আনের পূর্বে পাড়ায় একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। তাহা কলকারে ভীষণ দেখাইতেছিল। বাড়ী নিস্তক, কলকারময়। কেবল নীচের একতম প্রকাণ্ডে তখনও একটি কীর্ণাণোক অলিঙেছিল, সেই আলোক অপেক্ষাও জীবন্ত একটি রূপ। তখন অকাতরে বিছানার নিদ্রা হাইতেছিল; আর একটি আলিকা বসিয়া দীরে দীরে সেই কলকার পায়ে হাত বুলিতেছিল। কলকার গাতা। আর বারো দিন হইল তাহার মস্ত পোড়া হইয়াছে,—পেটের এক ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে—বুকে কাতর করিয়া তুলিয়াছে। দীর্ঘমেয়াদ চিকিৎসা হওয়া দূরে থাকুক, দেহিবার লোক পর্যন্তও নাই। পাড়ার লোকের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহারা তো বশতের কোমল। অল্প যদি কঠোর খালকপাড়ার অতিকোন্দলে একটুও মাংস পবিত, দেখিতে, পাড়ার কত ইনি-উনি-তিনি মনে মনে জ্বালাইয়া দেখিয়া দাইতেন। দিচ্চ হতজামিনী ক্রিষ্টবৎসর মনে দেখিতে তাহারা আদিবেন কেন? বাহারা বা মুখের আলো করিতে আদিবার ইচ্ছা করিত, গৃহিণীও কলকার আলিতে

মাহুল করিত না। বালিকারা ঘেঁষাটতে থাকিত, তাহাতে পরিবার অনেক পণনা করিলে স্রীলোকের মাংসা হাড়শটির কম হইত না; কিন্তু তাহা বা বড় মাংসে কি বউ; দুখীর জন্য কষ্ট করিতে হয়, তাহা তাহারা জানিত না। অথবা, জানিলেও করিতে ভালবাসিত না। সুতরাং দেখিবে কে? পুত্র নিকটে নাই, এক মাত্র কন্যা—মাতা বিছানার পড়িয়া—তাহারও সংসারে অশেষ কষ্ট। পণের সংসার, বিজ্ঞানের অবসর নাই। সুতরাং ক্রমশঃ দেখিবার লোক কোথায়?

বালিকারা নিত্যন্ত নিঃসঙ্গকীরা ছিল না। তাহার মাতা কতক আপনার মাতৃশ্রদ্ধা। কিন্তু দূরতুল্যগত সবধন বা তাহার শাখা প্রণাথগত এ কথা বুঝিত না, বাণ ও তাহাদিগকে কখনও ভাল করিয়া বুঝাইতেন না। বালিকার মাতা দরিদ্র ঘরের ঘরে, দরিদ্র ঘরের বউ ছিলেন। কোনও মতে দিনপাত হইত মায়। স্বামীই মৃত্যুতে একবারে অকুল পাণ্ডারে ভাগিলেন। বাৎসর বৎসরের বাণক ও অষ্টম বৎসরের বালিকা লইয়া বিধবা পণের কাঙালী হইল। বুকি, পেটের দায়ে আতি যায়। লোকলজ্জা হউন, নিজের উপকারের জন্য হউক, অথবা দয়া বা কর্তব্যের অহুরোধেই হউক, ব'নপো মাসিকে আপন সংসারে আনিবেন। বিধবা তথায় আদিয়া দেখিল, পাটিকার কর্ম তাহার জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। কি করিবে? আগম্য অদৃষ্ট ভাবিয়া তাহাতেই নিযুক্ত হইল। বাড়ীর এক এক জন এক এক প্রকার—অতি কষ্টে সকলের মন বোণাইয়া হাড়মাটি করিয়া বন্ধা আপন মতঃন দুটি মানুস করিতে লাগিল। তবুও লাগনা, ভিত্তকার, মুখভার, প্রভৃতি ধর্ম ছিল না। বড় কষ্ট হইলে বিধবা জ্ঞান পুতকনার মূণ দেখিয়া ভুলিত। পুত্রটি নিকটবর্তী একটি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। ক্রমে অনেকে ভাষার মেধা ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। বিধবা যখন তাহা শুনিত, জানিলে অধঃ নাড়িত। ঈর্ষা, হৃৎকরে পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত ঈর্ষদেবের নিকট প্রার্থনা করিত, স্বামীর জন্য নিঃশেষে এক বিদ্যুৎ অঙ্গ দেখা দিত, নিঃশেষে তাহা বুদ্ধিমানের কার্যে চলিত।

দেখিতে দেখিতে পুত্রটি এটেক পড়া করিল। ১৫ টাকা মূল্যের বস্ত্র হইল। বালক তখন মাতার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতার আদিত্য

কলেজে পড়িতে লাগিল। দুই পুত্র সহস্রে অনেকটা নিকিত হইলেন ; কিন্তু কন্যাও অন্য সদাই ভাবিতেন। কুলীন কন্যা—কন্যার পিতা মুগ্ধ কুলীন ছিলেন ; অনেক কটে একটি শত্রু ছুটাইয়া আট বৎসর বয়সেই কলকাত্ত—বিবাহ দিরাছিলেন। তাহার কিছু পরেই তাঁহান মৃত্যু হইল। কুলীন আশ্রয় সচরাচর বেরণ হইয়া থাকে তাহাষ্ট হইয়াছিল। কর্ণলতা কটকবুকে অঁড়িত হইয়াছিল, মুক্তার হার বান্ধের গলার উদ্ভিদ্ভাছিল। বিবাহের পর বার কএক মাত্র আশ্রয় দেখা দিয়াছিলেন। কন্যার যেমন প্রাণ ওগে সেইরূপ—তেমন স্বামীকেও দেবতার নামে ভক্তি করিত, তাহাও সেবার শরীর মন চলিয়া দিত। বিধবা ভাগা যখন দেখিত, মনে মনে একটু ক্রোধিত, কন্যার অন্য কাহ্নেরে উত্তেবতার করণা ভিক্ষা করিত। কুলীন আশ্রয় কন্যাকে নিয়ালিয়ে লইয়া যাউত না। মালিকের বয়সে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। নিজে বেকপে হর চলিয়া বাইত, এমন সময়ে কন্যা লইয়া পরগুহে থাকা বড় তাহনার কথা। কন্যাও ভাবিত। স্বামীর স্বভাব ভাল ছিল না তাহা সে জানিত, বয়সাগণ আপন আপন স্বামীর কথা পাড়িলে কটে ওথা হইতে সরিয়া যাউত। আপনার অনুধিক দিক্কার দিত, কিন্তু সে অন্য স্বামীকে উদ্দেশ্য করিয়া নপনও কিছুই বলিত ভাবিত, নিজে কাছে থাকিলে তাহার চক্রিয় শোধ্যাইতে পারে,—কিন্তু স্বামী লইয়া বাইতেন না। এই জন্য এক এক বার স্বামীগুহে যাউতে বড় ইচ্ছা হইত ; আবার, মাতার কটে দেবিয়া তাহার কাছছাড়া হইতে ইচ্ছা করিত না। সে দেবিত, মাতা বুকা—এই বুকাই স্বামীর পীড়া বনতঃ এক দিনও না পালিলে কেহ তাহার কাজ করিত না, সমস্ত কটে ঠেলিয়াও তাহাকে এত লোকের রক্ষনা দি করিতে হইত। বালিকা সর্বদা তাহার সাহায্য করিত। আপনিক পারিলে মাতাকে পাকশালায় বাইতে দিত না আজ করদিন মাতার পীড়া হইয়াছে, হুট বলাই বালিকা রক্ষনা দি করে। বাড়ি ময়টী পুখার রক্ষনা দি করিয়া সকলকে আহার করাইয়া বালিকা তাজ লইয়া গুহে আসিল। মাতা তখন নিদ্রা বাইতেছিলেন। কথনমতঃ অনেককণ তাহাকে দেখিতে পারে নাই, অনেককণ তাহার কাছে বসিয়া তত বলাইতে গুহে নাই— চকের মল মুছিয়া বসিয়া বালিকা মাতার গায়ে

বুলাইতে লাগিল । শনিবার—তা'র আদিবার কথা ছিল । সন্ধ্যা হইতেই
তুষ্টি আরম্ভ হইয়াছে,—এখনও জানা আসিলেন না । বালিকা বড় ভাবিতা
হইল । বুঝা সন্ধানের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাটয়া পড়িয়াছে—বালিকা
তা'হার পাশে বসিয়া উঠনা ছইয়া জাকার অন্য ভাবিতে লাগিল ।

হুপ্ হুপ্ হুপ্ । বাহিরে দরজার আঘাতের শব্দ হইল । রুদ্রার নিজা
ভাঙ্গিয়া গেল চাহিয়া দেখিল—নিকটে কন্যা বসিয়া রহিয়াছে । বলিল—
“মনোরমা, মা, হেন কি আসিয়াছে ?” বালিকার নাম মনোরমা । মনো-
রমা বলিল—“না মা, দাদা এখনও আসেন নাই । বাহিরে কে দরজা
ঠেলিতেছে, আমি বাই ।”

বুঝা বলিল—“হাঁ, মা, দরজা খুলে দাও দে ।” বাহা না জানি
রুষ্টিতে কত কষ্ট পেয়েছে !

মনোরমা অন্য একটি প্রাণীপ জাতিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল ।
ভাকিল ‘দাদা !’—কেহ উত্তর দিল না । দরজার নিকটে গেল । দেখিল,
দরজা কে খুল করিল কিছু বুঝিল না । কিন্তু একি ? মনোরমার
কথা গঠিল না । দেখিল—বাহী ।

এই সময়ে আর একটি বালিকা ধীরে ধীরে বুঝার ঘরে আসিল । বুঝা
পূর্ণ চাহিয়া ছিল, বলিল—“কে হেঁম এলি !” বালিকা বলিল—“না, তিনি
এখনও আসেন নাই ।” বুঝা বুঝিল, এ মনোরমা নয় । মনোরমা নয়—
দিদাম বলিল, “মা, তুমি এখনও ঘুমাও নি ।” বালিকা সে রুদ্রার
উত্তর না দিয়া বলিল—“আপনার মায়াই আসিয়াছেন ।”

“কে, রামকৃষ্ণ !”

“হাঁ ।”

বুঝা ওইদা ছিল, উঠিয়া বলিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

“মা”—~~বুঝা~~ বুঝা ধীরে ধীরে কতকণ পথে বেগ আসিয়া ভাকিল—“মা !”
মা বসি গেল । বুঝার বিনোদ্য অমৃত মাংসরা একই শব্দ গড়িয়াছিল ।

রোং রপে হউক, বনে হউক, রোগে হউক, শোকে হউক, দুঃখত্রণা
পরিপূর্ণ এই সংসারে আদিয়া 'বে' কখনও জ্ঞান ভরিয়া 'না' বলিয়া
ডাকে নাই, তাহার দ্বার অন্ধ। এমন কথা আর আছে কি? চিত্তাস
জ্ঞান—জ্ঞান লাভনা, বিপদে ব্যক্তি—এমন কথা আর আছে কি?
যাহা উচ্চারণ আর সকল সন্তাপ দূরে যায়, বাহা যখন বলি তখনই যেন
অন্তত করিয়া করিয়া করিয়া পড়ে, অপর পবিত্র ভক্তির সঙ্গে উচ্ছলিত হইয়া
উঠে, শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া কি এক অকৃতপূর্ণ হৃৎ উথলিয়া পড়ে—
এমন কথা আর আছে কি? শঙ্করাচার্যের দ্বারা সামগ্রী, মহাভারতের
ভক্তির শেষ সীমা, কলুষিত পৃথিবীতে অমরবতীর পবিত্রতা—অনন্তমণী
সন্তাপনা শুনী এমন কথা আর আছে কি? এভাবে দারুণ কঠোর পর বাটী
আদিয়া একবার 'মা-মা' কথাই বলিয়া ডাকিয়া যে কত হুণ—কত
আনন্দ তাহা যে কখন অস্তিত্ব করিয়াছে সেই জানে। হেমচন্দ্র এ
অগংসংসারে থাকিয়া তাহা ভিন্ন অন্য হৃৎ কখনও ভোগ করে নাই,—অন্য
হুণও তাহার তত্ত্ব স্পৃহণীর ছিল না। হেম ডাকিল—'মা!'

সে মধুর শব্দ তাহার মাতার কর্ণে পশিল। কদা বলিয়া ছিল, দেখিল
হেম সম্মুখে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে। মুহূর্ত্তের অন্য যে প্রাণে
চয়নক বসন্তও ফুলিয়া গেল। আনন্দে জ্বর আস্ত হইল, অনিমিক
নয়নে পূজরূপ নিরীকণ করিতে লাগিল। একদিশ অঙ্গ মননযোগে
বেধা ছিল। উঠিতে খেল, পারিল না। হেম তাহা দেখিল, বলিল,—
'মা, উঠিও না, অস্থির বাড়িবে—ওইরা বাক।' কদা ওইল না, বহিয়া
রহিল। পূজকে একবার ভাল করিয়া দেখিল। দেখিল, হেমের
শরীর শীর্ণ, সেই শীর্ণ শরীর জলে ভিজিয়াছে; পায়ে পাটলা নাই, নুঁকি
মাথায় ছাতিকা ছিল না, সর্বাঙ্গ দিয়া জল খড়ইয়া পড়িতেছে। হাতে
একটি ক্যান্ডিলের বাগ—তাহাও ভিজিয়া ভরি হইয়াছে। নিকটে
বিরাজ দাঁড়াইয়া ছিল; হাত হইতে ব্যাগটি লইয়া ভূমে নামাইয়া রাখিল।
কি ভাবিয়া বিরাজ তথায় আর দাঁড়াইল না, গৃহের বাহিরে গেল। কদা
এ সকল দেখিল, চকের জল হুঁহুয়া বলিল—'শোকা বিবাতা হতভাসীর
হরণ লিখিলে—না কেন?'

হেন বলিল—“এখন কেমন আছে না ?”

“আমি ভাল আছি। যাও, বাবা, আগে কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এস।

হেন বুকের বাতিলে অবিল। বেশিল—মল, গামছা, কাপড়—
প্রয়োজনীয় সকল জবাই সম্বিষ্ট রহিয়াছে, একপাশে বিরাজ নিতকভাবে
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বুদ্ধিল, এ সকল বিরাজের কথা। হেন বিরাজকে
আনিতে—বুদ্ধিল, বিরাজ কেন তখন হঠাৎ বৃহ হইতে চলিয়া আনিয়াছিল।
বলিল—“বিরাজ ! এখনও যে শোও নাই ?”

বীরে বীরে বিরাজ বলিল—“ওইবাছিগাম, মুখ ধর নাই।”

হে। কেন ?

বি। হোসান যে আকিবর কথা ছিল। কি জানি যদি দোর খোলা
না পাও ?

হে। কেন, মনোরমা কি ঘুমাটাইছে ?

বি। হেম, মনোরমা বড়, না আমি বড় ?

হে। তুমি বড়। কিন্তু সে কথা কেন ?

বি। সে আশাপেক্ষা ছোট। সে যদি আগিতে পারে আমি না পাবি
কেন ? হেম, তুমি কি আমার পরামর্শ কর ?

হেম অপ্রতিভ হইল। বলিল—“আমি তাহা বলি নাই। তারি
অনেক হইয়াছে, এখনও শোও নাই আনিলে, তোমার দিদি সে ভোমার
বকিবেন।”

বিরাজ বুদ্ধিল, হেমের কথা শুনা। বিরাজ মনোরমা বা মনোরমার
মাতার সহিত সর্বদা আলাপান্তি করে উহা বিরাজের মাতা বা তাহার দিদি
ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা ভাবি না বাসিলেও বিরাজ তাহা করিতে
ভাঙিত না। সে তাহা না করিয়া কেমন করিয়া থাকিবে ? বালিকার
সুত্র প্রাপ্তি বধন পবের জন্য কাপিয়া উঠিত, তখন কে কোম মতেই দির
থাকিতে পারিত না। তোমরা এ বালিকাকে দোর দিও না। সে জন্য
তাহার মাতা ও ভগ্নী সবয়ে সময়ে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কর্তব্য ভুৎননা
করিতেন। কিন্তু কেন তাহারা এতপ করিতেন, বিরাজ গরল মনে ডাক্ত

হেমচন্দ্র ।

বুঝিয়া উঠিতে পারিত না । বিরান বুলিল, হেমের কথা সত্য । বলিল—
“লে অন্য ভাবিও না, তেদিয়া আনিরাছি, সফলে যুগাইয়া পড়িয়াছে ।”

হেম আর কিছু বলিল না । হাতে, মুখে, চোখে, কপালে, পাশে মল
হিয়া ক্রাপড় ছাড়িল ।

হেম গৃহে আসিলে ভাতার মাতা তাতাকে কিছু থাকরাইবার জন্য নাহুল
হইলেন । কিছু কি দিবেন ? কিছুই নাই । ঢেকে মল আনিয়া । একটি নিখাস
ফেলিয়া মনে মনে বলিল—“নিখাসা রেখা বিলে, চুড়া বিলেনা ‘মন ৩’”

হেম উঠিয়া মাগের কাছে বসিল । বলিল—“মা, মনোরমা কোথায় ?”

“বুড়ি বাহিরে আছে । রাম কৃষ্ণ আনিয়াছেন ।”

হেম মাতার গারে হাত বুলাইতেছিল । বুড়া বলিল—না বাবা এমন
পাক । আত্মা বুঝানি শুধাইয়া গিয়াছে । মাত, আগে রামকৃষ্ণকে
ডাকিয়া দুই জনে কিছু পাও, আসি দেখি ।

হেম রামকৃষ্ণকে ডাকিতে উঠিল । দরবার নিকট না ঘাইতেই পিরাড
আনিয়া বলিল—একটু বস । এই খাবার আনিরাছি খাও ।”

হে । ইহা তুমি কোথায় পাইলে ?

বি । বেথানে পাই না কেন, বিতেছি খাও ।

হে । না, আমি খাইব না । তোমার খাবার আমি খাইব কেন ?

বি । আমার অন্য খাবার আছে । তুমি ইহা খাও, না খাইলে বড় কষ্ট
পাইব ।

হেমের মাতা বলিল—সে কি মা । হেমের ভাত আছে, হেম তাতা
খাইবে, তুমি কি খাইবে না ?

বি । না, আমি আনি জো বদিতেরি, আমার অন্য খাবার আছে,
ইহা আমি উৎসব জন্যই আনিরাছি ।

হেমের মাতা বুড়া, তত দূরদূরী ছিলেন না । তার সন্তান কুচিত,
আহারও নিকটে রহিয়াছে । পুত্রকে এ সময়ে খাওয়াইতে পারিলে মহা
সুখের—এতকণ তাক পাবেন নাই বলিয়া হেমের দীর্ঘা ছিল না । বুড়া
সকল ডাবিল মা, বলিল—“আত্মা । বিরাজ আধরে লক্ষী মেয়ে । তা নিখাস
খত করিয়া বলিতেছে, হেম তুই কেন না’ না, বাবা ।

হেম হঠাৎ মৃত্যুর বিরামের পক্ষ, বিরামও চাড়িতেছে না । হেম আর কিছু বলিল না । তখন, কামরুকের জন্য তাহা হইতে এক ভাগ বাণিজ্য দিয়া, মহানন্দে বিদায় তাহা এক একটা করিয়া হেমের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল । কুশাবও উজ্জেক হইয়াছিল, হেম আগ্রহ করিল । হেম ~~স্বাধীন~~ না, ইহা ভিন্ন বিরামের অন্য বাবার ছিল না । আনিল না যে, ইহা তাহার দশমীর বাবার । বিরাম বাণবিদবা । পরদিন একাদশী ।

মথুরায় ।

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাশরী নাই ।

বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই !

শ্রুতিয়া গেল অলি,

প্রজাপতি গেল চলি,

তকান বকুল গাছে ফুলে ফুলে গেল ছাই !—

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাশরী নাই ।

মলয় বহিল ধীরে,

মোছনা ঘুমাল নীরে ;

খিগিনী নাচিল ডালে, পাখী উড়ে গেল গাই !—

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাশরী নাই ।

ছুরিনী নগন মেলে,

তরুণলে গেল বেলে ;—

তটিনী কুলেতে ফুলে ব'লে গেল বাই বাই !—

আমারি হ'লো না গান আমারি বাশরী নাই ।

কুবক বাজারে বাণী,

চলে গেল হাসি হাসি ।

শালিকারা ঘরে গেল, মালায় মডন ফুল পাই।—

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাশরী নাই ।

সনি ভেসে গেল চোখে,

সনি কেঁপে গেল মুখে !

জাগে র'য়ে গেল দূর, ভাবের পেখনা বাই !

বসন্ত যে এস গেল, ব'সে আতি শূন্য চাই !

শ্রী.মহাকবিমাত্র বড়াল ।

প্রণয় ও বঙ্গীয় কবি ।

মহুবা-জদর কবির বড়ই আদরের সামগ্রী । আর ইহা বাস্তব মহুবারই বা আছে কি ? মহুবার জীবন যেমন প্রয়োজনীয়, জদরও সেইরূপ প্রয়োজনীয় । জদরহীন মহুবা সজীব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু মহুবা নামের ঘোপা হইতে পারে না । জীবন আমাদের কাছে অড়প্রকৃতি হইতে পৃথক্ রাখে, কিন্তু জদর আমাদের সেই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে । মহুবাদেহের পক্ষে জীবন বেকপ, জীবনের পক্ষে জদরও সেইরূপ । এ দেখ হইতে জীবন চলিয়া গেলে যেমন এ দেহের স্মার কিছুই রহিল না, সেইরূপ জীবন হইতে জদর বাদ দিলে এ জীবনের আর কিছুই থাকিল না । মূল কথা জদর জীবনের জীবনবরূপ । সেই জন্যই বলিতেছিলাম, মহুবা-জদর কবির বড়ই আদরের সামগ্রী ।

যিনি এই জদর বিশ্লেষণ কার্যে বক্তব্য কৃতকার্গ হইতে পারিয়াছেন, তিনিই তত উচ্চদের কবি । এই জদরই কবির অন্তঃপ্রকৃতির সারসংক্ষেপ, এবং ইহাই কাব্য-কাননের গোলাপ ফুল । যে কবি মাত্র বাহ্যপ্রকৃতিকে লালন করিয়াছেন, তিনি কখনই উচ্চদের কবি হইতে পারেন নাই । জদরের কৃতি সকল, কবি যেমন অন্তররূপে পৃথক পৃথক করিয়া আমাদের কাছে দেখাইয়া দিতে পারেন, অন্য কেহ আর সে রূপ পারেন না ।

প্রথম মধুসূদনের একটি প্রধান বৃত্তি মধ্যে গণ্য। ইহা নবপ্রদান না হইলেও সঙ্গাশেখা আশারাম ও প্রীতিপদ। এমন মধুসূদন কে আছে যে পবিত্র প্রার্থের পবিত্র ছবি দেখিলে মোহিত না হয়? মৌচকন সহিত চন্দ্রকর যেরূপ সঙ্গর্গ, সন্দেহের সহিত প্রবোধেরও সেইরূপ সঙ্গর্গ। উভয়ের কেহই অপরের বিরহ যেন মচা করিতে পারে না। সেট ভনাই নিকটে পাঠলেই যেন কোলে টানিয়া লয়। আবার প্রথম যেতপ আমাশিগের জগৎকে কোমল কবে, অন্য কোন বৃত্তি লেগে করিতে পারে না। প্রথমকে যিনি যেরূপ চক্ষে দেখুন না কেন, কিন্তু আমরা এ কথা বুঝকণ্ঠে পৌঁছাই করি, যে প্রথমই ছন্দেয় স্বরভূত বক্ষা করিতেছে। এবং ছন্দেয় অনেক ছবি উৎকৃষ্ট বৃত্তির প্রথমই কল্পনাত্মক। সেট অন্য এই প্রথম লইয়াই সকল কবি উৎকৃষ্ট; এবং আমরাও কবির অমাহুতিক কল্পনামাশি প্রভাবে প্রায়েই অপরূপ ছবি চিত্রিত দেখিয়া মোহিত হইয়া যাই। যদি কবির সহিত প্রথমের একটি বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গর্গ না থাকিত—তবে কল্পনাপ্রবৃত্ত প্রথমের ছবি দেখিয়া আমরা এতদূর মোহিত হইত কেন? সেই ভনাই কবিতা অমান্য বৃত্তি অপেক্ষা এই প্রথম বৃত্তিকে প্রবোধের মধ্যে উচ্চালন দিয়াছেন।

দ্বন্দ্বদেশে আশ্রয় বাহা কিছুই অত্যন্ত থাকুক না কেন, কবির অভাব কখনই হয় নাই। অভাব দূরে থাকুক, বরং কবির কিছু বেশী ছড়াছড়ি ও বেশী বাড়াবাড়ি দেখিলে লাগে বাহ্যিক। ইহার কারণও আছে। বাঙ্গালি বড়ই স্বদ্রব্যান। সেট ভনাই বাঙ্গালীর কবির সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু কবিত্বের রূপ ছড়াছড়ি ও বাড়াবাড়ি দেখিয়া অনেকেই ভীত হইয়া থাকেন। উৎসাহ নহে কঠিনা থাকেন, বৃত্তি কোন দিন বা কথিতার স্রোতে বদলে ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আমরা লেগেই নহে কবি না, কারণ বাঙ্গালীর কবির সংখ্যা অধিক হইলেও উচ্চশ্রেণীর কবির সংখ্যা অতি অল্প। তুমি আসি হুই চারি ছন্দ অমিত্রাকর বা মিত্রাকর লিখিত হইলে একটি বৈশিষ্ট্য কোমল ক্রমে ভাঙাইয়া লইয়া বাহিতে পারি মর্মা। বাঙ্গালীর কবির সংখ্যা যদি এতদূর অধিক হইত তাহা হইলে আমরা আজ উপলব্ধি শীঘ্র বিঘ্ন এইরূপ গবেষণা করিতে সাহসী হইতাম না। কয়েকজন বড়ী প্রদান কবি

এদেরই কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র তাহাই দেখাইতে আমরা এত প্রবন্ধে চেষ্টা করিব ।

— বাঙ্গালার আদি কবিদিগের কথা মনে হইলেই বৈদ্যনাথ কবিরাজ আসিয়া পড়ুক—এই সম্প্রদায়ের কবিদিগের নিকট বাঙ্গালী ভাষা বিশেষ স্বামী । ইচ্ছাদিগের কবিতায় কবিত্বশক্তিরও বিকাশ ঘটিয়া পাওয়া যায় । বাঙ্গালদেশে প্রথম বর্ণনার অনেক স্থলে প্রণয়ের বড় স্থান চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । এই সম্প্রদায়ের প্রথম কবি অরুণকব । কিন্তু অরুণকবকে আমরা বঙ্গীয় কবি মধ্যে ধরিতে পারি না । যদিও অনেকে “চল লবি কুলং” প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালী ভাষার ছন্দোবদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায় । অরুণকবকে তাড়িয়া দিয়া আমরা বিদ্যাপতিক বাঙ্গালার প্রথম কবি বলিয়া ধরিব । বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও অনেকে অনেকে কথা বলিয়া গায়েন । কেহ বলেন, তিনি বাঙ্গালি নহেন, মিথিলায় ইহার নিবাস, সেই জন্যই ইহার কবিতায় হিন্দির এতদূর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু আমরা এ স্থলে সে সকল প্রবেশণায় অবতরণ করিব না । বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির ভাব অধিক পরিমাণে মিশ্রিত বলিয়া অনেক স্থলে তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না সত্য, কিন্তু বোধগম্য না হইলেও তাহার স্তরে স্তর স্তরে অর্থবোধের জ্বরতরঙ্গী বাগ্মিয়া উঠে, মন মুগ্ধ হইয়া যায়, স্বপ্নের স্তরে স্তরে একটী আনন্দলহরী সেন বেলা করিয়া বেড়ায় । বাস্তবিক, যখনই আমরা সেই কাব্য কাননে প্রবেশ করি, কোথা হইতে যেন সেই কবিতা-কুলুমের স্বর্গীয় পরিমল বহিরে আবেশ করে, সেই পরিমলের স্রি যে যে-বিনোদিত তাহা জানি না, কিন্তু তাহাতেই আমাদের মন গলিত-আর্জ হইয়া যায় ।

এখন, বিদ্যাপতি এ প্রণয়ের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, দেখা যাক । একটল উদ্ধৃত কবিতা দেখাইতেছি ।

লমি কি পুচসি অম্বুতব মোয় ।

সোই পিরীতি অমুরাগ বাগ্মানিতে

কিলে কিলে নুতন হোয় ।

অনম অরুণি স্বপ্ন রূপ নিহারহু

কল্পনা ।

নয়ন ন তিরপিত ভেল ।

শোভি মধুর দোণ শ্রবণে শুভম

ঋতি পথে পরম না গেল ।

কত মধু-ধামিনী রতনে গোখরম

না ব্রহ্ম কৈটব কেল ।

লাখ লাখ যুগ চিরে চিরে রাখম

তবু কিয়া হুড়ন না গেল ।

ইহাটি প্রণয়ের মুদ্রকর ছবি । যে প্রণয় গভীরতার অগাধ, অতীন্দ্রস্পর্শ তাহাই এট খলে উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে । প্রণয়িনী প্রেমের কথা যতই বলিতেছে, ততই যেন নূতন হইতেছে, সে কথা যেন কখন পুৰাতন হয় না । প্রণয়পাত্রকে দেখিয়া তাহার নয়নের তৃপ্তি হইতেছে না, গেকপ দেখিয়া আত্মরস অন্য দিকে ফিরিতেছে না, তাহার কথা শুনিয়াও তাহার কার্য পরিত্যক্ত হইতেছে না, যত শুনিতেছে ততই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে, কত রাজি প্রেমাল্পগনে কাটিয়াছে তথাচ তাহার বিষয় সে কিছুই নুষ্টিতে পারিতেছে না । হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার হৃদয় জুড়াইতেছে না । প্রণয়িনীর সকলি হইয়াছে, তথাচ তাহার যেন কিছুই হয় নাই । ইহা প্রণয়ের চরমোৎকর্ষ না হইলেও মুদ্রকর বটে ।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলেই প্রণয়ের এইরূপ শুল্কর ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহার কোন কোন স্থলে অনেকের মতে অস্বীকা দোষ স্পর্শ করিয়াছে, বর্তমান শুল্কটির ভাবে সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে না চান হয় না । স্থানে স্থানে ভোগাভিলাষ পরিত্যক্তির আকাঙ্ক্ষাও দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু সে সমগ্রকার সঙ্গ ও শিকার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে আশ্রয় করিলেই দোষী কল্পিতে পারি না । আর নৈকর দর্শনের প্রেম সর্বব্যাপী প্রেম, সুতরাং এই বর্ণনায় সে প্রেম নিকলক । বিদ্যাপতি সেই প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া অনেক প্রেমিকজনদের হৃদয় তরলী নাচাইয়াছেন । বিদ্যাপতির পদাবলীতে অল্পাধিকারজিত, শুল্কটিপরিচায়ক, প্রণয়ের শুল্ক দৃশ্যও অনেক আছে । তাহা আমরা বারম্বার দেখাইতে চেষ্টা করিব ।

[ক্রমশঃ]

বুঝি কেহই নাই। কুলীন সম্রাটের যেখানে এত অপমান সেখানে থাকিতে নাই। ভাল, তুমি থাক, আমি চলিলাম, এমন জানিলে আসিতাম না।”

রামকৃষ্ণ বাহিবার উপক্ৰম করিল, বাকুলতার সহিত মনোরমা তাহার পা জড়াইয়া বলিল, চোখের অশ্রু সে পদতল স্নানিত হইতে লাগিল। অনেক রামকৃষ্ণ সে পা ছিনাইয়া ঘাইবার চেষ্টা করিল; বালিকা তাহা ছাড়িল না। নিষিদ্ধে কলম বাধিয়া আনিষ্ঠিতছে, পার্বণ্ড সেই কোমল অঙ্গে পদাবত করিল।

হেমচন্দ্র ইহা দেখিল। আর দাঁড়াইতে পারিল না; ঘাঁরে ঘাঁরে সাধা পরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

এইখানে রামকৃষ্ণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যিক হইতেছে। রামকৃষ্ণ সোণের পাঞ্জলি, হুগা কুলীন। পিতার নাম ৯ রামহরি পাঞ্জলি, পিতামহ ৬ রামরহন পাঞ্জলি, প্রপিতামহ ৩ বাস্তবাম পাঞ্জলি—ইত্যাদি ইত্যাদি। কেহ বিজ্ঞানিলে তাহার কুলচী আওড়াইয়া রামকৃষ্ণ এইরূপে নিজের পরিচয় দিত। কিন্তু সময়ে সময়ে গ্রামের কয়েকজন ছুপ্ত লোক নিম্ন গোলযোগ ভুলিয়া তাহার পিতৃ-পরিচয় সবকে একটা সন্দেহ রটাইয়া দিত। স্নাত্যনাহের গৃহেই রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ যখন মাতৃগর্ভে তখন তাহার বাতানুহী একদিন পাড়ার পাঁচ লাভ দশ জন প্রৌলোক জড় করিয়া অনেক কৌশলে (কিছু একটা পরিপাকের জন্য) বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে তাহার জামতা—কে জানে কেন ইতিপূর্বে একদিন হঠাৎ অনেক রাজ্যে আসিয়া তাহার ভোর না হইতেই চলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু পাড়ার দুই একটা অট্টালা-কুট্টালা আজও সে বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করে; আজও তারা কানাকানি করে, চোক মট্কাইয়া হাসে, এবুৎ পরস্পরে বলারলি করে—সেবাস জানেন! কিন্তু এসেই বিষের রাত্রি ভিন্ন তো আর রামহরি পাঞ্জলিকে তাহার খণ্ডরাজ্যে কেহ কখন ঘেঁষে নাই।” বাস্তবিক, আমরাও পিতৃপুত্র হুজে শুনিয়াছি, সেই বিদ্যাহাবলির পর রামকৃষ্ণের উপনয়নের দিন রামহরি-খণ্ডরাজ্যে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন। কন্যা প্রসব হইয়াছে শুনিলে রামহরি কখনই সেমুখো হইতেন না, কিন্তু শত্রুর জন্ম সংবাদে সানন্দচিত্তে খণ্ডরাজ্যে গমন করিলেন।

যথার্থিত উৎসাহকার্য্য হইয়া গেল। দু'লীন আশ্রয় শোভা নামলাদিকে
 পারিত। তা; লাতের পবীত্ৰব্য বিবেচনায় শব্দটি স্বীয় নিকট চাহিয়া গেল।
 বখা বাতলা, বাগকের মাতৃপক্ষ কেহই তাহাতে আপত্তি করিল না। অতঃপর
 নামকরণ স্তিতগরে আনিবের।। রামহরির শেষ দিন ঘুরাইল। রামকৃষ্ণ
 শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে বাড়িতে আসিলেন। ক্রমে বটক, বটকীন
 কলচিতে তাহার বাড়িতে টেকা ভাব হইল।। রামকৃষ্ণ আপনার পৈতৃক
 মা'মায়া 'মবলক্ষণ করিলেন।। রামকৃষ্ণ মাতৃপর্ভ হইতে বাহির হইয়াই
 কলেব, বহিকলী, সুভাং লেখা পড়ার সময় কোথায়? রামকৃষ্ণ বসনে
 কখনও কানির আঁচড় পাড়েন নাই; কলীনাটিকানবলগ্নে, সহিতও তাহার
 একটা বিশেষ লাঠালটি ছিল।। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? নব গণ
 অধ্যাপণে বাড়ির, বলাগতননের নাম 'অক্ষয়' হউক, দেবীর বটক 'রামকৃষ্ণ'
 পর্ক ভোগ করুন; তাহাধিপের আসিয়া তাহার সকলক কলে কিছুকি
 বলন্ত স্পর্শ করে নাই। সমাজে মানের কিছুমান হানি হয় নাই। কলীনা
 মহলে, বটকের দলে তাহার বিশেষ একটা প্রতিপত্তি ছিল। সেখানে
 মলাদানি হইত, সেখানে রামকৃষ্ণ মাথে দলপতি; সেখানে বিবাহদির
 সভা হইত, সেখানে বাগচীসনের ছাপ আগে তাহার গোপা; পা' ক্রিভাধনে
 কে পাতে বুদ্ধকায় সংসারও শোভা পাইত, সকলেই বহিত; সে পাঠের
 মাসিক—রামকৃষ্ণ শব্দ।। রামকৃষ্ণ কলেব, পৌরদের মাটিতে গা' নিত না।
 তাহার, এবং বিশ্বাস, তাহার পণ্ডের প্রায় অনেক বাড়ী পুতি হইত, অনেক
 অর্থক্ষণ আশ্রয় হইয়া হইত।। রামকৃষ্ণ কই একটা ছিট। জানিতে অভ্যাস
 করিয়াছিল।। অভ্যাসের নব, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবাহের সংখ্যাও অনেক
 বাড়িয়াছিল।। রামকৃষ্ণের সকল ধর্ম্ম আশ্রিয়াও অনেকের গিতা কুল;
 মধ্যোধ্য রক্ষক জনক অর্থক করিয়া মনেমরকে তাহার মাতে অর্থন করিয়া
 ছিলেন।। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা।। এখন রামকৃষ্ণের বড়াস আভ্যন্ত
 বাড়িয়া উঠিয়াছে, রামকৃষ্ণ একটি প্রকাণ্ড জলিধোঁয়া' নিবেশ আস্থার
 মা'মান ছিল না কোনও হইক বাড়ী লইয়া দিহিরে কেমন করিয়া?। গুলির
 পয়সার অভাব হইলেই রামকৃষ্ণ একবার 'দীমহল' চারিদিকে ঘুরিয়া আসিত।
 যে কোণেই হউক যামুর কাছে বাহা পাইত—হইয়া গ্রহান করিত।

আপনার অভিশ্রম সাধন-উদ্দেশ্যই রামকৃষ্ণ ভাষ্য মনোরমাক্ষণিকট আসিয়াছিল। কেনও ছল খুঁজিতে হইল না; বালিকা স্বামীর সহিত বাস্যা হইবার অব্যবহিত পরেই মাতার পোড়ার-কণা সকল কাঁদিয়া বলিয়াছিল। অবসর বুঝিয়া রামকৃষ্ণ তাহাকে লইয়া বাইবার কথা পাড়িল। সে জানিত তাহার মাতার এই উৎকট খোঁজার সময় সে কখনই বাইতে পারিত হইবে না, অথচ তাহার কথাও চিনিতে পারিলে না; সুতরাং বালিকা বিষম সঙ্কটে পড়িলে; রামকৃষ্ণ তাহার মতলব হাসিল করিবার সুযোগ পাইবে।

রামকৃষ্ণ বাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল। দেখিল, অতঃপিত বালিকা উঠিল না, সেই পুয়ের উপর মাথা লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ সে বালিকাকে চিনিত, জ্ঞান কিছু বলিতে সাহস করিল না; বিন হইয়া লুটাইয়া কি চিন্তা করিল। কতক্ষণ পরে বলিল—“মনোরমা, একটা কথা বলি, উঠ।”

সুখস্বপ্নের মত সে কথা করটি বালিকার কর্ণে পশিল। সুপ্রোত্তিতার স্থায় উঠিয়া বালিকা বলিল—“কি কথা আছে, ববুন।”

তখন অতি গভীর ভাবে রামকৃষ্ণ বলিতে লাগিল—“দেখ মনোরমা, আমার অন্য সুহৃদ জী থাকিলেও তোমাকেই আমার একমাত্র জী বলিয়া জানি। তাহা জানি বলিয়াই অন্য কাহারো কাছে না গিয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। শুন, আমার অর্থের প্রয়োজন, আমি সেইজন্য বিদেশে বাইবাম; তোমাকেই গৃহে রাখিয়া বাইবার বাসনা ছিল। অন্য কাহাকেও আমার বিশ্বাস হয় না, তার ধাকা না থাকা সঠিক; তুমিই সর্বাংশে বুদ্ধিমতী।” কিসে কি করিব, তোমার যাওয়া ঘটতেছে না; কাজেই আমারও বিদেশে যাওয়া হইতেছে না। কিন্তু শতর্থে বিদেশে আবধাক। তুমি জী, তোমার কাছে লুটাইয়া কি হইবে? আজ করদিন আমার আহার হয় নাই।” রামকৃষ্ণের বোধ হয় আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক চক্ষু দুই ঘোটা জল সকল কাজ সম্পন্ন হইল।

বালিকা মুহূর্তের জন্য লজ্জাকার দেখিল; তাহার চতুর্দিকে সকল পদার্থ দূরিতে লাগিল; জল চক্ষু পুরিয়া আসিল। কাঁদিয়া বলিল—“তবে কি হইবে।”

নৌচে নাখিতেন না, উপরেই তাঁহার কান ছিল। বিরাজ গিয়া বেসিল, মহামায়া আগিনার খতে একখানি ইঁদ্রি চেয়ারে পড়িয়া বহিয়াছেন। এমনও অবলচিত্তরূপান অগ্রবন্ধন লইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া বহিয়াছে। কাছিকার উপর চারি-অঙ্গুলি বিস্তারিত কালাপাত্ত মিসলার পুতি খানি বড়ই জ্বলন্ত দেখাইতেছে; চানিটিটি সযতনে বামফলের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে। একমনে একখানি ফাটেরি বুনিতছেন। ফানের পর কাগ উড়িতেছে, হস্ত অবিরত ঘূর্ণ লইয়া ঘুরিতেছে; লিকটে দাবা-পাড়িয়া কসিয়া আলকাই মা একদুই সেই সকল লোকাভীত অনিচ্ছনীর বাণীর বৈধিত্যে, আর কখনও যবে অনন্ত শব্দে তাহার প্রশংসা করিতেছে। দূর হইতে হাওয়াইয়া বিরাজ ইঁদ্রি দেখিল; একবার নেন বই অগত্যা ছেল যাহা হয় অলকার মার যে একটি পুট মন্তলব ছিল তাহাও বুনিল। কিছু বাড়িতে এমন সময়ে নিপুণের সময়ও মহামায়া নিশ্চিন্তভাবে কিরূপে তেমন করিয়া বসিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিল না। আর অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া বলিল—“রান্না কখন হইবে? ১১ টা বাজিয়াছে, অরুণ কানিতহুইবে।” অরুণ মহামায়ার তৃতীয়পুত্র।

মহামায়া একটি আশ্চর্য হইয়া বলিল—“এখনও ইঁদ্রি চড়ে নি।”

“কে করিবে?”

“যে বার মাস ত্রিশ দিন করে।”

অলকার মা বলিল “হেমেন-মার না কি বড় শক্ত বামি।”

মহামায়া সে কথাই কোন উত্তর দিলেন না। উদ্বেলিত করে বলিলেন—“কেন, তার মেয়ে হো'য়েছে।”

অলকার মা না বুঝিয়া হেমেন-মার পাড়রি কথা পাড়িয়াছিল একটি অপ্রতিভ হইল। পাছে পার্বসিদ্ধির কিছু বাবাত থাকে এই ভয়ে আর কিছু বলিল না। বিরাজ বলিল, “বিনোবমা হেমেন করিয়া পারিবে? আজ যে তার মার বড় বাস বাজিয়াছেন হেমেন-যেই তোকে ভাইয়া ডাকার আনিতে গিয়াছেন, তুমি কখনও কখনও কখনো ভাই-তোকে, তোলাই বন্ধিতহুইবে; বোধ হয় বন্ধা পাইবে না।” বিরাজকেমনা বিরাজ আর ঘরিক বলিতে পারিল না। কসিয়া কেলিল।

‘কি হইবে কেন, মনোপ্রসন্ন? যতদিন না তুমি যাইতে পারিতেছ, ততদিনের জন্য আমার কিছু দাও । তোমার ভাই তো আজকাল জলপানি পাইতেছে ।’

তিনি যা পান ‘তাতে তারই জুলায় না, আবার মার ডাও বিধবচ আছে, পক্ষা আছে ।’

রামচন্দ্র রাগিল। বলিল—‘তবে সকাই আমি তোমার কেহই নছি ভাল, বিবাহ হউলাম ।’

বালিকা কঁকিল । বলিল—‘দ্রাগ করিবেন না, আমার আর কে আছে, আমি দুঃখের কথা কাহাকে জানাইব ? আপনি অনাহারে থাকিলেন, ইহা আমি কেমন করিয়া সহ করিব ? কিন্তু আমি কাড়ালিনী, কোথায় কি পাইব ? তবে, পৈতা কাটিয়া অনেক দিন হইতে দুইটি টাক। সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা চরণের যোগ্য নয়, যদি বলেন, আনিয়া দিই ।’

রামচন্দ্র ভাবিল, যথা লাভ ; আর পীড়াপীড়ি করিলে কোন ফল হইবে না । বলিল—‘তুমি সাক্ষী, ভাল, আর তুমি কোথায় পাইবে ?’

আখাস পাইয়া বালিকা ধীরে-ধীরে উঠিল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বেলা দশটা বাজিয়াছে । একটা অকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখার উপর দিয়া হরিদেব হেমচন্দ্রদের বাড়ীতে আসিয়া দিতেছেন । দ্রাঘি আর বৃষ্টি নাই, আকাশ বেশ পরিষ্কার, কচিং হুই এক খানা আধভাগা মেঘ আকাশের প্রান্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কচিং হুই একটা হুড় পানী সেই মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া ‘কটিক জল, কটিক জল’ বলিয়া টিংকার ছাড়িতেছে । ক্রমেই রোদ বাড়িয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বিধবারা মনে মনে প্রসন্ন পবিল । সুখি, আজ একারণী আনিয়াই দুঃখিনীদিগকে কষ্ট দিবার অত সুবাদেব এ ধরসুষ্টি পরিগ্রহ করিলেন । দূরে আশা পাঠশালায় ১১টা বাজিল । মানুসখী বিয়তিস্তা বিরাজ উপরে তাহার ভগিনীর নিকটে গমন করিল । মহানন্দা বড় একটা

‘অবসর পাইয়া অলকার মা মুখ ধরিল। বলিল, “এমা তা তুমি কেন কেন ? এতে যে আপনাদের অকল্যাণ হয়।”

‘মহামায়া বলিল, “ঐ দেখ না, সব গেয়ে বসেছেন ; আজ কটা ছেলে ; তারা শেষ হ’লেই হাড়ে বাতাস লাগে।”

বিরাজের মনে বড়ট বাধা লাগিল। নিঃশব্দে ফেলিল। এই সময়ে গৃহের ছাদ হইতে ‘অক্ষর আ অলকার মা বলিল “ভাইত পা, মাগী যদি রক্ষা না বেলা ষাওয়াইয়া নিলে হইত।”

‘মহামায়া বলিল “রাগী না হয় তা’তে আর আমার—জামাই, মেয়ে, ছেলে,—ওরই ভো এক পাল ; এ এখনি দু পরসার চিড়ে আনাইলে চলিগা যাইসে।”

অলকার মা জানিত, মহামায়াই সকল, মহামায়ারই মে নিজে, তাহার স্বামী, তাহার পূর্ব কন্যা, তাহার ভাই যুধী ছাই দিগে ১৫। ১৬টা, সবচ মহামায়া, বলিল তাহ সকল জানিত, কিন্তু কুটিয়া বলিতে সহিস হইল না। বলি

‘দেখিয়া শুন্নিয়া বিরাজ অবাক হইল। কতকক্ষ যাই, আমি রা’দিগে।’ ইহা বলিয়াই বিব্রত যাইবার এমন সময়ে তাহার মা আসিয়া যেখানে উপস্থিত হই য়ানি, বিরাজ ?”

‘বিরাজ তাহার ভগ্নী অপেক্ষা মাকে বড়ই তয়-পাইয়া বলিল—“রা’দিতে হইবে।”

বুঝা জলিয়া উঠিল। বলিল—“উঃ সোহাগ যে বড় একাদশী—দুপুর রোজ, আশ্বিনভাতে না গেলে হ’রে কেন ? কেন-রা, ওদের হ’য়েচে কি ? মাগীর ওসব কেবল ঠাট বৈভো নয়।”

বিরাজ বলিল—“না, মা, তুমি এমন কথা বলিও না ; আজ তাঁর অস্থ বড় বেড়েচে।”

‘“হালো, তুই যেমন নেকি আমি ভো আর তা নই ; এমন আমরা ঢের জানি।”

বিরাজ তাহার মাতার কথা শুনিয়া জন্মে বড়ই কষ্ট পাইল; একবার কাদিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু ভয়ে পারিল না। নিঃশেষে স্থিরভাবে অনেক মন দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিতে বাইতেছিল, তাহার মাতা তাহা বলিবার লেন, “বাও, শোওগে বাও, এই দারুণ একাদশী, এখনই যে, আতনতাতে গেলে আর বাচবে কি!”

কথা করিল। মার কৌমল্য স্মৃতি দেখিয়া কতকটা ভরসা দি করিব? ছেলেওলো যে খেতে না পেয়ে টা টা

জ শুনিবার মেয়ে নয়। রাগিতে তাহার বড়ই ছিল।
 ১. আঁতে উঠিয়াই দেখিয়াছিল, হেমের মাতার পীড়া একরাত্রে এত বাড়িয়াছে যে সে দিন কাটা ভার। হেম নিজে গিয়াছে, মনোরমা মার মুখের নিকট বসিয়া কেবল তাকিয়েছে। ইহা দেখিয়া বালিকার সেই ক্ষুদ্র জন্ম কত কি বলিক? হৃদয়ের মধ্যে বালিকা সকল ভাবিল।
 ২. মারি, আঁতে রমা এক ঘণ্টার জন্যও মার কাছছাড়া হইতে পারিবে না।
 ৩. কি থাকিতে আর যে কেহ হাঁড়ি হান্শালের কাছে না গতে পারিল না। এতগুলো পরিবার আর না ঘাইয়া মরিবে, বাতায় কষ্ট হইল; তাহার আরও কষ্ট, না জানি এই জন্য মনোমাকে কতই কথা শুনাই দিবেন। মুহূর্ত মধ্যে এ সমস্ত ভাব আপনি রাগিবে স্থির করিয়াছিল। এই এতও রৌদ্রে

৪. মারিয়া রাগিতে আতনতাতে অবশ্যই তাহার বড় কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার নিষেধ অন্য কিসের কষ্ট? আহা মনোরমার সেই কাতর মুখ—শুনি—সেই অক্ষপূর্ণ লোচন—সেই নিতান্ত ভগ্নহৃদয়খানি—আজ যদি আবার এই ব্যথার উপর কেহ তাহাকে তিরস্কার করে, বড় দুখে আহা বলে যা ভিন্ন সে বালিকার এমন আর কেহই নাই, সেই মা আজ তিরস্কের অন্য কলিয়া বাইতেছেন! মনোরমা যে কষ্ট পাইতেছে, বিরাজ যদি পারিত, প্রাণ সঁটিও তাহা দূর করিতে চেষ্টা পাইত। বিরাজ মনোরমার জন্য ভাবিয়া আতন হইতেছিল, তাই আজ নিজে পাক করিবার জন্য অত গাড়াগাড়া করিল।

“বিরাজের মাতা বলিল — “কি করিব, আমি তো ভয়ানক মা নই। আমার নিজস্ব পোড়া কপাল, না হইলেই বা পেটের ছেলে পর্য্যন্ত আমার কথা শুনিবে না কেন !” বৃদ্ধা এইখানে চকের জল ফেলিল ।

মহামায়া এতক্ষণ কিছুই বলে নাই, - মাতার ক্রন্দন দেখিয়া বিরাজকে বকিয়া উঠিল ; অলকার মাও সে অবসর ছাড়িল না, যথামাধ্য সে ভৎসনার পোষকতা করিল । বিরাজের ভয় হইল, আর কিছু বলিতে সাহস করিল না ; হুইবিন্দু অশ্রুপাণ্ডুল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল ।

এই সময়ে মনোরমার অনুতপ্ত ক্রন্দন শব্দ বিরাজের কর্ণে পলিল ; পরদুঃখকাতরের জন্ম কাঁদিয়া উঠিল । আর সেখানে কাঁড়াইতে পারিল না ; দোড়িয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল ।

তখন, মহামায়া ও তাহার মা দুইজনে কান বাড়াইয়া দিয়া সে ক্রন্দন শব্দ মুহূর্ত্তের জন্য শ্রবণ করিল । অচিরাতঃ ক্রমা বাহাতে যমত্বনে গমন করিতে পারেন সে অস্ত্র উভয়ে অনেক প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিল । তার পর, মায়ে ক্রিয়ে মিলিয়া, কি করিয়া বিরাজের স্বভাব শোধরাইতে পারিবে তাহার পরামর্শে ব্যাপ্ত হইল । বলা বাহুল্য, অলকার মা বিনান্দ্রো অনেক মূল্যবান পরামর্শ সে ক্ষেত্রে বিলাইয়া দিল । অলকার মা বড়ই পবিত্রৈষিনী !

দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান ।

অহং হি সর্ববজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

নতু মামভিজ্ঞানন্তি তদ্বেনাতন্ত্যবন্তি তে ॥

উপবক্ষ্যতা ৯ । ২৪ ॥

উপবাস করিতেছেন । দেবতারূপে আমিই সর্ববজ্ঞের ভোক্তা এবং

ফলদাতা । দেবতার। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, যাহাদের একল বোধ, তাহার। এবড়ত আমাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে জানিতে পারে না । তাদৃশ যথাযথ জ্ঞান-ভাবে তাহার। পুনরাশ সংসারগতি লাভ করে । কিন্তু (স্বামী) “যেহু সৰ্পদেবতাহু মামুবাভ্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্তন্তে ।” যে ব্যক্তি সৰ্পদেবতাহে আমাকে অন্তর্দ্বারি স্বরূপ দৃষ্টি করিয়া অর্চনা করে, তাহার আর সংসারগতি প্রাপ্তি হয় না । গীতাশাস্ত্রের এই বচনটি উহার পূর্ব ও পরের বচনের সহিত ঐক্য করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্র, বায়ু রবি অথবা দুর্গা, লক্ষ্মী, গণপতি, কি বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণকে যাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র জ্ঞানে পূজা করেন তাহাদের উৎকৃষ্ট গতি হয় না । কিন্তু যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে একই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানেন, তাহারা তাদৃশ জ্ঞানযোগে কোন এক দেবতার নামরূপ অবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, অথবা তাদৃশ কোন এক দেবতার অন্তর্দ্বারীরূপে ব্রহ্মকেই দৃষ্টিপূর্বক ব্রহ্মেরই পূজা করিয়া থাকেন । তাদৃশ মহাত্মাদিগের অপকৃষ্ট গতি হয় না । এখানে যেমন দেবগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবেচনা করা দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সেইরূপ শাস্ত্রান্তরে প্রতিমাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করাও বন্ধনের হেতু কহিয়াছেন ।

মুচ্ছিলাধাতুদার্পাদিমূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ ।

ক্রিষ্ণস্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শাস্তিৎ ন যান্তি তে ॥

এ বচনের প্রচলিত অর্থ এই যে, “যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মূর্ত্তিকা ধাতু প্রস্তর কাষ্ঠাদি বিরচিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বুদ্ধি করে, তাহারা বঁশ তপস্যা দ্বারী কেবল ক্রেশ পায়, মুক্তি পায় না ।” যাহারা এমন ইচ্ছা করেন যে প্রতিমা পূজা দেশ বহিতে উঠিয়া বাউক, তাহারা উক্ত বচন দ্বারা এইরূপ বুকেন এবং উহা প্রমাণ দিয়া অত্যন্ত দুঃখান যে, ঈশ্বরের পূজার নিমিত্ত প্রতিমা প্রয়োজনীয় নহে । প্রতিমা অবলম্বনপূর্বক তাহার পূজা করা দোষ । কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞেরা উহার ওরূপ অর্থ করেন না । তাহারা বলেন যে, সকলেই কিছু নিরাকার নিরঞ্জন পরমাত্মার উপাসনা করিতে পারে না । অতএব অধিকাংশ লোকের নিমিত্তই প্রতিমার আশ্রয় প্রয়োজনীয় ; কিন্তু যেমন দেবকে আত্মজ্ঞান করা মূঢ়তা, সেইরূপ প্রতিমাকে অর্থাৎ প্রতিমারূপ ভেদ

হেষ্টিকে ঈশ্বর জ্ঞান করা বৃদ্ধি । আত্মা যেমন দেহের অন্তর্গামী—শারীর বিধি ব্যবস্থানুযায়ী ও সাধকের দৃষ্টিতে, ভগবান সেষ্টরূপ প্রতিমাতে আবি-
 রূত । উপাসক, ভক্তি ও জ্ঞানযোগে সেই আবির্ভাবের আরাধনা কবি-
 যেন ; নতুবা জড় মূর্তিটিকেই যে, একটা মাফাত জড়ময় ঈশ্বর জ্ঞান
 করিবেন এমন অতিপ্রায় নহে । বাহ্যিক ভাষা করে, তাহার অজ্ঞান
 পাশে বন্ধ । তাহার স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি বিহীন হইয়া সেষ্টরূপ জড় প্রতিমার
 সেবার কেবল কষ্ট মাত্র ভোগ করে, কিন্তু চৈতন্যরূপ ঈশ্বরোপাসনার
 আনন্দ পায় না । অতএব জড়রূপ প্রতিমার পূজা করিবেন না, কিন্তু প্রতি-
 মাতে ও প্রতিমা-উপলব্ধি উৎসবে চৈতন্যময় ভগবানের আবির্ভাব দর্শন
 করিবে । অর্থাৎ প্রতিমা পূজা করিতে গিয়া যেন জড় উপাদিস্বরূপ তৃণকাষ্ঠ
 ধাতু প্রভৃতির পূজা না করিয়া বসে, কিন্তু যে ভগবানেতে প্রতিমা পূজার
 অসাধারণ উদ্দেশ্য তাঁহাকে যেন লক্ষ্য করে । কলে, জড়প্রতিমা মাত্র দেহতা
 একরূপ বোধ করে এমন মর্থ বোধ হয় নাই । তথাপি কি জানি যদি কেহ
 থাকে তবে তাহারদিককে ইয়োনিভ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রে এই শাসন দিয়া-
 ছেন, “প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্দ্যাণো নরকং ব্রজেৎ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি
 দেবতার প্রতিমাতে প্রকৃত্যাদি জড়ত্ব বুদ্ধি করে সে নরকে যায় । তাৎপর্য
 এই যে, ভক্তজনের গতিস্বরূপ ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন নামের বিধি-
 বিহিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা গেল ; কিন্তু যদি পূজা করার সময় কেহ
 সেই ভগবানকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল জড়বোধে প্রতিমার পূজা করে, তবে
 তাহার পক্ষে সেই প্রতিমা দর্শন বা পূজা করিতে যাওয়া আর সং দেহিতে
 যাওয়া একই কথা । কেন না পূজা উদ্দেশ্য না করিয়া কত স্থানে কত
 দেবতার সং নির্মিত হয় । সে সকল সংকে লোকে জড় বলিয়াই দেখে ।
 সেষ্ট সংকে শিলা বা মৃত্তিকা বুদ্ধি করা শোণ্য নহে । কিন্তু ভগবানের পূজার
 উদ্দেশ্যে যে সকল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব জ্ঞান
 না করা কিন্তু কেবল সং-বৎ শিলা বা তৃণ মৃত্তিকা-বিরচিত এক একটা
 আধার মাত্র বোধ করা মহাপাপ । সেইরূপ প্রতিমা পূজাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ
 হইয়াছে । যে কোন দেবতার পূজা করা যাউক তাহা ভগবানেরই পূজা—
 সে সকল দেবতা তিনিই । আর যে কোন প্রতিমার পূজা করা যাউক—

পূজা তাঁহারই আবির্ভাবের । * পূজা মূর্তিকারও নহে, পাখাণেরও নহে, নামেরও নহে, রূপেরও নহে ।

যিনি ঐতিম্যে শিলাবুদ্ধিপূর্ক প্রতিমা পূজা করিয়া মনে করেন অড়ময় শিলামাত্রেয় পূজা করিলাম তিনি অপরাধী । ঈশ্বরজ্ঞান বিহীন দেবারাধনা মাত্রই দোষ । ঈশ্বরোদ্দেশ্য বিহীন প্রতিমাপূজা মাত্রই দোষ । ঈশ্বর-লক্ষিত অপ্রতিম বা সপ্রতিম নিকাম-দেব-উপাসনা অবশ্য দোষজনক নহে ; কিন্তু তাদৃশ সাকাম-উপাসনা নিষ্পনীয় । কেবল ফলকামনাবর্জিত, জগদ্ব্যাকুলতামুক্ত, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট সপ্রতিম বা অপ্রতিম দেবোপাসনা অথবা পরমাত্মীয় স্বরূপোপাসনা মূর্তির হেতু । তত্তির সমস্ত উপাসনাই হয় জড়ের, নয় ফলের উপাসনা । ঈশ্বরের নহে । তাহাই শাস্ত্রে নিষ্পনীয় হইয়াছে । নতুবা প্রতিমা ও নামরূপ আভ্যর্থ পূর্ক উপাসনা করিলেই যে দোষ হয় এমন নহে । প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের রূপ নাই । তাহা উপনুক্ত অনিকারীকে বুঝাইবার নিমিত্তে শাস্ত্রে কহিয়াছেন “অরূপনন্দেব হি তৎ-প্রধানম্” (শারীরকে অ২।১৪) । ভক্তের রূপ নাই । সমস্ত ভ্রুতি তাঁহার অরূপত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন । তবে কোন কোন ভ্রুতি যে, তাঁহাকে

* ৭৫ বর্ষ পূর্বে খৃষ্টীয় মিশনরিগণ হিন্দু-দেবদেবীগণের নিন্দা ঘোষণা করায়, জেনারেল ষ্টুয়ার্ট নামক সুবিখ্যাত সেনাপতি জন্মের বড় বেদনা পাইয়া তৎ প্রতিবাদার্থ আক্বের বাদসাহের হুযোগ্য মন্ত্রী আবলফজলের এই সিদ্ধান্ত বাক্য উক্ত করিয়াছেন ।

“Abulfazle that enlightened minister of a great and enlightened monarch, Akbar, the glory of Eastern potentates, thus speaks of the Hindoos—“They one and all believe in the unity of the Godhead: and although they hold images in high veneration yet they are by no means Idolators as the ignorant suppose”. (General Stuart's vindication of the Hindoos. P 47. 1810. London.)

জেনারেল ষ্টুয়ার্ট লিখিতেছেন যে—ধরণীর পূর্কভাগের সম্রাটগণের মধ্যে মহামহিমাবিত ও সর্বজ্ঞানসম্পন্ন অতি মহৎ আক্বের বাদসাহের মহাজ্ঞানী মন্ত্রী আবলফজল হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ইহা লিখিয়াছেন যে—“হিন্দুগণ ঐত্যাৎক এবং সকলে পবমেশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করেন । এবং যদিও তাঁহারা ঐতিমা পূজাকে অভ্যস্ত আদর করেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কেহন মতেই স্বেপোপাসক নহেন—যে রূপ অত ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া থাকে ।

সংগত অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট কহিয়াছেন সে কেবল তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি ও আশ্চর্য্য কৌতূহল বর্ণন মাত্র । “প্রকাশবাক্যবৈবৰ্ণ্যং” (শারীরকে ৩২।১৫) । অগ্নি যেমন বস্তুতঃ দ্রুপ, দীর্ঘ, বক্র, না হইয়া কাষ্ঠের দ্রুপ, দীর্ঘ ও বক্রতাতে দ্রুপ দীর্ঘ বা বক্ররূপে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রকৃতির বিবিধ রূপ অনুসারে ঈশ্বর নানা প্রকারে প্রকাশের ন্যায় হন । এইরূপ তাঁহার প্রকাশবৎ ভাব প্রকার না করিলে স্বগুণশ্রুতির বৈবৰ্ণ্য হয় । অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন এই অবলম্বনে লোকের ভিন্ন ভিন্ন কটিকথা ও দশদিকে প্রকৃতি বিচিত্র শক্তি অনুসারে ঈশ্বরকে বিবিধরূপে দর্শন ও বরণ করে তাহাতে সাধকের মনোভাব ও শ্রুতির সঙ্গ বর্ণন যুগপৎ সাধক হয় । “অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ” (শারীরকে ৩৩।১৮) । ব্রহ্ম নির্কিংশেষ । যেমন জলে তরঙ্গ উঠিলে একই সূর্য্য নানা রূপে প্রকাশিত হন, সেইরূপ ব্রহ্মের কৃতিশক্তি যে মায়া, তিনি একদিকে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রকৃতি হইয়া এবং অন্যদিকে বিচিত্র স্বভাব মানব-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া তদুভয়ের যোগে ব্রহ্মকে নানা করিয়া দেখান । এতাবত সূর্য্যাদির ন্যায় ব্রহ্মে উপমা হইতেছে । তাৎপৰ্য্য এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি ও নরজন্মগত প্রকৃতি যিনি মহামায়া শব্দের বাচ্য তিনিই ব্রহ্মকে নানারূপ কল্পনা করেন ; অথবা ইহাই বল যে, সেই মহামায়ার প্রভাবে মায়াচ্ছন্ন জীবের মনে ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হন বা নানামুদ্রি ধারণ করেন ; অর্থাৎ মায়াকার্য্যের যোগে ব্রহ্ম মানবের মনে আপনাকে রূপবিশিষ্টের ন্যায় দেখান, ফলতঃ তাঁহার নিজের রূপ নাই । যে দিক্ দিয়া হউক, প্রকৃতিই তাহার সংঘটক । এই হেতু জ্ঞানীকে মায়া কল্পনা হইতে মুক্তি দিবার নিমিত্ত শারীরকে (৩২।২২) কহিলেন “প্রকৃতেতাবকং হি প্রতিবেদতি ততোব্রীতিচ ভূয়ঃ ।” এইরূপে ব্রহ্ম প্রকৃতির মধ্যে যে পরিচ্ছিন্ন হইলেন, নেতি নেতি শব্দ দ্বারা তদন্তর্গত প্রত্যেক রূপের ও স্বগুণ ভাবের নিবেদন করিবেক । কিন্তু পুনশ্চ উপাসনার সুবিধার নিমিত্তে কহিলেন “অগ্রেহু যথাশ্রয়ং ভাবঃ ।” (শারীরকে ৩৩।৬২) । সূর্য্যাদি দেবগণ এবং অগস্ত্যাদি নানা শক্তিতে ব্রহ্মের অন্তর্ভূত অমৃতত্বপূর্ণক তাঁহাদিগকে বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপে আশ্রয় করত তাঁহার উপাসনা করিবেক । তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞানে পূজা করিলে না ।

শাবের দেব ও প্রতিমা পূজার যত রিবিহী থাকুক বা নিষেধই থাকুক, স্তার্থবাদে থাকুক আর নিস্বার্থবাদই থাকুক, একটি মার কথা এই যে, যদি অগতিব গতি দীননাথকে পাটবার নিমিত্তে সাধকের বিশেষ তত্ত্ব ও জ্ঞানব্যাকুলতা থাকে, তবে অলে হলে ভূধরে, ভূগপত্র তরুবরে, ধন দান্য পল্লবনে, অর্ন্ত চিত্ত বুদ্ধি মনে, নরনারী বৃদ্ধবালে, প্রাতঃমধ্য সন্ধ্যাকালে, পর্কদিনে মহোৎসবে, অশ্বনির ভীমরবে, অনল শব্দী তপনে, শক্তি আদি দেবগণে, জীবন্তনা মৃতকারে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমায়, সর্বত্রই সর্বাধারে সেই বিখ্যাত সার্বভৌম পবনেশ্বর সাধকের সন্নিধানে বিশেষরূপে প্রায় ভুবনমোহন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নতুবা সামান্যরূপে যিনি সর্বত্র বাস্তব আছেন তাহা কে না জানেন! কেবল বিশেষ আগ্রহেতেই বিশেষ বিশেষ দেশ কাল আধারে বা স্থায়ী বিখ্যাতরূপে তাঁহার দর্শন মিলিয়া পাকে। আত্মকল্পন, পর্যায় নামকপাতক সমস্ত ভগৎ, ভক্তরাং ভগবত্ত্ব ভিয়ার বেহ, দেব ও প্রতিমাদি মায়াকল্পনা হইলেও এইরূপ বিশেষ তত্ত্ববৃত্ত জ্ঞানব্যাকুলতা জন্য সেই নামকপাতক আগার ব্রহ্মদর্শনে ঐ মহাগায় ভেদ হইয়া থাকে। তাহাতে নব-আত্ম ক্রমে যুক্তির অস্তিম স্বরূপ প্রকাশ্যাক লাভ করেন। যদি উপাসনাধিকারে সমদর্শীর পক্ষে সর্বত্রই ভগবদর্শন সম্ভব হয়, তবে সেই ভগবানেরই পূজা করিবার নিমিত্তে তাঁহার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত নাম বা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল পবিত্র দেব-মূর্তিতেও ব্রহ্মদর্শন সম্ভব। এ কথা বিজ্ঞে সনাতন হিন্দুশাস্ত্রাচারী মহাত্মাদিগের কোন কথা নাই। কিন্তু নবদিগের মধ্যে অনেকের আপত্তি আছে যে আনি তাঁহাদের সহিত বাদান্ত্রবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল ভাঁহাদের জ্ঞান ও মনকে স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে একটি কথা বিজ্ঞাসা করি। হে নব্য! যারাপনৌ দামে অম্বপূর্ণা ও বিবেকবের সন্ধিরে সহস্র সহস্র বংগন ধুরিয়া এত নিস্তীর্ণ ভারতভূমির সকল অঞ্চলের কোটি কোটি বালক বৃদ্ধ বৃদ্ধা কুলবধূণ উঠেঃবরে মাত্রা পিতা বলিয়া ভগবানকে যে ডাকিয়া আসি-হেছেন, বল দেখি, সেখানে তাঁহাদের ডাকে পাপীর গতি দীনবদ্ধ করপাত করেন কি না? ব্রহ্মাবনক্ষেত্রে সমস্ত হিন্দুকুল সমনন্ত হইয়া পূর্বকাল হইতে তাঁহাকে প্রাণসখা বলিয়া যে পূজা দিহেছেন, বল দেখি, সর্বসাক্ষী

ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন কি না ? যে দেশে, যেখানে, যে কোন প্রকার রূপ নাম বিশেষণে ভগবানের পূজা ও নাম গান হইয়া থাকে তাহা কি “পৌত্তলিকতা” বলিয়া ঘেষভাবে বা ত্রেন্দ্রবশে দীননাথ উপেক্ষা করেন ? যদি বল কেবল তাঁহার নিরঞ্জন “অপৌত্তলিক” উপাসনাই তিনি গ্রহণ করেন, আর ঐ সকল “অজ্ঞান দুৰ্জনাধিকারীগণের” “পৌত্তলিক পূজা” তিনি গ্রহণ করেন না, তবে তিনি কি দীনদয়াল নওন ? আর যদি বল ঐ সকল পূজা তিনি অবশ্যই গ্রহণ করেন, তবে ধীর হইয়া বুঝিয়া দেখ দেখি, সেই সকল মূর্তিতে দেবালয়ে ও অৰ্চনায় তাঁহার গৃহাত্ম আবির্ভাব রহিয়াছে কি না ? একটু বীণভানে ও ধ্যানযোগে দেখিলেই তোমার জ্ঞান ভগবৎ-ভাবে ভরিয়া যাইবে । সেই ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিলে তোমাতে নর নরুতিহ উপাসনা প্রবৃত্তি সন্ধি স্থান লাভ করিবেক, তোমার অনিত্য কলেশন লোমশিত হইবেক, তোমার আত্মা সঙ্গতা অনুভব করিবে, অহঙ্কার বিদূষিত হইবেক, এবং তখন সেই দেবালয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিতে তোমার আর কোন আপত্তি থাকিবে না । হে নবা ! তুমি যদি তর্ক বা ঘেব পূর্বক ক্রিয়া ও দেবোপাসনা পরিত্যাগ কর, তবে তোমা কর্তৃক সমাজ-হিতকর বহুপত্তীকৃত ক্ষতিত ব্যবস্থা বিনষ্ট হইবে । ভগবানের উত্তম বিশেষ আবির্ভাব উপেক্ষিত হইবে এবং কোটি কোটি লোকের ধর্মপ্রবৃত্তি অবমানিত হইবে । হে ভ্রাতঃ ! তুমি তোমার স্বীয় আত্মাতে মনেতে বা জগতে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব কর্তৃক পূজা করিতেছ ইহা অতি উপদেশ । কিন্তু কোটি কোটি লোকে তাঁহাকে যে নানা নামে, নানা দেবালয়ে, ও উৎসবক্ষেত্রে ডাকিয়া স্ব স্ব আত্মাতে তাঁহাকে অনুভব পূর্বক পূজা করিতেছে, তাহার প্রতি যে কিছু মাৎসর্য্যাদা বা ভ্রম অর্পণ করিতে চাহ না এ বড় আক্ষেপের বিষয় ! দেখানে যে স্বর্গের আবির্ভাব আছে তাহা জানিয়াও যে তুমি বহু পূর্বক তাহা অস্বীকার করিতেছ এ অতি আক্ষেপের বিষয় । সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অসংখ্যাসংখ্য লোকের আত্মানে, আরামায়, প্রতিষ্ঠায়, বরণে, আওতিতে যে মূর্তি, মন্দির উৎসব ও স্তোত্রবন্দনা, ভগবানের সুপবিত্র স্মরণ-মাধা হইয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন দুবেলা সমস্ত হিন্দুকুলের জ্ঞান ভাণ্ডারে ভগবৎ

স্বয়ংকল্প প্রবাসাল ভোক্তাভোজ্য যোগ ইহেতে, তাহা যে তুমি পশ্চিকায়ণ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে ! বিশেষতঃ তাহা তুমি আশীর্ষি পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হও নাই, কিন্তু লোককে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছ, এবং বাহারা তাহাতে নিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে দুৰ্ব্ব বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে ! ফলে বাহারা নির্বেদনশূন্য হৃদয়ে সব ভাগ পূৰ্ণক সমাধি অবস্থাতে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হন, তাঁহাদের পক্ষে কাজে কাজেই বেদাদি শাস্ত্র, পূজা, পাঠ, তটস্থ লকণে ব্রহ্মোপাসনা, দেবতা দেবালয় প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু হে নবা ! তুমি না সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মানন্দমজ্ঞান যুবা, না সমাধিস্থজ্ঞান বৃদ্ধ। তুমি দুঃখপোষা বালক হইয়া কোন্ সাহসে দেবতা ভাগ ও দেবোপাসনার দেব কর ! অগ্রে ব্রহ্মানন্দ পণ্ডিতগণের পদানত হও, শাস্ত্র পাঠ কর, শাস্ত্রকথা শুন, হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি অন্বেষণ কর, বিষয় বাসনা বিদূরিত হউক, ব্রহ্মেতে আত্মা স্থিরীকৃত হউক, তবে দেবতা ভাগ করিও। হৃদয়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও বৈরাগ্য না উদয় হইলে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও বেদ পরিত্যাগরূপ নির্বেদনভাব উপার্জিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। খান দুই ইংরাজি দর্শন পড়িয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞান অন্বিত, তবে আর ভাবনা ছিল না। যদি ব্রহ্ম হইতে চাও তবে ভক্তিপূৰ্ব্বক সৰ্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করাই তোমার প্রথম কার্য। তাহার পর বিচারপূৰ্ব্বক তোমার জ্ঞাত হওয়া উচিত যে আত্মক স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রহ্ম-শক্তির আবির্ভাব। এইরূপ ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগতের মায়িকত্ব তিরোহিত হইবে। তখন “সর্বং ধর্মিণং” ব্রহ্মজ্ঞান তোমাতে উদয় হইবে। তখন যে কোন পদার্থের অবলম্বনে তোমার ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হইবে। সুতরাং প্রতিমা-উপলব্ধিত পূজা অর্চনার ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব অনুভব করিতে তোমার বিশ্রুতিপত্তি হইবে না। বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ, এমত ক্ষেত্রে তুমি জড়-পদার্থ উপাধিকে ব্রহ্মজ্ঞান করিতেছ না, কিন্তু চৈতন্যরূপ ব্রহ্মকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিতেছ। মহাত্মা রামমোহন রায়ও এতাদৃশ বিচারস্থলে শ্রীমদ্ভাগবৎ অবলম্বন পূৰ্ব্বক কহিয়াছেন “আত্মক স্তম্ভ পর্য্যন্তকে যে বাক্তি ব্রহ্মরূপ জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মে কেন বিশ্রুতিপত্তি করিবেক !” (গোদামিন্দীর সহিত বিচার গ্রন্থে ৩৩ পৃঃ ১২২৫ বঙ্গাব্দ)। এই বাক্যটি উপলক্ষ করিয়া আমরাও

বলি ঐ, তিনি বিচার পূর্বক সর্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারেন তিনি কি প্রতিমা-উপলব্ধিত পূজাকে সেই জ্ঞান হইতে দূরে রাখিবেন? ব্রহ্মজ্ঞানই সার। বাহ্যর ব্রহ্মজ্ঞান অথবা তিনি প্রতিমা পূজাকে কেন হেয় করিবেন? আহা! আমাদের উন্নত জাতারা তৎ অবধি উচ্চতরতর পর্য্যন্তে, শিশির-কণা অবধি সাগর পর্য্যন্তে, ভূপৃষ্ঠ অবধি গগনমণ্ডল পর্য্যন্তে, সর্বস্থানে ব্রহ্ম বর্ণন করিয়া কেবল কি দেবতা ও দেবালয় এবং শঙ্খচীটা-নিবাসিত বেদমন্ত্রপুত উৎসব-কেন্দ্রকে শূন্য দেখিবেন? জানি না কেমন তাঁহাদের “জ্ঞান”, কেমন তাঁহাদের “সহজ-জ্ঞান”, কেমনই বা “বিশ্বাস” এবং কেমনই বা “আত্ম-প্রত্যয়!” হা ভগবন! ভারতের এই তমোনিশাকে প্রত্যন্ত কর। হে জ্ঞাত! সরলচিত্ত ও নিঃস্বার্থভাবে এই সকল কথা চিন্তা কর—বুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্বক আমার উক্তি সকলের মধ্যে যদি কোন পাণ্ড—বাহির করিতে ক্রটি করিও না। তজ্জন্ত আমাকে দণ্ডনীয় করিতে ক্রটি করিও না। কিন্তু আমি এই মাত্র বুদ্ধিতেছি যে, তুমি একই সরল-ভাবে চিন্তা করিলেই তোমাতে যোগীজনসাধনীয় সমবর্ণিতা জন্মিবে এবং তোমা কর্তৃক ভারতীয় ধর্ম্মপিপাসু জনগণের অশেষ কল্যাণ হইবেক। তোমাকে আমি মৃতদেহের ছায় সন্ধ্যা-উপাসনা-প্রতিপাদক বেদবিধির দ্বাস হইয়া সন্তজ ও ফলকামনাপূর্বক দেবগণের সপ্রতিম বা অপ্রতিম অর্চনা করিতে কহিতেছি না। তোমাকে সর্বতোভাবে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেই প্রস্তুত করিলাম। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের স্বর্ধ্যাকার-নিমিত্তে তোমার ঐতি সহগুণে এই যে, ফলকামনা বিহীন ঐখরোক্ষিষ্ট বৈবর্জনা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং চরিতার্থকর হইয়া থাকে। তুমি এই উপদেশ লব্ধে ধারণপূর্বক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ হও, তোমার ভগবৎ-গিষ্ঠা ও পবিত্র আচার ব্যবহারে ভারত জননীর হৃদয় প্রফুল হউক।

২২এ মাস্কন
১২২২

}

ঐচন্দ্রশেখর বসু
শুভগপুর।

বসন্ত ।

আজ বসন্ত আসিয়াছে । বসন্তের বাতাস জগতের প্রাণের চাবি খুলিয়া দিয়াছে । আজ স্বর্ণ-মর্তের কোলাহুলির দিন । প্রাণ আসিয়া প্রাণে মিশিয়াছে । আর কি জগৎ জন্মের পাবণ কপাট বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে । আজ জগৎ আমাদের আত্মান করিতেছে । জগতের নৃতন গৃহে আমাদের আজ নিমন্ত্রণ । আজ বসন্তোৎসব । অর্থাৎ আজ জগতের উৎসব । জগৎ স্বয়ং জগদীশ্বরের পূজা করিতেছে । কি মহোৎসব ! এরূপ মহান জীবন্ত বিশ্বপূজা কে কোথায় দেখিয়াছে ? এ পূজা বসন্তের—প্রকৃতির । দেখ, কেমন বাসন্তী প্রকৃতি-শয্যা পড়িয়াছে ! জ্যোৎস্নার আলোর বিবেকের বিব-রাজ্য যেন আজ একখানি জ্যোৎস্না-জগৎ ! নবীন মলয় সজীবনীর বাতাস করিতেছে । সুত্র পিক বসন্ত-জগৎ তরঙ্গায়িত করিয়া মধুর উদ্যোতন-হৃদে কঁকার আরম্ভ করিয়াছে । তটিনী রাণী সহচরীগণ লইয়া নানাবিধ অদ্ভুত কবিতারবে চরণ ধুইয়া দিতেছে ! কাটি কোটি মাহুয়ের জন্মের মন্দির হইতে তাঁহার মহিমা-গান আজ একটি হৃদে গীত হইতেছে ! আজ আমি স্বেচ্ছায় প্রকৃতির কোলে বসিয়া সেই আনন্দময় বিবেকের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ।

বসন্ত আসিয়াছে !—কোথাকার কোন্ সুরপুরের কোন্ সুমন্ত শশিমুখী সুরসুন্দরীর স্বপ্ন-জাত হাসির সৌন্দর্য্য ছুরি করিয়া জগতে আনিয়াছে । বসন্ত স্বর্গের আভাস—বসন্ত প্রাণ—বসন্ত গান—বসন্ত কবিতা—বসন্ত সৌন্দর্য্য—বসন্ত কবির উচ্ছ্বাস—নারীর বোঁবন আর আমার অতীত-সুখ-সপন ।

তাই বৃষ্টি কতদিনের পর !—কি কতদিনের পর ?—আমার এই পুরাণ ভগ্ন কঙ্ক গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল ! তাই বৃষ্টি মৃত তরুতে আবার ফুল ফুটিল ! তাই বৃষ্টি আজ এই মধুর গাণ-উদ্‌যাদিনী জ্যোৎস্নার মীলনীতে স্মৃতির নদীর উপর কার একখানি সুন্দর মধুর মথের তায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে ! এ বসন্ত কোথাকার ? আর কখন এমন এই জন্মের হৃদের সঙ্গে একতান হইয়া বসন্ত আসে নাই । এ বসন্ত যেন আমার । কার মধুর হাসিতে এ বসন্ত ফুটিয়াছে ! এ বসন্ত আমার কত আপনার ! যেন এক গৃহে দুজনে কত কাল তিলাগ ! কে তাহাকে আজ আমার এত আপনার

—প্রাণের প্রাণ করিয়া দিল। আমার প্রাণের এত কথা সে কি করিয়া জানিল! সে যে আমার সব কথা—অতীতের সমস্ত কথা জগতের প্রতি পত্রে পত্রে চিত্রিত করিয়া দিয়াছে! কে তাকে শিখাইল? কোথায় সে?

বুঝিয়াছি। এ বসন্ত আমার অতীত। আমার অতীতের জীবন্ত বসন্ত-মূর্তি। আমার আজ—পাইনাম। আমার অতীতের আজ নবজীবন। আজ আমার বসন্তের এই নতুন কাণ্ডের মধ্যে অতীতের সেই অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতীতের আধুত্ব কথা—অতীত যাহা বলি-বলি-মনে-করিয়া বলিতে পারে নাই, সেই সব কথা বসন্ত আসিয়া বলিয়া দিয়াছে। বসন্ত তাহার জন্মের। বসন্তের সে আশ্রয়। কে সে? কে জানে কে!

বসন্ত অতীতের স্মৃতি—স্মৃতির জানালা। এই মধুর গীতিময়ী জানালায় বসিয়া কতকালের কথা—কত পূরণ গান—কত মেহের ছায়া—কত স্থবের স্মৃতি—কত অজানা সৌন্দর্যের কি-এক মোহিনী অদৃশ্য কাণ্ড এবং আরও কত কি যে জন্মের চারিদিকে অঙ্ককার করিয়া আসিতে থাকে তাতা বলিতে পারি না! আমি এই বসন্তের গৃহে বসিয়া সকলের প্রাণের কথা বুঝিতে পারি। এবং জগতের অপূর্ণ বাসন্তী সীমুর্তি দেখি। পরস্তু কি? জগতের বসন্ত—অর্থাৎ জগতের আলো। পরস্তু তাই—সৌন্দর্যের সাকার বাসন্তী স্মৃতি।

এ জগতে মৃত্যু নাই তাহা আমরা বসন্ত দেখিয়া বুঝিতে পারি। শীতের কুজ্জ্বলিকা যাহা অদৃশ্য হইয়াছিল বসন্তে আবার তাহা ফুটিয়া উঠিল। বসন্তে আমরা জগতের অতীত আর-একটি অদৃশ্য আদর্শ জগতে বাস করি। সে জগৎ আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তথাকার বাতাস আমরা বেশ উপলব্ধি করি। সেখানকার মনুষ্য অমর। গাঁহার জগতের আদর্শ, তাঁহার সেইখানে বাস করেন। বসন্তে আমরা তাঁহাদের দেখিতে পাই। সেই জন্ত বসন্ত আমাদের এত প্রিয়। সেই জন্ত বোধ হয় অতীতের দ্বন্দ্বময় বিচিত্র বাতাস কেবল এই বসন্তকালে কখন কখন পাওয়া যায়। তাই আজ আমি বসন্তের ছবির মধ্যে কে কোথা আছে অনুসন্ধান করিতেছিলাম।

ঈনগেন্সনাথ বহু।

একরূপ তুলা জন্মে। এবং উহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা দৃষ্ট হয়। ইহার পত্র গোলা ও দ্রব্য শুকাত। পুষ্প ক্ষুদ্র ও শুক বর্ণ। ওচ্ছাকারে অধোমুখে থাকে। এই জাতীয় আরো ২১০ প্রকার লতা আছে, অনেক তাহাদের কোন একটিকে অজশৃঙ্গী অস্থমান করিলেও করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন মেঘশৃঙ্গী ও অজশৃঙ্গী এক জাতীয় নহে। অজশৃঙ্গী পূর্বোক্ত লতা, মেঘশৃঙ্গী দুই তিন হস্ত পরিমিত শুকবর্ণ আটাদিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরু। ইহার ফল ও শৃঙ্গাভি, দেবিতে অতি সুন্দর। ওচ্ছাকারে উর্দ্ধমুখে জন্মে। আমরাও ইহাই বলি। ডাক্তার অধিকাচরণ রক্ষিত রুত “ভারত তৈবজ্য তত্ত্ব”ও মেঘশৃঙ্গী বৃক্ষ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

অনন্তমূল ।

অন্য নাম—শ্যামা, হুগকা ।

শ্যামাখ্যাত লতা বিশেষ। ইহার মূল উগ্র হুগক বিশিষ্ট। দ্রব্য তিক্তাদ্বাদ। বলকারক, পরিবর্তক, রক্তপিত্তনাশক, মূত্রকর, প্লেবজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, সার্কাসিক ঘোক্ষল্য, পুরাতন বাত, পারাদোষ, উপদংশ, কাণ্ডজর ও চর্মরোগে বিশেষ উপকারী। ইহা বাটীয়া লেপ দিলে ক্ষত হইতে পুঁদাদি নিঃসৃত হইয়া থাকে। চেলোনী জলে বাটীয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ নষ্ট হয়। অনন্তমূল, বাসকমূল ও রক্তশালী ততুল একত্রে বাটীয়া কাঁড়ি ও ছুদের সহিত ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে নাট্যদিগের বাধকদোষ নিবারণ হইয়া অগত্যোৎপত্তির বাধ্যত দূর হয়। অনন্তমূল; কুড়, উৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কাঁড়িতে বাটীয়া ঘৃত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত ও আধকপালিয়া রোগ বিনষ্ট হয়। অনন্তমূলের কাথে • ৫ রতি নিশাদল মিখাইয়া সেবন করিলে নানা ভোগ হয়। অনন্তমূল, রক্তচন্দন, লোধ ও জাফা ইহাদের কাথ চিনির সহিত পান করিলে নাট্যদিগের গর্ভাবস্থার জর নিবারণ হয়।

* কাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যে, যতগুলি দ্রব্য হইবে, তুলাংশে সর্বসমষ্টির পরিমাণ ২ তোলা লইতে হইবে। ঐ দুই তোলা দ্রব্য অল্প কুটিয়া আধ সের জলে মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ শোয়া অবশেষ থাকিতে নাখাইয়া, ছাকিয়া অল্প মধুসহ ২১০ বারে সেবন করিতে হয়।

অণু ।

অন্য নাম—ভিষু, আণ্ডা ।

সচরাচর মৎস্য, পক্ষী ও কৃন্দা এই ব্যবহৃত হয় । এই সকল অণু স্বাদু, কষ্ট-পাক, কটিকারক, শুক্রবর্ধক, বিক্রকারক, পোষক, বাত কফ নাশক । রসকপূর, তৃতীয়া প্রকৃতি দ্বারা বিধাক্ত হইলে অণুলাল দ্বারা বিব নষ্ট হয় ।

অন্ন ।

(ভাত ইতি লোকে)

অন্ন প্রস্তুত প্রণালী সকলেই অবগত আছেন । তত্বুলের ওষাঃস্বাদে অন্ন বিবিধ গুণবিশিষ্ট হয় । সামান্যতঃ অন্ন পুষ্টিকারক, বৃদ্ধি, প্রীতি, শুক্র, ধাতু ও তন্ত্রিয়ার প্রসন্নতাজনক, শুক্র, কৃশতা, কৃন্দা ও অন্ন রোগ নাশক । নূতন চাউলের অন্ন শ্লেষ্মাকারী, শুক্র, সুস্বাদু, স্বাদু ও বলকারক । পুরাতন চাউলের অন্ন কৃমি, অগ্নিকর, বিরস । নবজর ভিন্ন প্রায় সর্ব রোগেই উপায় । ঈষৎ উষ্ণ অন্ন প্রশংসনীয়, অগ্নিকারি, বাতশ্লেষ্ম নাশক, রক্তপিত্ত প্রকোপ-কারি । -ঔষ্যকৃত্য বলহানিকর । শীতশুক্য (কড়কড়ে ভাত) দুর্জর, সহজে জীর্ণ হয় না । অতি ক্রিয়াল (পচা ভাত) বিশেষ ঘানিজনক । জলধৌত সদ্যঃ অতিশয় লঘু, শীত পরিপাক প্রাপ্ত হয় । বাসি জলশুক্য (পাতা ভাত) শিথোষ কোপকারি, কৃমি । পর্দ্যাসিত অন্নের আমানি অগ্নি-কারক, তৃপ্তিজনক, সুখপ্রিয় । জ্ব্রোপ, পাণ্ডু ও কৃমি রোগে হিতকারক । পরমায়—সারক, উষ্ণবীৰ্য, শুক্র, মিষ্টরসযুক্ত, শুক্রবর্ধক, বলকারক, পিত্ত-কারি । স্বাদু তত্বুল দুগ্ধ বা জলমিশ্রিত দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে চিনি কিস্মিস্ প্রভৃতি একেপ দিয়া নামাইয়া লইলে পরমায় সত্ত্বত হয় । অন্ন মণ্ড—ভাতে মণ্ড—অর্থৎ বাহাতে কিছু মাত্র শিঠি থাকে না, কেবল জলবৎ অধুচ কিকিৎ গাঢ় । ইহা সদা উপায়, বর্ষ্যকারক, অগ্নির উদ্বীপক, ঘানি-নাশক, ধাতু সকলের সমতাকারক । মণ্ড কিছু শিঠির সহিত থাকিলে, তাহাকে “পেয়া” বলে । “পেয়া” স্নুংপিপাসাজনিত দেহের অবসন্নতা ও দৌর্বল্য নাশক । উদরবেদনা, অধিমান্য ও জ্বরানিরোগে উপায় ।

(ক্রমশঃ)

ঔশরচন্দ্র রায়, কবিরাজ ।

রাম বহু ।

প্রথম প্রস্তাব ।

সালিকা-নিবাসী জয়নারায়ণ বহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র বহু, ওরফে রাম বহু, ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে গ্রহণ করেন । তিনি ৪২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন ; অর্থাৎ, ১৮২৯ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন । নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রামু নৃসিংহ, † নিত্যানন্দ বৈরাগী, গৌর কবিরাজ, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, গোরক্ষ নাথ, নবাই ঠাকুর, কেট্টা মুচি প্রভৃতিরা তাঁহার সম-সাময়িক কবি ছিলেন । ইঁহাদের মধ্যে নিধুবাবু ও হরু ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ । রাম বহু যখন জন্ম-গ্রহণ করেন, তখন নিধুবাবুর বয়স ৪৬, ও হরু ঠাকুরের ৪৮ বৎসর ছিল । সুতরাং রাম বহু যখন তাঁহাদের সহিত কবিত্ব সমরাদানে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থাপন্ন ।

কবি-গাহনা কাহাকে বলে, এখনকার হরত অনেকেই জানেন না । পূর্বে কোন স্থানে কবি গাহনা হইবে শুনিয়া, শুনা গিয়াছে, এমন কি বশ জ্ঞান দূর হইতে লোক আসিত । আসর “ন স্থানং তিল ধারণং” হইয়া যাইত । এখনকার যাহারা “হাক্ জাকড়া” দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবি-গাহনা কতকটা অগ্রভব করিতে পারিবেন ।

পূর্বে, দুইটা দল আসরে নামিয়া, এক দল ধরতা বা চাপান (প্রশ্ন) পাঠিত ; অন্য দল তাহার উত্তর (উত্তর) গাহিত । উপস্থিত রচনা-শক্তি কবি-গাহনার একটা আশ্রয়্য মুদ্রকরী কমতা । রাম বহুই আসরে উত্তর রচনা করিবার প্রথা স্থাপিত করেন । তৎপূর্বে, প্রতি-পক্ষের নিকট এক জিহাঙ্গা করিয়া লইয়া পূর্বেই উত্তর প্রস্তুত করা হইত ।

কবিদলের মধ্যে হরু ঠাকুর, রাম বহু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী বেণে, ভোলা মররা, নীলু ঠাকুর, শুক দুখো, রামচন্দ্রের সেকুরা, বলরাম বৈকব, নীলমণি পাটুনি, এবং মোহনলাল সরকারের দল সুবিখ্যাত ছিল ।

† রামু এবং নৃসিংহ দুই জনে সংবাদদর । উভয়ের নাম একীকৃত হইয়া বাবুলত হয় ।

কবিগুণাধিপতির অধিকাংশ নীতি তৈরী, বিভাস, অমলমতী, বেহাগ এবং অংলা হুরে গ্রথিত ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীতে কি রকম একটা ফাঁকা গোছের যুদ্ধ হইয়াছিল । অষ্ট জেতাধিককে ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত দ্বিতীয় বৃত্তি-ভোগী একজনকে ভারতবর্ষের বলিয়া স্বীকার করিতে হইত ।—বাহা হউক, এ যুদ্ধের ফল আমরা ১৮৩০ খ্রীঃ হইতে ভোগ করিতেছি । ১৭৫৭ হইতে ১৮৩০, এই কিল্লিদ্ভিক সম্ভাবিব্যাপী সময়কে আমরা বাঙ্গালী দেশের ও বাঙালী সমাজের একটা স্বতন্ত্র যুগ বলিতে পারি ।*

আবার ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের যুদ্ধ হয় । আর কলিকাতায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে-আর সমাজ স্থাপিত হয় । ১৭৬০ হইতে ১৮২৮, এই আর সম্ভাবিব্যাপী সময়কে আমরা বাঙ্গালী সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র যুগ বলিতে পারি । †

যৎকালে বঙ্গদেশ, মিশ্র-খাওয়া বিধর্মীদের হস্ত হইতে এক অজানিত নব বিধর্মীদের হস্তে গিয়াছে, হেমচন্দ্রের সহনীয় ক্লান্তটিকা শীতের কুতীভেদ্য ক্লান্তটিকার মিশিতেছে ;—রাম বহু সেই যুগের লেখক, নীতের কোটিল । তখন ইংরেজ রাজত্বের মধুর বসন্ত—কেনিং-রাজত্বের পর-সীমায়, —বহুদূরে ।

আবার এ সময়ের সমাজের অবস্থা নিম্নোক্ত শোচনীয় । নিজের অস্তিত্ব ও গিয়াছেই, আবার মুসলমান-সমাজের উপসর্গ ও গ্লি-কুটিয়াছে । বহুবিবাহ প্রচলিত ; লাল্পট্য একটা ওষু ; বৈশাখাধা বাসুদাম ও ধনীরা লক্ষণ । রাম বহু এই সমাজের লোক ; তাঁহার আবার হুই জী ।

Carlyle বলেন,—“প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য সেই ব্যক্তি বতটা দুরী, সমাজ তদুপেক্ষা দারী ।” Emerson বলেন,—“একজন মহৎ

* ১৮১৮ খ্রীঃ কিছু কালের এই মহা নগরীতে স্থাপিত হয় । কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের অফল বঙ্গদেশ ইংরেজি স্থানিকত বৃদ্ধ-বৃদ্ধ, এই কালের হইতে, ১৮৩০ খ্রীঃ বহির্গত হয় ।

† দ্বিতীয় ওষ্ঠ ১৮০২, মকনমোহন ১৮১৫, বিদ্যাসাগর ১৮২২ খ্রীঃ অমলমতী করেন । রামমোহন রায় ঐই যুগের মধ্যবর্তী সত্য, কিন্তু তিনি যুগান্তবর্তী লোক নহেন ।

ব্যক্তি, সামাজিক মনোভাবরূপ বহু হরেন। সে সময়ের সমাজ তাঁহাকেই চিত্রিত-করিত।" তবে—বয়স অপভ্রুত, চিত্তপূজ্য কবিগণ সমাজের ধোঁস ওণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকিতে পারেন নাই, রাম বহু ত কোন দূরের কথা !

আমার নিবাস, দেখের উন্নতির যুগে সমাজের হতাবস্থা যদি তিনি জ্ঞাত হইতেন, তাহা হইলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা রচয়িতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, তাঁহার লেখা অন্য ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হইত। তিনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, এই অমর আমি স্বীকার করি। কিন্তু অসামান্য নহেন।

আবার, কবি-পাচন রাম বহুর জীবিকা ছিল। তাঁহাকে একজনমাত্র রাজা বা ভূমিমীর মৃগাপেক্ষা করিতে হইত না। সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আন ধারণ করিতে হইত। সমাজের সহিত কবিকে যখন মিশিতে হইবে, তখন তাঁহার অধোপাতি হইবে; ইহা দ্বির সিদ্ধান্ত।

এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খল-যুগের সাহিত্য-একটু অনোন্মোদন করিয়া পড়িলেই দেখা যায়, সে সাহিত্যও "বিশৃঙ্খল, আদর্শ-হারা। এ সময়ের সাহিত্যকে, আবার একটা স্বাভাবিক স্রোত বলিয়া বোধ হয়। সে স্রোতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির দুই একটা ভাব চেউয়ের মত আসিয়া পড়িয়াছে; ভারতচন্দ্রের ভাষাও দুই একটি আবর্তের মত ঘুরিতেছে সত্য; কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, স্রুতি বৈকব কবিগণ যে সমুদ্রমুখে, ভারতচন্দ্র যে উপসাগর মুখে গিয়াছেন, সে সাহিত্য সে সমুদ্রমুখে, সে উপসাগরমুখে যায় নাই, বা তাঁহাদের স্রোতে উপনদীর ছায়া কাঁপাইয়া পড়ে নাই। এ স্রোত স্বাভাবিক; ইহা অতীতপূর্ণ আকুলতা। উন্মিষাৎ যুগের ভিত্তি।

এই যুগের তিনটা তান বাজালা-সাহিত্যের চির গৌরব। "নিধুর উপা, হক্টাচুরের স্বা-স্বাধ, এবং দাম্বজুর বিরহ। "ঐরুক্ত রামগতি নায়ক মহাশয়কে, একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি রামবহুর বিরহ জনিয়া বলিয়াছিলেন। "আমার কবি টাকা থাকিত, রাম বহুকে লাখ টাকা দিতাম।"

"রামবহুর পানের ভাব যেমন স্বাভাবিক, সমস্তোপযোগী এবং সুন্দর; শব্দ

বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

বিন্যাসও তেমনি প্রাক্কল, সুকৌশলসম্পন্ন, যতরাং পরিপাটি ও মনোহর।[†] রাম বহুর ভাষা প্রাক্কল হইবার তিনটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। ১মতঃ, ইহা পানি, সরল হওয়াই উচিত। ২য়তঃ, ইহা সাধারণের জন্য। ৩য়তঃ, ভারতচন্দ্রের পরে, নহিলে কেহই ভুলিতে চাহিত না, বুদ্ধিতে পারিত না। এই কারণে কবিওয়ালাদিগের প্রত্যেক পানই প্রায় প্রাক্কল এবং সরল।—কিছু অর্থশাসের ছটার বিশেষ নূন। আবার বিবাকল্যুনি এক রকম ঘুল্লিগিরি ছিল।—

‘ঐ মনেতে মনি, পক আমার কান্ হোলে।

করে পক দুখে দাঁহ, পকহুত দেহ, পকহুত বুঝি পাই পকবা।

পক যাতনা প্রায় নিলি পক প্রহরেতে ।

যদি পকানত কলি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ, জুড়ে বেঁধে পকবাণ ;

জগ পকানত তবু তবু কোরেছিলেন যার, এখন সেই দহে দেহ পক শরতে ।

‘ইত্যাদি—ইত্যাদি ।

আবার রামবহুর প্রগতিচিত্র উচ্চ-স্থান নহে। যে সমীচীন পবিত্র হোমাদি-নিধার ন্যায় জগৎকে সর্বমুখে লইয়া, হাস, ইহা সে, প্রণয় নহে। যে প্রেম-নীতি পাঠ করিলে ইচ্ছা করে দুই দণ্ড বসিয়া জাবি; কি ভাবিল অথচ আনি না; দুনি দুই দণ্ড একা বসিয়া জাবিলে প্রাণের কোথাকার কতকটা যোর-যোর তার লাগব হইবে,—এ মানে তেমন একটা সাধের ত্রিষদ-ভাব নাই। সহস্র কথায়—ইহাতে ওস্তাদ নাই, আগ-বলিধান নাই, প্রাণের সরলতা নাই, কর্তব্যপরায়ণতা নাই। প্রতিদানের রাদিকার ন্যায় ব্যাহুলতা নাই, বিলাপতির রাদিকার ন্যায় অরূপ নাই। ইহাতে রোহিণী-হীরার ইঞ্জিয় চাকলা আছে; ভারতচন্দ্রের বিদ্যার লুকচুরী আছে; শক্তিকা মন্ত্রীর ছড়া আছে; বৃন্দাবতির প্রণয়নতা আছে, কোকিলের কুহুধর আছে, মল্ল-সঙ্গীত আছে, ভ্রমরগজন আছে, শ্রিয়সণী আছে, মন-আলা আছে। তবে—নির্ঘ দীর্ঘ যুগত নাই, কথায় কথায় প্রাণভাণ নাই; ঘন ঘন মুচ্ছা নাই। তাই রক্ষা। তবে, আরো কিছু আছে। সে কথা পরে দেখিব ।

ভাঁহার কবিতা পৃথিবীর পূজা মাথা । ভাঁহার সুবক্তার মননের পক্ষপরে,
প্রাণনাথের কিচ্ছদ-শরে সারা হয়েন । বিরহে রতিপতি কুলনাশক, প্রাণ-
পতি প্রাণনাশক । উভয় শব্দে পড়িয়া ভাঁহার সখীকে বলেন,—

“আপনার পতি হ’য়ে দুখিল না বেদনা,
রতিপতিবুকু বে কেন পর-নারীর বেদনা ?”

কেহ বা আক্ষেপ করেন,—

“আমার ধনের সম্ভোগী যে জন
করিনা বুকে ; দেখিল বিপুল
রক্ষা করিয়েন বকের ধন ।”

সখীর প্রবোধ শুনিয়া বলেন,—

“আমি সাধে ক্রি সাধিনা তারি ।”

দেখলে সুই আমার, শত্রু ফিরে চায় ;

“সে যেন—চোখের মাথা ধায় ।”

কেহ বা ভালবাসার ত্রিরাতি না যাইতে যাইতে বিড়ম্বনা দেখিতে পান,—

“আপো মান ধোয়ালেম, কুল মজালেম,

শেষে দেশ বিদেশে অপমান ।”

ইহাদের বড় দুঃখ জালা যৌবনের, বসন্তের এবং মননের ।

“যৌবন জনমের মত যায়,

সেতো আশাপথো নাহি চায় ।

কি জ্বরে গেণ প্রাণ সখি, রাখিব উহার ?

জীবন যৌবন গেলে আর, কিটের নাহি আসে পুনর্বার,

বাঁচিতেও বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায় ।

হার ঘোলকলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার ।

দিনে দিনে ক্ষয় হরে বিকলেতে বার ॥ ইত্যাদি—ইত্যাদি ।

উদ্দাগ হৃদয় ।

হায়, কেমনে বলিব আরেবারি—
 তোমার ও মুখ ধানি সরল কুহুম সম
 সাজের কোমল কাণে আলোক-প্রচার ।
 প্রাণের আধার মোর, যায়না, যায়না হায়
 ঐ ও আলোক দানে ;
 তোমার ও সরল মেহ, তোমার ও কোমল প্রাণ
 পশেনা—যেনো মোর প্রাণে ।
 আধার আধার মোর, ছিদি,
 পতীর অগীধ, মোর তৃষা,
 কেমনে মিটিবে বল কেমনে জুড়াবে বল
 হৃদয়ের দাক্ষণ পিপাসী !
 হু—হু কুহুম তুই, হু—হু তারাটি সম
 হু—হু, হু—হু তোমার প্রাণের লহরী ;
 বিরাট ছবি মোর, প্রলয়ের মেষ ধার
 চরাচরে এসারিয়া ঘোর বিভাবরী ।

কিছুতে যেতে না সাধ, বসিবায় স্থান তার
 পায় না—বেধে না মোর উদ্দাম হৃদয় ;
 ব্যাকুল কটিকা মত আকুল সাগর সম,
 নিরন্তর হু হু হু বহে চলে যায় !
 কেন রে পাগল মন কিসের করিয়া আশ ?
 কোন সাধ বল তোমার যেতে না ক্বেদায় ?
 কাহারে হু জিয়া কল গরজি গরজি উঠে
 আশার অশনি তোর দিকে দিলে ধায় !

আলোর মাঝে তুই দেখিয়া কাহার মুখ—
 কার প্রেমে উল্লসিত—কার প্রেমে বন !
 কাহারে করনা করি হৃদয়ে অনল জ্বলি
 "নিবের অনলে তুই দহ অবিরল !"

জানি নাকি যাহা আমি তাহার হৃদয়-মার্কে
 আছে গো কতই গোঁড়া ।

অজানা বলির গলে অপূর্ণ আলো জ্বলে
 আছে কত-মণি মনোলেভা ।

আধার সাগর পার করতই নিচির দেশ,
 কত দ্বীপ জাগ্রো ভাদে তার,

অপূর্ণ কুহুম কোটে, বরষা সুগীত ছোটে,
 বহে কত অপূর্ণ বায় ।

কালের সাগরে এই পায়নি হৃদয় মোর
 জুড়বার স্থান,

চরাচর আসি করি ঘুরিয়া বেড়াই তাই
 অশ্রিময় প্রাণ ।

তুমি সখি এতটুকু রক্ত নীহার-দরি,
 লোমল কুহুম-হৃদে তোমার আসন ;

এসনা আমার কাছে ত্রুটিয়া যাবে তুমি,
 প্রদীপ্ত ভাস্কর মোর অতৃপ্ত দীবন ।

আমার প্রচণ্ড প্রেম উড়াইয়া দেয় কত
 রাজ্য আর রাজার সম্পদ ।

অতৃপ্ত বাসনা হৃদে আসে গো যখন যাহা
 ঘটে তার-বিহীন বিপর ।

অনন্ত মত ধরে দারুণ হ্রস্ব : প্রেম
 বহে যায় কড়ের সমান ;

অতল জলপি তল নিভৃত-পারে না তারে,
নিশিতার কঁরে না নিরীশ ।

অতৃপ্ত কঠোর উষ জগতে আছে গেয় যাহা

আমার প্রাণের কাছে মানে পরাজয় ;

জলপি অনল বায়ু গরল পিপাসা জ্বালা

আমার জগৎ সম উগ্র তীর নয় ।

বাধিতে পারে না তাবে স্বরগ নরক—বন্দ্য

অবস্থার অদৃষ্ট সহরী ;

উধাও উধাও শায় জীবন-উৎস :

চরাচর সকল বিদ্যারি ।

এমন হৃদয় সখি কি কঁরে তোমার হবে

ঘুমে-ভরা আঁখি দুটি ভোব ;

হরত জলন্ত প্রাণ কেমনে রাখিবি ধরে

গোপল-স্বপনে হুই ভোর ।

যাও সখি কিরে যাও : তোমার মঙ্গল ধামে,

যেখানে সূর্য্যাস্ত-রবি হাসে,

কুবলয় আঁখি দুটি রাখিরা আকাশ পানে

চৈত্রে থেক সন্ধ্যার উদ্দেশে ।

সায়াক্ষ-সরসী যথা আঁধারি ঘনায় উঠে

সন্ধ্যার নাভাস পেয়ে গায় ।

প্রশান্ত মুখানি তোর হইবে প্রশান্ত আরো

রবি হবে চাহিবে বিদ্যারি ।

হুটিবে সাজের তারা উঠিবে তোমার গান,

বায়ু তাতে চারি দিকে বেবে ভাসাইয়া ;

শিশুর অধরে হাসি, কোমল শৈশব স্মৃতি

দুল গুলি সেই হবে উঠিবে আশ্রিত ।

আমি যাঁই খুঁজিবারে বিশাল জগৎ মানে

কোথা হুটে আছে মোর সাধের স্বপন।
 কোন্ আকাশের মাকে যেদি তারা উঠিয়াছে,
 সন্ধান পেয়েছে প্রাণ—দেখেনি নয়ন।
 কোন্ দিকে, কোন্ খানে, কোন্ সাগরের পারে
 দৃঢ় পৃথিবী মোর নব মহাধ্বনি !
 কোন্ প্রান্তরের মাকে পূরবের স্বর্ণ ঘরে
 অমর দিনের গিরে উঠিছে দিনেশ।
 খুঁজিবের—খুঁজিবের স্বপ্নমাধা মদীতীরে
 বনের গোপলিময় আলোকে আকুল,
 রি পথ পানে চেয়ে নাকলানা খুলিয়াছে
 স্বপ্ন সায়াহ্নে ভরা নয়ন-মুহুর।
 আধার পরাণ নিয়ে বনের আধারে ঘাব
 শত ধনি নিয়ে তার ডাকিব উচ্ছ্বাসে;
 বনের আধার কাটা তারকা নহীন খুলে
 কহিবেন নাকোন কথা আমার সকালে।
 তবুও না পাই যদি সে দেখের ঠিকানারে
 যেথায় স্বপন মোর নহে ত স্বপন,
 কোথাও না সেলে যদি সে উজ্জ্বল উপমাটি
 আধার ভাবের মোর নির্মল মর্পণ,
 পাখী ফুল তারাদের স্বপ্নানে চেয়ে চেয়ে
 কিছুতে পারিনে যদি করিতে স্বরণ
 সে মধুর কথাটির, পূর্ণ করে দেবে বাহা
 এ জীবন-পরারের অপর চরণ।—
 মিশায় আকুল প্রাণ আকুল বায়ুর সনে,
 অতৃপ্ত জীবন দিয়া পৃথিবী ঢাকিব।
 আশ্রয় সরিষা পুন, আশ্রয় বাঁচিয়া পুন,
 নিরন্তর হ হ হ হ-বহিব—বহিব।

প্রতিশ্রুতি রাখেন।

দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান ।

(দ্বিতীয় ব্যাখ্যান)

“তপাংসি সর্গানিচ যদ্বদন্তি ।” (কঠ: ৩ঃ) সর্গ প্রকার দেবদেবীর পূজা অর্জনা ব্রহ্মতেই উদ্ভিষ্ট । “ব্রহ্ম দৃষ্টি কংকর্ষাং ।” (শা: ১ঃ) আদিভ্যানি দেবগণে ব্রহ্ম দৃষ্টি পূর্ষক উপাসনা উৎকৃষ্ট দৃষ্টি: ।

“যেহপান্যদেবতাতকা বজ্রেনে শ্রদ্ধয়াবিধিতা: ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ষকং ॥” (গীতা: ৯:২৩)
যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ষক অন্য দেবতার পূজা করে সে আমরা পূজা করে । তবে সে, কলকানী বিধায়, কেবল যাগফল মাত্র পায় । কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে সগ দেবতাতে অগ্ন্যগ্নি জানিয়া পূজা করে সে মুক্তিলাভ করে ।

১৭৫০ শকাব্দা ৬ তাম্র বুধবারে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পূজ্যপাদ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যে প্রথম ব্যাখ্যান পাঠ করেন • তাহাতে আছে “পরমেশ্বরের সম্বন্ধে অবলম্বন করিয়া তাবৎ বস্তু রহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর বোধে যে কেহ যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে পরমেশ্বরেরই উপাসনা হয় ; এবং প্রত্যক্ষও দেখিতেছি যে, যে সকল ব্যক্তিরা পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্তি বিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন তাহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে, বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে, নদীকে নদী বোধে, ও মূর্তি বিশেষকে কেবল মূর্তিবোধে উপাসনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আনির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব তাহাদের প্রতি দেব ও গ্নানি শাস্ত্রত: এবং মূর্তিত: সর্গধা অধোপায় হয় । যদ্যপিও তাহারা পরম্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন বোধে উপাসনা করিতেছেন, তথাপি সে উপাসনা সর্গধা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে এমত কথা যায় না, যেমন যদ্বদ্য খটোতে, কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বুদ্ধোপরি শয়ন করিলে সে শয়নের

আধার পৃথিবাই পরম্পরা হইয়া থাকেন । এবং ত্রুটিতেও স্পষ্ট দেখিতেছি “তৎপাংসি সর্বানিচ যদ্বাস্ত ।” (কঠ) তপস্যাদি কৰ্ম্ম সকল যে কোন প্রকার হউক পরমেশ্বরের প্রাপ্ত্যৰ্থ হইয়া থাকে ।” * বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উক্ত ব্যাখ্যানে এই কথাগুলি কহিয়া তৎপরে নানাশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা দর্শাইয়াছেন যে, “সংকাম পরমেশ্বরের উপাসনা সৰ্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয় ;” পক্ষাৎ উপসংহারে কহিয়াছেন “অতএব ইহাদের (আত্মোপাসকদের) সহিত অন্য কোন উপাসকের বিরোধ সম্ভাবনা রহিল না, যে হেতু ইহারা বিরোধে উদ্যত অন্য উপাসককে কহিতে সমর্থ হইবেন যে ‘তোমরা স্ত্রী রূপ বিশিষ্টকে কিবা পুত্রস্বাকৃতি বিশিষ্টকে অথবা অন্য বাহ্যকে উপাসনা করহ তাঁহাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্দাহ-কর্তা কহিয়াই উপাসনা করিয়া থাক ; যদি তোমাদের সেই উপাস্য জগৎকারণ হন, তবে তিনি হুতরাং আমাদের অর্থাৎ “আত্মোপাসকদের” উপাস্য হইলেন, অতএব আমাদের সহিত তোমাদের বিরোধের বিষয় নাই । “এইরূপ আত্মোপাসকদের দ্বেষ অন্য অন্য উপাসকের প্রতি সম্ভবে না, কেন না ইহাদের বিশ্বাস এই যে ঐ সকল উপাসকেরা যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে ব্রহ্মবোধ বিনা উপাসনা হইতে পারে না । অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল যে, দ্বেষ ও বিরোধ যাহা ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত দূষণীয় হয় তাহা অন্যের প্রতি আত্মোপাসকের হয় না ।” কলিকাতা ব্রাহ্মসনাতনের এই প্রাচীন ব্যাখ্যানটি ও মহাত্মা রামমোহন রায়ের অনুষ্ঠান গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতেছি যে তখনকার ব্রাহ্মদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন উপাসক যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাঁহাতে ব্রহ্মবোধ করিয়াই উপাসনা করিয়া থাকেন । অতএব ব্রহ্মবোধ পূৰ্ব্বক বা ব্রহ্মের আবির্ভাব স্বরূপ পূৰ্ব্বক দ্বাৰারা প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের পূজা করেন তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মদিগের দ্বেষ সম্ভবে না । এ সিদ্ধান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বা মহাত্মা রামমোহন রায় নূতন করেন নাই ; কিন্তু তাহা সৰ্ব্ব শাস্ত্রানুমেদিত ভারতীয় সনাতন সিদ্ধান্ত । এই সনাতন সিদ্ধান্ত এইরূপ-

* রামমোহন রায়ও পূৰ্ব্বঃ স্বীয় অনুষ্ঠান গ্রন্থে ৪০৭ প্রস্তরের উত্তরে ও তাহার প্রমাণ-প্রকরণে ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । রাঃ মোঃ বা বাঙ্গালা গ্রন্থাবলি । ১৭২৪ শক । ৪০৮ ও ৪০৯ পৃ ।

কার অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের পুজিতে সংলগ্ন হয় না। হুতরাং দেব ও বিবেদ-বশতঃ ভারতীয় ধর্মরাষ্ট্রো মহা বিচল উপস্থিত হইয়াছে। এই বিবেদের প্রতিকারার্থে দুই একটি কথা কলা আনন্তক।

নব্যগণ যদি একবার হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা করেন, তবে মুক্তিতে পারিবেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উল্লিখিত প্রাচীন মত সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। ফলতঃ চিত্র বিচিত্রিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরবোধ করে এমন লোক ভাবিতে পারেন না, এবং শাপ্তে কোথাও মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলেন নাই। গীতা শ্রুতিতে আছে “বদ্যকৃত্যনেককিন্ম কার্যেসকু মহৈহতকম্। অতদ্বার্গবদমকু তত্ত্বামস দুদাগতম্॥” স্থল শরীরই আস্তা এবং প্রতিমাই ঈশ্বর এরূপ অভিনিবেশ এবং এ প্রকার যুক্তিবিমুক্ত ও পরমার্থবলপন্নশূন্য যে বোধ তাহা অতি তুচ্ছ। তাহা নিষ্টগণ কর্ত্তক তামস স্বরূপে নিকৃষ্ট হইয়াছে। অতএম মূর্ত্তি কখনও ঈশ্বর নহে। কেবল উপাধিমাত্র-মূর্ত্তিকে মূর্ত্তের ঈশ্বর বোধ করিতে পারে, কিন্তু ঈহাদের কিকিন্মাত্র শ্রদ্ধা বা বোধ আছে তাহারা মূর্ত্তির অবলম্বনে ভগবানেরই আবির্ভাব অহুতব করেন। মূর্ত্তিপূজার ভক্তিব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া মানব আপনার অনিত্য দেহ ও অনিত্য সংসার স্মরণপূর্ব্বক ভগবানকে সকাঁতরে আত্মান করেন। তাহার অহুতগণের সম্মুখে দীননাথের আবির্ভাব হয়। সেই আবির্ভাবই দেবালয়ের জীবন্ত দেবত এবং নিরবয়ব ঈশ্বর। নতুবা মূর্ত্তিই যে স্বয়ং ঈশ্বর এমন অতিপ্রায় নহে। তবে সকল পদার্থেই ঐশী শক্তির আবির্ভাব। ঈশ্বর তৎসকলজেই পূর্ণ। সে তাহে মূর্ত্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করা স্বতন্ত্র। তাহাতেও ভূতমাত্রোপাধি-যুক্তিত মূর্ত্তি ভিন্নত্বত হয়। পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মই গৃহীত হন। “পূর্ণম্য পূর্ণমাদ্য পূর্ণমেব-বেক্রিয়তে” (ঈশোপনিষদে-শান্তিবচন)। ‘পূর্ণম্য’ কার্য্যামনোভ্রাক্ষণঃ ‘পূর্ণং’ পূর্ণং ‘আদ্য’ গৃহীত্বা আয়তরূপে কবমত্বনাপাদ্য বিদ্যয়া ভূতমাত্রো-পাধিঃ ভিন্নত্বতা ‘পূর্ণং’ ‘এব’ অনন্তরমবাক্যং প্রজ্ঞাতৈক রস স্বভাবঃ কেবলং ব্রহ্ম অবশীষ্যতে।” (শাকর ভাষ্য)। ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, জ্ঞানযোগে অথবা ভুক্তিবোগে রূপতের যে কোন বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে সে বস্তুর ব্যবহারিক সম্ভার অসম্ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং

ব্রহ্ম সৰ্বস্বরূপ—এই জ্ঞানযোগে ভক্তিপূৰ্ণক যখন প্রতিমাকেও ব্রহ্মবোধ হয় তখনও আশ্চর্যরূপ লক্ষ্যই গৃহীত হন, তুম্যাত্মোপাধিনিশিষ্ট প্রতিমা মিথ্যা হইয়া যায়। “তে যদন্তরা তদ্ব্যক্ষ” (শারীরিক স্বত্ব) তাদৃশ ভূত-মাত্ৰোপাধি হইতে যিনি স্বতন্ত্র ও নির্রিণ্ড তিনি ব্রহ্ম।

ভগবানের স্বীয় বশীকৃত মারা-কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন ঐচ্ছিক রূপকে, আর স্বষ্টিতে বিক্ষিপ্ত মারার অঙ্গবিশেষ উপলব্ধিত তাঁহার অজ্ঞেয়মাদিঐবাদি রূপকে, আদর্শপূৰ্ণক ভারত সমাজে যত দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে সমুদয়ই পবিত্র। সমুদয়ই ভগবানের অনির্কলনীয়া শক্তির, অপার করুণার, বৈরাটিক মহিমার এবং পুরুষোত্তম অধিষ্ঠাতৃবের স্বরণ-মাধ্য। তাদৃশ কোন এক মূর্তি যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহার সহিত ভগবানের ঐশ্বর্য, বীৰ্য্য ও পবিত্র নাম সংযুক্ত হইয়া সেই মূর্তি, তদুপলব্ধিত পূজা, হোম, বলিদান, চণ্ডিপাঠ, আরতি, দক্ষিণাশ্র, ব্রাহ্মণ ও অতিথি অত্যাগত-ভোজন, দান, ধ্যান যাত্রা, বাদ্যোদ্যম, স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলগান, এবং সমস্ত দেবালয়কে আশ্চর্য-রূপে পবিত্র করিয়া তুলে। সেই সেই পবিত্র ঐশ্বর্যের ভাব কর্তৃক আকর্ষিত হইয়া পাণী ভাপী, মুখস্থ সকলেই আপন আপন মনের কথা ভগবানকে বলিবার নিমিত্তে শ্রীমন্দিরের দ্বারে গমন করেন, এবং তথায় সেই প্রাণ-সখাকে—সেই স্নেহময়ী অগজজননীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকেন। হে ভ্রাতঃ! অভিমান ভাগ্য করিয়া বল দেখি, তিনি কি দেবকের ত্রাণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন না? যদিও ফলদান নিমিত্ত সকাম-উপাসকের নানা প্রার্থনার সঙ্গ সঙ্গ তিনি মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, কিন্তু সরল মনে বল দেখি ব্যঞ্জনিত ভক্তগণের আস্থানে, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্তে, সেই সমস্ত দেবতাকে ও দেবালয়ে তাঁহার বিশেষাবির্ভাব হয় কি না? ফলে যিনি সর্বত্রই সমান তাঁহার এইরূপ বিশেষ আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব? এরূপ আশঙ্কার সমাধানার্থে গীতা স্বুতিতে ভগবান কহিয়াছেন, “সমোহং সর্ব ভূতেষু নামদেবোহন্তিন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তিত্বাং ভক্ত্য যস্মিতে তেহু চাপ্যহং।” যদিও সমস্ত ভূতে আমি সমান এবং সেজন্য কোন স্থানে আমার বিশেষ আবির্ভাব নাই, আমার প্রিয় ও অপ্রিয়ও নাই, তথাপি আমার ভক্তির এতনি বভাব, যে তদ্বারা উপাগক ব্যক্তি, যেমত আমাকে মুক্ত হয়, আমিও

তদ্বারা তাহার প্রতি সেইরূপ সদয় চাই। “নশ্বক্রেত্রেবারঃ মহিমেন্তি” আমার ভক্তিরই এট মতিমা। ইহা আমার সার্বভৌমিক নিয়ম। ফলে এ নিয়ম কেবল স্বত্বস্থিতিসম্বন্ধাধীন, সূত্রাৎ মায়িক। বেদান্ত সূত্রে ভগবান ব্যাসদেব সীমাংসা করিয়াছেন “মায়িকত্বাত্ নবৈষমাং”। লোকে কোন স্থানে অর্থাৎ দেবালয়াদিতে যে ঈশ্বরের বিশেষ অধিষ্ঠান দর্শন করে সে কেবল মায়িক, নতুবা ভগবান কোথাও অল্প-অধিষ্ঠিত, কোথাও অধিক-অধিষ্ঠিত নহেন। তবে ঐ ভক্তির নিয়ম এমনি আশ্চর্য্য যে, যেমন দৃষ্টি-বাচি-চার বশতঃ রজ্জ্বকে সর্প ভাবিয়া এক জনের আতঙ্ক হয়, আবার কঠমালা ভাবিয়া অন্যের আনন্দ হয়, সেইরূপ ভক্তির আশ্চর্য্য নিয়মামুসারে ভগবদ-ভক্তজন, স্বীয় উপাসনা-দণ্ডে, দেবালয়ে, গহ্বারানে, সূর্য্যচন্দ্রে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব দেখেন। যদিও এ প্রকার দর্শন আংশিক এবং কর্তৃত্ব (Subjective) কিন্তু তাহা পরিপূর্ণ ও বস্তুতর (Objective) ভগবদর্শনের ন্যায় ফলদান করে। কেন না ভগবানকে স্বরূপতঃ কে জানিতে পারে? ভক্তির গুণে তাঁহার যে আবির্ভাব দৃষ্ট, যে আদেশ শ্রুত ও ছন্দঃসম্বন্ধিত হয়, তাহাই তাঁহার দর্শন, তাহাই তাঁহার আদেশ। তিনি সর্ব্বত্র সমানরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সাধক কেবল মায়াজন্য তাঁহাকে উপাধিবিশেষে দর্শন ও অবস্থাবিশেষে তাঁহার আদেশ শ্রবণ করেন। এরূপ মায়িক, আংশিক বা কর্তৃত্ব দর্শনে ভগবানের সর্ব্বব্যাপ্তিভের হানি হয় না, এবং তাদৃশ দর্শন পূর্ণরূপেই সম্বন্ধিত। মূল কথা এই যে, ভগবান সাধককে দর্শন ও আদেশ দিবার নিমিত্ত সর্ব্ববটেই বর্ত্তমান। কিন্তু সাধক, স্বত্বস্থিতি উপাধির ও ভক্তির তারতম্য বশতঃ কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলে ও অবস্থার তাঁহার দর্শন লাভ ও ভগবানের আবির্ভাব সন্ধি স্থান লাভ করার সাধক সম্বন্ধে ভগবানের আবির্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূত্রাৎ ভক্তেরা অবিলম্বেই বলিয়া থাকেন যে, দেবদেবীর পূজার অথবা দেবালয়ে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হয় এবং ভক্তের জন্মে তিনি কথা কহেন। যদি ভাবুক হও, তবে হে পাঠক! তুমিও ঐ কথা স্বীকার না করিয়া পারিবে না। যনে কর, তুমি-এই পরম ওহ্য ভাবটি বুঝিতে পারিলে; বুঝিয়া কি বুড়ের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিবে? ভগবানকে ঐ দেবমন্দিরে ও ভক্তিবাপারে কি

তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিবে না? সেই যোগীজগৎ-মূলতঃ ভগবদাবিভাব লাভ ও স্বরণ করিয়া “শৌভলিক-অপবাদের” ভয়ে কি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? একবার মৌনভাবে চিন্তিয়া দেখ। যে পরম দেবতার উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রতিমার স্থাপন, সঙ্গপ্রকাঃ দেবার্চনার মধ্যে তাঁহাকেই দর্শন করা সাধ কথ্য। তাদৃশ দৃষ্টিব সম্মুখে প্রতিমা হের হইয়া ব্রহ্মই প্রকাশিত হইলেন, ঠিক সেইরূপ যেমন বৃক্ষশাখার অবলম্বনে চন্দ্রদর্শনের কালে বৃক্ষশাখা হের হইয়া থাকে। ঠিকই প্রতিমা পূজার মুখা উদ্দেশ্য। নচেৎ ইহা উদ্দেশ্য নহে যে কেবল “মূর্ত্তিটি” যোক্ষ নান করিবে।

ব্রহ্মজ্ঞানীর সকাশে যদি কোন দেবদেবীর উপাসক, পরমার্থের বিজ্ঞান হন, তবে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্তব্য যে, প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রতিমাপূজার যথার্থ প্রভৃতি ও উদ্দেশ্য এবং তাঁহার স্বীয় অজ্ঞাত অথচ তাঁহার অন্তরের গভীরতম যে লক্ষ্য তাহা বুঝাইয়া প্রতিমার অর্চিত, অতীন্দ্রিয়, “অব্যক্ত-মনসগোচরঃ,” “একান্তপ্রত্যাহারঃ,” পরব্রহ্মের জ্ঞানোপদেশ করিবেন। “অম্বর” • দ্বারা ঈশ্বরাবিভাব-বৃত্ত প্রতিমা পূজা ও দেবালয়ের পবিত্রতা বিজ্ঞাপন করিবেন এবং “বাতিরেক” • দ্বারা প্রতিমারূপ-উপাধির প্রতিবেদন করিবেন। তাঁহাকে বেশ করিয়া ভাজিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, লাগে যত স্থানে প্রতিমা পূজার বিধিও প্রশংসা আছে সে সমস্তই “অম্বর” ন্যায়াভ্যুগত। আর যত নিবেদন ও নিন্দা আছে সে সমস্তই “বাতিরেক” ন্যায়াভ্যুগত। এই “অম্বর,” “বাতিরেক,” প্রভৃতি পরিভাষার জ্ঞান সমস্ত তাঁহাকে “ভক্তি” ও “দর্শন” উভয়ের সাচাদো প্রদান করিবেন। কিন্তু বাহ্যতে প্রতিমা উপলব্ধিত ঈশ্বর-পূজার প্রতিবেদন হয়, এমন উপদেশ দিতে সর্বতোভাবে বিরত থাকিবেন। কেন না, বাহ্যের স্বরূপ জ্ঞান লাভে যোগীগণ অক্ষম হন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে কিরূপে স্বরূপতঃ বুঝিবে? এটী অন্য পুরম যোগীরা বাহ্যকে জগদ্রথামে স্বরূপতঃ সাক্ষাৎকার করেন, সর্বদেশের ও সর্বকালের লোকেবা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানাতাবে, যারার সহকারিতার,

• এক পদার্থে অন্য পদার্থের যোগকে “অম্বর” কহে। এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরকে বিরোধ করাকে বাতিরেক কহে। ঈশ্বরাবিভাব, প্রতিমা বা কোন সত্ত্ব পদার্থের সহ বৃক্ষ হইলে প্রতিমা বা তাদৃশ সত্ত্ব পদার্থের পবিত্রতা জন্মে। বিবৃক্ত হইলে একরাত্রা বিতণ ব্রহ্মই অংশিত থাকেন।

ওণেশিংহরপূরক নানা আকার প্রকারে তাঁহাকে আশ্বস্ত সেবা করিয়া থাকেন। সাধকদিগের অদ্বয়ে তাদৃশ পূজা দ্বারা যে ফল সঞ্চিত হয় তদ্ব্যক্তি সে নগ্নের বিধাতা। নতুবা প্রতিমূর্ত্তি কখন যোক্ষ বা অন্য ফলদাতা নহে। গীতাতে কহিয়াছেন “যো যো যাং যাং তন্ম ভক্তঃ শ্রদ্ধাযুক্তিহুমিচ্ছতি। তস্যাত্মাচলোৎ প্রক্কাং তামেব বিদ্যামাহঃ।” যে যে ভক্ত আমার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূরক কোন দেবমূর্ত্তির অর্চনা করে আমি অন্তর্যামীরূপে সেই সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই। ‘সতয়া শ্রদ্ধায়ুক্তস্তস্মারাদনমোহতে। নততেচ ততঃ কামান্ মাঠৈব বিহিতান্ হিতান্।’ সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাদৃশ দেবারাধনা দ্বারা যে ফলপ্রাপ্ত হয় তাহা আমাকর্ত্ত্বকই প্রদত্ত হয়। থাকে। কেননা সে দেবতার আমারই স্বরূপ এবং আমাতেই সমন্বিত।

অবিকৃত ভগবানের পূজার নিমিত্তে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সে সমস্তই তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও পবিত্র বিহীতি-রূপক। এই সমস্ত মূর্ত্তি, এক লিখিত উপদেশের ন্যায় নানা প্রকার পারমার্থিক অর্থে সমন্বিত। সাধকেরা প্রতিমা-উপলব্ধিত ভগবত্প্রাপনা দ্বারা এক দিকে যেমন স্বীয় স্বীয় ভক্তি ও প্রীতি বস্তির চরিতার্থতা লাভ করিবেন, অন্যদিকে এই প্রকার পারমার্থিক অর্থরূপ ফললাভও করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ফলতঃ কেবল মাত্রা অন্যাই ভগবানের এই সমস্ত রূপগ্রহণ। মাত্রাই প্রকৃতি। সেই অনির্করণীয় মায়া-স্বরূপিনী প্রকৃতিরূপ মহাপটে যেমন মহত্তর অবদি বাস্তুকাঙালি পযান্ত চিত্রিত হইয়াছে, তদ্রূপ এই মাত্রাকেই আশ্রয় করিয়া ভগবান সামান্যতঃ মহত্তর অবধি সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আত্মকল্পের পরিমিত সমুদ্র নৈবী-শক্তি সম্পন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন যখন স্বর্গের স্রাবী ও অধর্গের বৃদ্ধি হয় তখন জন সমাজে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। তখন যদিও তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণার্থে, দুঃখীদিগের বিনাশার্থে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত স্বর্গের পুনঃ সংস্কারার্থে মায়া-নির্ম্মিত রূপ পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভক্তদিগকে ব্রহ্মাত্ত্বের জন্য স্থিতিভঙ্গরূপ তত্ত্ব সকল উত্তমরূপে জ্ঞানদগম করিয়া দিব্য উপযোগী ভাব ও শক্তিকে স্বীয় রূপের দ্বারা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। তাঁহার বস্তুপ্রকার মাদ্রিকরূপ লোকেতে প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত বস্তুতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের গুণ ও শক্তির উপদেশ পাওয়া যায়। মহা মহা

ভক্তেরা এইরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানে আরোহণ করেন। ভগবানের শক্তিরূপিনী মহানারী এই প্রকারে ভাগ্যবান পুরুষকে উপকৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে অসং বিগত হন। তাঁহার সমস্ত প্রাকৃতিক চিত্রপট এবং ভগবানের সমস্ত রূপ অতর্কিত করে। ভগবানের রূপ সমস্তই মায়া-নির্মিত এবং সৃষ্টিতত্ত্বে সম্বন্ধিত। সাধক, বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি দর্শনমাত্রে একদিকে যেমন ভক্তি ও প্রেমে প্রসূত হইবেন, অন্যদিকে সেইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় ভবের জ্ঞানে দীক্ষিত হইবেন। সমস্ত দেবারাধনার ইহাই উদ্দেশ্য। সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্বের জ্ঞান দানে উক্তরূপ মূর্তি সকল, ঋষের ন্যায় এবং অধিকারী বিশেষে সাক্ষাৎ ভগবদর্শনের ন্যায় কার্য্য করে। ভগবানের এই সকল শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও কীর্ত্তিকে ভক্তির যোগে হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয় বলিয়া। তাঁহার প্রতিমা ও দেবালয় সমূহ দেবত্ব ও পবিত্রতা লাভ করে। বাহ্য কিছু তাঁহার স্বরূপরূপ চন্দন মাখা তাহাই পবিত্র। তাঁহার অধিষ্ঠান সহকারে তাহাই দেবতা নামে অভিহিত হয়। তদ্ব্যতীত তাঁহার বৈরাটিক অলঙ্কার সমূহ এবং তৎ সম্বন্ধিত তাঁহার মায়াকল্পিত মূর্ত্তি সকল জন সাধারণের দৃষ্টিতে বড় পবিত্ররূপে গণ্য হয়, এমনত অন্য কিছু নহে। অগ্নি প্রবেশে যেমন কাষ্ঠ তৃণাদি অগ্নি হইয়া যায়; ভগবানের স্বরূপ স্পর্শে—তাঁহার সৃষ্টি ও কীর্ত্তি-ষটিত বৃহত্তম সহযোগে—স্থান, পদার্থ, ও মূর্ত্তিবিশেষ দেবত্ব লাভ করে। তাপস দেবত্ব ও পবিত্রতা অথবা বাতিরেকে ভগবানেরই জ্ঞাপক হয়। নতুবা সে পদার্থ প্রতিমা বা স্থান স্বত্ত্ব দেবত্ব-জ্ঞাপক নহে। এই কারণে দেখিতে পাই যে, পরমহংস, সম্যাসী ও যোগীপণ অনেকেই বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র সমূহ ভ্রমণ করিয়া আছেন। কেন না সেই সকল পীঠের এমনি মাহাত্ম্য যে, তথায় সর্লক্ষণই ভগবান স্মৃতিপথাক্রমে হইলেন। সেরূপ ভগবৎ-স্বরূপে তাঁহার তবৎ মার্য্য ধ্বংস হইয়া যায়। সেই সমস্ত জ্ঞানীরা তথায় সেই অরূপী নারায়ণের সম্ভাপনর শীতলস্পর্শ জন্মে অহুত্ব করিয়া থাকেন। এই ধারা অহুদারে এই ভারতবর্ষে সনাতন হইতে সর্বল ও দুর্লভাধিকারীদিগের ব্যবহার চলিতেছে। এখন—এই বর্তমান কালে বাঁহারা অপ্রত্নাদিগের একেখরের উপাসক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কোন সাহসে তদ্বিপরীতা-

চরণ করেন বলিতে পারি না। আগাদের বুদ্ধি এই যে, যদি ভগবানকে মানিতে হয় তবে তাঁহার উদ্দেশে যে স্থান বা যে কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে সমস্তকেই আগের পূর্বক তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতে হইবেক। যখন যগপ দৃষ্টিতে দেখা বাইতেছে যে এক ব্যক্তি ব্যাকুলিত ভিত্তে সেই গগন তত্বকেই উদ্দেশ্য করিয়া শিবহুগীর পূজা করিতেছে, তখন তুমি যদি এমন নেন কর যে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের পূজার পরিবর্তে “সরস্বতী” অথবা ‘শূন্যের’ পূজা করিতেছে, তবে তুমি নিশ্চয়ই মানব-প্রকৃতি-গত উপাসনাবৃত্তির প্রকৃপ পরিচয় পাও নাট, স্তম্ভরাং সেই সর্বসম্প্রাপ্তর ভগবানের সহিত বিশ্বজনীন সেবা-সেবক সম্বন্ধ বৃদ্ধিতে পারি নাই। যদি তাহা না পারিয়া থাক তবে কেন অর্থ না বুঝিয়া “সহজজ্ঞান” ও “ঐশ্বর্য প্রভার” প্রভৃতি শব্দ সমূহের অপব্যবহার করিতেছ? কেনই বা নবদ্বিপ সমাজ-কল্যাণ ও হেতুবাদ-মোহিতা বুদ্ধি-জীড়া দ্বারা সহজ সহজ লোকের বুদ্ধিতেব করিতেছ? মহাত্মা রামমোহন রায় এ প্রকার কোন প্রকপোল-কমিত ধর্মপ্রচার ও সমাজ-সংস্কার দ্বারা ভারতবাসীদিগের বুদ্ধি ভেদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল শাস্ত্র সকল মুদ্রাঙ্কিত করিয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া-ছিলেন এবং বাহ্যতে ভারতবাসীরা মূর্তিচা, পাষাণ, কাষ্ঠ তৃণাদি-নির্মিত বা মনঃকল্পিত মূর্তি মাত্রকে ঈশ্বর অথবা দেবতা জ্ঞান না করে, বাহ্যতে দেহ ও মূর্তির অভীত একমাত্র আত্মার উপাসনার লোকের নিষ্ঠা হয়, বাহ্যতে দেবগণকে স্বতন্ত্র জ্ঞান না করে, বাহ্যতে একমাত্র আত্মাকেই সর্ব দেবতা-স্বরূপ বলিয়া বৃদ্ধিতে পারে, বাহ্যতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বাদি সমস্ত আকার এবং স্বায়ং জলমাদি নাম রূপাত্মক সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়ী-কল্যাণ বলিয়া বোধ কয়ে, বাহ্যতে কলকামনা ও তর্কশিষ্ট বৈদিক ক্রিয়া কর্তব্য হইতে লোক সকল উদ্ধার পাইয়া নিষ্কাম বৈদিক কর্মে ত্রীতী হয়, অথবা তাদৃশ সর্ব কর্ম ব্রহ্মতে অর্পণ করে এমত সকল বুদ্ধিপ্রদ উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার এ নব্য ব্রাহ্মধর্মে সে ভাব সে শাস্ত্রজ্ঞান সে হিতাহিত বোধও কদাচিত্ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ইংরাজি সমুদয় ব্যাপারই উচ্চ-গতি-শীল, সেইরূপ ইংরাজি ধাতুতে বিরচিত বর্তমান ব্রাহ্মধর্মও উচ্চগামী। যেমন

ইংরাজদিগের যেন-সকল উদ্ভাবনী, আভিষ্কার-বাহী উদ্ভাবনী-বিশিষ্ট, কাজ করি অসম্ভব উদ্ভাব, চাল, চলন ও অত্যন্ত উদ্ভাব, সেইরূপ এই ইংরাজি আশ্চর্য্য ও ভয়ানক বেগবান। কেন না আজ তাহা কলিকাতায় প্রচার হইতেছে, কলি যাদবতার ও বহাই নগরে প্রচার হইয়া গেল, পরদিন ইংলণ্ডে যেমন বহুতা হইল অমনি শত শত লোক উক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুতা সকল ছাপা হইয়া দেশ বিদেশে চণিয়া গেল, এবং তাহার দ্বারা এক এংটা প্রচায়ে ভারাক্রান্ত হইল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া দুঃখ হয়। কেননা যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চিত্তভঙ্গি ব্যতীত হয় না, আব যে চিত্তভঙ্গি সম নম বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্পদে প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এত স্নগত!!! কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রাবের প্রচারিত আশ্চর্য্যের ভাব উহা চইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দান অল্প আদিকালতঃ কেবল শাস্ত্রই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্র মুদ্রাঙ্কন করিয়া এবং শাস্ত্রীয় বহু বিবরণ লিখিয়া জন সমাজে প্রচার করিতে কবিতাকার নামক একজন লিখিবাদী তাঁহাকে দোষ দেন। তাহার উত্তরে রামমোহন রায় কহিয়াছেন—“একশ পুস্তক বিতরণ আমরা শাস্ত্রাভিযানে করি, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়মানুকল্প হইয়াছেন। আত্মিকতত্ত্বে আত্মের ধৃত গুরু পুরাণের বচন—বেদার্থে ব্রহ্মশাস্ত্রানি ধর্ম্মশাস্ত্রানি চৈব হি। মূল্যে লেখনিষ্ঠা যো মদ্যা-দেতি সতৈবদিবঃ। যে ব্যক্তি বেদার্থ ও ব্রহ্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে মূল্য দিয়া লেখাইয়া দান করে সে অর্পণে যায়। এবং ব্রহ্মদায়ক উপনিষদে লিখেন—সমোহন্য মাশ্চনঃ শ্রিয়ং ক্রবাণং ক্রবাং শ্রিয়ং ব্যোৎসানীতি। যে ব্যক্তি মায়া ভিন্ন অন্যকে অর্থাৎ দেহ ও মূর্ত্তি প্রভৃতি উপাধিকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরূপে কহিবেন যে তুমি এই সকল অনিত্য উপাসনা দ্বারা বিনাশকে পাইব। এইরূপ শত শত প্রমাণাদ্বারা আমরা জানা হইতে পরামুখ ব্যক্তিবিশেষে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কহিয়া থাকি। এবং নমুজিত্তেবঃ অনয়েবজ্ঞানং কর্ণসঙ্গিনাং। অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ণ-ব্যক্তির মুক্তিভেদ জন্মাইবেক না। এই বচনাদ্বারা বাহ্যকে দেখিবে যে এক ব্যক্তি কেবল কর্ণ নটে এমত নহে বরঞ্চ অজ্ঞান কর্ণ, তখন তাহাকে উপদেশ করিতে লাগে। অতএব কবিতাকার যেন আর উদ্বেগ না

করেন।” মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই সর্বশাস্ত্রগিষ্ঠ বিচারের মর্ম কি এখনকার ঐতিহাসিকগণ নব্য ব্রাহ্মণেরা ধারণ করিয়া চলিতে পারেন ? তদনুযায়ী জ্ঞানধর্ম প্রচার তাঁহাদের অভিলাষাত্মক ঐতিহাসিক ভাষ্যেই নহে, তাহা ভারতের সনাতন দাত্তর অঙ্গব্যাপী, অধিকারাহীন, বীরে ধীরে হইবেক । শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা সম্ভবতার কৰ্ম নহে । কিন্তু পদে পদে জ্ঞান, ভক্তি, অধিকার প্রভৃতি অধ্যায়-ধর্মের যোগে অতি সঙ্কোচনে তাহা একান্তা হুটেতে অন্য আচার এবং শাস্ত্রও গুহ্য হুটেতে শিখো, প্রচারিত হইয়া থাকে । ভগবান করুন, ক্রমে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হইয়া তদাণেক আমাদেবের অস্থির প্রকৃতিবর্ণের চক্ষু বুদ্ধি অতিক্রম্য হউক এবং সমগ্র ভারতবর্ষ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা কর্তৃক উজ্জ্বল হইয়া উঠুক ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু ।

অতীতের কথা ।

আমি অতীত । সাগর যেমন একটি বীপকে বেষ্টিত করিয়া থাকে, আমিও তেমনি সেই চিত্র-কোটির্ময়ী চিত্রশী আধ্যাত্মিক আদ্যাত্মিক বি-এক অনির্কলনীয়, অদৃশ্য কারণ-সাক্ষর, নদ নদী পর্তত, সাগর উপ-সাগর, নগর উপনগর, দেশ মহাদেশ, দেবতা মানব, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ কোটি কোটি প্রাণী-পরিবেষ্টিত এই বর্গ মর্ত্য পাতাল নিম্বনকে জগরে লইয়া নির্জিকার চিত্রে অসীম ঐশ্বর্যের সহিত চির দিন একইভাবে অনন্ত শরনে শয়ান রহিয়াছি । কে আছে, এস আমার এই অননুক্রমণীয় অসারণ অদৃশ্য অননুসৃষ্টি ধারণ করিবে । আমার স্বষ্টি

* অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ । তাৎপৰ্য্য এই যে অনধিকারীর প্রতী ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেই না ।

নাই, বিকার নাই, মালিনা নাই । আমি অযত্ন, অবিকৃত, নির্ভয়, সৰ্ব-
দেশবাসী, অখণ্ড এবং চিরমর ।

আমার কথা তোমাদের ভাল লাগিলে কি-না জানি না । আমি জানি,
আমার কথাব গৃহগুলি অশ্বিনহৃদির উপর রচিত বলিয়া তোমরা তাহার
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নারাজ । কিন্তু তাহা হইলে যে, আমার কথা
থাকি থাকিয়া যায় । আমার যে না-বলিলেই নয় । আমার কথা আমি
না-বলিলে আর কে বলিবে । আজ—কি-জানি-কেন—কি অল্প শক্তি-
বলে আমার প্রাণের পাখি আর ভাঙ্গিয়া প্রাণের অবরুদ্ধ ডেউ উখলিয়া
জগতে আসিয়া পড়িয়াছে । তোমরা কেউ আর তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া
দিয়া সমুদ্রে আগিয়া দাঁড়াইও না । আমার হৃদয়ের মধ্যে কত কথা—
কত বাণ্যকালের অশ্রুতীর কথা—কত অশ্রুতীর আগার অতুল রূপের
প্রতিধ্বনিময় স্রব-হৃৎ-প্রেরণা—কত জীবনের না-বলা কথা—কত অশ্রু-পূর্ণ
চির মুকুল-মুষ্টি—কত ভালো ঘরের জ্যোৎস্না—কত বিন্যাসের বিবিধ-কবিতা
কল্পনাকারী নিশ্বাস—কত হৃদয়ের গান—কত অসম্পূর্ণ প্রেমের চির স্রবণ
—কত প্রেমিক প্রেমিকের হৃদয়ের দেখাশুনা—নিভৃতনিভুলে সন্ধ্যা-সমী-
রণের কাহাকে খুঁজিবার জন্য তাহার প্রতিদিনের স্রব-বিকলিত লুকাহুরী
ধোঁয়ার ছবি—কত চিরবিশ্রুত মৃত প্রাণের অশ্রুতীর—কত গোপার দেহের
দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি—কত সাহস-গগনের সেই পলকে-নুহন লাবণ্য-মুষ্টি—
কত অপরিস্ফুট কৌতুক—কত নাকচিক জগতের নৃত্য—কত রমণী-চক্ষের
প্রভাঙ্গ-গর্ভ সৌন্দর্য—কত নৈশ সমীরণের বিরহ-জাগান গান—কত সেই
জ্যোৎস্না, গান, প্রাণ ও বসন্তের বাতাসের একীকরণ-মুষ্টি—কত জগতের
কত ভীতিনরী সংহার মুষ্টি—আবার তাহার শান্তিপ্রদায়িনী চিরন্তনী মুষ্টি—
কত জীবন-কাণ্ডের শেষ অধার—কত মরণের সমসাতনা—অগ্নী নীরবতার
মধ্যে একাকী বলিয়া কত বিরহীর নির্মূল প্রাণের গভীর রহস্যময় মধ্যমা
গানের মোহিনী কারা—এইরূপ আরও কত শত কি-বে ইত্যদ্যৎ তাহারা
বেড়ায় তাহা বলিতে পারি না । জগতের সকল জিনিসই চকল । সকল
জিনিসই পরিবর্তনশীল । কিন্তু আমার গর্ভে বাহা একবার আসিয়া পড়ে
তাহার আর কথাই পতি থাকে না । তখন তাহা একবারে অচলী আমি

যে পাষণ। আমার ভদ্রের প্রস্থের একবার ঘাটার ছাব পড়ে, কালের সাধা কি যে তাহা মুছিয়া ফেলে !

সেই অন্য আমার প্রাণের কথা তোমরা কেহ বুঝিবে না। আমার সব কথা বাসি। তোমাদের ভাষার অনুপূর্ণতা উদ্যানের মধ্যে কি আমার এই বাসি-কথা-গাছে ফুল ফোটে ? তোমাদের ভাষা কেন, আমি জগতের কোন ভাষার ক্ষুদ্র সন্থীম গৃহের মধ্যে থাকিতে পারি না। আমি অসীম-অনন্ত। জগৎ অপূর্ণ, আমি পূর্ণ। জগতের কোন-কিছুই মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু আমার কোণে জগৎকে দেখিতে পাইবে। আমি অতীত, জগৎ বর্তমান। আমি না থাকিলে জগৎ বাঁচিতে পারে না। জগতের আমি বহন।

প্রকৃতিশক্তি কর্ম্মশক্তি। এখানে কাহারও অঙ্গল হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। প্রকৃতি তোমার দ্বারা তাহার কাজ করিয়া লইবেই। সেই অন্য আমি তোমাদের বলি যে, তোমরাও সর্বদা সতর্ক থাক। প্রকৃতির কাজের সঙ্গে তোমাদেরও কাজ সাংগিয়া লইবার চেষ্টা কর। তাহা না করিলে, তোমার কাজের সময় জীবনের মধ্যে আর পাইবে না। প্রকৃতিশূন্য সময় কোথায় ? আসাবও কাজ আছে। আমার কাজ অতি সামান্য। আমার কাজ বর্তমানের চকল প্রাণের মধ্যে কোন-কিছুই ছিষ্ট না-রাখা। আমার কাজ আত্মবিশর্জন। আমার কাজ তোমার বর্তমানের প্রতিষ্ঠা। মৃত আমি, প্রকৃতি-জীবন বর্তমান হওয়ারই ত আমার কাজ। আমি যত মরিব, অর্থাৎ আমার বয়স যত বাড়িবে, তত বর্তমানের সুখ-গান-সৌম্য অনায়াস পরিণত হইবে। বর্তমান বড় চকল। বর্তমান আদ্যাত্মিকের চাকলা-মুষ্টি। চকল বলিয়া তাহার কার্য পূর্ণতা পায় না। সেই অন্য আমি তাহার কার্যের উপর বিশ্বাস করিতে পারি না। বর্তমানের অহুদার সর্গীর্ণ মন্দির আমি ভাল বাসি না। কিন্তু আমার আমি তাহাকে যত ভালবাসি, এত ভাল আর কে বাসে ? বর্তমানকে আমি শরীর দিয়া তাহার পিছনে ছায়া হইয়া আছি। বর্তমানের গৃহ-বাড়ি উদ্বাটন করিয়া দেখিবে যে তাহার চারিদিকে অতীতের মুষ্টি বিরাজিত। আমিই ত বর্তমান-বালীর একমাত্র গান।

বর্তমানকে কি মজাইয়াই রাখিয়াছি! বর্তমান আমার জন্য উদ্ভব! আমাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার জীবন এক-মুহূর্তও নয়। সে অবিরত আমাতে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই ত আজ এই বর্তমান লেখক বাসনার বিচিত্র গৃহে বসিয়া আমার কথা ভাবিতে আসিয়াছে। আমাকে না-পাঠিয়াই ত সে দিন সেই প্রতিভাশালী কবি জগতের চোকের উপর ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ দিলেন। আমার জন্য সদাসর্বদাই এইরূপ কত-কি হুটে। তাহা বলিয়া আমি করিব কি আর বল! আমার কর্তব্য আমি করি? আমি বুঝিতে পারি যে, তোমরা মিথ্যার পরদা দিয়া আমার চক্ষু ঢাকিবার চেষ্টা কর। কিন্তু আমার চক্ষু ঢাকিবার তোমাদের সাধা কি। আমি সর্বজ্ঞ, ইহা মনে থাকে যেন।

আমি জগতের মালি। অনন্তকাল ধরিয়া বসিয়া বসিয়া মালাগাছি গাঁথিতেছি। হায়! একটি ফুল ভুলিতে গিয়া কত ফুলই নষ্ট করি! হায়! একবার দেখি না যে, ফুল কোথাকার—কার। আমি,—অতীত: আমার তাহা জানিবার আবশ্যক কি? যতদিন না মালা শেষ হয় ততদিন ফুল ভুলিয়া গাঁথিব। এ মালা যে কবে শেষ হবে তাহা কে বলিতে পারে?

আমি বড় নিষ্ঠুর। কারণ আমি কাহারও মন রাখিতে পারি না। আমার এই চিংগ্রসহমান হৃদয়-গর্ভে সকল জিনিসের সমাধি হয়। সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ সব আমি কোল পাতিয়া লই। আমি ত তোমাদের সকল আলা যন্ত্রণা দূর করিবার দান। তবু তোমরা আমাকে নিষ্ঠুর বল! বুঝিয়াছি। তোমাদের স্বভাব একজনকে কাঁদান এবং আর একজনকে হাসান। দুই জনকে হাসাইবার ক্ষমতা তোমাদের বড় দেখি না। এই জন্য জগতের মহৎ ব্যক্তির মধ্যেও তোমরা নিষ্ঠুরতার বীজ দেখ। যাহা হউক, ইহাতে আমার কোন ক্ষতি দেখি না। আমার মত এত মহৎ কাজ আর কার আছে? চতুর বর্তমান আমার অদৃশ্যগৃহের অব্যবহৃত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কত শত বিবিধ রত্ন, কত শত সৌন্দর্য্য চুরি করিয়া আপনার বলিয়া যে, গৌরব-গিরির সর্ব-উচ্চ চূড়ায় বসিয়া জগতের কিছুই দৃকপাত করে না, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? হায়! আমি সব বুঝি। বুঝি বলিয়াই ত চুপ করিয়া থাকি। আমি জুজের কাজই এইরূপ। কি

আশ্চর্য্য! এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারাই অগতের চক্রে ধূলা দিয়া বেড়ায়! তাহারা জানে না যে, সে ধূলার জীবন ছুদিন! অগতের চক্রে কি কখন মিপ্যা টিকিতে পারে? অগতাই যে, একটি জীবন্ত মহান সত্য। সত্য কখন মরে না। সত্যই জীবন। এ জীবন্ত সত্য-অগতে মিথ্যার স্থান নাই। সত্যের পরীক্ষা সর্ব্বত্রান্যে মুহূর্ত্ত কাছে হয়। সে পরীক্ষার যে উদ্যোগ হয়, তাহাকে এই আমার হৃদয়-মন্দিরে স্থান দি। আমি যদি না থাকিলাম, তাহা হইলে যে, কত সত্য, কত প্রতিভা, কত এত কালের অনন্ত সাগরে লয় পাইত, তাহা আর আমি বলিতে পারি না। আমি না থাকিলে এত-গান কে করিবে? তাই বলি, আমার মত মহৎ কাজ আর কারও নাই।

এ অগতের আমি ইতিহাস। আমার এই দুঃ-সুঃ-মহী জীবনের প্রতি পক্ষে অগতের সব কথাই ত লেখা। আমার গৃহে বসিলে অগতের ইতি-হাসের মানচিত্র দেখিতে পাইবে। অগতের গলাধ আমি ইতিহাস-মালা। এ মালা শুকায় না। সেই জন্য অগতের এত শোভা—এত আদর। অগতে অতীত না থাকিলে, এ মহাকঙ্কার অগৎ-অরণ্যে কেহ প্রবেশ করিত না।

আমি অতীত। যত্নবো বে কথা বলে না, সেই কথা আমি বলি। যখন অগতের পর-পারে, অগতের কোন-কিছু আগে, তখন তাহাতে আমি হাত দি। অর্থাৎ অগতের কাণ কুরাইলে আমার কাজের আরম্ভ। আমি নিজিত কথার ভাষা।—অনন্ত কাল-সাগরের সোপান।

আমি—অতীত পৃথিবী—অগীমের গৃহ ভাগ করিয়া তোমাদের অন্ধকার-অন্তঃপুরে মাঝে মাঝে প্রবেশ করি। অগতের তুল শুধরাইরা অনন্তের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য আমি আসি। তোমরা আমাকে দেখিতে পাও না। আমি তোমাদের সব দেখিতে পাই—বুঝিতে পারি। আমি সত্য-দৃষ্টি। আমার উপর সমুদ্র অগৎসংসার চণিতেছে। আমি অগতের নয়নের নয়ন—জ্যোতির জ্যোতি—সৌন্দর্যের সৌন্দর্য্য। আমাকে তোমরা কখন ভুলিও না।

শ্রীগঙ্গেন্দ্রনাথ বসু ।

রজনীগন্ধা ।

পাই যদি কহু গঠিতে রমণী
 প্রাণ ভরে গঠি তায় ।
 ছাঁকিয়া নবনী চাঁদের অঁচলে
 গঠি হুকোমল কায় ।
 নিবিড় সমুদ্র লুকান অঁধার
 বাছিয়া বাছিয়া ধরি,
 সে তনুর পিঠে চরণ চুম্বিয়া
 চিকুর-প্রপাত করি ।
 ছায়ার বিকাশ গোছা গোছা তুলি
 এলায়ে এলায়ে তায়,
 রচিয়া কুন্তল ঘুরায়ে উড়ায়ে
 রাখি ললাটের গায় ।
 নীরব নিশীথে পশি সিঁদুতলে
 আধ-শশী তুলে আনি,
 সে কুন্তল কোলে ঢালি ধীরে ধীরে
 গঠি সে ললাট খানি ।
 খুলি দলগুলি ঘুমান পদ্মের
 ঘুম তার করি খালি,
 তুলিয়া স্বপন সে ললাট গা
 ঢল ঢল করি ঢালি ।
 শিরীষ-কেশরে রচিয়া তুলিকা
 লয়ে মধুগল ফাঁকি,
 সে ললাট তলে ধীরে ধীরে ধীরে
 সেই দুটি ভুরু অঁকি ।

সে ভুঙ্গত কোলে অকুল করিয়া
 খুলে দেই ছুটি আঁবি
 অবশ-পলক, গেন হেসে যায়
 আকাশের শেষে পাণি ।
 সে উদান চ'খে উঠিবে উপলি
 চাহনি আপনা-হারী,
 যথা পক্ষাপুরে প্রপাতের দিগে
 ভাসে গোদাবরীদারা ।
 আনন্দের ঝারা সে চাহনি হ'তে
 উথলিবে অনিরল,
 পুরুষ পাষণ পড়ি তার তলে
 গলিয়া হইবে রুল ।
 গোলাপের আভা অরুণ কিরণে
 করি তিল অতরল,
 ফুট ফুট ক'রে অফুট রাগিয়া
 গঠি ছুটি গওতল ।
 পূর্ণিমা নিশীথে নিরঞ্জন হ'তে
 ছানিয়া মলিকা রাণি,
 ওষ্ঠাধরে তার দিই মাথাইয়া
 ফুটায়ে মোহিনী হাসি ।
 প্রথম প্রভাতে স্মৃমাধা চ'খে
 ধবলার রেখা দেখে
 যেই আলু খালু হৃথের উচ্ছ্বাস
 উঠেছিল এই বৃকে,
 সে হৃথ ভুলিয়া ঢালি সে অধরে
 মিণায়ে সে হাসি তার,
 মুচ্ছিত করিয়া কল্পনা আমার
 রেখে দিই তার গায় ।

দূর বংশীরবে নিজিত নিশায়
 শুনি যে স্বপ্নের গান,
 ধরিয়া তাহার রচি মূহু ভাব
 করি সে অধরে দান ।
 কবিসঙ্গি খুলে নেখা আনি তুলে
 মুছি মণা পিপাসার,
 সম্ভানের জুখা মাথারে তাহার
 রচি সে উরস তার ।
 নব বসন্তের কচি লক্ষ্যবর্তী
 খুলিলে হৃদয় খানি,
 তুলিয়া সরস অঙ্গে অঙ্গে ঢালি
 ঢাকি সেই মূর্তি ধানি ।
 দেখিলে সে নারী ছুঁইলে সে নাই
 ছুঁইলে পড়িবে ঢলে ।
 নয়ন ছাপিয়া বদন প্রাণিয়া
 বুকে সে ঘাইবে গলে ।

ঈশান ।

আত্মমর্যাদা ।

অনেকে আমাদের অধঃপতনের অনেক কারণ নির্দেশ করিয়া গমনেন ।
 কেহ বলেন অনৈক্যতা অবনতির কারণ, কাহারও মতে আভিভেদ
 অবনতির কারণ, কাহারও মতে গৃহবিচ্ছেদে বলবীৰ্য্যহানিই ইহার মূল
 কারণ । এইরূপে নানা লোকে নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । কিন্তু
 এক মূল কারণ চেষ্টে যে অনান্য কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, এক প্রবল
 ঐশ্বর্য্যবৃত্তি হইতে যে শত শত শাখা বাহির হইয়া নানাদিকে প্রবাহিত

হইয়াছে, ইহা আমরা ভাবিয়া দেখি না । আজ কাল প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা লেখার, বক্তৃতার, কথপোকাধনে, শব্দনে, স্বপনে স্তমিতে পাওয়া যায়; চারিদিকে হিন্দু ধর্মের হিন্দু সাহিত্যের, হিন্দু রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা দেখি হইতেছে । কিন্তু এ সব গর্ব কেবল মুণের । আমরা পূর্ন গৌরব, পূর্ন মহত্ত্ব হারাষ্টয়াছি বলিয়াই সে সকলের বিশেষ অভাব বশতঃই আমাদের এত আন্দোলন, এত গর্ব । কেন আমরা এত গুণ হারাইলাম ? কিসে আমাদের অতুল গৌরব লুপ্ত হইল ? আমাদের এ অসার, নিক্ষেপ, নিরুদ্যম ঘোর অলসতা কোথা হইতে আসিল ? কি কারণে আমাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন, মহৎ লক্ষ্যহীন হইয়াছে ? আমাদের জীবনীশক্তি আরো নাই কেন ? ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীকমান হইবে, আত্মমর্যাদা-জ্ঞানের বিলোপই সকল অনর্থের হেতু । আমরা বিশেষর নিকট নিজস্ব বিক্রয় করিয়াছি; রাজ্য ধন বিসর্জন দিই নাই । আত্মমর্যাদাবোধ থাকিলে রাজ্য, ধন, ক্ষমতা সব থাকিত; এ ধন পায়ে ঠেলিলাম বলিয়া সমস্তই চলিয়া গেল ।

আত্মমর্যাদাজ্ঞান মনুষ্যের মনুষ্যত্ব । মনুষ্যই এই স্ফুট ভিত্তির উপরেই গঠিত । সে সকল বৃত্তি অন্য কোনও প্রাণীতে নাই, এবং যেগুলি অল্প প্রাণীতে অল্প পরিমাণে আছে, সেই সকলের সম্যক অঙ্গশীলন, বিকাশ ও কার্যাই ত মনুষ্যত্ব । অথবা সেই সকল বৃত্তির কোন একটা চরিতার্থ করিতে গিয়া যখন মানুষ সকল নিকট বৃত্তি সংঘনিত করে, নিজ স্বার্থ বিস্মৃত হয়, অবিকৃত চিত্তে, উদ্বাসে, উৎসাহে আপন প্রাণ বিসর্জন করে, তাহার সেই কার্যকেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলা যায় । তবেই বলিতে পারি, আত্মমর্যাদা-জ্ঞান সকল মহৎ বৃত্তির উত্তেজক, সকল মহৎ বৃত্তির প্রসূতি । যতই আমাদের নিজস্ব প্রসারিত হয়, যতই আমরা নিজ মন অহত্ব করিতে থাকি, ততই আমরা নিঃস্বার্থ হই । ততট আমাদের উচ্চতাবসমূহের বিলক্ষণ অঙ্গশীলন হয়, সে গুলি ততই ক্ষুদ্রি পাঠতে থাকে । আত্মমর্যাদাজ্ঞান সকল উচ্চ বৃত্তির সহিত একত্রে গ্রহিত, এ জ্ঞানের লোপ হইলে সে সকলের অঙ্গহানি অবশ্যজারী । কলক বৎসর পূর্বে একতা লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে । একতা বাতীত যে আমাদের কিছুনা উন্নতি হইবে না, একতা চিত্র যে আমরা একটা জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না, একতা

ব্যতীত যে কোনও জাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই, এ কথা আবান-বুদ্ধবনিতার মূলে শুনা গিয়াছিল। কপাটিতে কাঠারও মতটেষধ হইতে পারে না বটে; কিন্তু তাহার কোনও ফল হয় নাই কেন? বৃক্ষের মূল ছাড়িয়া অগ্রভাগে জলসেচন হইয়াছিল বলিয়াই কোনও ফল হয় নাই। আত্মমর্যাদা-বোধ না জন্মাইলে কাহাকেও একান্ত্রে আবদ্ধ করা যায় না। যখন আমরা আপনার হীনতা অন্তরের অন্তর হইতে অনুভব করিব, যখন অন্যের হীনতায় আমাদের জ্বর ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখনই বৃক্ষিব, এই মহান্ভাবে জ্বর পূর্ণ হইয়াছে, তখন আমাদের মধ্যে প্রকৃত একতা জন্মিবে; তখনই আমাদের ধারা বর্ষা কাঁধা—গহ্ব কাঁধা সম্পন্ন হইবে। পরস্পারে নিজস্বার্থ মিথিয়া যাওয়াই একতা। আত্মমর্যাদা-সেধ যখন হাড়ে হাড়ে মিথিয়া যাইবে, তখন সেই গহ্বভাবে লক্ষ্য করিয়া পরস্পারকে নিজস্বার্থক্ষা মনে করিতে লক্ষ্য হইবে। আবার সেই মহান্ভাবে বার্ষ্য হৃদয় ভরপুর, তাঁহার নিকটে বৃত্তি সকল আপনা হইতেই সংযমিত হইয়া যায়। নীচ দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় না। পরনিন্দা, পরস্কর্দা, পরের ক্ষতি তাঁহার উন্নত মনে স্থান পায় না। সুখৈশ্বর্য ইহার নিকট অতি তুচ্ছ। ইহার বিন্দুমাত্রও অস্বহানি করিয়া তিনি সুখ সম্পন্ন নাভের চেষ্টা করেন না। এই বলে বলীয়ান হইয়া তিনি দারিত্র, যন্ত্রণা, ক্রোধ অকাতরে লহ্য করেন।

কালের পরিবর্তনে এ ভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছে। নূতন শিক্ষা প্রভাবে এতাব নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। এখন আত্মমর্যাদা বলিতে মহাবাহু রক্ষা করা বুঝায় না। যিনি যত নম্রতা, বিনয়, প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতাব সকল জ্বর হইতে দূর করিয়া অহঙ্কারী, উদ্ধত চইতে পারেন, তাঁহার তত আত্মমর্যাদা-জ্ঞান বাড়িতে থাকে। এখন মহাবাহু রক্ষা করিয়া আত্মমর্যাদার বৃদ্ধি হয় না; মহাবাহুর অবমাননা করিয়া এই ভাবের ক্ষুণ্ণ করা হয়। এখন আপনাকে মন্ত লোক ভাবা এবং আপনি বাতীত সংসারভুক্ত লোককে নিজাপেক্ষা সর্বাংশে হীন মনে করিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষা করা হয়। সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য কীতুত, কোনও বৃত্তির কণামাত্র অস্বহানি না করিয়া যে আত্মমর্যাদা রক্ষা করা যায় না,

আত্মমর্যাদার ক্ষুণ্ণতা হয় না, একথা আমরা একবারে বিস্মৃত হইয়াছি। একজন অশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত কথাবার্তা করিলে, তাঁহার প্রতি সন্দেহ ব্যবহার করিলে, আত্মমর্যাদা নষ্ট হইয়া যাউবে, মনে করেন তাঁহার বিশ্বাস, লোকে বলিবে, ইনি তত জ্ঞানী ও বিদ্বান হইলে অশিক্ষিতের প্রতি প্রতি প্রশংসা করিতেন না, ইহার মন এখনও তত উন্নত হয় নাই। উন্নতপন্থ লোক নিরপদ্ব লোকের সহিত একাধানে বলিয়া কথা করিতে, তাঁহার গহিত নম্রভাবে ব্যবহার করিতে বড়ই কুণ্ঠিত হন; পাছে তাহাকে তাঁহার পদুমর্যাদার বিশেষ ক্ষতি হয়, পাছে তাহাকে তাঁহার মত লোক আর খাতির না করেন, এবং পাছে সেই নিরপদ্ব লোকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভয়, ভক্তির আঁটি হয় ধনী নির্দীনের নিকে ফিরিয়া চান না, তাহাকে কৃপার পাত্র মনে করেন, পাছে সমাজে তাঁহার মান্য কমিয়া যায়। ক্রমে এই নূতন প্রকারের আত্মমর্যাদা এইরূপ দাড়াইয়াছে যে, এখন পুত্র পিতাকে শ্রদ্ধা করে না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মান্য করে না। মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়াই এমন সকলের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং বিবেচনাশক্তি পরিপক্ব হয়। এখন কেহই পরাধীন হইতে চান না। পুত্র পিতার পরামর্শগ্রহণকারী কার্য্য করা দূরে থাকুক, পিতার আজ্ঞাবহন করা আত্মমর্যাদাহানিকরক মনে করেন। এখন কোন কার্য্য করাইতে হইলে জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠের নিকট, 'আমার এই উপকারটি করিবে?' এই ভাবে অহুরোধ করিতে হয়। কারণ, তিনি self-respect নামক যে একটি মুকুট শিরে বহন করিতেছেন, তাহার প্রতি সর্ব্বদা নজর রাখা চাই। এই Self-respect-এর নিকট গুরু লগ্ন নাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সংব্রুতি নিচর এখানে উঁকি মারিতে পারেন না। এই Self-respect নামক অসুত পদার্থটি কি জানি কোন্ মহাদেশ হইতে আদমাদমী ওইয়াছে ইহার মূল Individuality নামক একটি দিগ্গজ শব্দ। Individuality বাকাটি আসলে মন্দ নহে। কিন্তু আমরা ইহাকে নূতন ভাবে—বিপরীত আকারে মহাপ্রমাণের সহিত, বোর কোলাহল করিয়া ইহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম এবং অনশেষে ইহাকে আমাদের জন্মস্রাব্যের অধীশ্বর করিয়াছি। আমরা পূর্বে যে আত্মবিক্রমের কথা বলিয়াছি, Individuality তাহাই

করিতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক ভাল জিনিষ যেমন বিকৃত—নকল স্বহস্তার আমাদের দেশে আসিয়াছে, এটিও সেইরূপ। এটির অর্থ আমরা এখন এইরূপ করিয়াছি। “আপনাকে মহাপণ্ডিত, মাজানী মহাপুরুষ ভাবিতে হইবে, আমি কোন বিষয়ে ক’হারও অধীন মতাবলম্বী হইয়া নিচু হারাইব না, কারণ বাতম্বাই উন্নতির মূল।” যিনি যত উদ্ধত, যিনি যত গর্বিত, যিনি যত গর্বলীনে অশ্রদ্ধাবান, তাহার Individual-ত ততই বাড়িতে থাকে, ততই বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইহার মূলে কত গলদ আছে সহজেই বুঝা যাউতেছে এবং ইহার পরিণাম যে বিষম হইয়াছে তাহা বিচিتر নহে। যে পূর্ক হইতেই আপনাকে বড় ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে কখনই আপনাকে বড় করিতে পারে না। আমরা আপনাকে বড় ভাবি বলিয়াই আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে দিন দিন ছোট হইতেছি। প্রকৃত আত্মমর্যাদা মনুষ্যের প্রেরী। মনুষ্যের গায়ে বাহ্যতে একটুও আঁচড় না লাগে আত্মমর্যাদা সতত সেই চিন্তার চিন্তিত। এ কথা আমরা বুঝিয়াছি, আমরা ইহাও বুঝিয়াছি, যে নমতা, বিনয়, প্রীতি, শ্রদ্ধা, হস্তি, মেহ প্রভৃতি মহাবৃত্তিগুলির অঙ্গশীলন ও সামঞ্জস্যরক্ষাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু যে, বিদ্বাভীয় Self-respect বা Individuality আমাদিগের এ সকল বৃত্তির মূলে কুঠরোঘাত করিতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব না বাড়িয়াই অনবরত কমাইতেছে, তাহার ফল যে বিষমর এ কথা বলা বাছল। নকল জিনিষ বলিয়া কাজও নকল হইয়াছে। যেখানে Self-respect-এর প্রকৃত কার্যক্ষেত্র, সেখানে ইহা একবারে অস্তর্ধান হইয়াছে। আমরা এতলে কেবল একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালী-জীবনের প্রধান লক্ষ্য চাকুরী। বাঙ্গালী স্কুল কলেজে পড়েন, গ্রাজুয়েট হন—চাকুরীর জন্য; বাঙ্গালী য় প্রাণান্ত করিয়া বিশাল জ্ঞানসমুদ্র মহন করিতেছেন তাহার পরিণাম সেই চাকুরী। বাঙ্গালীর লক্ষ্য এতদপেক্ষা উন্নত হয় না। বাঙ্গালীর উচ্চাভিলাষের, আশার সীমা এইখানে। এই কেন্দ্রবানে থাকিতে থাকিতে তিনি আরহারা হইয়া পড়েন। এখানে আত্মমর্যাদার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পিতার তৎসনা অল্পযোগ সহ্য করিতে পারেন না; কখন Self-respect

মর্ত্তমান হইয়া উপস্থিত হয় । কিন্তু আফিসের প্রভু কারণে বা অকারণে
যতট কেন ভৎসনা কখন না। গালাগালী পর্য্যন্তও তিনি অকারণে অস-
হোচে সহ্য করেন । প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষায় তিনি সর্বদা সশরমে চাপির
থাকিতে পারেন । কিন্তু জ্যেষ্ঠ মণ্ডোলরের নিকট কয়েকের তলেও ওরূপে
দাঁড়াইতে তাঁহার বড়ই যত্না বোধ হয় । তখন তাঁহার মনে হয়, “ভ্রাতার
মত একরূপভাবে আমার অবস্থান করা কি উচিত হইতেছে ?” পিণ্ডী, ভ্রাতা,
জ্যেষ্ঠা, খুড়া যে কোন ওরূপে যখন যে কাজ করিতে বলেন, তাহা করিবার
পূর্বে হিতাহিতজ্ঞানের সহিত পরামর্শ করেন । তখন মর্দ্যবুদ্ধি (con-
science), সহজ বুদ্ধি (common sense) প্রভৃতি পারিসদবর্গ উপস্থিত
হয়, কিন্তু সাহেবের আজ্ঞাপালনের সময় এ সব পারিসদবর্গ আঁগেত'গে
রণে ভগ্ন দেন । ইহাই আমাদের চূড়ান্ত আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান ! ইহাই আমরা
নিশিতেছি, ইহাই আমরা সর্বদা পোষণ করিতেছি ।

আত্মমর্ধ্যাদা কাকে বলে, আমরা একরূপ নুসাইতে চেষ্টা করিয়াছি ।
এই মহৎ তপ হারাইয়া অবধি আমরা যে সুখ, শ্রীশ্রীতা সর্বদা হারাইতেছি ;
দিন দিন পণ্ডব হইতেছি, বারাত্তরে তাহা বৃদ্ধি হইতে চেষ্টা করিব ।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ।

হেমচন্দ্র ।

—দিবা অবসান প্রায় । সূর্য্য ডোব ডোব হইয়াছে । আকাশের পশ্চিম
কোনে থানকতক রাঙা মেঘ ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে । পৃথিবী হইতে
ঐশ্বরের যেন একটা ডাব উঠিতেছে । দিন যায় যায় । হেম সেই যে ভোরে
উঠিয়া ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে এখনও আসিল না কেন ? মনোরমা
কাদিতে লাগিল । বিরাট বড়ই ভাবিতা হইল । বৃদ্ধার অবস্থা অতি
ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে । আর সময় কাটে না । বৃদ্ধা অনেক দিন হইতে

রোগ ভোগ করিতেছিল, শরীর বড়ই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু তথাপিও এতদিন তাহার জীবন ভ্রমিত প্রায় প্রদীপের ন্যায় একরূপ কাটিয়া গিয়াছিল । পুসের মুখখানি দেখিবার জন্য বৃদ্ধা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল । হঠাৎ একেবারে পুস ও জামাতাকে দেখিরা আর অজ্ঞানদের গীমা রহিল না । কিন্তু সে রূগ্নাবস্থায় সে ক্ষীণ দেহে তত আজ্ঞাদ সহিল না— শেষ রাত্রি হইতে বৃদ্ধার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল । বৃদ্ধা হাস টানিতে লাগিল । এইদিন কোনও ঔষধ পড়ে নাই—কে চিকিৎসা করাষ্টবে ? তেন তাহা ভাবিয়া কান্দিল, আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ রানকৃষ্ণকে যার নিকট রাখিয়া দূর গ্রামে ডাক্তার ডাকিতে গেল । ক্রমে সকাল হইল, রোগ বাড়িল । তাহার মনে মনে হাস আরও বাড়িয়া উঠিল । কে দেখিলে ? এক দিৱাজ ভিন্ন বাড়ীর আর কেহই উঁকি মারিয়া দেখেন না, একা বিৱাজ কি করিয়া উঠিবে ? মনোরমা বলিকা, সে সেই সকল হইতে কেবল অভ্রান্তধারে কান্দিতেছে । রানকৃষ্ণ এ অবস্থায় কখন পড়ে নাট, তার মন বিদেশী, কার কাছে যাইবে ? পাড়ার দুই এক জন এক আধবার দেখিতে আসিল, অনেক দুঃখ জানাইল, কেহবা দু এক কোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেও ক্রটি করিল না ; বলা বাহুল্য, কেহই বৃদ্ধার শয্যা স্পর্শ করিল না, দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনাদিগের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল । অনেকেই যাইবার সময় জানাইয়া গেলেন, তাঁহাদের যাইতে কোনমতে ইচ্ছা ছিল না, কেবল ‘পোড়া সংসার’ চলে না বলিয়া কাজেই চলিয়া যাইতে হইল । কয় দিন ধরিয়া কর্তাও বাড়ীতে ছিলেন না ।

মনোরমা, বিৱাজ ও রানকৃষ্ণ তিনজনে বৃদ্ধার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কান্দিতোছে । বৃদ্ধার বয়স তখন অপরিণীত, মুহূর্ত্তে চল চাহিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া জলের জন্য ‘খা’ করিতেছে । তাহা দেখিয়া তিনজনে আরও কান্দিতেছে । বৃদ্ধা বারবার হা করিয়াও জল পাইল না, তখন কথা কহিবার শক্তি ছিল না, গেড়াইয়া গেড়াইয়া বলিল—“জ-অ-ল ।” মনোরমা উচ্চে কান্দিয়া উঠিল ; বলিল—“মা, আজ যে একাদশী ।” হঠাৎ ক্রি যেন লুপ্ত হইয়া আসিয়া উঠিল । বৃদ্ধা সে কথা শুনিয়া ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল ।

অশ্রুস্রব্ধ ক্রমা আবার ছোর করিল। চেয়ে কদিয়াও বৃক্ষা স্থির থাকিতে পারিল না, আবার হা করিল। মনোরমা কাঁদিয়া বিরাজকে বলিল—“কি করিব, দিদি?” বিরাজ বলিল—“যে পাণ হয় আমার হইবে, একবিন্দু গঙ্গাজল দাও।” মনোরমা পায়ে গঙ্গাজল লইয়া দিতে গেল। বৃক্ষা তা করিল। রামকৃষ্ণ রাগিয়া উঠিল; বলিল—“জল দিও না। কেন পরকাল নষ্ট করিবে?” মনোরমা ভাবিতা হইল, মার গালে জল দিতে পারিল না, হাতের জলপাত্র কাঁপিতে লাগিল। বৃক্ষা তাহা বুझিল, একবার সেই জলপাত্রের প্রতি নির্ভয়ে দৃষ্টে চাহিল, মনোরম আপদগ্রস্ত প্রাণিত করিয়া ভই বিন্দু অক্ষ গওঃস্থলে গড়াইয়া পড়িল। ‘মা গো’ বলিয়া বালিকা উঠেঃঃঃঃঃ কাঁদিয়া উঠিল। স্বভাবকোমল বিরাজ সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না। বগনাকলে চক্ষু বুজিতে বুজিতে নিঃশব্দে তথা হইতে উঠিয়া চলিল।

পাড়ার অতি নিকটেই বনমালি ভট্টাচার্য্যের গৃহ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ‘বিজ্ঞ’ বলিয়া বড়ই একটা নাম ডাক ছিল। সে গ্রামের সকলের ঐব বিশ্বাস, বনমালি ঠাকুরের ন্যায় অপাধবিহীন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণ লোক কলিকালে আর অস্তিত্বে না। কপিত আছে, বনমালি একদিন তাঁহার গুরু উপাণহ-প্রচার ভক্ষণ করিয়াই সর্গশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠেন। মনু তাঁহার মুখাণ্ডে; ন্যায়, অলঙ্কার সকল নগদর্পণ; নিদানশাস্ত্রেও অসাধারণ নুৎপত্তি। অনেক দিন হইতে ভট্টাচার্য্য গোটাৱতক অমুঠুপ ছন্দ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ন্যায়, অলঙ্কার, শ্রুতি যে কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া হাসিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাত নাড়িয়া মাথা ঘুঁরাইয়া দুই একটী অমুঠুপ ছন্দ বলিতেন; দর্শকমণ্ডলী, শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক হইয়া তাঁহার বিদ্যার প্রশংসা করিত। এক দিন নাকি তাঁহার মনু বিচার সময়ে পাড়ার একটা এটুৱাল পাশ করা হুট ছেলে তাঁহার শ্লোক শুনিয়া বলিয়াছিল, তাহা বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক। বলা বাহুল্য, সেজন্য সে ছেলেকে অনেকের নিকট তিরস্কার পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শেষ বৃদ্ধিয়া একটা বড় ব্যাধি ছিল। চাষা জুঁয়ো পর্য্যন্ত সকলে বিপদ আপদে তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে হাইত। গৃহের দাবায় বসিয়া

কত্ৰাক্ষমালা গলে, চন্দনটিপ কপালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন ; চারি পাশে বসিয়া পাড়ার বর্ষায়সীগণ সেই 'অমৃত সমান' কথা শুনিতেছে, আর মাকে মাকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভৎসনার প্রশংসা করিতেছে ; এমনত সময়ে বিরাম দেইখানে উপস্থিত হইল। বিরাম মধ্যে মধ্যে অনেক ব্রত নিয়ম করিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক দক্ষিণা হস্তগত করিয়াছেন, তাঁহার গৃহে অনেক নৈবেদ্য আসিয়াছে ; ফলতঃ বনবাণী ঠাকুর সে জন্য বিরামকে দেহ করিতেন। বিরাম কাঁদিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সকল জানাইল। একবার নাড়ি ধরিয়া দেবিয়া আসিবার জন্য অনেক অচুনয় করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বালবিলম্ব না করিয়া নানাবলি লইয়া তাহার সঙ্গে গমন করিলেন।

করণের তখন খাদ্য প্রবল হইয়াছে ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শিয়রে বসিয়া বামহস্তের নাড়ি টিপিয়া ধরিলেন। নাড়ি বৃদ্ধি পলাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল ; বৃদ্ধ মুখ বিকৃত করিয়া একটু সরিয়া বসিয়া অধিকতর জোরে চাপিয়া ধরিলেন। পরে তাহানিককে বলিলেন “আর অধিক বিলম্ব নাই, অস্ত্রিম সময় উপস্থিত।” বালিকা মনোরমা একদৃষ্টে বৃদ্ধের নাড়ি পরীক্ষা দেখিতেছিল, সে কথা কর্ণে বাইবামাত্র ‘মা গো’ বলিয়া চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। বিরামও কাঁদিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণকে স্মরণ্য দেপিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, “বাপুহে ! শোকের এ সময় নয়, ঘরে মারিও না, বাহির করিবার উদ্যোগ দেখ।” রামকৃষ্ণ গদগদবরে বলিলেন—“আমি একাকী, আর লোক কোথায় ?” ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই পরোপকারী—বলিলেন, “আমি লোক আনিতেছি, তুমি শুভক্ষণ ইহাদের সাক্ষ্যনা কর।” ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

মনোরমা কিছুতেই সাক্ষ্যনা মানিতেছিল না, ‘মা মা’ শব্দে কেবল ভীতে রোদন করিতেছিল। সে রোদন শব্দ উপর হইতে শুনিয়া মহামারা তাহার মাকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ মা, মামী ম’লো নাকি ?” তাহার মাতা বলিলেন—“তাইত মা, এ যে মরাকান্নাই বটে।” মহামারা একটু উত্তেজিত হয়ে বলিলেন “বল কি, ঘরে ম’লো !” মা উত্তর করিলেন “ওমা—সত্যই তো।” এই সময়ে অরুণ নীচে বাইবার জন্য প্রোড়া ইয়া

আগিতেছিল, মহামায়া তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—“ছি বাবা ! এখানে যাইতে নাই ।” অরুণ বলিল—“কেন ঐ যে মাঘি র'য়েছে ।” এই কথা শুনিবামাত্র মায়ে শিরে একেবারে জলিয়া উঠিল ; হুই জন বিরাগের উদ্দেশে সহস্র গালি দিল । বালক অরুণ তাহাদিগের ভাব দেখিয়া মারি থাইবার ভয়ে অনাজ চণিয়া পেল ।

রোদ পড়িয়া গিয়াছে । প্রাঙ্গনে তুলসীতলায় কণা অভিক্ষণব্যায় শাস্তিত রহিয়াছে—তাহার চারি পাশে ভট্টাচার্য্যপ্রমুখ প্রতিবেশীগণ বসিয়া উচ্চে নাম ডাকিতেছেন ; অনূরে বালিকা মনোরমা ধূলার পড়িয়া চীৎকার ছাড়িতেছে ; বিরাজ কখনও মনোরমার চক্ষের জল মুছাইতেছে, কখন আপনার চক্ষের জল মুছিতেছে ; হেম সারাদিন অনাহার ও পথশ্রমের পর ডাক্তার লইয়া গিরিয়া আগিল । সহসা কে যেন তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করিল । সম্মুখের সে দৃশ্য দেখিয়া হেম দাঁড়াইতে পারিল না, “মা গো” বলিয়া তৎক্ষণাৎ অছাড় থাইয়া পড়িল । কন্য়ার শেষ হইয়া আদিয়াছিল, তথাপি হেমের সে ডাক কর্ণে যাইবামাত্র অক্ষপূর্ণলোচনে একবার চাহিয়া দেখিল । হেম আর শির থাকিতে পারিল না ; বালকের ন্যায় কাঁপাইয়া পড়িয়া সে বকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল । মার প্রাণ কত কাঁদিয়াছিল তাহা কে বলিলে ? এই সময়ে আবার অন্তিম তৃপ্তা জোর করিয়া উঠিল, বুকটা শত চেঁচা করিয়াও শির থাকিতে পারিল না, হা করিল । নিকটে গঙ্গারল ছিল, হেম তাড়াতাড়ি মুখে জল দিতে গেল । ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হুই হাত ধরিলেন । বলিলেন—“ছি ! পরকাল মই করিও না, আজ একাদমী ।” হেমের মাথা ঘুরিয়া গেল, কাঁদিয়া বলিল—“দে পাপ হয় আমার হইবে, আমি এ যন্ত্রণা আর দেখিতে পারি না ।” ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“ভূমি বালক ; শাস্ত মানিতে হয় ; ভাল, কর্ণমূলে গঙ্গাজল দাও ।” সে কথার হেমের মস্তকুলে কে যেন অক্ষুণ্ণ ফুটাইয়া দিল । সর্দঙ্গ নিয়া তাড়িত বাহির হইতে লাগিল, দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল ; কোভে হাতের দেই জলপাত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া উচ্চে কাঁদিতে লাগিল । কন্য়ার প্রাণ তখন বাহির হইবার পথ দেখিতে-ছিল; আবার হা করিল । হেম তাহা দেখিল, বুক ফাটিয়া থাইবার

উপক্রম হইল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া অল্পলি পুরিয়া মুখে বল চালিয়া দিল। অল গলাধঃকৃত হইল না। দুই কস বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

হিন্দুশাস্ত্রের শ্রাব হইল !!

আকাঙ্ক্ষা ।

ঐ যে বিশাল শূন্যমণ্ডল পবিত্র চন্দ্রিকারাশি বক্ষে করিয়া শুভ্র-সলিলা পূর্ণগর্ভা স্রোতধিনীর ন্যায় আপন মনে ধেলিয়া বেড়াইতেছে, উহার সঙ্গে আমাদের জীবনের কি সাধুশা আছে, তোমরা বলিতে পার কি? বলিতে পার কি, গগনতলে ঐ হাসিমাখা চন্দ্রাননধামি দেখিতে পাইলে, হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষারাশি কেন এত ক্ষীত ও উবেলিত হইয়া উঠে? যখনই আমি একটু আদ্য হইয়া অধাকরের কোনদীর্ঘালবেষ্টিত শূন্যমার্গের দিকে লক্ষ্য করিয়াছি, তখনই যেন আমার বোধ হইয়াছে যে, আকাশের ঐ ভাবটুকু আর আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাণের বিহ্বালগত তাড়িত-পরিচালকের ন্যায় পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছুটিতে চাহিতেছে ওই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এরূপ আকাশের এত প্রণয় কিসের?

জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশমণ্ডল—স্বকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-লহরী—চন্দ্রকর-প্রতিবিম্বিত বিশাল জলবিগর্ভ, এ সকলেরই সঙ্গে যেন আকাঙ্ক্ষার বড় ভাব। এত প্রণয় আমি কখন আর কোথায়ও দেখিতে পাই নাই। এত এক হইবার ইচ্ছা, এত মিলনাথী, বর্ণনে এত উত্তেজিত, পলিত, প্রণয়ী কি আর দেখিতে পাওয়া যায়? কিসের এত বদ্ধতা এ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার মনে হয় যে, উহার ঠিক একই প্রকৃতির। ঐ জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশমণ্ডলের ন্যায় আমার এ আকাঙ্ক্ষাও বিশাল অগত সঙ্গীত, পরিকার অগত অক্ষুট। ঐ স্বকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনির

নায়া ইহাও ধীরে ধীরে জননদেশে কিছুকালের জন্য জীড়া করিয়া চিত্ত মাতাইয়া আবার শূন্যেতে মিলাইয়া যায়—ইহারও সুর অবিলোম্বী। আর ঐ চন্দ্রকর-প্রতিবিম্বিত বিশাল জলবিগর্ভের নায়া ইহার অন্তরদেশেও একটি সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রবাহও ঠিক ঐরূপ সন্তোজ অগত যদুপভাস্য। এই কি এত প্রণয়ের কারণ? কি জানি, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না, তোমরা একথা বলিতে পার কি?

আমার এ আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি এতকণে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারি-
রাছ। এ আকাঙ্ক্ষা ধনার্থ্যের নহে—বিদ্যাার্ণভের নহে—বুখি সুখ-
সন্তোষেরও নহে। এ আকাঙ্ক্ষা ইহার অর্থার্থী পদার্থ বা ভাবরাশির সঙ্গে
মিলনের অভিলাষ—লীন হইবার ইচ্ছা। ইহাই কি আমাদের শাস্ত্রীয় মুক্তি—
পরব্রহ্মে লীন হওয়া? শাস্ত্র জানি না, দর্শন পড়ি নাই, যোগ কাহাকে বলি
বুঝি না, কিন্তু আমার বেন বোধ হয় যে আমার এ আকাঙ্ক্ষাওলি এখন
যেমন ক্ষণকালের জন্য ঐ হাস্যময় গগনমণ্ডলের সহিত মিশিতে চাহিতেছে—
মিশিবার জন্য ছুটছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, যদি কখনও চিরকালের জন্য
এইরূপ অভিলষী হয়, যদি করনও সে অভিলাষ পূর্ণ হয়, তখন আমার
আকাঙ্ক্ষার মুক্তিলাভ হইবে—আমিও মুক্ত হইব। আজ যেমন ঐ গগন-
মণ্ডল আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, যখন অগতঃ হিমালয় পর্বত হইতে
সাগর্য্য বালুকণা আমাকে এইরূপ নুদ করিতে সক্ষম হইবে, আকাঙ্ক্ষাকে
তৎসহ মিশিতে শাকাঙ্ক্ষ করিবে, তখনই আমার মুক্তি হইবে। যদি মুক্তির
অর্থ এই না হয়, আমি সে মুক্তি চাহি না।

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি কি তবে মুক্তির প্রধান সহায়? যে যাহা বলে বলুক,
আমার নিকট তাহাই বটে। প্রকৃতিস্ব সমস্ত পদার্থে সৌন্দর্য্যের বিকাশ
দেখিয়া তাহাতে আনন্দহারার নাম প্রকৃতিতে লীন হওয়া বা মুক্তিলাভ।
তোমরা সৌন্দর্য্যকে এবং তাহার উপভোগকে সময়ে সময়ে বড়ই দৃষ্ণীয়
মনে কর। আমার নিকট কিন্তু সৌন্দর্য্য কোন পক্ষিতাই দৃষ্ট হয় না।
কূলটি দেখিলেই সে তাহার স্পর্শস্থ বা স্রাবগ্রহণ আমাদের লক্ষ্য হয়,
সুন্দরী গন্ধা দেখিলে যে তাহার সন্তোষের জন্য মন আকুল হইয়া উঠে,
ইহাতেও সৌন্দর্য্যের সেই পবিত্র ভাবটুকু দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দ-

ধীর সহিত আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিলাইতে চাহে, তাই দূরে রাখিয়া তাহার সম্ভোগেচ্ছা নিবারণিত হয় না। একথা বেশি বলিতে গেলে হয়ত অনেক কুরুচির কথা আসিয়া পড়িবে—তাহা বলিয়া কবে কাজ নাই। একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি এতৎসম্বন্ধে তাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। * “পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন।” পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্য তাহা কবে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, অদূর কাননের সমীপ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের প্রাতিভিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ চণিরা যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা তা করিতে থাকে, হুই নাম ভুলিয়া স্বর্ঘ-কিরণে উড়িতে ইচ্ছা হয়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে ঐ অদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেকে না। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়। হৃদয় বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্ভেক করিয়া দেয়।

“স্বর্গে মর্ত্তে এগনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি অক্ষুণ্ণ আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।”

সৌন্দর্য্যের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। এবং যে এই ব্যাখ্যা বুঝিতে পারে, সে না বলিয়া পারিবে না, যে সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি যেকোন প্রধান সহায়। আমি যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলিতেছি তাহা এই সৌন্দর্য্য-স্বাভাবিকভাবে

নেপথ্য নদীর ন্যায় সন্তোজে বহিয়া ঘাইতেছে । যেখানে ইহা, এই সাগরের অংশ দেখে, সেইখানেই ইহা ছুটিয়া মিলাইতে চাহে । সমষ্টি মৌল্য ইহার লক্ষ্য—কিছু বাটি মৌল্যও ইহার চিত্ত উন্মাদে হইয়া যায় । ভাবিয়া দেখিলে বাটিকেও সমষ্টি করা যায় । তাই চক্রকিরণোদ্ভাগিত গগনদেশ, মনোমোহিনী সঙ্গীতমালা, অনন্ত-প্রসারিত সাগরবারি, পূর্ণ-মৌল্যধামিনী প্রকৃতির আংশিক মৌল্য হইলেও, আকাজ্ঞা তাহাতেই মিলাইতে চাহে । এই আকাজ্ঞাই আমাদের প্রাণ—প্রকৃতিতে লীন হওয়াই ইহার অভিলাষ ।

ঐগিরিপ্রপন্ন রায় চৌধুরী ।

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ ।

(৫১ পৃষ্ঠার পর)

অপরাজিতা ।

অন্য নাম—বিম্বকাস্তা, শ্রুপুত্রী, বিবহত্রী ।

অনামধ্যাত পুষ্পগতা বিশেষ । গেষ ও নীল ভেদে ইহা বিবিধ । ইহার পুষ্প সচরাচর দেবার্চনার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার মূল তিক্ত, কষায়, মূত্রকারক, পিত্তোপশ্রব, বিষদোষ, শোথ, কান ও আমশাশক । চক্ষুর পক্ষে হিতকারী, অংশোদক, এবং ত্রিদোষের সমতাকারি ।

ইহার পাতার রসের নস্য করিলে পানাজর নিহারণ হয় । খেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁদিয়া রাখিলে নারীদিগের অকালে গর্ভপাত হয় না । শুভ সহ বাটিয়া দেহন করিলে গলগণ্ড আরোগ্য হয় । গ্লামুজে বাটিয়া পান করিলে গণ্ডমালা উপশমিত হয় । চেলোনী ঘলে বাটিয়া দ্বতের সহিত ~~শ্রব~~ করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় । ইহার মূলের রসের নস্য লইলে আধকপালে ভাল হয় । ইহার মূল ও আপাংমূল একত্রে পট্টহৃত দ্বারা কহে

বন্ধন করিয়া রাখিলে বীর্ণাশ্রয়ন হয়। নীল অপরাধিতার মূণ ও শিশুল মূল একজে বাটিয়া লেপ দিলে খেত কুষ্ঠ নষ্ট হয়। অপরাধিতার শিকড় কণে বাধিয়া রাখিলে শিরঃশোভা আরোগ্য হয়।

অপাঙ্গ।

অনা নাম—অপাখার্গ, আপাং, চিচিড়ে, মর্কটী।

খেত ও রক্তবর্ণ ভেঙ্গে টেঁকা দ্বিবিধ। আরুহিতে উভয়ই সমান। কেবল বর্ণে ও শীর্ষে বিভিন্নরূপ। ইহা সাধারণতঃ ভীক্ষু, উদ্য, কটু, তিক্ত, দারক, মৃতকারক। কফ, কশ্ম, উদরাময়, মূত্রশোভা ও বিষলোম নিবারক। ইহার মূল অবিবাহিত। কনার হাতের হুতা দিয়া মস্তকে বাদিলে ঐকান্তিক জ্ঞান নিবারণ হয়। চেলানী ফলে বাটীয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। আপাং মূল ২ ভোণা পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে উন্নত শৃংখল ও কুকুম দংশন জনিত বিষশোভা নিবারণ হয়। ইহার মূল বাটীয়া সেবন করিলে হৃদিষ আরোগ্য হয়। আপাংমূল পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে নারীদিগের অতি রক্তস্রাব নিবারণ হয়। আপাংমূলের রস আত্মাণে পালাজব আরোগ্য হয়। আপাংমূল, অম্বখছাল ও ভেঁতুলছাল সমপরিমাণে একত্রে বা পৃথক পৃথক ভক্ষ্য করিয়া শিলাইচা দিকি তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে দারুণ শূলবেদনা তৎক্ষণাৎ উপশমিত হয়। আপাংবীজ ততুলবারি সহ শিশিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারণ হয়। আপাং পাতার রস কাটো-স্থানে প্রয়োগ করিলে আত্ম রক্তরোধ হয়। ওলাউঠা রোগে ২।১ বার ভেদ হঠেরাতে এমন সময় খেত আপাংদের একটী সমস্ত শিকড় সাতটী গোল-মরিচের সহিত জলে শিশিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর তিন বারে সেবন করাইলে ভেদ বমন এককালে বন্ধ হইয়া যায়; অথচ তৎক্ষণা উদর ক্ষীভ বা অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না। বৃক্ষিক দষ্ট স্থানে ইহার পাতা ও কোমল শাখাগ বাটীয়া লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ জাণা নিবারণ হয়। আপাং পাতার রসে মূলাব বীজ পেষণ করিয়া লেপ দিলে ছুলী আরোগ্য হয়।

—কৃষ্ণঃ

ঐশ্বর্যচন্দ্র রায়, কদিরাজ।

বিনিময় ও মুদ্রা ।

অতি প্রাকালে কোন দেশেই মুদ্রার প্রচলন ছিল না । বিনিময় দ্বারা প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই সংগৃহীত হইত । আমার তৈলের আবশ্যক হইল, আমি কতকগুলি তেল লইয়া তৈলবিক্রেতার নিকট গমন করিয়া তদ্বিনিময়ে তৈল আনিলাম । অস্ত্রের প্রয়োজন হইল, বস্ত্র লইয়া অস্ত্রবিক্রেতার নিকট গমন করিয়া—তাহার পরিসর্ত্তে অস্ত্র আনিলাম, ইত্যাকার ব্যবহার ঘোর পল্লীগ্রামের মধ্যে অন্যাপিও কতক পরিমাণে বর্ত্তমান । কালক্রমে যমুঘোর জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি স্ফোরের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় দ্বারা সকল বস্তু সংগৃহ করণের অসুবিধা প্রভীত হইতে লাগিল । আমি দুই ত্রয় করিবার মানসে কাষ্ঠাসন লইয়া গমন করিয়া দেখিলাম যে, দুইবিক্রেতারি কাষ্ঠাসনের আবশ্যকতা নাট, সুতরাং আমাকে বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষির-মনে প্রত্যাগর্ত্তন করিতে হইল । অথবা অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে দুইয়ের অনুসন্ধান গমন করিতে বাধ্য হইতে হইল । যদিহা সামান্য বস্তু দ্বারা কোন দল্যবান দ্রব্য বিনিময় করিবার প্রয়োজন হইল তাহা হইলে একেবারে সৰ্ব্বনাশ । বহুমূল্য বস্তু পাইবার জন্য মাসাবধি আমাকে কাষ্ঠ বহন করিয়া বস্ত্রবিক্রেতাকে দিতে হইবে । যদি আমার তাঁহার তত অধিক কাষ্ঠের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলেই সমুদ্র বিপদ উপস্থিত । অকস্মাৎ কোন এক বস্তুর আবশ্যক হইলে যাহার সেই বস্তু আছে তাঁহার নিকট বাইরা অশুলকান লইতে হইবে যে তাঁহার কিম্বের অভাব; আমার যদি সেইটি না থাকে তাহা হইলে একেবারে মাতায় হাত দিয়া বসিতে হইল, অপর এক ব্যক্তির নিকট তাহা চেষ্টা করিতে করিতে হয়ত আমার অভাব দূর হইয়া গেল, এবং আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল । চিকিৎসকের সহিত এ প্রকার বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকিলে, সময়ে সময়ে যে রোগের ~~সহিত~~ হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন । সকলেই বুঝাবস্থার জন্য কিছু না কিছু সংগ্রহ

করিয়া রাখেন, যেন সেই অসহায় অকথ্য অসহায় তাঁহাকে কষ্ট পাইতে না হয়। কিন্তু এক প্রথা প্রচলিত থাকিলে তিনি কি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন ? যাঁহা কিছু সঞ্চিত থাকিবে তাহাই কাণ্ডক্রমে পচিয়া যাইবে, অগ্নি লাগিলে ভস্মসাৎ হইবে, বা অন্য কোন দৈব ঘটনায় নষ্ট হইয়া যাইবে এবং যদি কোন বস্তু রক্ষা পায় তাহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করা বৃক বস্তুসে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে বুদ্ধদেবের বাণিজ্য ব্যবস্থা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বেশ বিদেশের রাজস্ব নিরূপণ করিয়া তাহা নানা কার্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। যদি কাৰ্য্যকেও জিজ্ঞাসা করা যায় মহাশয় আপনি কত ধনের অধিপতি, তাহাকে নিঃস্বই নিম্ন দ্রব্যের ধারাবাহিক নাম ও পরিমাণ বলিতে হইবে তদ্বিধা পাতাতর নাই। এইরূপ মুদ্রার অভাবে যে কত অনর্থ উপস্থিত হয় তাহা কে সংখ্যা করিবে ?

এই শিশু বিজ্ঞানের দিনে সভ্যজাতিদিগের মধ্যে রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, ষড়্ধি ও নানাবিধ কণ আবিষ্কৃত হইয়া মানবজাতির অশেষ উপকার সাধন করিতেছে, আজ সেই বিনিময় প্রথা থাকিলে এই সকল মূল্যবান কল কোন মতেই ক্রয় করা যাইত না, এবং কোনও রূপে সংগৃহীত হইলেও চলিত না। হয়ত এই শিশু ও বিজ্ঞানের জন্ম উপায় ও চেষ্টা এককালে নির্মাণ হইয়া যাইত। এক রেলগাড়ি লইয়া বিনিময়ের অসংখ্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। রেলওয়ের এক এক সমান্য ষ্টেশন হইতে দিগন্তের মধ্যে সহস্র সহস্র যাত্রী বিদেশে গমনাগমন করিতেছে। দিবসে ও রজনীতে কোন কোন ষ্টেশনে ১৫, ১৬ খানি ট্রেন যাতায়াত করে। যদি মুদ্রার প্রচলন না থাকিত, তাহা হইলে যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ মেঘ, কেহ মহিষ, কেহ ছাগ, কেহ পক্ষী, কেহ তুল, কেহ গোমুগ, কেহ তৈল, কেহ ঘৃত, কেহ লবণ কেহ ডাল, কেহ মূল্যবান পদার্থ, কেহ ধাতু তাড়া স্বরূপ লইয়া আগমন করিত। তদ্বৎ বস্তুর মূল্য নিরূপিত করিয়া তাহাদিগকে টিকিট দিতে হইলে স্রাসের মধ্যে গাড়ী একবার ছাড়া হইত কি না সন্দেহ হয়ত মূল্য নিরূপিত হইতে অনেক পত্ত আহারাভাবে লব্ধপাণ হইত ও অনেক প্রব্য পুট্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। চৌদ্বারাদির আধিক্য হইত ও বিবাহ, কলহ

উপস্থিত হইয়া নানা অর্থ; আদান-করিত। এই সকল বস্তু রাখিবার জন্য ট্রেনে নিত্যমুখ্য অর্থ স্থানের আবশ্যক হইত না। বতদিন পর্য্যন্ত যাত্রীরা টিকিট প্রাপ্ত না হইত। তাহাদিগকে ট্রেনের সামিথো থাকিয়া আহারাদি নির্মাহ করিতে হইত এবং নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছারখার করিয়া দিত।

তুচ্ছ মুদ্রার প্রচলনে সকল প্রকার কষ্টক্রেশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। মুদ্রা এত প্রয়োজনীয় পদার্থ যে ইহাকে নিঃসন্দেহে বাণিজ্যের বস্তু বলা যাইতে পারে। কি জন্যে মুদ্রা প্রস্তুত করিলে নিঃস্ব হুনিদা হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইলে এমন একটি দ্রব্য বাছিয়া লইতে হইবে তাহাকে সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়, অর্থহীন বাহ্য সামান্য আকারে অধিক মূল্য ধারণ করে। কাষ্ঠ, পশুর, লৌহ প্রভৃতি পদার্থে মুদ্রা হইতে পারে না, এই সকল দ্রব্যে মূল্য প্রস্তুত করিলে সামান্য পক্ষ ত্রুটি করিবার জন্যে মুদ্রাবাহকের আবশ্যক হয়। প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন লোকের দ্বারা মুদ্রা-স্বরূপ ধানসত্ত্ব হইত; যথা, চীনদেশে চা. আফিকার কোন কোন দেশে ও প্রাচীন ভারতে কড়ি, অরবের গো মেষ, আফ্রিনিয়ায় লবণ। কিন্তু ভূরিসম্পদ দ্বারা ইহা সাধারণ হইয়াছে যে স্বর্ণ রৌপ্যই মুদ্রার উপযোগী; অপর কিছুতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে তাহা তাদৃশ হুনিদাজনক ও কার্যকারী হয় না। যে কোন পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১। মূল্যবান। পদার্থটির নিম্নের মূল্য না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এক রৌপ্য মুদ্রাতে প্রায়শঃ এক টাকা মূল্যের রৌপ্য থাকা উচিত। যদিও ব্যাংক নোট প্রভৃতি নিম্নের কোন মূল্য নাই, কিন্তু তাহারা মুদ্রার আদেশপত্র, প্রয়োজন হইয়া যাতায়াত বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায়। এবং পাছে কোন পোলযোগ উপস্থিত হয় এই জন্য রক্ষা স্বয়ং দায়ী। অতি পুরাকাল হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য চাকুর্টকা, স্থায়িত্ব ও গাভসহস্বের জন্য মূল্যবান বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে

২। ~~সুপ্রায়োজন্যতা~~। বাহ্যেতে পদার্থটি অনাগাদে এক স্থান হইতে প্রয়োজনমত ভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে

ইহা যেন আকারে আন হইয়া অধিক অর্পণের পরিমাপক হয়। হীরক সর্পিপেক্ষা মূল্যবান হইলেও আকারে এত ক্ষুদ্র যে সহজে হারাষ্টরা বাইনার সম্ভাবনা। সুতরাং ইহা যত্না হইবার পক্ষে অসম্প্রদায়ী। আবার স্বর্ণ-নির্মিত অধুনি সিঁকি চুয়ানি হইলেও সেই গোল। কাজে কাজেই স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত মুদ্রার প্রয়োজন

৩। অনিন্দনীয়। পদার্থটি যাহাতে সহজে নষ্ট না হয় তাহাও দেখিতে চাইবে। এই জন্যই কাষ্ঠ ও তাম্র প্রভৃতি মুদ্রা হইবার পক্ষে অসম্প্রদায়ী। পুনশ্চ, স্বর্ণ রৌপ্য মরিচা ধরিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

৪। মূল্যের সমতা। যে পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহার মূল্য এক তওয়া চাই। স্বর্ণ বা রৌপ্যকে শোধন করিলে তাহাদিগকে একই মূল্যের অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে নির্গল বা দুই তিন আনা খাণ্ড-নিশিষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু হীরক বা অন্য কোন বহুমূল্য প্রস্তরকে তাহা পারা যায় না, ওতনে ও আকারে এক হইলেও ওজলাভেদে মূল্যের বিশাল তারতম্য হইয়া থাকে।

৫। যৎ সকলের মূল্যের অভ্যন্তরমাতা। পদার্থটিকে যৎ করিয়া ফেলিলেও যেন তাহার মূল্যের ব্যতিক্রম না হয়। একটি টাকাকে সমান আটটি অংশে বিভাগ কর, আটটি চুয়ানি হইবে। আটটি চুয়ানি একত্র কর একটি টাকা হইবে। একটি ডবল পয়সা ওতনে এক পয়সার বিত্তন, মূল্যও দ্বিগুণ। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতির ওতনের সহিত মূল্যের সমান অসম্প্রদায়। কিন্তু হীরক ও অন্যান্য প্রস্তরের পক্ষে তাহা নহে। এক আনা ওতনের এক হীরকের মূল্য ৪০ চব্বিশ টাকা হইলে দুই আনার এক খণ্ডের মূল্য $২ \times ২ \times ৪০ = ১৬০$; তিন আনার এক খণ্ডের মূল্য $৩ \times ৩ \times ৪০ = ৩৬০$ ইত্যাদি। হীরকাধি কোন কারণে ভাঙিয়া গেলে উহাদের মূল্যের যৎপত্রো-নাস্তি তারতম্য হইয়া থাকে।

৬। মূল্যের অপরিবর্তনীয়তা। পদার্থটির মূল্য যেন সকল সময়ে সকল দেশে একই থাকে। অগতে বাণিজ্য বন্ধন মূল্য পরিবর্তনশীল। আজ এক প্রকার, কাল ভিন্ন প্রকার। মুদ্রার মূল্যের স্থিরতা না থাকিলে কেবলমাত্র উপর নির্ভর করিয়া, বাবিলে প্রস্তুত হইয়া সশ্রম-কোলাহল শকাব্দিত হওতঃ মধ্যে

মধ্যে হতদর্শক হইবে? স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্যের এত সামান্যরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় যে ইহার অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা সম্ভার জনা বিশেষ উপযোগী। কোন এক জনা ওজননে অত্যন্ত লঘু হইলে তাহার মূল্যের বিশেষ ভারতম্য হয় না। কিন্তু যে সকল দ্রব্য ভারি তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হইলে অনেক ব্যয় পড়ে। কাজে কাজেই স্থান বিশেষে মূল্যের বিশেষ ভারতম্য হইয়া থাকে। খনির মুখে পাটুরিয়া কয়লার এক দর, আর ১২।১৪ ক্রোশ দূরে আর এক প্রকার। ব্যবসায়ীগণ এক মূল্যে বাহ্যিক কান্ট্রি করিয়া দূরবর্তী স্থানে লইয়া গিয়া তাহার তিন চারি গুণ মূল্যে বিক্রয় করে। একটা জীবন্ত মৎস্যের মূল্য এক টাকা হইলে সেই আকারের একটা পচা মাছের দাম দশ বার পর্য্যন্ত অধিক নহে। ততুল গোপন প্রকৃতি অবশ্য-প্ৰযোজনীয় বস্তুর অভাব এত অধিক যে কসল অল্প হইবার কথা দূরে থাক আমদানির বিলম্ব হইলেই বাত্মার চড়িয়া গেল, অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি হইল। এইরূপ সময়ে সময়ে আর আর সকল জিনিষেরই তেজি মন্দা দেখা যায়। কিন্তু স্বর্ণ বৌপ্য কেহ খাইয়া ফেলে না, বা অন্য কোন রূপে নষ্ট হয় না। দিন দিন স্বর্ণ রৌপ্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি কোন কারণে স্বর্ণ রৌপ্যাদির আমদানি তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়, ইহাদের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার অভাব অপেক্ষাকৃত এত অল্প যে, তাহাতে তাহাদের মূল্যের বিশেষ কম বেশি হয় না।

৭। বাথার্থ্য নিরূপণীয়তা। যে পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহা এমন হওয়া চাই, বাহাতে তাহা খাটি কি মেকি সহজে নির্ণীত হইতে পারে। স্বর্ণ বৌপ্য ও তাম্রের বাথার্থ্য জ্ঞান আগাদন ও শল দ্বারা সহজে অঙ্কমিত হয়। একটি টাকার বাথার্থ্য পক্ষে সন্দেশ হইল, বাজাইলাম, খাটি কি ভেল সহজে ধরা গেল। কিন্তু হীরকাবির মূল্য নির্ধারণে কয়টি জহরী সক্ষম?

ঐদৃশ ওৎপত্তি পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র বাতীত অপর কোন পদার্থে এই সাতটি ওৎ সমদিক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনেরই মূল্য স্থির আছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতবর্ষে রৌপ্যের মূল্য স্থির

রাখিয়া অপর দ্রব্য সকলের মূল্য নির্ণয় করা হয়। আজ কাল কোম্পানির মোহরের মূল্য প্রায় ১১, কিছু দিবস পূর্বে ১৭ টাকাতেও পাওয়া যাইত। ডাকের মূল্যের পরিবর্তন বড় দেখা যাইতেছে না। কিন্তু ইংলণ্ডে সর্বের মূল্য স্থির রাখিয়া অপর দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ হয়। পূর্বে গিনি ১০০ টাকাতে পাওয়া যাইত, আজকাল ১ গিনির মূল্য প্রায় ১৩০ টাকা। ভারতবর্ষের রাজত্ব-প্রণালী পরিদর্শনের জন্য যে সকল ইংলণ্ডীয় কর্মচারী বিলাতে আছেন, তাঁহারা পূর্বে হইতে সর্বমুদায় বেতন পাইয়া আসিতেছেন। সুতরাং এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বৌপ্যমুদ্রা তাঁহাদের বেতন স্বরূপ বিলাতে প্রেরিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের রাজকোষকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। যে বিলাতী কর্মচারী ২৫ গিনি বেতন পান, তাঁহার জন্য পূর্বে যদি ২৬০০০ ভারত হইতে পাঠাইতে হইত, আজকাল তাঁহার জন্য ৩০৭০০ পাঠাইতে হইতেছে। এইরূপ টাকার বাটাকে একচেতন বলে। একচেতন আজ কাল রূপার দর এত কমিয়াছে, যে বিলাতী মাল লইয়া আমাদের দেশে নাশিদ্ধ ব্যবসা করা কঠোর হুকুম হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, একটি টাকাতে ঠিক এক টাকা মূল্যের রৌপ্য নাই, না একটি পয়সাতে ঠিক এক পয়সা মূল্যের তাম্র নাই। অর্থাৎ একটি রৌপ্য বা একটি তাম্র মুদ্রা এক টাকা বা এক পয়সার পরিজ্ঞাপক হইলেও তাহার মূল্য মূল্য এক টাকা বা এক পয়সার কিকিৎ অন্য। এক্ষণ হইবার চারটি বিশেষ বিশেষ কারণ দৃষ্টিতে পারা যায়।

১। রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রার পরিজ্ঞাপক মূল্য বাস্তব মূল্যের অধিক হওয়াতে, মুদ্রা প্রস্তুত জনা গবর্ণমেণ্টকে দায়গ্রস্ত হইতে হয় না। এক রৌপ্য মুদ্রাতে যদি চৌক আনার খাঁটি রূপ থাকে, তাহা হইলে তাই আনা রাজার লাভ। সেই লালের মধ্যে কিয়দংশ মুদ্রা প্রস্তুত জনা ব্যয়িত হয়।

২। মুদ্রা প্রস্তুত জনা ব্যয় নির্দোষ হইয়া যাহা অতিরিক্ত থাকে, তাহা ভাঙকাঠো ব্যয়িত হয় এবং প্রণারা অতিরিক্ত করতর হইতে নিষ্কতি পায়। যদি মুদ্রার রৌপ্যের মূল্য ঠিক এক টাকা হইত, তাহা হইলে মুদ্রা

প্রস্তুত জন্য দায়, ও রাজ্য শাসনের আংশিক ব্যয় বাহ্যে এক্ষণে মুদ্রা প্রস্তুত করণের উপসত্ত্ব হইতে নির্যাস হইতেছে তাহা নির্যাস জন্য প্রকার উপর অতিরিক্ত করভার অর্পিত হইবার সম্ভাবনা হইত।

৩। রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রাতে এক টাকা বা এক পয়সার অল্প রৌপ্য বা তাম্র থাকিতে লোকে মুদ্রাকে গলাইয়া অন্য প্রয়োগে ব্যবহার করিতে পারে না। কে জানিয়া ওনিয়া একটি টাকাকে গলাইয়া চুই আনা কতিপয় হইলেন? টাকায় খাদ না থাকিলে লোকে যথেষ্ট গলাইয়া নিজ কার্যে ব্যবহার করিত এবং রাজাকে অনবরত মুদ্রা প্রস্তুতকার্গে ত্রুটি থাকিতে হইত, ও তাহাতে রাজার নিতান্ত অল বাগ হইত না।

৪। খাদ মিলাইলে মুদ্রা কঠিন হয়, ও সহজে ইহার আকার পরিবর্তিত হয় না। মুদ্রাতে থাক যে উদ্দেশ্যেই দেওয়া হউক না কেন, ইহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েই উপকৃত।

মুদ্রা স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র নির্মিত হওয়া উচিত ও তাহাতে খাদ থাকে উচিত, এই পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে পাওয়া গেল। এক্ষণে ইহার আকার গোল হইল কেন দেখা যাউক। সকল আকার অপেক্ষা গোল দেখিতে সুন্দর। মুদ্রা ত্রিকোণ বা চতুর্কোণ হইলে তাহার কোণ দ্বারা অঙ্গাদি ক্ষত হইবার সম্ভাবনা আছে, ও কোণগুলি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পাছে কেহ মুদ্রা চাঁচিয়া ওজনে কম করিয়া ফেলে অথবা কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করে এইজন্য রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও নানা প্রকার স্বস্ত লহা পাতা ইহার উপর অঙ্কিত থাকে ও ইহার ধার কাটা কাটা থাকে। মুদ্রা ঠিক ওজনের না হইলে তাহা রাজদ্বারে গৃহীত হয় না, ও কেহ কোনও রূপ কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিলে তাহাকে বিচারালয়ে লিপক্ষণ শাস্তিভোগ করিতে হয়। এই সকল নানা উপায়ে মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া জনগণের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে এবং মনুষ্যকে কষ্টসাধ্য অসুবিধাজনক বিনিময়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে।

ঐচ্ছিকানি চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যার বিদায়।

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায় শিথিল কপরী পড়ে গুলে,—
 যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
 চরণের পরশ-রাতি মা বেধে যায় যমুনার কূলে;—
 নীরবে-বিদায়-চাওয়া-চাওয়ে, গ্রন্থি-দাঁড়া রক্ষিম হ্রস্বে
 আঁধারের শ্রান-বধু যল বিষাদের বাসর-শয়নে।
 সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল-নয়নে।
 যমুনা কাঁদিতে চাছে সুখি কেনের কাঁদেনা কঠ তুলে,
 বিফারিত হৃদয় বহিরা চলে যায় আপনার মনে।
 মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিদ্রাস ফেলে ধরা।
 সপ্ত কবি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরভঙ্গ-মূলে,
 চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে তুলে যায় আশীর্বাদ করা'।
 নিশীথিনী রহিল বসিয়া বদন চাক্ষুষা এলোচুলে।
 কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না হাস;
 আপনার সমাধি মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাম বনু।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রামবনুর সঙ্গীতাবলী পাঠ করিলে, তাঁহার একটি বিশেষ অভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সেটি সুশিক্ষার অভাব। শিক্ষা-রহিত্য অভাবে, কবি নিজের হৃদয়-জগতের চতুর্দিক নিজেই হুস্পষ্ট দেখিতে পারেন না। তখন, অন্যকে চতুর্দিক দেখাইবেন কি করিয়া?

রাম বহু স্বাভাবিক কবি ছিলেন, সত্য। তাই, সময়ে সময়ে শোণ পক্ষীর ন্যায় হুল্লোল আকাশে উড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, বা উঠিয়াছেন; কিন্তু অনিকা-ডোরে পদ আবদ্ধ। আবার খাদ্য পেয় ভূতলে। হুতরাং, ঈষৎ আকর্ষণে বা বায়ু-কম্পনে ভূ-লুপ্ত হইয়াছেন। বিহ্বালের ন্যায় মেঘ হইতে মেঘান্তরে ছুটিয়া--লুটিয়া স্থখী হইতে পারেন নাই, কিন্তু ঋটিকার ন্যায় সমাজের সংক্রামক রোগে বহুমূহঃ বস্ত্রাঘাত করার মে আনন্দ-টুকু লাভ করিতে পারেন নাই।

তাহার লেখা পড়িলে বোধ হয়, অধিকাংশই গরজে বা ফারমায়েসে লেখা। উত্তর দিতে হইবে, বা চাপান গাইতে হইবে, ইধা ভাবিলে মর্শ্বস্পর্শী ভাবাপেক্ষা বাহাহুরী-আকাশ। কেমন স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে। আর, ভাব—কবিতার প্রাণ—গরজে প্রসব করিবার সামগ্রী নহে। উটপক্ষীর ডিম্ব নহে, যে স্বর্ঘ্যোক্তাপেও ফুটিতে পারে। হয় রাম বহু প্রভৃতি!

বিরহ। “রাম বহুর বিরহ আমাদের দৃশ্বে অতি বিখ্যাত। অন্তর ও বাহ্যজগত বর্ণনে রাম বহুর ধরুপ নৈপুণ্য দেখা যায়, এমন বাঙ্গালা ভাষার অতি অল্প সংখ্যক কবির দেখা যায়। তাহার গীতগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে, এমন বোধ হয়।”*

“বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভাল ছিলাম, সই, ছিল না স্বপ্ন-অভিলাষ।

পতি চিন্তেম না, ও রস জান্তেম না, জুপিপদ্ম ছিল অশ্রুকাণ।

এখন সেই শতদল জব্ব-কমল, কাল পেয়ে ফুটিল,

পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভ্রমর উড়ে গেল।”

“একজন প্রকৃত বঙ্গ-মহিলার কথা এই। ইহাতে কাল্পনিক প্রেমের তেঁকী নাই, প্রকৃত সত্যের সাক্ষ্য প্রাতিমা আছে।”†

“মনে রৈল সই, মনের বেদনা।

প্রবাসে যখন যায় পো সে, তাকে বলি বলি, বলা হোল না।

সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম, সজনি,

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা।

† ভারতী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। বেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি।

অন্যসে প্রবাসে গেল, সে তখনমণি ;

একি সখি হোল বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান ।”

“কি বিভক্ত দাশ্যত্ব প্রেম ! সাক্ষী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনো-
হর চিত্র !”*

“ধাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ বেন সখে রয় ।

থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে করি পাছে পতিনিন্দে হয় ।

আমি মরি সহচরি করিনে সে ভয় ।

• • • • •

এই খেদ তারে দেখে মরতে পেলেমু না ।

আমায় চাক্ না চাক্, সখা হখে থাক্,

কেন দেখা দিয়ে, একবার কিরে গেল না ।”

কিছু রাম বহুর অধিকাংশ বিরহ-সংগীত এ ধরনের নহে । প্রেমের
নাম লইয়া, জগতে যে ভেজাল বস্তু, অর্থাৎ যে সাময়িক উত্তেজনা (Lust)
প্রচলিত, তাহার অধিকাংশ কবিতা, তাহারই বিভ্রম-জনিত আক্ষেপ,
ব্যক্তোক্তি, বা বিরহ !

বিরহ প্রেমের মানদণ্ড । যে বিরহ প্রেম মন্দাকিনীর মধুর তরঙ্গ-লীলা ;
যে বিরহ প্রেমাপেক্ষা সুন্দর, প্রাণাকর্ষক, প্রেমবর্ধক ; রাম বহুতে তাহা
নাই ।

রাম বহুর বিরহের প্রাণ—অভিমান । প্রতারিতের আত্মাভিমান । বাস্তবিক,
পার্শ্বিক প্রেম বতটুকু জ্বলিত থাকে, মানাভিমানের খেলা লইয়াই । খুটি
নাটি ভিন্ন ইহা থাকিতেই পারে না । শিশুর ন্যায় স্বতঃ চকল । বন্ধ রাখিলে,
বন্ধ বান্দু—বন্ধ জলের ন্যায় দূষিত হইয়া যায় ।

প্রকৃত প্রেমের অভিমান বা আত্মাভিমান আছে, সত্য । অভিমানে
একটু বিশেষ সৌন্দর্য আছে । কেমন সাধ কবিতা মনে করিতে ইচ্ছা হয়,
আমি বতটা দিয়াছি, বুঝি ততটা পাই নাই । অর্থাৎ, তুমি যাহা দিয়াছ,
তাহাতে আমার প্রাণ পরিপূর্ণ হইতে পারিতেছে না । আবার, অভিমান করিয়া
প্রেমিকের বুঝি একটু বিশেষ দুখ আছে । সে দুখটুকুর জন্য তুমি চির-

* সেকাল আর একাল ।

হাসি-মাথা মুখ মলিন দেখিতেও প্রস্তুত । বা, সেট মলিন মুখখানিই যেন দেখিবার সাধ । তাই, সাধ করিয়া অভিমানে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, আরো কিছু আদায় করিতে হইবে ! ইহা, মিলনে-বসন্ত সমীরণ-স্পর্শে, অঙ্গির উপর একটা অশ্রি ।

রাম বহুর অভিমান শব্দ । তাহা স্থূল । শরতের মেঘ, বর্ষণের আশা বিদ্যা গর্জনবাত্র করিয়া চলিয়া গেল । সবট কলিকারী । জগৎ একটুমাত্র রেখা দিয়া, সংসারে কলঙ্কের ছায়ার আমার চিরায়ত করিল । শূন্য-জগৎকে দেহবিক্রেতী বলিল,—

“আপে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করিলি ছাড়াছাড়ি, তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি ।”

অপত্ত:—

“ক’রে না খুঁজে লোভ, শেষে পেয়ে ফোভ
বলি কারে, চোখে দেখে ঠেকছি !”

ভক্ত-প্রেমে প্রভাবিত রমণীর (হৃৎ নহে) লাঞ্ছনা বা জালা নর্পনে রাম বসু হুনিপূর্ণ । প্রভাবিত সরলার হৃৎ, সে ত জগৎ-ভেদী দীর্ঘ-নিবাস । কাব্যের উপাদান, কবি-গাহনার নহে ।

আবার পুনশ্চিলনে, তাহার বিরহিবীরা এমন একটু জগৎ-ভেদী ব্যঙ্গ করে, যাহার প্রতি প্রয়োগ করা হয়, সেই লম্পটকেও যেন দ্বারে পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া পলাঠতে হয় । প্রেমিক হইলে তাহার জগৎ ভাঙিয়া যাইত । অক্ষ বেদানে কিছুই করিতে পারিল না, ব্যঙ্গ সেখানে শেষ উপায় । আশ-ভ্যাগ, উপন্যাস নাটক প্রভৃতির একচেটে ; সংসারে বিরল ।

“দৈবযোগে যদি, প্রাণল্লাঘ, হোলো এ পথে আগমন ।

কণ্ড কথা, একবার কণ্ড কথা, হোলো ও বিদুরদন ॥

পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তার লজ্জা কি ?

এমন তো প্রেম ভাদাভালি, অনেকের দেখি ।”

আবার, —

“প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না ।

তধু দেখা দিবে, মধা, সেতো তা মনে বুঝে না ॥

এসো ব'সো বলা হোলো দায়, কি ছানি কে গিছে, সখা, বলে দিবে তায় !

আমায় বরং সখা, দিও দেখা, হৃদ যুগান্তে,

অনাদর নাহি কোরো সেই নতন পিরোতে,

আমায় যেমন আগিয়ে ছিলে, প্রাণ, তারে জ্ঞান দিও না।”

শায়ীর চট্টবাক্য শুনিয়া বলেন,

“প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আসাব হবে কি !

মনে মনে মনোত্তপে, আমি জন্ম বই আর বলব কি ।

প্রাণ গেলে, প্রাণ, নিভ হুঃখ তোমায় বলিলে,

ফলহীন রক্তের কাছে, সাধলে কাদলে ফলবে কি !”

আবার,

“বধু, কার কখন মন রাগ্বে ?

তোমার এক জালা নয়, হৃদিক রাখা, বল, প্রাণ, কিসে প্রাণ বাচ্বে ?

কপট প্রেমে বল দেখি, প্রাণ, হাসাবে কার কাদাবে ?”

সখীর নিকট বলেন,

“হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ ।

নামে ভাৰ্জা, কাখে ভাৰ্জা, সেই, লোকের যেমন নদীর চড়ার সনন্দ।”

রামবধু বহুবিবাহিতের প্রথম পত্নীর, পম্পটের লবণীতা রমণীর, কলঙ্কিনীর এবং প্রাণিত-ভর্তৃকার বসন্ত কালীন বিরহ বর্ণন করিয়াছেন। বিষয় নির্দোষ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ব্যক্তব্য নাই। প্রতিভা আপনার পথ আপনিই খুঁজিয়া লয়। সে, আপনার গন্তব্য পথে যাইবেই; না-যাইয়া থাকিতেই পারে না! পৃথিবী ধনমান-প্রলোভনে তাহাকে কি করিয়া বাধিবে? কোকিল গাহিবেই, তাহার ক্ষুদ্র সঙ্গীত যে উছলিয়া পড়িতেছে! সে বিরহে গাহিবেই,

“প্রিয়জনে ত্যাগে, প্রিয়জন আছে কেমনে !

কি হিলাম, কি হলাম, আর বা কি হই।”

এই ধানে আমরা, তাহার শুটিকত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রত্যেক কবিতা হইতেই মাঝে মাঝে হই এক স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। নহিলে টান থাকে না। “কোকিল” “মদন” আসিয়া পড়ে। কিন্তু,

এই গীতগুলি ইংরেজি বিরহ-কবিতা বা আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার ন্যায় কতকটা চাপাল্য, ছুটাছুটি, ব্যস্ত-সমস্তভাব, এবং শকাড়স্বর-পূর্ণ নহে। ইহা বর্ণার গভীর রাসের ন্যায় নিস্তরক, গভীর, উদাসময়, আবেশপূর্ণ।

সরলা কিশোরী, না বুঝিয়া পুরুষের শঠতায় মজিয়াছে। বুঝিয়াছে। জদয়কে বাধিতে চেষ্টা করিতেছে।—মরুভূমে যেন সন্ধ্যা আসিয়াছে। নীল-কোমল জদয়াকান্তে ঔদাস্য-রূপিনী শান্তি দেবী ধীরে ধীরে আসিতেছেন; কিন্তু, এখনও যেন তাঁহার চরণস্পর্শে উত্তপ্ত বালুকারণি গীতল হয় নাই। বায়ুর তপ্তপ্রাণ সময়ে সময়ে দূর হইতে শুনা যাইতেছে। জটসর্পস্বা কাঁদিয়া বলিতেছে, কেন সে এ পথে গিয়াছিল !

“প্রেমে স্মৃতি হব ব'লে সখি গো, মণিলাম পরে প্রাণ মন।

* * * কে জানে শেষে কঁাদাবে।” ইত্যাদি।

রমণী তাহার শেষকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছে। সুখসাধে তৃষ্ণা নাই। যেন, আপনার ঘোষণে আপনি মগ্ন থাকিয়া হৃদয় লাভ করিতে ইচ্ছা। প্রাণে যেন বৈরাগ্য-ধর্মের বায়ু ঈষৎ লাগিয়াছে। বর্মের পর প্রেম-ভর কমিষা গিয়াছে। রমণী যাহাই বলুক, আমরা দেখিতেছি, জরভোগের দুর্বলতা এখনও বুচে নাই।

“বলিমনে, সখি, প্রেমে মরুতে আর, ও হৃদে নাহি প্রয়োজন।

শঠের প্রণয় হোতে বিচ্ছেদ ভাল, সই, জুড়াল প্রেমে কই ভীবন ?

প্রাণ বেঁচেছে গো সই, পিরীতি গেছে—পাপ গেছে,

হ'য়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য বেত,

বাহক মেনে এতদিনে, গায় বাতাস লেগেছে।

হৃদেই চেয়ে স্বপ্নি ভাল বাসে দেহ ছেড়েছে।” ইত্যাদি।

রমণী এখন প্রেম-সংসারত্যাগিনী যোগিনী হইয়াছে। জদয়ের কথা আর সখিকে বলিতে হয় না; স্বয়ং মূখের উপর নায়ককে বলিতে পারা যায়। যোগিনীর ন্যায় দূর হইতে আপনি পূর্বে কি ছিল, কেমন ছিল, সম্পর্কশূন্য হইয়া দেখিতেছে। সংসারত্যাগী যেমন দ্বাদশ বৎসরান্তে আপনার জন্মভূমি দেখিতে আসে, রমণী আশা যেন আপনার পূর্ব-জন্মভূমি দেখিতে আসিয়াছে। প্রেম—বন্যার মত, কাটিকার মত, পশুপালের মত,

সূক্তের মত—যে পথ দিয়া চলিয়া যায়, সে পথে জলময় দেশের মত, তবু গৃহের মত, দুর্ভিক্ষের মত, অভ্যাচারের মত একটা না একটা চিহ্ন রাখিয়া যায়। শ্রেম, জন্মে যৌগিক মিশ্রণ নহে, রাসায়নিক মিশ্রণ। জন্মই হইতে—পাণ হইতে প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিলেও জন্মে,—প্রাণে কতকটা না কতকটা প্রেম মিশিয়া থাকিবেই। জন্মকে প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে প্রেমের কতকটা জন্ম প্রাণ থাকিয়া যাইবে! রমণী আজ আপনার আরোপের গর্ভ করিতেছে, বটে; কিন্তু তাহার কথাতে স্মৃতির জালা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

“পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ!

কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জালায়,

আজ্ঞে তোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।

পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর;

সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে।

তোমার শ্রেম হতে প্রাণ বিচ্ছেদ আশায় ভাল বেসেছে।” ইত্যাদি।

শুক পুষ্প ও কতকটা মায়া থাকে। কবে এক দিন তাহার সুগন্ধ ছিল! জানি, তাহা আবর্জনা, মারাত্মক। কিন্তু কে প্রাণ ধরিয়া প্রেমের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে পারিগাছে?

রামবহুর একটা প্রেম-বিজ্ঞান আছে,

“প্রেমকে দিয়ে আশা নীর, করিতেছ ভজন;

দেখো লো—দেন হয় না শেষে রথা আকিকন।

বেড়া দাও সট প্রবৃত্তি-বিন্দুক, প্রেম-অক্ষুরে আঘাত করে এমনি পোড়া লোক,

যদি থাকে ফনের বাসনা, বেশি জল দিই জালিও না,

সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিদ্ধ উপলে।

প্রেম তরুতে সধি চারটি ফল ফলে;

তন নগের নাম—সুখ, মৌখা, মোক্ষ, কাম,

সুজনের সু, কলন কঠিনের কপালে।

গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে;

চিনে মূল যে দিতে পারে জল, বটে তার ভাগ্যেতে প্রেমতরুতে হাতের ফল;

তক মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, বিচ্ছেদ ছাপে বুড়িয়ে যায়,
দেখ দেখ যত্নে রেখ ফল্বে না ফল শুধানে।”

একটা খেদ,—

“কথায় কথায় ক’রে অভিমান
ভিলে ক’রে ব’স তাল,
ও ধনি, না জানি কেমন পুফের কপাল।”

আবার,

“নারী মিলতে যেমন, ভুলতে তেমন,
হু বিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে, চায় না দিগে
আপনি হয় অন্তর।”

আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-তয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। আর,
উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া, কোনও কবির প্রকৃত শক্তি কতটুকু বা কি, ঠিক বুঝা
যায় না। রাম বহু নিজেই বলিয়াছেন,—

“যে ক’রেছে যার সহ পিরীতি ব্যাভার,
সেই সে বুঝেছে, সখি, মরম তাহার।

আমরা আশা করি, বাঙালী সাহিত্যসুরাগী সকলেই “প্রাচীন কবি-
সংগ্রহ” এবং “গীত-সংগ্রহ” পড়িয়াছেন বা পড়িবেন।

অদৃষ্টবাদ ।

ভারতবাসী চিরকাল অদৃষ্টবাদী বলিয়া বিখ্যাত। হিন্দু পুনর্জন্ম
এবং পূর্বজন্ম, বৌদ্ধের কর্মফল—এ সমস্তই অদৃষ্টবাদের ভিত্তির উপর
প্রতিষ্ঠিত। জীবনের দৈনন্দিন সাধারণ কার্যের মধ্যে এবং অসাধারণ
বিশেষ সুখ দুঃখের সময়, আমরা যে অদৃষ্টবাদী তাহার নত নত প্রমাণ,

পাওয়া যায়। অদৃষ্টবাদ আমাদের ধর্ম এবং নীতির মূলে, অদৃষ্টবাদ আমাদের দৈনিক জীবনের মূলে। সম্পদের এবং সুখের সময় আমাদের গর্ভ এবং মাংসর্ঘ্য হইতে আমাদেরকে রক্ষা করে—অদৃষ্টবাদ। সাংসারিক বিপদের ভাঙনাগ, জীবনের পতীর শোকাবকার আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা—অদৃষ্টবাদ। বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদ আমাদের হাড় হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে। এ বিশ্বাস আমাদের মর্জ্জগত।

ইয়ুরোপে অদৃষ্টবাদ এবং স্বাধীনতাবাদ লড়াই বহুশতাব্দী হইতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে; আজিও মীমাংসা হইয়া উঠিল না। তবে, কার্যতঃ স্বাধীনতাবাদের জয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কতিপয় দার্শনিক পণ্ডিত ব্যতীত ইয়ুরোপের সাধারণ লোকমণ্ডলী স্বাধীনতাবাদী। অনেকের বিশ্বাস, ইয়ুরোপের যে আজ এত সুখসমৃদ্ধি ইহার কারণ এই স্বাধীনতাবাদ; আর আমরা যে পরপদানত, জীবনবিহীন এবং দারিদ্র্য-শ্রমীড়িত, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের অদৃষ্টবাদ। অনেক ইয়ুরোপীয়ের নিকট আমরা এই জন্য কৃপার পাত্র।

আমি ভারতবাসী, আমি হিন্দু, আমি অদৃষ্টবাদী। সুতরাং এই সভ্যতার দিনে—এই স্বাধীনতাবাদের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিনে, আমি আমার এই সেকেন্দ্রে বিশ্বাসের কারণ দেখাতে বাধ্য। আমি আজ তাই অদৃষ্টবাদ-সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাত্মা জন্ টুয়াটমিল্ ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া, তাহার নিজের মত কারণবাদের (Necessitarianism) সহিত অদৃষ্টবাদের পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মতে কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ এক নয়। অদৃষ্টবাদীকে তিনি দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। এক দলকে তিনি Pure Fatalists বলিয়াছেন; ইহাদের মত যে, আমাদের কার্য সকল আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, কোনও উচ্চতর শক্তি আমাদের ইচ্ছাকে সর্বদা উণ্টাইয়া দিতেছে। দ্বিতীয় দলের মত, আমাদের কার্য সকল আমাদের চরিত্রের বল, কিন্তু আমাদের কার্যের জন্য আমরা দায়ী নহি। মিল্ তাহার নিজের মত সংক্ষেপে এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমাদের করিত্র নৈতিক বাসনা সকলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, সুতরাং আমরা

ইচ্ছা করিলে, আমাদের চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতে পারি। মিল্ মনো-বিজ্ঞানের তিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, মিজের আত্মার দিক্ হইতে বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে তিন প্রকার মতের বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন, আমরা দর্শনের উচ্চতর তিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, ব্যক্তি ছাড়িয়া জগতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এই মতবিত্তাগ সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহাধিপের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই, এ তিন প্রকার মতের মধ্যেই সত্য আছে, এ তিন প্রকার মতই অদৃষ্টবাদের বিভিন্ন দিক্ মাত্র। দেখাইতে চেষ্টা করিব, আমরা যে দিক্ হইতেই দেখি, দেখিতে পাই যে, মানুষের নথ্যে হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ; দেখিতে পাই যে, আমাদের জন্মের অর্জকুটিত ভাবকণা হইতে প্রলয়ের বিশ্ববিধটন কতাবাহু পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত শক্তিই অখণ্ড নিয়মের দ্বারা চালিত।

প্রথমটি যে অতিশয় গুরুতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রথমটিকে নানা দিক্ হইতে দেখা যায়, এবং বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিলে আমরা বিভিন্নরূপ মীমাংসার উপনীত হই। কেবল বৈজ্ঞানিক দিক্ হইতে দেখিলে আমরা বেরূপ মীমাংসার উপস্থিত হই, দর্শনের চক্ষে দেখিলে আবার আমাদের পূর্ন মীমাংসার অমেক পরিবর্তন হইয়া যায়। আমরা এই দুই প্রকার পথকে বিপরীত বা বিসম্বাদী মনে করি না। দর্শন আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে নষ্ট না করিয়া বরং তাহাকে পূর্ণতা দান করে। যেমন, সাধারণ সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা বস্তুতঃ বেরূপ বৃষ্টি, বিজ্ঞান তাহাকে উল্টাইয়া না দিয়া তাহাকে সংশোধিত করে মাত্র, সেইরূপ দর্শন আবার আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে পরিমোদিত করিয়া তাহার সংস্করণ করে মাত্র। বিজ্ঞান এবং দর্শনের পরস্পরের কার্যক্ষেত্র এবং পরস্পরের সম্বন্ধ ভাল করিয়া না বুঝার কারণেই, এবং কেবল এক দিক্ দিয়া প্রথমটিকে দেখার জন্যই আজও পর্য্যন্ত আধুনিক ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এ প্রথমটি সম্বন্ধে এত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এই একদেশদর্শিতার জন্য ইংলণ্ডের মনোবিজ্ঞানবিৎ এবং অজ্ঞবিজ্ঞানবিৎগণ অদৃষ্টবাদ এবং কারণবাদ স্থাপন করিতে গিয়া, আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। মিল্ (Mill), বেন (Bain), স্পেন্সার (Spencer) প্রভৃতি সকলেই এষ্ট জন

নিয়মের সম্মান রাখিতে গিয়া, কার্যকারণের অথবা নৃশূল দেখিয়া নিয়মের পশ্চাতে নিয়ন্তা দেখিতে পান নাই, কার্যকারণের পশ্চাতে জড়েরই খেলা দেখিয়াছেন। ইহাদের মতে আগ্রা ভাবসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে; জগৎ যাম্যন জৌড়াহুনি ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড়শক্তি এবং জড়ের নিয়মই জগৎকে চালাইতেছে। অপর দিকে আলার অর্থান দার্শনিক কান্ট (Kant) বৈজ্ঞানিক জগতের নিয়মের বাধাবাদি দেখিয়া, পান্থনতা এবং নীতির সমূল নষ্টের ভয়ে, একেবারে এ প্রকান্ত জগৎ ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় রাজ্যে গিয়া আশ্রয় খাণ্ডনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন তাঁহার বিজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে এক পথরাজ্যে লইয়া উপস্থিত করিয়াছে।

আমরা এই দুই বিপরীত মতের কোনটিকে সম্পূর্ণভাবে ঠিক মনে করি না। আমরা অদৃষ্টবাদী হইলেও আশ্রয় অস্তিত্ব স্বীকার করি, নিয়মবাদী হইলেও নিয়মের পশ্চাতে নিয়ন্তা দেখি, প্রকৃতির জৌড়াহুনিতে পুরুষের ক্রিয়া দেখিতে পাই। হিন্দু অদৃষ্টবাদী হইলেও বিশ্বাস করে যে, সে তাহার নিজের কর্মের ফলে আজ ইহজন্মের সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে; সে অদৃষ্টবাদী হইলেও জানে যে, তাহার ভবিষ্যৎ তাহার হস্তে; সে মায়াবাদী হইলেও জানে যে, অদম্যের পশ্চাতে সং আছে, অপরা শক্তির মূলে পরা শক্তি বিদ্যমান। প্রত্যহ আমরা এই দুই বিপরীত মতের নক্ষিহল কোথায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সং অথবা পুরুষ * সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলিয়া, কোন প্রকান্ত জগতের অসং অথবা প্রকৃতির * কার্যের পর্য্যালোচনা করিব। ভাগ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে আমরা এ প্রশ্নটিকে দেখিব; তার পর, সেই বৈজ্ঞানিক মীমাংসাকে দার্শনিক বৃত্তি দ্বারা বিস্তৃত করিয়া লইব। এক্ষণে দেখা যাউক, এই বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিলে আমাদের আবেশের অর্থ কি পাঁড়ায়।

* আমার বোধ হয়, ইংরাজি *nouveau* অর্থে পুরুষ, এবং *phenomena* অর্থে প্রকৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্ততঃ আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

বহির্জগিতে আমাদের জীবন কার্য্যসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইংরাজেরা বাহ্যকে actions বলেন, তাহা যেমন কার্য্য, তাহার বাহ্যকে passions বলেন তাহাও যে সেইরূপ কার্য্য ভাৱকে আর সঙ্গেই নাই। প্রভেদ কেবল ফেঁদে—বাচিরে আর অন্তরে। অন্তরে বাহিরে কার্য্যের পর কার্য্য করিতেছি এই তো জীবন। কিন্তু, কার্য্যের উৎপত্তি কিসে? আত্মাত্মবীণ এবং বাহ্যিক এই দুই শক্তির পরস্পর বাস্তবপ্রতিঘাতেই কার্য্যের উৎপত্তি। আমরা কখনও বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না। বাহ্য জগতের সহিত যতক্ষণ সম্পর্ক ততক্ষণই তো জীবন। যদি কেহ বলেন যে, কবি যখন আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইয়া নগন মূগ্ধিত করিয়া, দীর্ঘ অপরাহ্ম্য গড়িতে থাকেন, প্রেমিক যখন প্রিয়তমের চিন্তায় বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যান, ভগবদ্ভক্ত যোগী যখন যোগমত্ত হইয়া ভগবানের সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের জীবন বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমরা বলি, না, তখনও তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে বাহ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ। কবি তাঁহার অপরাহ্ম্য গড়িবার মালমসলা স্মৃতিসাহায্যে বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করেন, এবং পূর্বে যদি তিনি কখনও বহির্জগতের দ্বারা আক্রান্ত না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার চিন্তা অসম্ভব হইত। প্রেমিক, অবশ্য কোন না কোন সময়ে, তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাকিবেন, অথবা তাঁহাকে চক্ষু ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত যোগীও বাহ্য জগতের উপর নির্ভর করেন তাঁহার আশ্রয়স্থান চিন্তার জন্য। অনন্ত-তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডল দর্শন করিয়াই হউক, অথবা বিবেকের স্নানর মোহনমূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, ঈশ্বর-প্রেমিকের ঈশ্বরচিন্তার মূলে বাহ্য শক্তির গুঢ় সম্মিলন। শরীরবত্ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের আত্মা থাকিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলিলেও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ কার্য্যই দুই বিপরীত শক্তির বাস্তবপ্রতিঘাতে উৎপন্ন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা ইহারই প্রমাণ পাই। মানুষ জন্মিল এক শরীর লইয়া এবং এক বিশেষ মানসিক গঠন লইয়া; এই শারীরিক এবং

মানসিক শক্তির প্রকারভেদে বাহ্যজগতের সহিত বিভিন্ন বিভিন্নরূপে সংস্পর্শ স্থাপিত হইল। ইহা হইতেই হো কার্যের উৎপত্তি। এই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি লইয়াই হো মানুষের জীবন। এখন, আমরা একবার, এই দুই বিভিন্ন শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ পথ্যোপাচার করিয়া দেখিব কিরূপে নিয়মের অধীনে তাহারা কার্য করে।

বাহ্য জগতের শক্তি সম্বন্ধে এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, সেখানে সমস্তই অধ্যাত্ম নিয়মনুশীল আবদ্ধ; কার্যকারণের হস্তে সমস্ত ঘটনাই দৃঢ় সংঘটন। এমন এক সময় ছিল, যখন মানুষ বাহ্য জগতের বিভিন্ন বিভিন্ন কার্যের পশ্চাতে বিভিন্ন শক্তির অবতারণা করিয়া তাহাদের পরিবর্তনশীল এবং অনিয়মিত ইচ্ছা দ্বারা সমস্ত ঘটনা ঘটতেছে এইরূপ মনে করিত। এমন আর সে নিগ্রাস সভ্য সমাজে নাই। এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি পদার্থ সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের উপর যাত প্রতিযাত করিতেছে। জগতের সমস্ত ঘটনাই কার্যাকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

বহিজগতের সম্বন্ধে এ কথা সকলে স্বীকার করিলেও একদল লোক মনে করেন যে অভ্যন্তরগতে মানুষের ইচ্ছা শক্তি এই নিয়মের বহির্ভূত। ইহাদের মতে অভ্যন্তরগতে এ নিয়মের আধিপত্য নাই। তুল। বাচা দেখিয়া আমরা বহিজগতে কার্য কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হই, ঠিক তাহাই অভ্যন্তরগতের মতো দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও এ নিয়মের অব্যাপ্তি নাই। মানুষের ইচ্ছাশক্তি এ নিয়মের অনধীন নহে। আগামীবারে আমরা কার্য-কারণ-সম্বন্ধে কিনিষটা কি তাহা দেখাইয়া ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিশ্বনাথ গিত।

হিন্দু আচার-ব্যবহার ।

(সামাজিক ।)

বহুসংখ্যক মনুষ্য কতকগুলি সাধারণ নিয়মের শাসনে বদ্ধ থাকিলে সেই জনগণের সমষ্টিকে সমাজ এবং তদ্বিপর্যয় পালনকে সামাজিকতা বলা

যায়। ঐ সব নিয়ম রাঙ্-ক্ষমতা-সম্পন্ন নহে, কোনো ব্যবস্থাপক সভাকর্তৃকও প্রায় বিধিবদ্ধ হয় না, সচরাচর উহা পরম্পরাগত প্রথাতেই জন্মে, অথবা ধর্ম-শাস্ত্রের উপদেশে বহুমূল হয়। যে সকল মনুষ্য এইরূপে মিলিত, তাহাদের মূল ধর্ম প্রায় একনিবই হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করিতে পারেন এক বংশোদ্ভব জনগণ লইয়াই একটা সমাজ হয়। কিন্তু সর্বদা ও সর্বদেশে তাহা নহে। তাহার সাক্ষ্য শিখ-সমাজ। নানক ও নানকের শিষ্যগণ যখন শিখ-সমাজ স্থাপন করেন, তখন একজাতি হইতে উপকরণ লাভ হন নাই। বহুজাতির লোককে আপনাদের মতাদ্রান্ত করিয়া সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন। ক্রাইষ্ট এবং মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম-প্রবর্তকেরাও যে বর্ণের, যে দেশের, যে বংশের লোককে লওয়াইতে পারিয়াছেন, তাহাকেই দ্বীপ দ্বীপ সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে ধর্ম-সম্প্রদায় বলা যতদূর সূক্তি-মূলক, সমাজ বলা ততদূর ন্যায্যসঙ্গত হইতে পারে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি বহুজনপদবাসী লোকদিগকে এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক বলা যাইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে ভৌগোলিক ও রাজকীয় অবস্থা ভেদে প্রত্যেক স্থানের লোককে স্বতন্ত্র সমাজ বলা হয় এবং হয়তো তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে অধিক সমাজও অবস্থান করিতেছে। যেমন, ইংলণ্ড-মধ্যে ইংলিস-সমাজ ও স্কটল্যান্ড-সমাজ। যেমন, আমেরিকাতে শ্বেত ও কৃক, দুই পৃথক সমাজ। এ বিষয়ের জ্ঞাতজ্ঞাযমান দৃষ্টান্ত জনা দূরে দৃষ্টি করিবার আবশ্যক নাই, কেন না আমাদের জগৎভূমি ভারতবর্ষ অনেক সমাজের যুগ দেখিতেছেন। পূর্বকালে অসভ্য আদিম অধিবাসীগণকে ধর্মব্যা না করিলে স্বক এক হিন্দু-সমাজই বিশাল ভারতরাজ্যে বসতি করিত। জেতু যবনজাতির অধিকার ও অধিবাস অবধি হিন্দু যবন দুই সমাজ হইল। যবনজাতির অপ্রতিহত পরাক্রম বশতঃ তাহাদের স্বীয় সমাজ ও সামাজিকতা অটুটভাবে বর্জিত হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অপ্রতিহত পরাক্রমের হিংস্র-স্বভাব জন্য তাহারা অধীন জাতির সমাজ, সামাজিকতা ও সামাজিকগণের সঙ্গাবাবলী বিনষ্ট করিতে শত শত বৎসর বিজাতীয় আক্রোশের সহিত আক্রমণ করিয়াছে। সেই আক্রমণের ফল কি হইয়াছে? হিন্দু-সমাজ রাজকীয়-শক্তিতে বর্জিত ও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে নিবীর্ণ।

ও নিশ্চেষ্টবৎ সকল বিষয়েই অবনত ও বশীভূত হইল। ওথাপি ধর্ম্ম পরি-
তাপে সম্মত হইল না। মারিয়া কেল, কাটিয়া কেল, যন্ত্রণা দিয়া বধ কর,
বাড়ী লও, ভূমি লও, ধন লও, ঐশ্বর্য্য লও, কিন্তু জাতি ও ধর্ম্ম লইতে
পারিবে না—এ চুটি কদাচ দিব না—যখন অগ্নির আঘাতে, অগ্নিতে, ফাঁসিতে,
তোপের মুখে শ্মশন যাইবে, এ চুটি সেই সঙ্গেই যাইবে—সহস্র নির্যাতনেও
যখনরাত্ তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না! এইজন্যই চিতোরের তেজীয়ান্
হিন্দুরা যখন দেখিল, যখন-চূর্ণমে দুর্গ-রক্ষা আর সম্ভবে না, তখন ভয়কর
অনলমূপ করিয়া সপরিবারে নগরহস্ত তাহাতে কল্লদানপূর্ব্বক যবনের
অবশ্যাস্তাবী অভ্যাসের অব্যাহতি পাইল! এমন ঘটনা একবার নয়, তারত-
বর্ষে হিন্দুবংশে অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে!

এইরূপ অমূল্য মানসিক সাহসের সহিত হিন্দুরা জাতি ও ধর্ম্ম-রক্ষা
করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ ও সামাজিকতা ধর্ম্ম-মূলক। হুতরাং জাতি ও
ধর্ম্ম-রক্ষা বাহাকে বলে, সমাজ ও সামাজিকতা রক্ষাও তাহাকে বলা যায়।
যবনের অস্ত্র বাইলে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয় ও জাতি যায়, হুতরাং সমাজ ও
সামাজিকতা হারায়! অপরাধের জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-নিয়ম, রাজকীয় নিয়ম ও
সামাজিক নিয়ম পৃথক। এক স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যেই হিন্দুদের রাজা, প্রজা,
গৃহস্থ, বানশ্রম, দাতা, গৃহীতা সকলের ব্যবস্থা এবং পারমার্থিক, সামাজিক ও
রাজকীয় সকল নিয়মই আছে। যবনাধিকারে রাজ্যশাসন কর্তব্যটী হিন্দুর
হস্ত হইতে অন্যের হস্তে গেল। কিন্তু সামাজিকতা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে
অপরাধাতি, অর্থাৎ রাজ-জাতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিল না! হস্তক্ষেপ দূরে
থাকুক, অধিতীয় প্রতাপশালা দিল্লীর কোন সম্রাট কোন হিন্দু প্রজাকে
তাঁহার অভ্যুত্থানপর্য্যন্ত, রাজ্য, ধন, মান পদ-দাত্তী রাজপুত্রীতে এক দিনের
জন্যও নিমন্ত্রণ করিয়া কিছু খাওয়াইবেন তাহার দো ছিল না! তাহা দূরে
থাকুক, কোন যবন কোন হিন্দুকে স্পর্শ করিলে, সে মর্মান করিয়া শুটি না
হইয়া গৃহে যাইতে পারিত না।

কিন্তু কালের পরাক্রম ও অভ্যাসের প্রভাব সর্ব্বপক্ষে বলবৎ। আজ
বাহাকে পাপাস্ত্র অসামূল্য বলিয়া তাহার সঙ্গ-বোঝের আশঙ্কায় ভূমি বৃথ
কিয়াইয়া চলিয়া গেল, যদি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে হয়, তবে তত্তত

তোমার থাকিবে না; যদি কার্যবিপাকে সর্বক্ষণ তাহার সহিত একসমনে বসিতে, আলাপ করিতে, কি ব্যবহার করিতে বাধিত হও, তবে সে ক্রমে তোমার নিকট অসামুখ্য পরিবর্তে অর্ধেক সাধু হইয়া উঠিবে; ব্যাপক কালে তাহার সহিত এত বক্তৃতা হইতে পারে। যে, তুমি সহস্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র হইলেও ক্রমে তাহার দোষগুলি তোমার অজ্ঞাতমারে তোমাকে আশ্রয় করিবে। একজন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বেরূপ সম্ভব, এক জাতির পক্ষেও তাহার ন্যূন নহে। হিন্দুজাতি মুসলমানদের সহিত বহুকাল সংবাস করিতে করিতে তাহাদের প্রতি পূর্বে যে ঘোরতর ঘৃণা করিত, তাহার বহুলাংশে পরিত্যাগ করিল। স্ফুরে রাজা ও রাজপুরুষগণের অমুগ্রহ-ভাজন হইব, অনেকেই এই পদা দেখিতে লাগিল। সেই পদা স্বরূপ বাবনিক ভাষা হিন্দুরা পড়িতে আরম্ভ করিল; মুসলমান আমীর ওমরাহ রাজ-প্রতিনিধিদের দেখা দেখি বহু স্থানের বহু হিন্দু আপনাদের পৈতৃক বেশভূষা ও শিষ্টাচারের প্রণালী প্রভৃতি পরিবর্তিত করিয়া যবনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বেশভূষা ও সম্বোধন অভ্যর্থনাদির রীতিতে কি আইসে যায়? সে সমস্ত কেবল সভ্যতার বাহ্যচিহ্ন বৈতো নয়। কিঞ্চিৎ, আন্তরিক ভাবের পরিবর্তন তির কি বাহ্য পরিবর্তন হইতে পারে? যদিও তখনকার কোনো হিন্দুর মনে খাঁর ধর্মের প্রতি অণুমাত্র অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় নাই, কিন্তু সম্ভবদোষে অথবা সঙ্গ-তণ্ডেই বল, সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে অজানিতরূপে ক্রমে অনেক রূপান্তর ঘটিয়া উঠিল। অনেক হিন্দুরাজা, হিন্দু ছাত্রাণী ও হিন্দুধর্মেরেরা আচার ব্যবহারেও সামাজিক পাণে নবাবী ধরণ ধরিলেন—অনেক অনেক মধ্যবিধ লোককেও সেই সংক্রামক রোগে ধরিল। ধীন দরিদ্র ইত্যর লোকদিগের কথা উল্লেখযোগ্য নহে; সমাজের উর্দ্ধস্তরে যে দোষ এত বস্তায়, নিম্নস্তরে তাহা বদ্বিভিন্ন অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক রীতি নীতির ভাবান্তর তো সহজ কথা, আশ্চর্য্য এই ধর্মবিষয়েও হিন্দুরা কিঞ্চিৎ পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে হিন্দুর বাটীতে কথায় কথায় সত্যপীর, একদিল, গোরচাঁদ, সাজন্য সাহেব, মুকিল আসানের সিন্ধি ও কন্নতা দেওয়া হইবে কেন? যবনেরা

বলপূরক আপনাদের গীর পেকস্বরকে মানাইয়াছে, তাহা নহে। সামান্য হিন্দুরা গীর ও ককিরের বৃক্ষরূপিতে মূর্ত হইয়া এবং ক্রীলোকেরা “ছেলে পুলে নে বর ক’ন্তে হয়, কোন্ দেবতা কোন্ ছলে কবে কার বাড় ভাংবেন” এই ভয়ে তটস্থ হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির দেবতাকেই মাফ করিতে ও পূজা দিতে লাগিল। হিন্দু পণ্ডিতেরা দেখিলেন, এ বিষয়ে সমাজের সাধারণ লোকের এবং আপনাদের ঘরে ব্রাহ্মণীদের এত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, অসং শতরাচার্য্য আসিলেও তাহা আর খণ্ডিত হইবার নহে। কাজে কাজেই তাঁহারা স্রোতে অস্ত ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা এমন পাত্র নহেন, যে, আপনাদের লভ্যাক্রপাতে উপেক্ষা করিয়া কোনো নতন পদ্ধতিকে প্রণিষ্ট হইতে দিবেন? তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সভাপতিরের সিদ্ধিকে শাস্ত্রমূলক দেব-পূজা করিয়া তুলিলেন। সংস্কৃত শ্লোকময়ী একধানি পুস্তিকা প্রস্তুত ও তাহাতে এই উপন্যাস রচিত হইল, যে, বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ দেখিলেন, কনিয়ুগে কেহই কঠোর তপ করিতে সমর্থ নহে, অথচ জীবের পরিভ্রাণ ও আন্ত কামনা গিদ্ধির কোনো উপায় চাই; আর্য্যাবর্ত্ত এখন যবনের অধীন, যবনের মনস্তাট্টির সহিত হিন্দুরা ভক্তি-মাৰ্গে চলিতে পারে এমন উপায় করা আবশ্যিক : এইজন্ত তিনি ককিররূপে দ্বীনবিজ বিমুখশাকে বর্শন দান পূরক উপদেশ দিলেন, “আমি নারায়ণ গীররূপে কলিতে আবির্ভূত হইলাম; পঞ্চমোকামে কাঁচা পাকা সিরিতে আমার পূজা কর।” তদবধি সভাপতির, সভানারায়ণ নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষের কোন কোন ভাগের হিন্দুরা পূর্ক নিয়মের বহির্ভূত আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিল। এমন কি, নিষিদ্ধ আহাৰ্য্য ও পানীয় উপভোগেও সঙ্কুচিত হইল না। যে সকল স্থানে মুসলমানেরা অত্যন্ত নির্দয়-চরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় অধিকাংশ প্রধান লোককে বধ করিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব দ্বারা বধাকার সমাজ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের বাস যেখানে বহুতলে বেশী, যেখানকার প্রধানবর্গের সহিত যবননৃপতিগণের সমধিক আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই স্থানেই এবং প্রকার দশা ঘটিয়া উঠিয়াছে। অব্যাপি তত্ত্ব স্থানের হিন্দু অধিবাসীদিগকে অর্ধেক হিন্দু অর্ধেক মুসলমান বলিয়া বোধ হয়।

কণতঃ ঘটনার বৈচিত্র্য, উপজীবের বৈচিত্র্য, ক্রমাগত হৃদ্যন্ত এতাদৃশপত্রের অধীনতা ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজের পূর্ব গৌরব, পূর্ব অবস্থা, পূর্বকার ঐক্যভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজ উপদ্বীপের বহুশত বর্ষ ধরিয়া যে সব বাহ্য আক্রমণ সহ্য করিয়াছে, ইহাতে যে এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই অত্যন্তাশ্চর্য্য। অল্প সমাজ হইলে কখনই জেতাজাতির সমাজে লীন না হইয়া থাকিতে পারিত না। আর্থাবর্তের অসীম বুদ্ধিশালী ঋষি প্রণীত সমাজ বলিষ্ঠ আত্মা আমরা তাহার মুখাবলোকন করিতে পারিতেছি ! এমন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, তাহাদের সমাজও বাহ্য আক্রমণে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজদিগের পূর্ব পুরুষ ম্যাক্সন সমাজকেও তাহাদের জেতাজাতি গ্রাস করিয়াছিল। ভূমণ্ডলে হিন্দু তিন্ন অল্প কোনো জাতি এ বিষয়ে অধিক স্পর্ধা করিতে পারে না। কেবল হুংঘের শিবর আমাদের সমাজের অবয়ব আছে বটে, কিন্তু বোহরতর বৈরপীড়নে চূর্ণাশ্ম ও বিকলেঙ্গিয় হইয়া রহিয়াছে ! রাজনৈতিক বিষয়ে যে হিন্দুজাতি সভ্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, সে বিষয়ে সে হিন্দুজাতির জাতি পদতো অনেক দিন রহিত হইয়া গিয়াছে ; অধিকন্তু ইহার সামাজিকতাও মিশ্রতা বাপন ও ক্রমে নানা বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে !

সেই অবস্থাকে আমরা বিপদের অবস্থা বলি, যে অবস্থাতে নিম্নলিখিত কয়েকটা প্রধান দোষ সমাজ মধ্যে সঞ্চারিত হয় :—

প্রথম। সমাজমধ্যে হঠাৎ কোন নূতন আচারব্যবহারের প্রবল জোরে তাহার পূর্বতন আচারব্যবহারগুলি একে একে হুইয়া বাইতে আরম্ভ হইলে, লোকে বিভ্রান্তের ভ্রায় দাহার বাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে আরম্ভ করে ইহা বড় কঠিন অবস্থা—ইহার অপর নাম খেচ্ছাচার। এই খেচ্ছাচার যে সমাজে প্রবল হয়, সে সমাজের শুভ-বন্ধন শিথিল লইয়া মহানিষ্টের উৎপত্তি হইতে থাকে। হিন্দু সমাজে মঙ্গলমানদের সময়ই খেচ্ছাচার প্রথম পদার্পণ করে, কিন্তু বিশেষ রূপে অথবা তরানক আকারে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কোনো কোনো স্থলে তাহার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষিত হইত এই পর্য্যন্ত। তাহাও অনাক্রম্য বেশী নয়, কেবল কোনো

কোনো স্থানের বড় লোকের বয়েই যাহা কিছু আদর পাইয়াছিল। বিশিষ্ট হেতুতে সেই সব বড় বরের নাম করা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংসারেই তাহার প্রচলন সংবাদ শুনা যায়। বঙ্গদেশে তৎকালে প্রভুত্বের প্রাবল্য হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় সামাজিকগণ তাহাকে দূরে রাখিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এখন কিছু সেই দূরত্ব তাহার প্রতিশোধ লইতেছে।

দ্বিতীয় দোষ স্বার্থ। স্বাধীন অস্থায় স্বদেশানুরাগ ধর্ম্মটী লোকের পরমারাধ্য থাকে। আপনার পরিবার প্রতিপালন ও ধনবৃত্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা এক দিকে, রাজ্যের শুভাশুভ, প্রতিবাদীর মঙ্গলামঙ্গল ও সমাজের উন্নতি অবনতির তত্ত্বাবধান অন্য দিকে। অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্য, প্রতিভা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের এইরূপ যত্ন বাতীত দেশের কোনো প্রকার উন্নয়নতা থাকিতে পারে না। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহুকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়া অনেক জাতি সে সদ্‌ভবে বঞ্চিত হইয়াছে। হর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজ সেই সাধারণ দৃষ্টান্ত শৃঙ্খলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে জাতি এত নিঃস্বার্থ ও সমাজ-হিত-পরায়ণ ছিল যে, তাহার শাস্ত্রকারেরা নিঃস্বার্থপরতার এমনই বিধান করিয়া গিয়াছিলেন যে,

ত্যাগেবৈকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।

গ্রামং জনপদস্যার্থে আশ্রমার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

যে জাতির ভোগভোগী কবিরা জনশূন্য তপোবনে বাস করিয়াও সমুদ্র সংসারস্থে নিজে জলাঞ্জলি দিয়াও সমাজের হিতের জন্তই কেবল রাজসভা ও সামাজিকগণের ভবনে অগ্নিমন পূর্বক রাজা প্রজা সকলের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল কিসে সাধিত হইতে পারে, ইহার উপদেশ দিতেন, ধ্যান-ধারণা যোগতত্ত্বের মধ্যে তাহাও অনবরত চিন্তা করিতেন, এবং সমস্ত হিন্দু সমাজকে পরম নিঃস্বার্থ কহিয়া হুলিয়াছিলেন; স্বার্থের দিকে হিন্দুজাতির এতই অল্প দৃষ্টি ছিল যে, জিৎসংসা বৃত্তির সাক্ষাৎ শিবাক্রপী, শত্রুমাত্রব্যবসায়ী হিন্দু অত্রিয় যোদ্ধাও বৃদ্ধকালে শত্রুকে কর-কবলে পাইলেও অন্যায় যুদ্ধে তাহাকে বধ বা পরাস্ত করিত না; বলিতে ছদ্ময় বিদীর্ণ হয়, সেই-হিন্দুজাতি আজ স্বার্থের ক্রীতদাস—স্বার্থের নরক-কীট! রাজ্যের চিন্তা করিতে হয় না

বলিয়া কেহ আর আপনার ধনমানের বিষয় ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তাই করে না—কেহ কাহারো অন্য ভাবে না—সমাজের জন্য, ধর্মের জন্য কোনো চিন্তাই করে না, তজ্জন্য স্বার্থ ত্যাগ তো নাহল। কথা! যখন-নিম্পাভনে আমাদের যত হীনতা হইয়াছে, তহার নায় কোনোটিই বিশেষ মন্দকারী নয়! যে দিন এ ভাবের পরিবর্তন হইয়া পুনর্বার নিঃস্বার্থ সামাজিকতার সঞ্চার হইবে, সেই দিন জানিব, ভারতের দৌভাগ্যমুখ্য আবার নব-অরুণ-বেশে তরুণ কিরণ দিতে আসিয়াছেন।

তৃতীয় ধোম, প্রকৃতীয় ভাষার প্রতি বিভাগ ও পরকণ ভাষাতে অথবা অনুরাগ। তবে যে সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রচলন বহিত হইয়া ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি ও ব্যুৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নির্বাক্তি করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যে দিন তাহা হইয়াছে, সেই দিনাবধি ভারতের ভূমিনের স্মরণ্য, মল্লহ নাই। এক সংস্কৃত ভাষা সমুদয় বিভাগের মাতৃভাষা থাকিতে নিখিল ভারতবাসী মল্লহে যেন এক মাতৃগর্ভে জন্মিত ছিল। সংস্কৃতভাষা বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষা হওয়াতে সম্পর্ক একটু দূরবর্তী হইল—এক মাতৃগর্ভে সন্তান না হইয়া পরস্পরে যেন এক মাতৃমহীর পৌত্রিত্ব হইয়া উঠিল! শুণ্ডায় সহোদর ভাই আর মাসবুতো ভাইতে যে প্রভেদ, তাহাই ঘটিল! তাহাতেও বহু একটা হানি ছিল না, প্রত্যেকের সেই মাতৃভাষা যদি সাধারণ জননী সংস্কৃত ভাষার অতুলনৈবর্ঘ্যের অংশ পাইয়া স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারিত, তবে কয় ভগ্নী মিলিয়া জুলিয়া একটি সুখের সংসার চালাইতে এবং তত্ত্ব-সম্ভানগণের সমষ্টিতে এক বিপুল বিক্রমশালী মহাসমাজ নাম পাইতে সমর্থ হইত। কিন্তু ভাগ্য আর এক প্রকার ব্যবস্থা করিল! পরাধীনতা রক্ষণীয় ভাঙনায় ভগ্নী কয়টির অস্থিচর্যাবশেষ হইয়া শুকাইয়া গেল। তৎপরিবর্তে বিভাজন লোকের রাজ্যাদিকারের সহিত পারসীক ভাষা তাহাদের সাম্রাজ্যের এক সীমা হইতে সীমাস্তর পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসিল। সংস্কৃত অধ্যাপকের আদর অপ্রকাশ্য, এবং পারসী ও আরবী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তির সম্মান প্রকাশ্য হইয়া উঠিল। তথাপি অর্থা-হিংস্রতার ধর্ম-দুহুয়া ও ভাণাসুহৃদগকে ধনা যে, যে বিদ্যার অর্থ, ধন্য, মান, রাজপদ ও বৈবয়িক উন্নতি অতি অল্প, সেই

সংস্কৃত বিদ্যার চর্চাও তাঁহারা এককালে পরিত্যাগ করেন নাই! ব্রাহ্মণেরা বহু কষ্ট পাইয়াও অশ্রুতিহত শাস্ত্রানুরাগে উত্তেজিত ছিলেন বলিয়াই আত্মও আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, ধর্মনীতি প্রভৃতির মুখ দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর দেব-দেবী-শাস্ত্র-দেবী এবং দেবালয়-ঈশ্বর-কাল যবনেরা তত্তাবৎ নির্মূল করিবার জন্য নৃশংস যত্নের কি কিছুমাত্র জ্ঞাতি করিয়াছিল? সেই উৎপীড়নে কত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন যে এককালে মর্ত্যলোক হইতে অনূশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মহা শোকে মগ্ন হইতে হয়। সেই সঙ্গে যে আমাদের ব্যাস, বাস্করিক, ভবভূতি, কাশিধামকে হারাই নাই। ইহাই যারপর নাই মোহাশয়! কিন্তু রাজ্য নৈবেদ্যিক। রাজ-সরকারে সংস্কৃতির আদর নাই—তাঁহার আলোচনার আর পেট ভরে না; দেখিয়া শুনিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ অর্থকরী রাজ ভাষার আরাধনায় বাপৃত হইলেন। ভারতের জ্ঞান ও ধর্ম লোপ পাইতে আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে ভারতের ঘোর দুর্দিনের সূত্রপাত হইল।

[ক্রমশঃ ।

ঈশানোমোহন বসু ।

হেমচন্দ্র ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

অনেকক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ, নক্ষত্র, নীলিমা সকল স্তরে স্তরে অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। গৃহে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ জলিয়াছে, গৃহে গৃহে সান্ধ্যকৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। সেই সন্ধ্যার আঁধার ছায়ায় হেমচন্দ্রের মাতার মৃত্যুবিবর্ণীকৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। বাতাস দেখিতে আসিয়াছিলেন, একে একে চলিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণও কার্যান্তরে সিদ্ধাছেন, হেমচন্দ্র একাকী সেই মতের পাবে বসিয়া চক্ষের জলে

ভাসিতেছেন। অদূরে ছিন্ন নগিনীর ন্যায় খুলায় পড়িয়া বালিকা মনোরমা হাহাকার করিতেছে। বিবাহ কাঁদিতেছে, কখনও বালিকাকে শাস্ত করিবার চেষ্টা পাঠিতেছে, আবার চক্ষের জলে নূর ভাসিয়া বাইতেছে। এইরূপে অর্ধবটাকাল কাটিয়া গেল। রামকৃষ্ণ কিরিয়া আসিলেন। হেম বলিল—“কি করিয়া আসিলে?”

রামকৃষ্ণ মুখ বন্ধ করিল; বলিল—“কেহই গৃহের বাহির হইতে চাহে না।”

হেমচন্দ্র কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—“উপায়!”

রামকৃষ্ণ নিরুত্তরে রহিলেন। হেম বলিল—“আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি; তুমি বস, আমি ঘাই।”

রামকৃষ্ণ সেখানে বসিয়া রহিলেন; হেম লোক ডাকিতে চলিলেন।

দ্বারে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বার খুলিয়া দিল না, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না। হেম কাঁদিতে কাঁদিতে আরও অগ্রসর হইলেন; নিকটে একটি গৃহে তাঁহার এক বন্ধুর গর শুনিতে পাইলেন, আগাসে বুকখানা শতহস্ত ফুলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি দ্বারে গিয়া বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কেহই সে ডাকের উত্তর দিল না। হেমচন্দ্র আর সে গর শুনিতে পাইল না, দ্বারে দুই একবার আঘাত করিল, এক বৃদ্ধা প্রদীপ হস্তে বাতিরে আসিল, হেমকে দেখিয়া বলিল—“কে হেম; ব'সো বাবা, ব'সো।”

হেম বলিল—“বসিব না, আপনার পুত্র কোথায়?”

বৃদ্ধা বলিল—“আহা, বাবা, সে কি বাড়ী আছে! সেই যে কাল কোথায় গিয়াছে আজও আসে নাই, আর ভাবিতেও পারি না, আমি অভাগী মরিব না। ভাগ্যধরী যে, সে এই সোণার চাঁদ ছেলে রেখে চলে গেল।”

বৃদ্ধা এইখানে হেমের মাতার মৃত্যু যে কত স্নানার বিষয় তাহা বলিতে আরম্ভ করিল। এবং নিজের সেরূপ মৃত্যু হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনেকস্থঃ প্রকাশ করিল; সেই দীপালোকে তাহার নয়নকোণে দুই বিন্দু অশ্রুও দেখা গিয়াছিল। অন্য সময় হইলে এ সকল কথা হেমের ক্রম

লাগিত জানি না, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বড় ভাল লাগিল না ।
হেম বলিল—“আপনার পুত্র কি গৃহে নাই ?”

বুকা বলিল—“না বাবা, তা হ'লে তোমাকে—” তাহার কথাই বাধা দিয়া
হেম বলিল—“আমি আসিবার সময় গৃহে যেন তাঁহার আওয়াজ শুনিয়াছি ।”

বুকা স্বমত খাইল ; বলিল—“সে বুঝি বৌমার ভাই ।”

বুকার কথা শুনিয়া সে দারুণ দুঃখেও হেমের হাসি আসিল, আর
বিক্রমিক না করিয়া ঘুয়ায় হেম সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন ।

কতদূর গিয়া হেম তাঁহার বাসগৃহ মতিলালের গৃহ দেখিতে পাইলেন ।
গৃহে যাইবেন কি না অনেক ভাবিলেন, অনেক ইতস্ততঃ করিলেন । ঘৃণা,
দুঃখ বা অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন । হেম বহুগৃহে
গমন করিলেন । মতিলাল সাদরে হেমকে আলিঙ্গন করিলেন, হেমের
দুঃখে তাঁহার যে ঘৎপরোনাস্তি দুঃখ হইয়াছে তাহাও বিশেষ করিয়া
জানাইলেন । হেমের ভয় ছাড়য় অনেকটা আশ্বস্ত হইল । এতক্ষণ
কেহই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই ; মতিলাল এখন হাত ধরিয়া কাঁদিতেছেন,
হেম অনেক আশ্বস্ত হইলেন । কিন্তু আর অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে
অসুচিত ; জেনেই রাত্রি বাড়িতেছে, কাণবিলম্ব অসহ্য । হেম কাঁদিয়া
বহুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । মতিলাল এইখানে বড়ই দুঃখ প্রকাশ
করিল, বহুর এমন বিপদে সে যে কোনও উপকার করিতে পারিল না, এ
দুঃখ রাখিবার স্থান নাই । মতিলালের স্ত্রী আজ আট মাস অন্তঃসত্ত্বা !
হেমের মাথা ঘূঁতে লাগিল ; তাহার আশা ছুরাইল, মতিলালের নিকট
হইতে এ উত্তর পাইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই । হেমের আর
কথা কহিবার শক্তি রহিল না, অবাস্থুখে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান
করিলেন ।

হেম আর কোথাও না গিয়া বরাবর গৃহে আসিলেন । সম্মুখে সেই
শোকের দৃশ্য—মাতার বৃত্তবেহ ভূপতিত রহিয়াছে । এখনও সংকার
হইল না, উপরূক্ত সন্তান জীবিত থাকিতে তাঁহার অন্তি গম্বায় পড়িল না ।
মহাদুঃখে হেম ‘মা’ বলিয়া উঠিলেই চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল । ‘ভাতার
রোগন শুনিয়া বালিকা আরও হাহাকার করিয়া উঠিল । বিরাজ তাহা-

দিগকে সাস্তুনা করিতে লাগিলেন। বিরাজ হেমকে বলিল—“কাঁদিও না, কাঁদিয়া কি চইবে ? চূপ কর, আমি লোক আনিতেছি।”

হেম বিরাজের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল ; বলিল—“আমি বিকল হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এ রাত্রে কোথায় ঘাইবে ?”

বিরাজ বলিল—“ভাবিও না, এখনই আমিভেছি।”

তৎক্ষণাৎ বিরাজ সেই ভট্টাচার্য্যের গৃহে গেল, তাঁহার পায় জড়াইয়া কাঁদিয়া সমস্ত জানাইল। ভট্টাচার্য্যের অস্ত্র কোনও তণ থাক বা না থাক, শরীরে বিলম্বন দয়া ছিল। তাঁহার দয়া হইল। গৃহে অনেক তলি ছাত্র প্রত্যহ পাঠ অভ্যাস করিত। ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“আমি ইহাদিগকেই বলিতেছি, কিছু টাকার যোগাড় আছে তো ? উহার কিছু কিছু না পাইলে যে খাব এমন তো বোধ হয় না।”

ভট্টাচার্য্য যে এ কথা বলিবেন বিরাজ তাহা জানিত, সেই জন্য তাহার কিছু যোগাড়ও করিয়া আসিয়াছিল। অকল হইতে বুলিয়া এক গাছি বালা বৃদ্ধের পায়ে রাখিল। ব্রাহ্মণ অন্তরে বড় লুট হইলেন ; তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগকে আবেশ করিলেন। কিন্তু বালার ভাগ তাহাদিগকে কখনও দিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। রূপচাঁদ স্বর্ণকার বলে যে, তাহার দুই দিন পরে একগাছি বালা ভাঙ্গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্রাহ্মণীর তাণা গড়িয়া দিয়াছে। সে বাহাই হউক, দুই দিন যে আর পাঠ বলিতে হইবে না, নিশ্চিতে ফলার করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে পারিবে ইহাই ছাত্রদিগের পরম লাভ। আজ্যমাত্র সকলে মহা আছন্দ্রাৎ পুৰি ওটাইয়া বিরাজের পুস্তক পড়িতে চলিল। ব্রহ্মত্মমধ্যে সকলে মিলিয়া শব্দ শুনিয়া ‘হরিবোল’ দিয়া গঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। অস্ত্রপূর্ব-লোচনে হেম ঘাইতে ঘাইতে ভাবিল; বিরাজ কি মানবী !

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

প্রভাত হইয়াছে। কাল যেমন সূর্য্য উঠিয়াছিল আজও তেমনি সূর্য্য উঠিয়াছে, পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও তেমনি বায়ু বহিবেছে, গাছ

নড়িতেছে, পাখী গায়িতেছে, জল চলিতেছে, সংসারের নরনারীগণ আপন আপন কার্যে নিমগ্ন রহিতেছে । যেন কোথাও কিছুই হয় নাই, যেন কোথাও কোনও নূতন ঘটনা ঘটে নাই, প্রভাত কালও যেমন আসিয়াছিল, আজও তেমনি আসিয়াছে । কিন্তু মনোরমার মিকট আজ আর সে পুরাতন প্রভাব নাই, এ জীবনে সে কখন এমন সময় আর দেখে নাই ; রাত্রি গিয়া যে কখন ভোর হইয়াছে তাহা পর্য্যন্ত বালিকার জ্ঞান নাই—বোর অন্ধকারে নিমগ্ন । তাহার চক্ষে সকলই যেন আধারমাণি—সূর্য্য। যেন আধারে ডুবিয়া গিয়াছে, বিখ ছায়ার আকারে পড়িয়া রহিয়াছে ; আন্ধ আর যেন বায়ু বহে না, পাখী গায় না, জল চলে না,—প্রকৃতি জন্তিত ; আর সেই তন্ত্রিত প্রকৃতি মধ্যে সেই শূন্য পৃথিবী লক্ষ্য শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে ;—“মা মা, কোথায় তুমি” বালিকা উগ্রাধিনীর ন্যায় চীৎকার ছাড়ি তে লাগিল । পূর্ব্বদিন কঠোর একদিন গিয়াছে, এক বিপুল জল পর্য্যন্ত পেটে পড়ে নাই—সে বিষয়ে লক্ষ্য মাত্র নাই ; বিরাজ অবিরল চক্ষের জলে ভাসিতেছে ও মনোরমাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা দেখিতেছে । রোদন-শব্দ শুনিয়া প্রাতে পাড়ার ইনি উনি তিনি করিয়া অনেকে আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছেন—বাহার যেমন ক্ষমতা সকলে আপন আপন সহায়হুতি প্রকাশ করিতেছেন, কেহ স্বর্ণীয়া বৃত্তার গুল কীর্তন করিতেছে, কেহ তাহা তনিতে তনিতে আপনাই ছল ছল চক্ষুদ্বারা মার্জনা করিতেছে ; কেহ, তিনি যে হেমকে রাখিয়া হেমের মা হইয়া গিয়াছেন, এতদ্বা বড় মৌভাগ্যবতী বলিয়া প্রশংসাবান করিতেছে, কেহ বা তাহা শুনিয়া তাঁহার নিম্নের দীর্ঘজীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন । মনোরমার এ সকল কিছুতেই মন ছিল না, দ্বালায় পড়িয়া কেবল ‘মা মা’ বলিয়া চীৎকার করিতেছিল । সেই চীৎকার শেষে—সেই রোদনধ্বনির মধ্যে একজন নবীনা তাহার পদাঙ্গুলের পা টিপিয়া বলিল—“আঃ ছুঁড়ি যেন চিল চেঁচাইতেছে, মা যেন কারও আর মরে না।” পদাঙ্গুলও সেইরূপ জনান্তিকে বলিলেন—“সত্য বলেছি, মাথা ধরিয়ে দিলে ; চল্ তাই, বাড়ী যাই।” কোনও প্রবীণা আসিবারকালে তলের কৌটা আনিতে তুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং মনোরমার দুঃখে সহায়হুতি করা আর তাঁর সাধিল না, প্রত্যগমনের উদ্যোগ দেখিতে

লাগিলেন । নদীর মা কোলের ছেলে ফেলিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাহার মনটাও বড় উচাটন হইয়া উঠিল । মনোরমার একটা পোষা বিড়াল ছিল, সে মনোরমাকে কাদিতে দেখিয়া তাহার কাছে চূপ করিয়া বসিয়াছিল ; নিস্তারিণীর খোঁকা সেই বিড়াল লইবার জন্য বড়ই আবদার করিল, কানেই নিস্তারিণী কান্না ফেলিয়া ছেলে শাস্ত করিতে মন দিল । বগল চাকর মার কাছে অনেক দিন হইতে দুই আনা পাইত, হঠাৎ সে কথা মনে হওয়ায় নাম হস্তে চাকর জল মুছিতে মুছিতে দক্ষিণ হস্তে চাকর মার পা ঠেলিয়া হাত পাতিয়া পয়সা করটি চাহিল । বলা বাহুল্য, চাকর মা সে কথাও দৃকপাত না করিয়া পূর্নাপেক্ষা অধিকতর রোদন আরম্ভ করিল । ক্রমে বেলা হইয়া পড়িল । মনোরমার রোদন থামিল না, পাড়ার সকলে এক এক করিয়া সরিতে লাগিলেন ।

সকলে চলিয়া গেলে, বিরাজ কাদিতে কাদিতে বলিল—“দিদি, উঠ, মুখে একটু জল দাও ।”

মনোরমা কথা কহিল না ; পূর্ব্বে উঠে রোদন করিতে লাগিল । হঠাৎ তাহার কি মনে পড়িল, ঘরে ঘরে চক্ মুছিয়া বাষ্পনিকৃত কর্তে বলিল—“দিদি, তুমি যে মারা পড়িলে, কাল একবেশী গিয়াছে, ষাণ্ড, একটু কিছু খাওগে ।”

বিরাজ কথা কহিতে পারিল না । নীরবে মনোরমার মুখের পানে চাহিল । বালিকা সেই শুক নীর্ণ উদাস মুখখানি তুলিয়া কাতর নয়নে বিরাজের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—সে নয়নে জল উছলিয়া পড়িতেছে—পর-পুংখকাতরের ছন্দর কাদিয়া উঠিল । বিরাজ কথা কহিতে পারিল না । নিঃশব্দে কোটাং করিয়া চাকর জল গড়াইয়া পড়িল । বিরাজ কাদিল ।

মনোরমা বলিল—“দিদি, আর জন্মে তুমি আমাদের কে ছিলে তাই ?”

গদগদবরে বিরাজ বলিল—“কেন, মনোরমা ?”

“আমরা বড় গরিব, আমাদের দিকে কেহ ফিরিয়া দেখে না ; কি কতামার এত কষ্ট কেন ?” মনোরমা বসনাগ্রভাণে আপনার চক্ষুদ্বয় মার্জনা করিল ।

বিরাজ কোন উত্তর দিল না । এ কথা উত্তর সে ব্যথিতের ভাষায় ছিল

না। মনোরমা কহিল—“সেই কাল সকালে নীচে আসিয়াছ, আর উপরে উঠ নাই, একবার যাও, তোমার মা যে তোমায় বকিবেন।”

বিরাজ বলিল—“আমি তোরে একবার উপরে দিয়াছিলাম, কেহ আমাকে একটা কথাও বলে নাই; আমি উপরে যাইব না।”

“হিঃ অমন কথা বলিও না; আমরা তোমার কে? আমাদের জন্য কেন মা বোনের বিরাগভাজন হইবে।”

সে কথায় বিরাজের বড়ই হঃখ হইল, বলিল—“মনোরমা, তুই কি আম'য় ভালবাসিস্ নে?” পর বাস্তবিকত হইয়া আসিল। মনোরমা আশ্চর্য হইল। দেখিল, তাহার সেই বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দুটি জলে পুরিয়া আসিয়াছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত ।

জীবনীনা-পথে প্রান্ত

কে ওই শায়িত পাহ

অলসে নয়ন দুটি পড়িয়াছে চুলে।

ঐক্যতি নিস্তক মত

বুকে যেন ব্যথা কত,

কাজবী কুলেতে মুটি কাঁদে চুলে চুলে।

আশার অক্ষুট কলি,

ক্ষুটিত কমল ঝলি,

শোভিবে কি আর ওই জীবন মৃণালে?

চিত্তার অক্ষুর চয়

ফল পুষ্পে শোভায়

হবে কি কখন আর কোনো ধরাতলে?

অথবা, ইহাই তোমার শেষ
মানব-জনমোদ্দেশ
এক মুষ্টি ভাষ্যশেষ স্বরধূনী-তীরে !
প্রেমসিদ্ধ হৃদি ধানি
অমিয়া-সিদ্ধিও বাকী,
সমুজ্জ্বল জ্ঞানমণি—
সকলই বৃথা রে !

হায় ! কে কবে কি অবশেষ !
আঁধার ভবিষ্যৎ-দেশ,
রক্ত তার দারদেশ চলেনা দর্শন !
কালের বিভ্রাম ভূমে
নিদ্রিত অনন্ত বুমে,
কি জানি অক্ষর আজি দেখে কি স্বপন !
কে বলে অক্ষর কয় ?
(জীবন-বিশ্বের নয় !)
সাহিত্য-পগনে চির উজ্জ্বল দিনেশ ।
মহাকবি বিধপাতা,
কে বুঝিবে তব গাথা
এ নাট্য সমাপ্তি কোথা নর-ভাগ্য-শেষ !
শ্রীমতী গিরোজমোহিনী দাসী ।

নিশীথ-জ্যোৎস্না ।

"What more felicity can fall to creature

"Than to enjoy delight with liberty."

নিশীথের জ্যোৎস্নার মুষ্টি কি সুন্দর !—ভাব কি প্রগাঢ় !—কবিতা
কি সুধুর !—কি নীরব ! নিশীথের বিখণ্ডপ্রসারিত ঘন বিচিত্র 'জ্যোৎস্নার

মধ্যে কবিতার মধুরহাসিনী জীরন্তমুর্জি দেখিতে পাই। মৌন্দর্য্যের এত ছড়াছড়ি আর কখন দেখি নাই। জগতের কোন সাহিত্যে এ অপূর্ণ চিনিম নাই। ইহা প্রকৃতির। ইহা একখানি জীবন্ত কাব্য। যতই পড় না কেন, ইহাও শেষ নাই। ইহা অনন্ত। মরি মরি কি প্রাণশ্লথী জীরব ললিত গান! এমন গান কে শোনাতে পারে? আর এ গান বুঝিবার কাণ ক'জনের আছে? এ শাস্ত্র গানের লয় শুনিয়া পর্কিত স্তম্ভিত।—বৃকলভাবি পুলকে শিহরিত!—অনন্ত সিদ্ধ ব্রহ্ম-উদ্বেলিত!—নিশীথ জ্যোৎস্না প্রকৃতির স্রগের আগরথ। মরি কি সুন্দর!—নিশীথের অনাবৃত কোলে শয়ন করিয়া, গুম্বস্ত প্রকৃতি তাঁদের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জ্যোৎস্না-ভাসি হাসিয়াছে! জ্যোৎস্না প্রকৃতির হাসি। এত হাসি তাহার কাচাকে দেখিয়া?

আজ নিশীথ-জ্যোৎস্না, আমার আত্ম-বিশোপকারী এট মৃদুময়ী নিশীথ-জ্যোৎস্না, অনন্ত অচেতন জগৎকে জগতের শয্যার রাধিয়া, স্বয়ং আগত। এ ধনকার ভাব বড় প্রাণ-ঢালা। অনন্ত পৃথিবী, নিশীথ-জ্যোৎস্নার অনন্ত হৃদয় শাস্তিময় কোলে নিদ্রিত; আর জ্বলন-যোহিনী নিশীথ জ্যোৎস্না সেই অনন্ত গুম্বস্ত পৃথিবীর শ্বকোমল মুখের প্রতি মেহময়ী মার মতন কেমন অনিবেদন নয়নে চাহিয়া আছে! নিদ্রিত সন্তানকে কি মা চোকের আড়াল করিতে পারে! এই অনির্কটনীর নিশীথ-জ্যোৎস্না-জগৎ জগদাছাড়ীত আত্মার এক অপূর্ণ সাক্ষ্য। এখন বোধ হইতেছে, অনন্ত প্রকৃতিশক্তি যেন চকু চাহিয়াছেন।

এট নিশীথ-জ্যোৎস্নায় হৃদয় জগতের প্রাণের কথা, স্রগের আকার পরিধা হারকা-গচিত ঐ নীল শূন্য-লগ্ন দিয়া অনন্ত রূপ-মাগরের মাহবকে দেখিতে যাইতেছে। কল্পনার রাজত্বের সময় এই। কল্পনার এ মায়া-রাজ্যে প্রবেশ করিলে পৃথিবীর মারামর হৃদয়ের ভাপা ঘরে বাটতে সন আর চাহিবে না। আজ কত কথা—কত অপরিচিত জগতের স্বপ্ন জ্বলনের কথা পরিচিত হইতেছে। যে কথা, কখন সচেতন অবস্থায় জগতের মধ্যে আসিত কি না সন্দেহ, তাহাও আজ এট অপূর্ণ মৌন্দর্য্য মহামেলার পূর্ণিমা নিশীথে বঙ্গাকারে তুটিয়া উঠিতেছে। মৌন্দর্য্য রুদ্ধ-স্বপ্নরূপে চাবি। প্রকৃতির কাছে কিছুই সজ্ঞাত থাকিতে পারে না। আজ আমার নিশীথ-

জ্যোৎস্নার গান শুনিয়া, জ্বলন্ত বৃক্ষের শাখায় কত নব চিত্রাঙ্কন স্মৃতিতে এক একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে । জ্যোৎস্না-রূপসী আত্ম আমাকে একরূপ আকুল না করিলে, বোধ হয় যে, এ পুণ্যতন বৃক্ষে আর কেহ নতুন ফল ফুটিতে পারিত না । আর কেন জ্যোৎস্না, আর তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া কেন দাঁড়াও ! আর কি দেনে ? কি আছে ? স্তবের বঁশী ত অনেক দিন নীরব হইয়া গিয়াছে ! কি গারিন ? কি ভাবিব ? এ নবীন গৃহ আমার কুমিট ত ভাঙিয়াছে, জ্যোৎস্না ! ভায় ! এ জগতের সবট কি নিশীথ-স্বপ্ন !

মনে পড়িতেছে,—কলে একদিন ঠিক এইরূপ অনন্ত জ্যোৎস্নার কপের সাগরে ডুবিয়া, পৃথিবীর গাছপালায় মধ্য দিয়া কোথা একখানি পোড়ো বাড়ীর ছাদের উপর স্তবের আবেশময়ী একটি হাসি দেখিয়াছিলাম । সে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোর হাসির অন্তঃপুর স্তব্ধ দেখিতে পাইয়াছিলাম । বোধ হইল, সে হাসি আমার কত পরিচিত ! যেন আমারই নয়ন-কিরণে হাসি ফুটিয়াছে ! দেখিলাম, সেই হাসির মধ্যোই আমার পূর্ন কন্য-কাহিনী লেখা রহিয়াছে ! কি করিয়া বলিব সে কাহিনী কি ? সে কাহিনীমালার ফুল ত আমার এ ভাবার বাগানে নাই । তাহা এ জগতের নয় । অথবা সেই কাহিনীই এই সমস্ত জগৎ ।

এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোকের উপর দিয়া বিজ্ঞান-গতিতে একখানি অজানা জগৎ চলিয়া গেল । কিন্তু বাইবার সময়, সে আমাকে ডাকিয়া গিয়াছিল । সে মিলন মুহূর্তের । আর তাকে পাইলাম না । রেলগাড়ীতে চাপিয়া প্রকৃতির কৃত দেশ-বিদেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাইতে বাইতে তাহার মধ্যে আমার স্বপ্ন-দৃষ্ট গ্রামের সজীব প্রতিরূপ দেখিয়া যেমন একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া নিশ্চল বৃত্তিতে চাহিয়া থাকি, সে কাহিনীও ঠিক সেই রকমের । সে কাহিনী, চোক বৃক্ষিলে দেখিতে পাই, ভাবিলে বৃত্তিতে পারি । সে কাহিনী সৌন্দর্য্যের অসীমতা । বা হাসির আকারে অসীম সৌন্দর্য্য ।

“সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্যের বিবাহ-বন্ধন ।” বড় সত্য কথা । এ পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার দ্বারা আমরা সত্যকে শ্বাসিত পারি, বৃত্তিতে পারি । সৌন্দর্য্য জগতের ঐক্য । সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই আগের জগতের ঐক্য-ভঙ্গকারী যিগাকে জ্ঞানিতে পারি ।

এই মিথ্যা আমাদের চোকে ধূলা দিরা রাখাচ্ছে। সেইজন্য আমরা ভগতের রাগিণী রক্ষা করিতে পারি না। আর সেই জন্যই আমরা আদর্শের জন্য এত হাছাকার করিয়া বেড়াইতেছি। বাস্তবিক, সৌন্দর্য্য ভিন্ন আমরা কিছুই জানি না। সৌন্দর্য্য ঐক্য—সৌন্দর্য্য সত্য—সত্য ভগৎ। ইহাও ত ভগতের মূল তত্ত্ব। সৌন্দর্য্য-প্রেমিক কবি কীটস্ (Keats) বলিয়াছেন—

Beauty is truth, truth beauty that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

সেইজন্য যখন আমরা কি এক অদৃশ্য শক্তিবলে—সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে একবারে বাহ্যভগৎ ভূমিরা বাই, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের অনন্তপূরে অনন্ত ভগৎকে দেখিতে পাই। তখন আমাদের চারিদিকেই সৌন্দর্য্যের কোরারা। তখন সৌন্দর্য্যের সহস্র বার দিয়া অনন্তের বার্তা আসিয়া আমাদের প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে। সেই সময় স্মৃতি জাগিয়া উঠে। স্মৃতির অদৃশ্য মলয়-পর্বত হইতে তখন পূর্বজন্মের এক মধুর বাতাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। তখন আমরা বিবে লীন! ভগৎ তখন আমাদের মধ্যে বর্তমান। তখন সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের স্রোতস্রাব শয়ন করিয়া অনন্ত জাগ্রত নিজার চোক চাহিয়া বুঝিতে পারি যে, আমরা পূর্বজন্ম-ফুল। অর্থাৎ অনন্ত সৌন্দর্য্যভাগরণই পূর্ব-জন্মস্মৃতি। ইন্দ্রিয়াতীত পূর্বজন্মের স্মৃতি-বাতায়ন এই ভগদত্তীত সৌন্দর্য্য।

আজ এই নিম্নক জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ছাদের উপর একাকী বলিয়া রক্তময় অনন্ত আকাশের রাণীর চাঁদ মুখের দিকে বির নরনে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ কি একটা মধুর উদাসময় কথা আত্মহারা ভ্রমরের ন্যায় জদর-পুষ্পের চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কি কথা সে? আজ আমাকে সে কথা কে বলিয়া দেবে? এমন স্মন্দরী নিশি সেই কথার বিরহে আজ শুনি নিশি। এ অনন্ত ভগতে কি তবে আমার সে হারাময় কথা বলিয়া দিবার আর কেহ নাই? আছে। এ ভগতে কথা ফুরায় না। একের পর দুই—শত্রীর পর মন—সাকারের পর নিরাকার—মহুবার পর প্রকৃতি। একে অনন্ত প্রাপ্তি। প্রকৃতি সর্বদাই এই কথা কত রকমে বলিতেছে। ভগতের পথে ভগতের কথা কখন অদৃশ্য হইতে পারে না। নিম্নোক্ত জ্যোৎস্নাকে কেহ ভুলিও না। জ্যোৎস্না স্বর্গের সোপান। এ ভগতে

অমরাবতীর এই একমাত্র পথ। এস, আজ এই সৌন্দর্যের অনন্ত আনন্দ-
সাগরে ঝাঁপ দিয়া মরিতে মরিতে বঁচি—

“To die for Beauty, than live for bread.”

জীনগেন্ননাথ বহু।

ফোঁটা ও তিলক।

বিষম সমস্যা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, বাপু হে, দশহরা, গজাশ্রান করিয়াছ, একটা ফোঁটা কাট। ও দিকে আবার গোসাইদাস বাবাজি বলিতেছেন, না হে না, আজ প্রভুর পাদপদ্মে দ্রবময়ীর উদ্ভব— বড় উৎসবের দিন—একটা তিলক সেনা কর। কি কবি—কাহার কথা রাখি? কখন ফোঁটাও কাট নাই, তিলক সেনাও করি নাই—কি ভাল মন্দ বুঝি না—বিষম সমস্যায় পড়িয়া এদিক্ ওদিক্ করিতেছি এগন সময়ে অনূরে মৃদুভালে খজ্ঞনী বাজাইয়া কে গাহিল—

গৌর আমার মাথা মাড়ি।

গৌর আমার মিতের মিদর, চুলবাধা বড়ি ॥

আওয়াজটা বড় মিঠা লাগিল। বামাকণ্ঠ। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, এক প্রোঢ়া বৈকবী। বৈকবীর বয়েসটা এখনও একেবারে চলিয়া পড়ে নাই; শরীরখানি মাঝামাঝা, গোলগাল, কালোকালো। পরশে একখানি কালাপেড়ে ধুতি। অঙ্গের মধ্যে কোথাও কোন অলঙ্কার দেখিলাম না। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। দেখিলাম, বৈকবীর তিল জ্বলের ন্যায় নাগা, সেই নাসাগ্রভাগে মধুর রসকলি। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, ভট্টাচার্য্যের কথাও সত্যিব না, বাবাজির কথাও রাশিব না, যদি কাটিতেই হয়, তবে নাকের উপর ঐরূপ রসকলি কাটিব। কিন্তু, সে তো পরের কথা। তখনকার উপায়? তখন অন্য উপায় না দেখিয়া পলায়নের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলাম। সুবিধা সহজেই

হইল। ডট্টাচার্য্য মহাশয় আমার দিকে চাহিয়া গঙ্গানোত্র আঁওড়াইতে ছিলেন, “মাতঃ শৈলহুতে” বলিয়াই তাঁর স্বব পাঠ ঘুরিয়া গেল, একদৃষ্টে সেই বৈষ্ণবীর প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বাবাজি বাম হস্তের তালুদেশে গঙ্গাভূক্তিকা ওলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া নাসিকার উপর তিলকসেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে আড়ল নাকের উপরেই থাকিল, তিলকসেবা হইল না। জড়ের ন্যায় বৈষ্ণবীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বৈষ্ণবী এ সব দেখিয়া কি ভাবিয়াছিল জানি না; মুখের হাসি মুখে মারিয়া, ভিজা কাপড়ের আঁচি সেই স্রোতের ঘাট হইতে পলাইয়া আসিল। সে দিন আর কিছুই করা হইল না।

তার পর কতদিন ভাবিয়াছি, কি করি, কোঁটা কাটি, কি তিলক সেবা করি, কি রসকলি পরি। কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। বৈষ্ণবীর দেখা দেখি একদিন রসকলি কাটিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা দেখিয়া পাড়ার একটা ত্রিপণ্ড ছেলে, “কে গো, গোবিন্দ অধিকারীর বাত্রার সবী নাকি?” বলিয়া “শমচুরি—শমচুরি” করিয়া বড়ই আগাতন করিয়াছিল; সেই দিন হইতে আর রসকলি কাটিতে মন নাই। কোঁটা কি তিলক যেটা হয় একটা কাটিলে কাটিতে পারি, কিন্তু কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ তাহা আজও স্থির করিতে পারিলাম না। ডট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তিলকের শিক্ষা করিয়া কোঁটার ব্যবস্থা দেন; আবার বাবাজিকে কোঁটা কাটার কথা বলিলামাত্র, তিনি ‘রাধে রাধে’ বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। তাঁহার কোঁটায় বিশেষ আপত্তি, কোঁটা শব্দের পর কাটা শব্দ ব্যবহার হয় বলিয়া; বৈষ্ণবের কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিলেও পাপ করে। কাহারও নিকট ইহার সহজ পাইবার আশা নাই। দুজনকেই দেখাই—শাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্র কি তাহার জ্ঞানে দুজনেই সমান ব্যাপ্ত।

যাহা হউক, শাস্ত্রের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। কোঁটাই বল, আর তিলকই বল, এ প্রথাটা কিছু আজ কালের নয়। অনেক দিন হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। অমৃতব হয়, আখ্য ঋষিরূই ইহার স্বষ্টিকর্তা। কিন্তু ঋষিরা কোন একটা কাজ অনর্থক করিতেন না। দেখ-শোভার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহারা যে অন্তঃকরণের শোভা

বর্ধনের জন্য ইহার স্ফুট করিয়াছেন এ কথা বিশ্বাস হইতে পারে না। তাহা হইলে, যে মহাদেব শাশানে মশানে তন্ময় মাখিয়া সাপ জড়াইয়া বেড়ান তাহার কপালে ইহার চিত্র দেখিতাম না। অন্ধরণের জন্য ইহার স্ফুট হয় নাই। ইহার কোনও গুঢ় গভীর অর্থ আছে।

সে অর্থ বুঝিতে পারা যায়, যদি আমরা স্থিরচিত্তে সেই প্রাচীন ঋষিদিগের প্রকৃতি একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখি। যোগ সেই আধ্যাত্মিকগণের প্রকৃতির মূল অবলম্বন। সকলেই লক্ষ্য সেই এক, গতি সেই এক পথে। কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম, ও অসামান্য। মনে করিলেই, যে ইচ্ছা, সে পথে সচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যোগ বড় কঠিন ব্যাপার। ইহাতে চিত্তকে লয় করিতে হয়। চিত্তের লয় না হইলে সমাদি হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।”— তাবৎ মনোবৃত্তির নিরোধ করার নাম যোগ। মাহুষের মনোবৃত্তি নানা প্রকার। সে সেই সকল বৃত্তির অধীন হইয়া এই জগতে আসিয়াছে। যে দিন সে স্মৃতিকাগ্ধের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ভূমিষ্ট হইয়াছে, সেই দিনই সে শিশু এই মনোবৃত্তির অধীন হইয়া তাহার হস্ত পা নাড়িয়াছে, তাহার ক্ষীণ স্বর উচ্চে তুলিয়া দুঃখের কার্য কঁাদিয়াছে। জন্মের সেই আদি দিন হইতে সেই শিশুরই যতই সংপুষ্ট হইতেছে, ততই এই সব যুগচকল মনোবৃত্তির তড়নায় সে ইতস্তত বিধাবিত হইতেছে। ইহা কখন তাহাকে আকাশে তুলিতেছে, কখন সাগরে ডুবাইতেছে, কখন অসাধ্য সাধনে শক্তি দিতেছে। সেই মনোবৃত্তির নিরোধ সহজ কথা নয়, সে কৰ্ম্ম সকলে পারে না। নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্তের কোন অবলম্বনই থাকে না। দার্শনিকেরা বলেন, চিত্ত তখন দৃঢ় স্তরের ন্যায় কেবল মাত্র সংস্কার-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মনের সম্পূর্ণ মরণ উপস্থিত হয়। যোগের জন্য চিত্তের একপ লয় সাধন কি সহজ কথা।

সহজ নয় বলিয়া ঋষিগণ যুগযুগদিগের জন্য প্রথম কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অনাস্বাদ্য ক্রিয়া-যোগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল ক্রিয়াধোৰ্ণ আবার সিদ্ধ করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যিক। একাগ্র হইয়া সাধনা না করিলে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। চিত্ত আপনায়

চিরাভ্যস্ত চাকলা বিস্মৃত হইয়া, নিরবলম্বত্বা হইয়া একমাগ বস্তুতেই নির্ভর করিলেন—তাগর সমস্ত জ্ঞান ভূমিমা পিয়া, তন্ময় হইয়া, নিবাত নিকম্প দীপনিধার ন্যায় কেবল একমাত্র বিষয়েই অবিকলিত ভাবে অবস্থিত থাকিবে, তবেই সে সাধনায় সিক্তি অদ্রবর্তিনী। চিত্তের সে একাগ্রতাও যত্ন-সাপেক্ষ। বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া, চিত্তের অনন্তবৃত্তির রোধ করিয়া তাহার একতানবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। সেই যত্নকে অভ্যাস বলে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—“তত্র চিত্তো যতোহভ্যাসঃ।”

ঋষিগণ কোন কিছুই অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। এই অভ্যাসটী বিশেষরূপ সহজ ও স্বাভাবিক করিবার জন্য আবার তদুপযোগী কঠকতালি প্রক্ৰিয়ায় নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে তাহাকে ক্রাটিক বলে। ইহা মনঃ-সৈবর্ধ্যের প্রকৃষ্ট উপায়। সে প্রক্ৰিয়াগুলি এই:—

“নাসাগ্রাং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনং পতেন বৈ।

মনসো মরৎ তদ্য • • • ।”

পদ্মাসনবন্ধ হইয়া নাসিকার অগ্রভাগ দর্শন করিবে। তাহা হইলেই দৃষ্টি আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না। দৃষ্টি অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হইলে সহজেই চিত্তের সৈবর্ধ্য সম্পাদিত হইবে। ক্রমেই মনের মরণ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির লয় হইবে।

বাশিষ্ঠযোগ ও বাস্তুগায়ত্রীযোগসংহিতায় এইরূপ বিধান আছে।—

“সমগ্রীব শিরঃকায়ঃ সংযতাসাঃ স্থনিচলঃ।

নাসাগ্রদৃক্ সমাসীনো যথোক্তং যোগমভ্যাসেৎ ॥”

অর্থাৎ গ্রীবা নিঃশব্দে এবং দেহটি অবরুদ্ধ ভাবে সমান রাখিয়া সংযত-রূপে স্থির হইয়া নাসাগ্রভাগ দর্শন করিবে, এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া যোগ অভ্যাস করিবে।

কিন্তু নাসাগ্রদর্শন সর্বাপেক্ষা প্রথম অথবা সহজ প্রক্ৰিয়া। ইহা সিদ্ধ হইলে, তাহার পর একটু বেশী আয়াসসাধ্য—“জবোরত্বগতা দৃষ্টিঃ * * *।” —দৃষ্টি জহর্যের মধ্যগত বিশুমধ্যে আবদ্ধ করিবে; তাহা করিলে সমাধি সহজে জন্মে।

পাছে দৃষ্টি-বিভ্রম হয়, বা দৃষ্টি স্থির না থাকে, এই আশঙ্কায় এই

ত্রোটক সাধনাকে আবার সুগম করিবার জন্য সেই সকল ঔষধি, যাহাতে দৃষ্টি সহজে আবদ্ধ হয় এই নিমিত্ত, সেই সেই স্থানে কোন একটা চিহ্ন বিন্যাস করিবার নিয়ম করিয়াছেন। ইহা হইতেই ফোঁটা বা তিলকের স্থিতি। রসকলি নাসাগ্র-দর্শন-সাধনার অতি সুন্দর উপায়। ফোঁটা ও তিলক একই কথা। ইহার ভেদভেদে জ্ঞান মূঢ়তা মাত্র। বাহার যেরূপ অভিকৃতি সে তাহাই ধারণ করিতে পারে। কাহাকেও ইহা ধারণ করিতে দেখিলে নব্য ইংরাজিনবিশগণ যে উপহাসের হাসি হাসিয়া থাকেন তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না।—সে কেবল তাঁহাদেরই চপলতা ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। হুঃখের বিষয়, ঐশ্বর্যকার অধিকাংশ বৈষ্ণব বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আজ কাল ইহা কেবল “মানের সাক্ষী ফোঁটা” হইয়াছে !

দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ ।

অর্জুন ।

অনান্য—অজন্, বীরভূম, ঈশ্রজঃ, কর্ণারিঃ ।

স্বনামখ্যাত বৃহৎক । বীরভূম, বর্জমান, ২৪ পরগণা ও নবীয়া জেলায় ইহা বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ফল ছোট কামনাজ্জার মত। দেখিতে পেয়ারা গাছের ন্যায়। পাতাও পেয়ারা পাতার মত, তবে কিছু কোমল ও মন্থণ। ইহার বকল সচরাচর ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা কঁসার, তিক্ত, উষ্ণ, ত্র্যণ্বোধক, কক, পিত্ত, শ্রম, তৃষ্ণা নাশক। বায়ু প্রকোপকারি, সংকোচক, বলকারক। অশ্মরী (পাথুরি) জ্বংপীড়া, কত ও মূত্রকষ্কু রোগে উপকারী।

অর্জুনছাল-চূর্ণ দ্রুত বা চিনি সহ সেবন করিলে জন্মোগ, পুরাতন জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। অধিভঙ্গ ও আঘাতজনিত বেদনায় অর্জুনছাল দ্রুত নিবৃত্ত করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে। অর্জুনছাল ১ তোলা চেণোনী জলে বাটীয়া সেবন করায় অনেক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্যলাভ করিতে শুনা গিয়াছে। অর্জুনছাল মধুর সহিত বাটীয়া লেপ দিলে ব্যঙ্গ রোগ দূরীকৃত হয়।

অলাবু ।

অন্যনাম—লাউ, তুখী, কহু, মহাকলা ।

বৃহৎ লতাকল বিশেষ । মিঠা, তিৎ ও বামনীভেদে ইহা তিন প্রকার । মিঠা লাউ মলভেদক, কুচিকারক, কফকারি, গুরুপাক, অতি শীতল ও বুঝা । তিৎ লাউ কটু তিক্ত, লঘুপাক । পাণ্ডু, কৃমি, বিষদোষ, শ্বাস, কাশ, ব্রণ ও শোথ রোগে উপকারক । বেহার অকলে ইহাকে তুখীর বলে । ইহা আকারে দুই তিন হাত দীর্ঘ হয় । বঙ্গদেশে এক জাতি তিৎ লাউ আছে, উহা দেখিতে ঘটীর মত । বামনী (বাউনে) লাউ পিত্তনাশক । লাউশাক, ঢরু, মধুত, মলভেদক, কফ, পিত্তনাশক, বায়ু ও কফবর্দ্ধক ।

লাউশাক ও শোধ একত্র বাটীয়া লেপ দিলে ঘোনির শিথিলতা নষ্ট হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় । কাঁচা লাউ আধপোয়া ১০ সের দুগ্ধে সিদ্ধ করত ক্ষীরবৎ করিবে । ঐ ক্ষীর ৩৪ দিন সেবন করিলে দারুণ প্রমেহ রোগ উপশমিত হয় । তিৎ লাউবীজচূর্ণ অজ ঘোল বা জলের সহিত সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয় । লাউফলের রসের নস্য গ্রহণে নাসা আরাম হয় । লাউ বিচির শাঁশ বলিয়া জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ নিবারণ হয় ।

অশোক ।

অন্যনাম—বিশোক, বায়া; শোকনাশ, স্নাতগ ।

লোহিতপুষ্প স্বনামখ্যাত বৃহৎ বৃক্ষ । ইহার ছাল সচরাচর ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । ইহা শীতল, তিক্ত, ঝাঙ্কী, কষায় । পিত্ত, দাহ, ক্রম, তৃকা, কৃমি, শোথ, ওলু, শূল, উদরাগ্নান ও বিষদোষ নাশক । ইহার বিশেষ গুণ রক্তদোষক ও সংকোচক । এ অন্য রক্তপ্রদরাগি রোগে বিচক্ষণ বৈদ্যগণ ইহা প্রায়ই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন ।

অশোকছাল ২ তোলা ও দুগ্ধ এক পোয়া, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া হৃদ্যবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাতিয়া সেবন করিলে প্রবল প্রদর রোগ আশু উপশমিত হয় । অশোক ছালের কাথ দুগ্ধসহ পান করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয় । শোক-রাহিত্য কামনায় বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ইহার কণিকা জলের সহিত পান করিবার বিধি আছে ।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিরাজ ।

সমালোচনা । *

গাইদ্যাপাঠ । শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম, এ, প্রবীত । প্রণেতাকে না চিনেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক অতি বিরল । বাঙ্গালীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য বাঁহারা দৃঢ়ব্রত ; বাঙ্গালীর নিজস্ব বদেছে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে, বাঙ্গালীকে মহুযাত্ত শিখাইতে বাঁহারা প্রাণ-পণ করিতেছেন ; বাঙ্গালা ভাষার সহিত বাঁহাদের নাম থাকিবে, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান । সমাজের অনাস্ত্র শিক্ষকদিগের দ্বায় তিনিও এইদিন শিশু ও বালক ছাড়িয়া, সুবা, প্লোট ও বুদ্ধকে শিক্ষা দিতে-ছিলেন ; গৃহ ছাড়িয়া সমগ্র সমাজের সংস্কারকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন । সমাজলক্ষিকগণ মূলের প্রতি উত্ত লক্ষ্য রাখেন না । বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণপণ ব্রত প্রায় সফল হয় না । তাই এ পর্য্যন্ত আমাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি জ্ঞানে হইয়াছে, কাণ্ডে পরিণত হয় নাই । অধিক কি দৈবরকেও আমরা ভক্তিতে ও কর্ণে চিনি না, জ্ঞানে ও তর্কে চিনি । কিন্তু নরম মাটি ভিন্ন শক্ত মাটিতে কিছু গড়া যায় না । যে অবস্থা আমাদের চরিত্রগঠনের সময়, সেই অবস্থা আমাদের কত শোচনীয়, গোড়াই কি গলদ তাহা সকলে বুদ্ধিতে চেষ্টা করেন না । এতদিনে চন্দ্রনাথ বাবু সেই মূলে হাত দিয়াছেন । এককর ঠিক বলিয়াছেন, আমাদের ধাতু বিগড়াইয়া গেলে,—আমাদের সংস্কার কলুষিত হইলে আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় বলিয়াই আমরা সর্কত দুঃখ, বহুণা, ও ক্রোণ ভোগ করিতেছি । সেই জনা আমরা এখন কোন মহদমুঠান করিতে পারি না । সেই জন্যই আমাদের মধ্যে কার্যো মহৎ লোক—আদর্শ-চরিত্র এত অভাৱ ।

* দুই বৎসর পূর্বে সাবিজী লাইব্রেরী হইতে নূতন ও পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনার কথা হয় । নানাকারণে সে প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কার্যো পরিণত হয় নাই । এখন হইতে সেই সমালোচনা কল্পনার স্বীভবিত প্রকাশিত হইবে ।

এককার পুস্তকখানিতে গৃহ পরিষ্কার রাধিবার কথা, গৃহসামগ্রীর কথা, রাগাদিহের কথা, গড়তি আটটি পাঠ নিখিওছেন। পুস্তকখানি দেখিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে যে এত খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনার কি আবশ্যক ছিল? এ সব কথা ত সকলেই জানে। কিন্তু, এত যে জ্ঞান-কথা তাহাও কারো আমরা আদৌ পরিণত করিতে পারি না কেন? আমাদের সেই প্রকৃতিগত—অস্থিরজ্ঞানগত মহৎ দোষ একবার দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি তুচ্ছ বিষয় লইয়া নিজ শক্তির অপচয় করেন নাই। গৃহ পরিষ্কারের কথা, অন্ন বাঙনের কথা, ভোজনের কথা, বড়ই গুরুতর কথা। ইহাতে আমাদের শরীর ও মনের উন্নতি ও অবনতির অধিকাংশই নির্ভর করে। ইহার প্রতি কামনা দৃষ্টি রাখি না বলিখাই আমাদের ঘরে নিতাই বেগ, নিতাই ক্রোধ, নিতাই হাহাকার, আমরা এত সন্তোষ-অনন্দ, এত ক্ষুধিহীন, এত ভীক; আমাদের গৃহে এত বিশৃঙ্খলা, এত কলহ, এত অশান্তি। কিন্তু এ সমস্ত অনর্থের মূল জালসা। জালসার কতদূর প্রভাব একবার আমরা গোড়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া লেই মহৎ দোষ সংশোধনের উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রথমে গৃহ পরিষ্কারের কথা। —“আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার যে মল, মূত্র, সর্কড়ি প্রভৃতি দ্বারাই গৃহ অপরিষ্কার হইয়া থাকে, এবং সেট জন্য সেট সব জগৎ অস্বপ্যারানে পড়িয়া না থাকিলেই তাঁরা মনে করেন, যে গৃহ পরিষ্কার আছে।” অপরিষ্কারের তাৎপর্য্য ধনী, কি সম্ভাবিত কি দরিদ্র সকলেরই গায় এইরূপ! তার পর তিনি অসদৃশ সামগ্রী একত্রে রাখার দোষ যাতা দেখিতে ধারণ, তদ্বারা গৃহ অপরিষ্কার হয়, ছেপাচোপা ভিনবি ফেলিয়া রাখার দোষ, এবং এত সব কারণে পরিবারের কত অসুবিধা, কত কাঁদাহাঁনি, অনর্থক কত সময় নষ্ট তাহা বুকাইয়াছেন। এ সকলের মূলে লেট জালসা বিরাজমান। “গৃহ সুন্দর হইলে গৃহের লোকের মন প্রফুল্ল থাকে এবং মন প্রফুল্ল থাকিলে তাহাদের সর্বাঙ্গীন কলাপ হয়।” এ কথা কতদূর সত্য, সকলে ভাবিয়া দেখিবেন। গৃহ পরিষ্কার ও সুন্দর রাখার কথায় কেহ যেন না বুঝেন, এতদ্বারা জালসা দাসদাসী রাখিতে হইবে। সকলেই জানেন, অপরিষ্কার অট্টালিকা অশ্রোকা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামান্য পূর্ণকুটীর কত নয়ন-প্রীতিকর হইতে পারে। ঠহার ভিতর আর একটি বড় হাসির কথা আছে। অনেকে তুমারদলন অটালিকায় বাশ করেন, সদা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করেন, হুঁশুলা মাঝে-মাঝে ঘারা গাজ পরিষ্কার করেন; কিন্তু তাঁতার সেই ছবি প্রভৃতি ঘারা হৃদয়ঙ্গম গৃহ নিজেবনের ঘারা কি প্রকার অস্বাখ্যকর ও কুদর্শন হয়, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এ সব উ সামান্য কথা, জানা কথা। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জনের গৃহে এ প্রকার দোষ নাই? কয়জন আগলোর এই সব ভয়ানক দোষ পরিহার করিয়াছেন?

তার পর রীতিমত ও অবস্থামত গৃহ সামগ্রী না থাকার কত কষ্ট সহিতে হয়, তিনি স্বন্দররূপে তাহা বুঝাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহী ও গৃহিণীর সে অংশ বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত।

“বাড়ীর মধ্যে যে স্থান খুব সঙ্গীর্ণ, আর সেই স্থানে সকলে রান্নাঘর নির্মাণ করিয়া থাকেন। আবার রান্নাঘরের পার্শ্বেই বাড়ীর অপরিষ্কার জল প্রভৃতি নির্গমনের নর্দামা করা হয়—ইত্যাদি।” জিজ্ঞাসা করি, লক্ষ্যপতি হইতে সামান্য হীনাবস্ত্র লোকের রান্নাঘর একপ কি না? বাহাতে আমাদের দেহের পুষ্টি, সুতরাং জীবন নির্ভর করিতেছে, সেই আহার প্রস্তুতের স্থান জানিয়া শুনিয়া এত কদর্যা হয় কেন? যে সব বিষয়ে আমরা পিতৃ-পিতামহ হইতে কুণ্ডভোগী, সে সব বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য নাই কেন? আমরা আর বেশি বলিতে চাহি না। আশা করি, প্রত্যেক পরিবারের আগল বুক এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। এ স্থলে কেবল আমরা বুক বুঝা এবং বালক বালিকা একজ ভোজন করিলে তাহার কি মহান ফল হয়, সেই স্থানটী সকলকে বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে এবং নিজ ও বহুদর্শী মাত্রকেই সে বিষয় চিন্তা করিতে অনুপ্রাণিত করি। সকলেই বুঝিবেন, গ্রন্থকার পরিবার-গঠন দৃঢ় পরিবার কি উৎকৃষ্ট উপায় বাহির করিয়াছেন। সমস্ত পরিবারকে ভালবাশা, সহানুভূতি ও প্রীতির এক সূত্রে বাঁধিবার কি কোমল অচ্ছেদ্য পাশ নির্মাণ করিয়াছেন আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থখানিতে আগলরূপ বিষয়বস্তুর মূলে কুঠারা-ঘাত্ত করা হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইবে।

গৃহে তাহার আরম্ভ । এই আলস্য পরিহার করিতে পারিলেই আমরা নীরোগ, সুস্থ, সম্বল ও চুটকায় হইব ; গৃহ শান্তি, স্বগ, সজ্জনতা ও মানসিক উন্নতির প্রদান এবং প্রথম শিক্ষাশ্রম হইবে । সহঃ আতি হইবার যে মন ও ব্রহ্মচর্যনীলতা, সতর্কতা, অধ্যবসায়, একতা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও শিক্ষা হইতে পারে না । গৃহ ভিন্ন আমাদের চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব ।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, এ পুস্তকখানি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়ান উচিত, বালক ও তরুণ ছাত্রদের স্বপাঠ্য পুস্তক আমাদের দেশে বিহীন । শুনিয়া সুশী হইলাম, ইহার মধ্যেই কয়েকটি বিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারিত হইয়াছে । এক্ষণে, প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি আমাদের অশ্রুতি, তাঁহারা নিজ নিজ কন্যা প্রভৃতিকে সাতিনয় যত্ন সহকারে এই পুস্তক খানি পড়াইবেন । মূল্য ছয় আনা মাত্র ।

ধর্মচিন্তামালা । শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র প্রণীত ।—পুস্তক খানি ছয় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, কিন্তু টহার মধ্যে ছয়টি কপা বাদ দিবার নাই । হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্রের মধ্যে যে কোটি কোটি সমুদ্রা নীতিরঙ্গ আছে, সেই সমুদ্রের মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রত্নে “ধর্মচিন্তামালা” রূপা হইয়াছে । এতদ্বারা বাল্যকালে দীর্ঘ পিতা বৈকবশ্রেষ্ঠ জীমূক্ত কেশরিনাথ দত্তের ভাগবত আলোচনা প্রত্যহ শুনিয়া যে জ্ঞান পাইয়াছিলেন, এ পুস্তকে তাহারই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে । পুস্তকখানি তাঁহার জয়োদশ বৎসর বয়সের পূর্বে লেখা । এত অল্প বয়সে ভাগবত শাস্ত্র বুঝা তীক্ষ্ণবুদ্ধির আবশ্যক । জীলোকেশ কত শীঘ্র সুনীতি ও সুদৃষ্টান্ত ধারণা করিতে পাবেন, ইহা হারা তাহা আমরা হইব । যে পিতা এরূপ বালিকা কন্যার মনে ধর্মপিপাসার উদ্বেক করিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ধর্মনিষ্ঠাকে আমরা ধন্যবাদ দিই ।

এই পুস্তকখানি ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে । আশিতে পারিলে সুশী হইব, নবীন এতদ্বারা এই কয় বৎসরে আর কোন পুস্তক গ্রহণ করিয়াছেন কি না ।

শ্রীমোবিন্দলাল দত্ত,

দাবিডী লাইব্রেরী ।

কনকাঞ্জলি ।

গীতি-কাব্য*]

life shall be poetry.

বান্ধালা সাহিত্যে “উৎকর্ষ গীতিকাব্যের অঙ্গাব নাই” সত্য কথা। বান্ধালা সাহিত্য যে, নিলামপূর্ণ গীতিকাব্যের আদিকে। দিন দিন নতিশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাহারও আর অপেকার করিবার যো নাই। যে দেশের লোকে “বিদ্যাহুন্দরব” লেখককে “ডপাকর” উপাধি দিয়া, বিদ্যাহুন্দরী কবিতার মান বাড়াইয়াছিল, সে দেশের গীতি-কাব্য কতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা এখন বিলম্বন দৃষ্টিতে পারিতেছি। সেই জন্যই ত আজ বান্ধালা, নিলামিতার জন্মভূমি। এরূপ গীতি-কাব্যকে আমরা কখন আদর্শ বলিতে পারি না। এইরূপ গীতি-কবিতা যদি বান্ধালির চরমোৎকর্ষ হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ইহা যত শীঘ্র এ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, ততই আমাদের মঙ্গল। প্রাতিমুখ্যনহ শব্দের মালাকে কবিতা বলিতে পারি না। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈক্য কবিরা, অন্তরের অন্তর-নিহিত সুকায়িত ভাব এবং মৌল্য, যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে প্রাণের তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছেন, সেরূপ কবি—সেরূপ কারিগরি তাঁহাদের পরবর্তী কবিদের নাই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গীতিকাব্যের জন্যই কি বান্ধালা সাহিত্যের এত দুর্দশা? যদি তাহাই হয়, তবে যুরোপের সাহিত্য-জগতে গীতি-কবিতা লইয়া এত মাতামাতি কেন? তাহাদের গীতি-সাহিত্যের দিকে এত গতি কেন? যে প্রকৃত গীতি-কবিতার পূর্ব সঙ্গীত মূর্তি দেখিবার জন্য কত কাল ধরিয়া মহাকবি Shelley হইতে আজিকার কবিটুডামণি Tennyson এবং Swinburne প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা, নিশিদিন কখনা-কাননে বসিয়া আছেন, সে গীতি-সাহিত্যকে এখন আমরা উপহাস এবং “আর চাইনা” বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। গীতি-কবিতা চাই। বান্ধালা দেশে এখন প্রকৃত গীতিকবিতা জন্মায় নাই। যত দিন না মানুষের আপনাকে এবং রূপকে বোকা সম্পূর্ণ হইবে, তত দিন গীতি-কবিতা

ঐক্যবন্ধুতার বড়াল প্রণীত। মূল্য আট আনা।

কবিতাপ্রবণ মনুষ্য-জগৎ-কাননে দুটি। মানুষের জীবনই গীতি-কবিতা। এ জগৎ-সাহিত্যে প্রত্যেক মনুষ্য এক একটি জীবন্ত গীতিকবি। দেশ যতই কেন সভ্য হউক না, তাহার জন্ত কবিতা—গীতি-কবিতা কখন মরিবে না।

তবে বাঙ্গালার কথা বিভিন্ন। বাঙ্গালা দেশে প্রতিভাশালী কবি অতি অল্প জন্মিয়াছিলেন। যে দু-একজন জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাতে দেখি। তাঁহাদের মধ্যে মুহূন্দরসি বাঙ্গালার শেষ প্রতিভাশালী কবি। তাঁহার পর আর কাণকে প্রকৃত প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ হয় না। মুহূন্দরসির পর আমরা যে সব কবিরা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে শব্দ-বিস্তারের চাতুরী ভিন্ন আর কিছুই নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, সে গুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক। অপবা সময়ের ভুল। সময়ের এইরূপ ভুল মাঝে মাঝে হয়। একটা বড় প্রতিভা-ভুল ফোটার জন্ত সময়কে কতকগুলি বাজে ফুল ফোটাতে হয়। সময়ের এ ভুল বাঙ্গালায় অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। তাই বাঙ্গালায় এত শাব্দিক কবি। ইহার আর এক কারণ শিক্ষার অভাব। তখন শিক্ষা আদৌ ছিল না।

কিন্তু জগতের সকল জিনিসই ও কালসাপেক্ষ। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কিছু আর জগৎ ছাড়া নয়। কালে, সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে আবার মধুসূদন উদ্ভিত হইল। মধুসূদনের গান কিছু নতুন ধরণের। পূর্ববর্তী কবিরের সঙ্গে আর তত মিল নাই। হইবেই ত। মধুসূদন প্রতিভা-শালী মধুসূদন শিক্ষিত। মধুসূদন পান্ডিত্য শিক্ষা-বিপ্লবের ফল। মধুসূদন দুয়েরই অতীত এবং নতনের মিশ্রণ। এক রকম বলিতে গেলে মধুসূদনই আধুনিক গীতি-সাহিত্যের পিতা। স্বপ্নোপের বে লোকাভীত কবিরা, আজ বাঙ্গালার জীবিত প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শিরায় বর্তমান। সে লোকাভীত কবিরের মত মাত্র মধুসূদনই করেন। কিন্তু তিনি সে কবিতার বীজমাত্র। সময়ে সেই বীজ হইতে দুইটি ফুল ফুটিয়াছে। একটি রবীন্দ্রনাথ, আর একটি অক্ষয় কুমার। অনেক দিনের পর বাঙ্গালার মলিন কাব্য-কাননে আবার ফুল দেখিতে পাইলাম। দুইটি ফুল। দুইটি কানন কেমন আলো করিয়া আছে! এ দুটির তুলনা নাই। আমার অদ্যকার আলোচ্য অক্ষয় কুমার।

“কনকাজলি”—বাস্তবিকই কনক-অন্তনি। ইহাকে কি বলিব? ইহা মূর্তিমান নগ্ন। বর্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য-জগতে “কনকাজলি” অথবা ইহার ভাবুক রচয়িতার কতদূর আদর জানি না। আদর হউক বা না হউক, আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া যুগ্ম। কবি কখনার ঐশ্বর্য্যালিক পাখায় চাপিয়া ভাব-আকাশের প্রতি তারকার প্রকৃতির নিভৃত সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়াছেন। ইহা এক নৃতন—নৃতন জগৎ। নৃতন বলিয়াই ইহা আমাদের এত প্রিয়। এত প্রিয় বলিয়াই আজ অগতির কাছে ইহার কিছু পরিচয় দিলাম।

“কনকাজলির” কবি সৌন্দর্য্যের কবি। সৌন্দর্য্য তাঁহার একমাত্র উপাসনা। সৌন্দর্য্যের জন্ত কবি পাগল। বাস্তবিক, কনকাজলির অক্ষরে অক্ষরে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট। ইহা সৌন্দর্য্যের আকর। সেই আকর হইতে কবির সৌন্দর্য্য-আকাজ্জার একটি কুসুম-কোমল কল্পনা-চিত্র আমরা পাঠকবর্গকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা কবির অনন্ত প্রাণের অনূশ্য আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত। সেই রহস্যময় “অদৃষ্টজ্ঞায়া” ইহা চানি—

আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী, সৌরভে আকুল যায়।

চুলে চুলে স্রোতধিনী কূলে কূলে ব'হে যায়।

চখে আসে সূর্য-সোঁর, মন কি ভাবিতে চায়।

আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথাঁ যায়।

সমীরণে ভেসে ভেসে হৃদয় অঙ্গরা-গান,

অলস স্বপ্নের মত, যেন ছাইতেছে প্রাণ।

এই শ্রান্তির পরে, এই স্বপ্নের শেষে,

কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে।

উড়ে কেশ বাহু ভরে, ঢল ঢল হৃ-নয়ান,

যুকেতে উছলে গেম, —ওনু কবে অভিমান।

২

কোথা তুমি — কোথা তুমি—প্রাণের অদৃষ্ট জায়া!

স্বপ্নময়ী, স্মৃতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া!

নন্দনে, মন্দারকুঞ্জে, মন্দাকিনী-তীরে পমি,

অন্য মনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণশশী।

কালে প'ড়ে পারিজাত, করেতে কুসুম-ডোর,
 দূরেতে বিরহ-গান মন হাহে হ'য়ে ভোর !
 না-জানি আসিছে অশ্রু, না-জানি কি ভাবি প্রাণে,
 ভোগ্যাময়ী দৃষ্টে বৃক্ষি, চেয়ে আছে ধরা পানে !
 কারে কি বলিবে সাধ, যেন গিরাছিলে ভুলে !
 জ্যোত্স্না, সৌরভে, গানে' স্মৃতি তার খুলে খুলে !

৩

পৃথিবীর আলিঙ্গনে পীড়িতা কল্পনা মোর,
 কৈদে কৈদে ক্রান্ত হ'সে, মুচ্ছারি পপনে ভোর,
 মেঘেদের ঝাঁকচোরা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
 অবশেষে পৌছিয়াছে মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে !
 দূর হতে দেখিতেছে, শ্রুৎসে দৃষ্টিটি তব !
 পলকে পলকে ফুটে কত হর নব নব ?
 জান আর নাহি জান,—তোমার দৃষ্টিটি হায়,
 সাগরে মগন-মুখী সরলা অবলা-প্রায়,
 ধ'রেছে জড়ায়ে যত্নে কল্পনার পলা মোর !
 জান আর নাহি জান, প্রাণে প্রাণে প্রেম-ভোর !

৪

দাঁড়াও অভেদ-মায়া ! পরলোক-বেলা-ভূমে,
 বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যু-কুহেলিকা-ধূমে !
 তোমাতে মিলিয়া নাই, দেখ ভূমি চেয়ে চেয়ে,
 সৌন্দর্য্যে মিলিয়া যায় কবিত্ত কেমন ধ্যেয়ে !
 শিখেছি তোমার চোখে সৌন্দর্য্যের মৃত্যু নেই,
 বৃক্ষিরাছি এ ব্রহ্মাণ্ডে মন্ত ব্রহ্মানন্দ সে-ই ?
 নক্ষত্র নক্ষত্রে, দেবি, হাছা ক'রে তোমা তরে,
 ছুটিতে না হয় যেন আবার জনম-পরে !
 এই মৃত্যু, শেষ মৃত্যু—হ'লো কি দেবতা মোর ?
 ধর ধর গীত-উৎস, জিঁড়িছি অগত-ভোর !

বাক্সালায় এমন জিনিস আর নাই । ইহা পড়িয়া এক নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম । ইহা মৌল্যের কনক-তোত ।

মৌল্য মাথাকে অমর করে । মৌল্য প্রাণ । এই জগৎ সেই মৌল্যের দাক্ষ-মর্তি । কবি, সেই জগৎ-মৌল্য-মাগরে ছুনিয়া মধুর দ্বৈব-হাস্যে অতি দীরে দীরে ব্রহ্মীকে বলিতেছেন ; -

রমণি ! তোমাকে চেয়ে

ভেবোনা, কি বেড়ে গেয়ে

কি বেড়েছে ভূমি

সরল-জন্ম কনি

যেখানে মাপুরী ছনি

সেখানে আকুল ।

সুন্দর কথা—কবি-যোগ্য কথা । পাখল ভিন্ন এ কথা আর কেহ বলিতে পারে না ।

রবীন্দ্রনাথ বর্তমান-গীতি-সাহিত্য-অগতের রাজা, আমরা অক্ষয় কুমারকে তাঁহার সহিত তুলনা করিতে চাহি না । ইহারা দুই জনেই Tennysonর ছাত্র । কিন্তু Tennysonর ছাত্র হইয়াও ইহারা উভয়ে স্বাধীন পথ অবলম্বন করিয়াছেন । আমরা ইহাদের কবিতার মধ্যে একটি সুন্দর প্রভেদ-চিহ্ন দেখিতে পাই । ইহারা দুই জনেই পশ্চাতা শিক্ষা-বিপ্লবের ফল । কিন্তু অক্ষয়কুমার বর্তমান যুগের অধীন । তিনি এ যুগের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই । বর্তমান যুগ-সমাজ অপূর্ণ-লক্ষ্যহীন—আবশ্যের জন্য প্রাণের অবিরাম আকাজক্ষা এবং বর্তমানের সকল জিনিষেই অসুস্থি । “কনকাক্সলির” অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রদীপ্ত । রবীন্দ্রনাথের উপর এ যুগের প্রভাব দেখা যায় না । একবার নাই যে, তাহা বলিতে পারি না । তিনি এ যুগের গতিশীলতার মেঘ ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন তিনি আদর্শ-কবিতা যুগের পথ-যুগে । অর্থাৎ তিনি সব যুগেই ।

কবি অক্ষয়, স্বীয় প্রতিভা বলে কনকাক্সলির সকলগুলিই উজ্জ্বল কবিতা তুলিয়াছেন । তাঁহার “বিভা”, “অদৃষ্ট বালিকা, হিরণ্ময়া” “মাপুরী” এবং “কল্পণার” তুল্য কবিতা বাঙ্গালাসাহিত্যের মধ্যে নাই । একপ কবিতা,

কেবল আমাদের এই নবীন কবিই লিখিতে পারেন। ইহা অক্ষয় বাবুর। আর কাহার হাতে এমন খুটিতে পারে না। কনকাক্ষণি একটি হরের—
 হৃৎকের প্রেম-গীতিতে পরিপূর্ণ। একটি হরের হইয়াও ইহার মিষ্টতা ত কম
 নাই। এ পুস্তক যখনই পড়ি, তখনই আর সমস্ত কাম ভুলিয়া যাই। ইহাতে
 কবির আশ্রয়ের পরিচয় পাই। কবি ইহাতে তাঁহার সমস্ত আশ্রয় ঢালিয়া দিয়া-
 ছেন। এখানি পুস্তকাকাষে ঐশ্বর্য অক্ষয়কুমার বড়াল।

গীতি-কবিতার প্রথম ওগ, পদ-লালিত্য বা শব্দ-বিক্রাস-চাতুরী। সেট
 পদ-লালিত্যেই কনকাক্ষণি প্রথমে মন কাড়িয়া লয়। তার পর যত পুস্তকের
 মধ্যে প্রবেশ করি, ততই ইহার কবিতা—কল্পনা—ভাবুকতায় এবং মৌলি-
 কতার আশ্চর্য্য বোধ করি। কবির ভাবোদ্বেক করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে।
 নবীন কবির ইহা এক অসাধারণ ওগ। যখন আমরা অক্ষয় কুমারের কবিতা
 পড়ি, তখন সেই বাসন্তী পৌর্ণমাসী-রজনীর সুশীতল স্রমহর কাননের জাগত
 নিশ্চিন্ততার রাশে বসিয়া প্রেমিক হৃদয়ের কি-এক অন্ত্যাত নিঃশ্বাসের নীরব
 কবিতা-কথা মনে পড়ে।

আমরা এ ক্ষুদ্রে-বৃহৎ পুস্তকের সমালোচনা করি নাই। আমরা সৌন্দর্য্য-
 কবির হৃদয়ের ছবি তুলি বুলিতেছিলাম। প্রেমকার নবীন-প্রতিভাশাণী।
 প্রেমকার এখন তাঁহার ছবির একদিক দেখাইয়াছেন। আর এক দিক এখনও
 বাকি। সেই ক্ষুদ্র ইহার সমালোচনা হইতে পারে না। যে দিন ছবি পূর্ণ
 হইবে, সমালোচনার কঠিন দিন সেই দিন আসিবে। আমরা ইহার কখনার
 ও কবিদের পরিচয় আর অধিক দিলাম না। মূল্য অতি অল্প, গাণ্ডা ইহার
 আশ্রয় পাইতে ইচ্ছা করেন এবং গাণ্ডা বাবুলা সাহিত্যের উপাসক,
 তাঁহার পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করুন। তাঁহার নিরাশ হইবেন না। আমরা
 জানি, রবীন্দ্র ভিন্ন এত অল্প বয়সে এরূপ হৃদয় কবিতা আর কেহ লিখেন
 নাই। আমরা নবীন কবির দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। আমরা অতি শীঘ্রই
 তাঁহার এক নূতন গীতি কাব্য পড়িয়া মোহিত হইবার আশা রাখি।

ঐনপেন্সনাথ বসু।

হিন্দু-আচার ব্যবহার ।

(সামাজিক ।)

(পূর্ব প্রাকানিতের পর)

ক্রমে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় পূর্বকীর্তি, পূর্ব-খাদীনতা, পূর্বজ্ঞান ধর্মের উন্নত অবস্থা জান নিত্য যুগ ও ভাস্তি-সম্মূল হইয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। সে জ্ঞানও যে লভ হইত, সে কেবল এদার্বব কানীরাযদাস, পণ্ডিত কীর্তিবাস এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মহিমাবিত তুলসী দাস, তথা পূবাব বাবসাথী বক্রীয় কথকঠাকুরদিগের এবেই। তাঁহারা যদি ভাষায় ভাষিত করিয়া না দিতেন, তবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির সম্বাও অন্যান্য দ্রববগাহ শাস্ত্রের ভাণ্যায়ণ ভোগ কবিত সন্দেহ নাই। এই সকল উপায়ে আমাদেব পূর্বপুরুষগণ তাঁহাদের বহ পূর্বপুরুষের যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, তাহা ইতিহাসের জ্ঞান লাভের ন্যায় নহে, তাহা অলৌকিক উপন্যাসবৎ অথবা ধর্ম শাস্ত্রের অঙ্গ, এই ভাবেই পাঠ বা প্রবণ করিতেন। হিন্দুরা যে এক কালে মহাজুজ-বোধ্য-শালী, অতুল্য কীর্তিমান ধর্মপরায়ণ স্বাধীন জাতি ছিলেন; যদি যখনবা আসিয়া ব্যাঘাত না জঘাইত, তবে অদ্যাপি হিন্দুদিগের তদ্রূপ বা তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা থাকিতে পারিত, এভাবে তাঁহারা সে সব পুরাণের বিনয়ণ গ্রহণ করিতেন না;—দুর্দান্ত ব্যবসের নির্ধ্যাতনে তাঁহারা এত নিস্তেজ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, স্বজাতিত্ব ও স্বাধীনতা-ভোগেচ্ছা একবারে এত নির্মূল হইয়াছিল, যে তাঁহাদের এমনি একটা ধ্রুবজ্ঞান জন্মিয়াছিল, যে, যখন পুরাণ-বর্ণিত কত্রিয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন হিন্দুরা পরের অধীনে, পরের শ্রেযাতা করিয়া, পরের মুখ চাহিয়া কেবল বাবে, পরিবে, থাকিবে। এই পর্য্যন্ত করিতেই ভগবান তাহাদিগকে অবনীতে রাখিয়াছেন। মহাভারত পাঠে তাঁহারা রাঝা অশ্বজয় পর্য্যন্ত চক্রবর্ত্তের ইতিহাস জানিতেন, তাঁহাদেরই অজ্ঞতুলের শেব কুলধ্বংস ভাবিয়া রাখিয়াছেন। সে দাপ

নির্দোষিত হওয়াতে মন অকারণে—তাঁহার পরে আন কোনো কাজের ভারতবর্ষে ছিল কি না ইহা তাঁহারা জানিতেন না, জানিবার জন্য অমুসন্ধানও করিতেন না। সুতরাং আবদীর আলেকজান্ডারের আক্রমণ; পুরু-জুগতির অসাধারণ মহত্ব-মূলক মাহাত্ম্য; দিত্যের পৃথুরাভাদির বৃত্তান্ত; সময়েত কবিরাজগণ কর্তৃক গিজনীর দুর্জয় মায়ূদের প্রথমতঃ পরাজয়, পরে অগ্নিচক্রের হ্রিবার আবর্তনে তৎকর্তৃক হিন্দু রাজলক্ষ্মী অপহরণ; সোমনাথে হিন্দুধর্মগণের অসামান্য সাহস এবং পরশুরাম শোভনীয় ঘটনা; পাল ও সেন বংশের বহু শত বৎসরের শাসন এবং যোগেন্দ্রনাথগণের সহিত রাজপুত্রজাতীয়ের অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বি; এ সকল তথ্য তাঁহারা কিছুই রাখিতেন না! কেবল মধ্য সময়ে রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক নাম ও ঔপন্যাসিক অলৌকিক কীটিকলাপের কথা তাঁহাদের অবগতিবশতঃ প্রবেশ করিয়াছিল, এইমাত্র! তাহাও কি ভাবে? তিনি নিজে মনুষ্য ছিলেন না, শিবানুচর ভাসবেতাল তাঁহার একান্ত আত্মপালক সহায় ছিল, এই ভাবে! সুতরাং বাদশাহের বাদশাই, যাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন নবাবের নবাবী, বাহার প্রভূত শাসনচক্রে তাঁহারা পেষিত হইতেন; রাজপাদি কুমারীবর্গের রাজাই, বাহার মোহকরী শক্তিতে তাঁহারা মুগ্ধ ছিলেন; ইহা ব্যতীত মনুষ্যের দ্বারা আর যে কখনো কিছু হইয়াছিল, কি অন্য দেশে হইয়াছে, কি এখন হইতেছে, কি এই দেশেই আবার হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বড় বুঝিতেন না! তাঁহাদের সংস্কারের যোগ-ফল তবে এইরূপ;—ভারতবর্ষে পূর্বে যাহা হইয়াছিল, আধুনিক কলিযুগে তাহা আর হইতে পারে না; শাস্ত্রে লিখিত আছে, কলিতে স্বেচ্ছাধিপতি হইবে অস্ত্রিয়হীন নির্বীৰ্য্য হইবে; ব্রাহ্মণ বেদহীন এবং শূদ্রের বেতন-ভোগী হইবে; বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বৃত্তিত্যাগী হইবে; চাকুর্য্য আচারভ্রষ্ট হইয়া স্বেচ্ছের দাসত্ব করিবে, ইত্যাদি সকলই বিপর্য্যস্ত, ভ্রষ্ট, সঙ্কলিত হইন দশপদ হইবে। অতএব যাহা ঘটিলে, শাস্ত্রানুসারেই ঘটিলে, তাহাতে আর কথা কি? অধীনতা, এ দাসত্ব, এ হীনতা অবশ্যস্বাভাবী—অবশ্যই তাহা সৌকৃত্য—অবশ্যই তাহা সহ্য করিতে হইবে। এই সংস্কারের বৈপর্য্য হইয়া এবং নিত্যই তাগের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এককালে ভিক্ত

হইয়া পড়িলেন। চিত্তাহীনতার কল অজ্ঞতা; সেই অজ্ঞতাবোধ উন্মাদনয়
জড়াইয়া পড়িল। বিনাভী ভেবাণ্ডার ন্যায় একমতান হইতে সকল স্থান ভাইয়া
কেলিল! লোকের স্তম্ভ-ভূমিতে বংশাধুরণরূপ যে কল্পবৃক্ষ ছিল, তাহা
শুক হইয়া গেল—স্বর্ণনামা উজাড় রূক্ষে বিশাল ভারতভূমি পরিপূর্ণ হইল!

এমন সময় চিরচঞ্চলা রাজকমলা ইন্দিয়াসক যখনকে পবিত্রত্যাগ করিয়া
দুর্ভ্রাতৃ স্বকণ্ঠে সভ্যতম ত্রিটাম-অঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন! মদনা-
ধিকারের মেঘাংহা ও ত্রিটিসাদিকারের আলাপেতে হিন্দু সমাজের
সামাজিক ভাব বড় বিভিন্ন হয় নাই। সামাজিকগণ সেই নিরুদ্যম, সেই
নিষ্টিত, সেই ভ্রোংসাহ, সেই স্তম্ভ-শূন্য রহিল। তত্ত্ব বালকগণ গুরু-
পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ নিষিদ্ধে পড়িতে ও অঙ্ক করিতে লাগিল; অতঃপর বালক-
গণ গোচারণ, কৃষি বা পৈত্রিক ব্যবসায়ে পিতা জাতাকে নানাব্য করিতে
লাগিল; ভদ্রযুবক ও প্রৌঢ়বৃদ্ধ অর্থোপার্জনে রত; অতঃপর যুবক ও বৃদ্ধও
তাই। পলিতচন্দ্র ধবলকেশ তত্ত্ব প্রাচীন মহাশয়ের আর্থিক পুঙ্খ, সংসারের
তত্ত্বাবধান, শিশু পৌত্র ও শিশু দৌহিত্রের মনোরঞ্জন, বৈকালে কেহ বা
মহাভারত, রামায়ণ, কবিকল্প পাঠে মগ্ন, কেহ বা পাণ্ডি হাতে 'কচে দারো'
বলিয়া বাতাজ্ঞান-শূন্য! সত্য-সক্যাত্তে প্রথম রজনীতে পরিণত বয়সের
বয়সাদল কাহারো চতুর্মতপে বসিয়া হয় খোদগত, নয় ভ্রমাত্মক নিরর্থক
রাজকীয় বিষয়ে বিতণ্ডা, নয়তো দলদলির খোঁটে করিয়া (কুকুর-শব্দ
বাড়ীত) নীরব গ্রামকে বোর নিনাদিত করিয়া তুলিতেন! এইতো আবার
বৃদ্ধ তবতের দৈনিক জীবন ক্ষেপণের তালিকা, বড় ভাল কাজের মধ্যে
পিকুমাত্ত-শ্রদ্ধ, দোল দুর্গোৎসব ও পুত্র কন্যার বিবাহ। বড় মন্দ কাজের
মধ্যে বিবাহ বিসম্বাদ, লাঠিয়াল ভারা দাড়া হাঙ্গামা ও মালিমোকদ্দমা।
তখন বর্ধা সামাজিকতা রক্ত বেশ বঞ্চিত; কেবল দলানলিরূপ সামাজিকতা
মাত্র অবশিষ্ট। কতারা তাহাতেই চিরজীবনের সুপকলুক্ষি, সংগৃহীতজ্ঞান এবং
রাশীকৃত বহুদর্শন সমুদয় নিষ্পেক করিয়া সন্তপ্ত!

তাহার পর জীভান মিসনরীগণ আগমন করিলেন। তাহারা কে,
তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি, সে সন্ধান হিন্দু সমাজের কেহই লইল
না। যেইমাত্র দুই একটা হিন্দু যুবক পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ পূর্বক নবগত

শিক্ষকের দর্শ্য গ্রহণ করিল অমনি যেন ভীমরূপের চাকে বা পড়িল ! কিন্তু কেবল গম, জনস্রুতি ও হা হতোম্মি বই অল্প কিছুই হইল না ! একদিকে হাহাকার অথচ অন্য দিকে প্রাণতুলা হৃদয়ার হিন্দু-কুমারগণকে মিসনরী কুলে পাঠান হইতেছে ! এ যদি অল্প দেশে হইত, তবে কি রক্ষা থাকিত ? বাও দেখি নিলাভের এক গুণগামের এক পার্শ্বে একখানি টোল দাঁড়িয়া জিনজাবত্তের উপদেশ দেও দেখি একটীমাত্র কৃষকের পুত্রকে ছুটানি হইতে হিন্দুয়ানিতে কি তাস্ত ধর্মেই আন দেখি, দেখ দেখি কি ঘটে ? দেখ দেখি, কেমন তোমার টোলে কি তোমার সমাজগৃহে আব. একটী ছাত্রও পড়িতে আসে ? তখনই তাহার গায়ত্রী জড় হইয়া সভা করিলে, তখন তোমার টোল বা সমাজগৃহ উঠাইয়া দিবে, তাহা না পারে তো নিদান এমন ব্যগ্ৰা করিলে, যে একটী প্রাণীও তোমাদের নিকট আসিবে না ! ইহা ভাল কি মন্দ, আমি তাহার বিচার করিতেছি না। সমাজের তীব্রতা ও একতা বুলানই আমার অভিপ্রায়।

সে বাহা হউক, তাহার পরে রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। হিন্দু কলেজ প্রভৃতি বহু ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সমাজরূপ ঘির বারিধিও আলোড়িত হইতে লাগিল ! ক্রমে শিক্ষা প্রাণীও এরূপ দাঁড়াইল যে, মাতৃ-ভাষা শিক্ষা না করিয়া এবং স্বদেশের পূর্ণবৃত্তান্ত কিছুই না জানিয়া হিন্দু বালকগণ এতদ্বারে ইংরাজী আরম্ভ করিল। বাটীতে বৃদ্ধ পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে বলে পৃথিবী ত্রিকোণ, চ্যাপ্টা, বাস্বকীর মস্তকে স্থিত, বাস্বকী আবার কুর্দ-পৃষ্ঠে আসন করিয়া আছে, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে ভূগোল পাঠকালে প্রমাণ পাইল পৃথিবী গোলাকার, সূর্যের চতুর্দিকে শূন্য জগৎশীল, মাধ্যাকর্ষণই ইহার অবলম্বন। তাহার বাল্যাবদি ভাবিতছিল, রাজ নামক চতালের আসে চন্দ্র সূর্য পতিত হইলে গহব হইত; গঙ্গা দেবীর দৈবশক্তি বিশেষে জোয়ার ভাঁটা আসে এবং এবং আলেয়া নদী পেতনী নদীর মূখ হইতে অধি উল্লীভূত হইয়া পৃথিবীকে দিগ্‌হারা করিয়া অভিশ্রুত বিল মধ্যে লইয়া গিয়া পাক মাথা পুড়িয়া উঠে পা ভুলিয়া মারিয়া ফেলে ! ইংরাজী পড়িয়া জানিল এ সবই ভ্রান্তিমাধা কল্পনার পিতৃমূল মাত্র ! একতরু তত্ত্বের সহিত এ সব

মৃত্যুর কোনও সংশয় নাই ! অকস্মেৎ চির-কালকাল ব্যক্তির চক্ষে হঠাৎ
স্বর্ণা-কিরণ লাগিলে যেমন অসহ্য হয়, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াই জল পান
করিলে যেমন সন্ধিগম্য হয়, আশাতিরিক্তরূপে এই সব প্রাকৃতিক তত্ত্বের
সত্য সন্ধান সহসা লাভ করিয়া তাহাদের দীর্ঘ সমাজ ও পৈত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্রের
প্রতি যোরতর অশ্রদ্ধা জন্মিল, স্বদেশের আচার ব্যবহার সমুদায়ই তাহাদের
অসহ্য হইয়া উঠিল । পক্ষাঘরে, পান্ডিত্যে, জ্ঞানে ধর্ম্ম ও সামাজিকতার প্রতি
তাহাদের আন্তরিক অনুরাগ বর্জিত হইল । তখন দেশে যোর তান্ত্রিক ও
পৌরাণিক কাণ্ড ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মমধ্যে যে উচ্চতর ভাব আছে, তাহা একমুহুর্ত
সকলেরই অজ্ঞাত ছিল । তখন কাজে কাজে দ্বাধারা কেবল দেশী ইংরাজী-
পণ্ডিত, তাহারা পৈত্রিক ধর্ম্মের প্রতি এককালে প্রীতিশূন্য এবং ঘৃণাপূর্ণ
হইয়া উঠিল । সে অন্ত্যায় তাহাদের মন কোনরূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য
যে লালারিত হইবে, আশ্চর্য্য কি ? তখন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোনও
বিশুদ্ধ জ্ঞেয়ীর সম্বন্ধ ও তত্ত্ব তাহাদের নর্যকূহবে প্রসিষ্ট হইত না, সুতরাং
মহত্তরীর ভাসমান লোকের কাষ্ঠকলকাজ্য মদূর্ণ সেই ধর্ম্মকে তাহাদের মধ্যে
অনেকে আশ্রয় সহকারে আশ্রয় করিল । আবার তৎকালে যে অসংসখ্যক
ইউরোপীয় খ্রীষ্টান এখানে আসিতেম, তাহাদের উচ্চ দাভাব, সচ্চরিত্র, উন্নত
ভাবময় বাক্য ও উদার কার্য্যকলাপ নবশিক্ষিত নবীন হিন্দুর চক্ষে দেব-
ব্যবহারবৎ অমুচ্ছত হওয়াতে তাহাদের ন্যাগ বসন ভূষণ গ্রহণ ও তাহাদের
আচার ব্যবহার শিষ্টাচারের অনুকরণে তাহারা প্রবৃত্ত হইল ।

তারপরে রাক্ষাস রামমোহন রায় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মেব জ্যোতিঃ জন্মে অজ্ঞে
পথর সীমিত পারণ করিতে লাগিল । এই নব ধর্ম্ম পূর্ণ পচলিত পৌত্তলিক
এবং নব্যোপনিষদে খ্রীষ্টান উভয় ধর্ম্মেরই প্রতিদ্বন্দ্বী বলীগান বোদ্ধবশে রণ-
ভূমিতে অবতীর্ণ হইল । কিন্তু এই ধর্ম্মেব সার বিনেচনা করিলে ইহা কোন
ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বিস্তারের প্রতিবন্ধক এবং দেশের
প্রচলিত ধর্ম্ম-প্রচরণের সংশোধকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল । কেন না
খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দু সম্ভ্রান্তকে যেমন আতি ও সমাজ-চ্যুত হইতে হইত,
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে তাহার কোনো সম্ভাবনা ছিল না । তরুণবয়স্ক শিক্ষিত
হিন্দুনা দেখিল, কিয়দিন পূর্বে তাহাদের যে শাসকে নাস্তিসম্মূল, অসম্ভা-

প্রাকৃতিক-তত্ত্ব-বাহক ও দুর্নীতি-বোধক পৌরালিক বলিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত পরম সত্য নিহিত আছে। তাহারা দেখিল, পৌরালিক ধর্মের দ্বারা ঐষ্টান ধর্মের অবতার ও অনৈতিক ঐকরিক ক্রিয়াদি রহিয়াছে; কেবল দেশীয় জনাভাব ও নিলাভী পরিবার পরিচ্ছন্ন ভাবে যে প্রভেদ, নতুবা উভয় ধর্মই প্রায় সম-ধর্মাক্রান্ত। তাহারা দেখিল, নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম যে দোষে মুক্ত এবং তদ্ব্যতীত অবলম্বনে সমাজ-চ্যুতিরূপ ক্রোধ ও পিতৃ-মাতৃ-বর্জনেরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না, অথচ দেশী নিলাভী পৌরালিক ধর্মের হাতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাহারা আরও কত কি দেখিল : দেখিয়া, শুনিয়া, ভালরূপে বুঝিয়া ঐষ্ট-ধর্মের দীক্ষিত হইতে আর বড় অগ্রসর হইল না— অধিকাংশ শিক্ষিতগণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিল।

এ স্থলে বলা উচিত যে, আমরা সমাজের কথা বলিতেছি, ধর্মের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আপন আপন পরকালের কল্যাণ উদ্দেশ্যে যাহার যাহা ভাল বোধ হয়, তিনি সেই ধর্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু, তাহা বলিয়া সমাজকে নষ্ট করার অধিকার কাহারও নাই। ঈশ্বরকে যিনি যে ভাবেই ভাবুন, কিন্তু ঐহিক উন্নতি ও সুখ লাভের জন্ত সকলে সমবেত হইয়া এক মতে ও এক পথে চলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্তব্য। প্রবোধ বিষয়, ব্রাহ্মগণ তিষ্ঠা চলিতে পারিল না। কালে তাহাদের পদস্থলন আরম্ভ হইল। তাহাদের মধ্যে এক বোর অনিষ্ট আদিয়া জুটিল। ব্রাহ্মগণের মধ্যে দলদলি উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মগণ পূর্ণ সমাজ ও সামাজিকতাকে রক্ষা পূর্বক ব্রহ্মোপাসনার ইচ্ছুক। নব উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা সমাজ-বিপ্লব অভিলাষ করিতে লাগিলেন। মতের সামঞ্জস্য না হওয়াতে দীর্ঘ তাহারা দুই দলে পৃথক হইলেন। গোষ্ঠাক সঙ্গ্রামের মধ্যে আবার মত-ভেদ আরম্ভ হইল। কতকগুলি লোক খ্রী-সমাজের পূর্ণ নিয়ম চাইতে এককালে বহির্গত হইয়া নিতান্ত ইউরোপীয় ধর্মের দী-সদৌনতার জন্ত লোপুপ হইলেন। এইরূপে চিন্তু সমাধি নিশ্চল ভাবে হইতে এককালে অসম্ভব ও অপ্রাভাবিক উদ্যম-শালিতার উপস্থিত হইল। কিন্তু “কোনে দলবতা” কথাটা বড়ই ভয়ানক। ইহার ফল প্রায়ই বিষময় চইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে পিউরিটানগণ এক দিন বড়ই ফেপিয়া উঠিয়াছিল। ধর্মশাস্ত্রে

যেমন বলে, এবং যুক্তিতে খাধা কিছু ত্রাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত তাহারা তদনুরূপ উপস্থান, আচরণ করিতে সংকল্প করিল। দেশের প্রচলিত ধর্ম, রাজশক্তি, রাজ্যশক্তি, প্রধানী ও সামাজিক আচারে তাহাদের যুক্তিতে অনেক দোষ লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহারা সেই সমস্ত দোষের নিরাকরণ পূর্বক যাহাতে সমাজে শান্তিরূপ ও যুক্তিমূলক নিতান্ত উপাসনা ও আচার-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা নিশ্চিন্দ নয়। কিন্তু যে বিষয় আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আইসে, সে বিষয় উঠাইয়া বল পূর্বক অপবা যুক্তি দান পূর্বক সংস্কার এবং প্রতিষ্ঠা করা কখনই হইতে পারে না। নবরাতি প্রবর্তনের নিমিত্ত প্রকৃত শাস্ত্র প্রদর্শন ও যুক্তিমার্গ অবলম্বনই যথেষ্ট নহে। উচ্ছ্র প্রবর্তককে অগ্রে লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যিক। তাহার অভিপ্রায় যে সাধু, তিনি যে বর্ণাশ্রম সমাজের হিতৈষী, তিনি যে সকল রকমে একজন বিশেষ কাজের লোক, এমন বিশ্বাস অগ্রে জন্মাইয়া তাহার পর মাধুর্য্যভাবে সময় ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশেষ বৈধর্ম্যসহকারে লোকের হৃদয়কে পরিবর্তনের যোজ্য ধারণের ক্ষমতা প্রস্তুত করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাসে সিদ্ধ করিতে হয়। নতুবা লোক দিয়া সমাজের গঠা ছাড়িয়া সমাজগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অভিমান ও স্পর্ধারূপ উচ্চ স্থান আরোহণ করিয়া যুদ্ধে হাত দিয়া বাহাদুরীপরে গলা ছাড়িয়া ডাকিয়া বলিলেই হয় না, যে,—“ওগো! তোমাদের আচার ব্যবহারে বড় দোষ; তোমরা জানিতে পার নাই, আমি জানিয়াছি; তোমরা এই দণ্ডেই আমার পথে আইস—আর অন্ধকারে থেকে না!” এ অবস্থায় তাহার কথা শুনিয়া লোকে গ্রাহ্য না করিয়া যে করতালি দান ও বিক্রপের বিকট হাত পূর্বক তাহার গায় ধূলা নিক্ষেপ করিবে, সন্দেহ নাই। পিউরিট্যানদের সেই দশাই ঘটয়াছিল। তাহাদের সেই শুভ-চেষ্টায় যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের গোঁড়ামি, তীব্রতা, অবিজ্ঞতা এবং অপ্রাভাবিক তৎপরতা দেখিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। পিউরিট্যানেরা প্রায় হাসিত না, কোনো প্রকার সামাজিক আয়োজ উৎসবেই লিপ্ত হইত না, শোভাকর বসন ভূষণ শারণ করিত না, সর্বদা গম্ভীর ভাবে থাকিত, সকল কথাতেই ধর্ম্মতত্ত্ব আনিত, সকল

কার্যেই ঈশ্বরকে ডাকিত! উঠিতে বসিতে, খাইতে, শুইতে তাহাদের অঙ্গ-
ভঙ্গীও যেন কমন এক প্রকারের ছিল! এই সব কারণে তাহারা নিয়ত
হাস্তে আশ্রয় হইয়া উঠিল! এমন হইল যে, পিউরিট্যানদের দেখিবা মাত্রই
লোকে হাসিত, অসন্তোষের কথা কহিত! তাহারা যেন সমাজের সং হইয়া
উঠিল লোকে রাস্তা বাটে মাটিালগে তাহাদিগকে বা তাহাদের কথা লইয়া
রং করিতে লাগিল!

এমন বিতর্ক অভিপ্রায়েই এমন কল হটবার কারণ কি? তাহার কারণ
শুদ্ধ তাহাদের অতিগমন! সহজে অগ্রে অগ্রে স্বভাবের নিয়মানুসারে
উন্নতি সাধন না করিয়া তাহারা একেবারে একদিন সকল দোষ ও সকল
ত্রুটি নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইল, একদিনেই মানব প্রকৃতির সক্ষমতা
বুচাইয়া সম্পূর্ণতা সাধন করিতে চেষ্টা পাইল, যে দেশাচারের মূল শিকড় মত
যন্ত্র বর্জিত হইয়া পাতাল ফুঁড়িয়া বলিরাঙ্গার মস্তকে পিয়া ঠেকিয়াছে, এক
দিনেই তাহাকে উৎপাটিত করিয়া, তৎস্থানে নবতরুর বন্ধন করিতে যত্ন
করিল, সুতরাং অসন্তোষের সাগরে যেমন নিরাশ হইতে হয়, তাহাই হইল!

বাহাদের মনে নিচায়শক্তি অপেক্ষা কল্পনাশক্তি সমদিক ভেদবিধী—
বাহারা “হু” ও “কু” যে দিকে যখন যায়, সেই দিকেই তখন ঐশ্বর্যের
অতিরিক্ত গতিতে পমন করে, তাহারা ভিন্ন সে বলে যোগ দিতে অন্যের
কুচি হইবে কেন? লতি সমাচে এমন অতিগমনশীল লোক কজন থাকে?
সুতরাং সাধারণ সমাজকে তাহারা আকর্ষণ করিতে অশক্ত হইবেই হইবে।
লাভের মধ্যে তাহাদিগকে একটি পুত্ত্র সম্প্রদায় হইয়া থাকিতে হয়।

যে পিউরিট্যানদের কথা বলা গেল, তাহারা ইংলণ্ডে তৎকালে এত
প্রবল হইয়াছিল যে, রাজার মর্চন্ট ও শেষে পার্লামেন্টের সহিতও যুদ্ধ
করিয়া জয় হইতে পারিয়াছিল। চার্লস ভূপতির দোষের বিচার করিয়া
তাহাকে ফাঁসিতে বধ করিল এবং আপনারাষ্ট্র দেশাধিপ হইয়া উঠিল।
এত করিয়াও তবু তাহাদের নবপ্রণালীকে স্মার্ত্তে রাখিতে পারে নাই।
যেই মাত্র ফ্রমওয়েলের মৃত্যু হইল, অমনি পূর্ণ প্রণালী চকুতগ বলের
সহিত—পূর্ণাঙ্গের চতুর্থ দোষ গুণের সহিত পুনঃস্থাপিত হইয়া উঠিল।
“সর্বমত্যন্তং গর্হিতং” এই প্রাচীন জ্ঞানশাস্ত্র কোথায় যাইল? অতিগমন

গোড়ামী এবং লক্ষ-বাল্ম-নিশিষ্ট উন্নতির বিরূপ নৃশিষ্ট পোষিত সমাজ ভগ্ন পাইল। প্রকৃতি রুগ্ন হইলেন, সুতরাং সর্জনীয়তা ঈশ্বরও বিনুথ হইলেন ! পর্কতের মূষিক প্রদবের ন্যায় পিউরিট্যানদের এত আড়ম্বর, এত রক্তপাত, এত উগ্র অনুষ্ঠান, সব ব্যর্থ হইয়া গেল !

আমাদের সমাজেও এক্ষণে সেইরূপ উৎপাত আশস্ত হইয়াছে, সেইরূপ আতিগমনের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে। এই জন্যই পিউরিট্যান সম্বন্ধীয় কথা এত বাহুল্যরূপে বলিতে বাধ্য হইলাম ! আমাদের উন্নতিশীল ভায়াদের এই ইতিহাসখণ্ডকে স্মরণ করিয়া এখনও সাবধান হওয়া উচিত। আমরা উন্নতির বিরোধী নহি। উন্নতির অভিলাষী ! কিন্তু আমাদের সমাজকে ছাড়িয়া যদি যাই, তবে কাহাকে লইয়া উন্নতির রাজ্যে বসতি করিব ? সমাজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে উন্নতি, তাহা যদি অবলম্বন করি, তবে তো সমাজভ্রোহী হইলাম—সমাজ আমাকে আর বিশ্বাস করিবে কেন ? দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার তারতম্য বশতঃ এক দেশে এক অবস্থায় বাহা উন্নতি ; অন্য দেশে, অন্য অবস্থায় তাগ অধোগতিও হওয়া সম্ভব। তাহা বিচার না করিয়া পূর্বের দেখাদেখি উন্নত হইলে কি হইবে ? ল্যাপল্যাণ্ডের লোক প্যারিস ও লণ্ডন নগরের দেখাদেখি যদি হৃদয় অব বানাদি তাহাদের দেশে লইয়া যায়, তবে বরফের উপর সেই গাড়ী বোড়া কি চলিতে পারে ? না তদ্দেশীয় বঙ্গা-হরিণের গাড়ী প্যারিস, লণ্ডন ও কলিকাতায় ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব ?

সামাজিক পরিবর্তনের ধর্ম অতি আশ্চর্য্য। তাবাই হউক আর লোকাচারই হউক, ইহা কাহারো আজ্ঞায়, কাহারো বিনয়ে, কাহারো অর্থে, কাহারো বল-প্রকাশে কখনই রূপান্তরিত ও অবস্থান্তরিত হইবার নহে। ইহা যখন পরিবর্তিত হয়, (হৃদিকে, কৃদিকে যে দিকে হউক) তখনই যে কি কারণে কোথা হইতে কেমন করিয়া বটে, তাহার নির্দেশ করা বড় দুষ্কর। বড় বড় নোকের বড় বড় উদ্যোগে যেটা সিদ্ধ হয় না, হয় তো অতি সামান্যত্রে সামান্য লোকবিশেষ দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া উঠে ! হ্যামিণ্টন-নাথ ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রবিৎ মহাশয় সামাজিক উন্নতি উপলক্ষে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, “সকলেই

জানেন, বীণ অজুড়িত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িতে থাকে, কিন্তু সমস্ত দিবা রজনী সহস্র নব-চন্দ্র প্রদরীকরণে নিমুক্ত থাকিলেও সেই বৃষ্টি দেখিতে পাইবে না! অর্থাৎ যে চাণা কণা হই অজুলি ছিল, অথবা তাহা চারি অঙ্গুলি হইয়াছে, ইহা মাপিয়া পাইবে; কিন্তু এখন কতটুকু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা দর্শন করিবার স্রাণা নাই।" অতএব প্ৰভাতের এই নিয়মানুসারেই সমাজের উন্নতি ওয়া উচিত। তদ্বিষয় অন্য যত উন্নতি, তাহা অসম্ভাবিক, অধিক অথবা দোষায়িত।

উন্নতির বিরোধী আমরা নহি। উন্নতি চাই। কিন্তু তাই বলিয়া অসম্ভাবিক উন্নতি চাই না। যে সকল পরিবর্তনের জন্য সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা আমাদের সমাজের দাবিতে সংলগ্ন হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে হউক। সেগুলি সিদ্ধ হইলে, অন্য উন্নতির জন্য সমাজ সহজেই আবার প্রস্তুত হইবে। এখন যাহাকে অসম্ভাবিক বলিতেছি, তখন সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতন অনাগ্রামেই সম্ভাবিক হইয়া প্রবর্তিত হইতে পারিলে। হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পরিবর্তনোন্মুখ বলিতেই হইবে। গাহারা পুরাতনের নিত্যন্ত ভুল, তাহাধিপত্যকেও স্বীকার করিতে হইলে, যে, শিকার নূতন প্রণালী, যুগের নূতন প্রণালী এবং দৃষ্টান্তের নূতন প্রণালী যাহা বহুসংস্কারবিধি হিন্দু সমাজমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আপনাপনিই আচার ব্যবহারের কিয়দংশ পরিবর্তিত হইয়াছে এবং আর কতকগুলি অংশে পরিবর্তন না হইলে চলে না। সে পরিবর্তন হইবেই হইবে, তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে কাহারো সাধ্য নহে। কিন্তু সে পরিবর্তন কোন দিগে, কি পরিমাণে কতদূর হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এবং তাহাতে মঙ্গলামঙ্গল কতদূর সাধিত হইবে, তাহা এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা দুকর। এই মাত্র অশ্বাসন হইতে পারে, যতদিন সেইরূপ কতকগুলি ভাবান্তর না ঘটিতেছে, ততদিন সমাজের স্বার্থ সামাজিকের স্বিন্নরূপেও দাঁড়াইতেছে না।

বর্তমান হিন্দু সমাজের যে অবস্থা, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাকে সমাজ বলি, কি, কি বলি ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না। এই প্রবন্ধের

আরন্ত্রেই সমাজ কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে । আমাদের মধ্যে তাহা কৈ ? সমাজের সে সব সর্বজনমান্য নিয়ম কোথায় ? এমন স্থান নাই যেখানে প্রাচীন নবা ও শিক্ষিত অশিক্ষিত এক প্রকার নিয়মে চলিতেছে ? এমন সংসার প্রায় দেখি না, যাহাতে পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, ভ্রাতার ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী পুরুষে এক ভাবে—এক প্রকার—এক ব্যবহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে ! সুত্রে বাটতে একটা ব্রাহ্মণ আনিলেন, পিতা প্রণাম করিয়া ভক্তি পূর্বক আগম দিলেন ; পুত্র “নমস্কা” বলিয়া হাস্য করিয়া চলিয়া গেল ! পিতার বন্ধু আগত, পিতা নমস্কার করিলেন ; পুত্রের বন্ধু আগত পুত্র “সেকুহাও” করিলেন ! মাতা সুবচনীর আনিপান দিতেছেন, কন্যা বা পুত্রবধূ ব্রাহ্মণ্য পুস্তক পড়িয়া পৌত্তলিকতার প্রতি বীতংস-রসে গলিয়া যাইতেছেন ! কর্তা দণ্ডকায়ার আরতির সময় চামর হস্তে দেবীকে ব্যঞ্জন করিতেছেন এবং কর্তা সন্ধিপূজাব্যমানে ঢাকের বাদ্যের সহিত পুত্র কন্যার কল্যাণে মাধব ধূনা পোড়াইতেছেন ; সেই কালে পুত্র স্বীয় ভৃত্য ও ভাণ্ডার সঙ্গিত পোষাক পরিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে গমন করিতেছেন ! স্ত্রী আসনে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, স্বামী পাহুকা পাগ সমোপবস্তা হইলেন দেখিয়া স্ত্রী সন্তোষে বিনীত ভাবে “উর্ছ” বলিয়া নিষেধ করিতেছেন ! স্ত্রী গ্রহণের সময় তুল, বস্ত্র উৎসর্গ করিতেছেন, স্বামী “হো হো” শব্দে হাসিয়া সেই সময় আহার করিতে বসিতেছেন ! গ্রামস্থ বৃদ্ধ মহাশয়েরা “কলিকাল কলিকাল” বলিয়া নব্য-তন্ত্রের ব্যবহারে স্মৃত্তান্তিক ঘটনা প্রকাশ করিতেছেন ; নব্যতন্ত্র এ সময়কে “সত্যযুগ” করিবেন, এমত আশা করিতেছেন, কেবল এই করজ্ঞান স্থবিরের গতানু হওনের অপেক্ষা !

একপ দৃষ্টান্ত কত বলিব ? এমন বিসদৃশ, বিরুদ্ধ জনাকীর্ণ জাতিকে কি এক বলা যায় ? যত দিন না ইহাদের সামঞ্জস্য হইবে—যত দিন প্রজাতীয় মধ্যে সম্পূর্ণ সমবেদনা ও সম্মততা না জন্মিবে—যতদিন সামাজিকভাবে প্রাণাপেক্ষা স্বার্থীয় বলিয়া আবল বৃদ্ধ নরনারী সকলের দৃঢ় মমতা ও সকলের মনেই এক সমাজকে আমাদের সমাজ বলিয়া প্রত্যয় হইবে, ততদিন হিন্দু-সমাজকে স্বার্থ সমাজপদে স্থাপিত করা ভার !

[ক্রমশঃ

জীমুনোমোহন বসু ।

গান ।

১

ললিত—কাওয়ালি ।

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার)
কি হ'ল কি হ'ল রে অকরে !
ভূমি ত্রিভুবন মন
করে কার অবেষণ,
কাতর নয়ন কার তাপ !
ভ্যজি এই মর্ত্য-ভূমি,
কোথা চ'লে গেলে ভূমি
কি জানি কি অভিমান-ভরে !

২

ললিত—কাওয়ালি ।

(অহহ !) সমুখে স্মরণ একি !
দেবি, দাঁড়াও নয়ন ত'রে দেবি !
তাজেছ মানব-কায়া,
আজো তাজ নাই মায়া
একি অপকণ ছায়া—একি !
করণ নয়ন দুটি
তেমনি রয়েছে দুটি
তেমনি টাচর কেশ বেশ,
মলিন মলিন্ মুখ
কেন পো কিসের হুখ,
ভালবাসা মরণে মরে কি !

ঐবিহারিলাল চক্রবর্তী ।

অদৃষ্টবাদ ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

আগুণে হাত দিল'ন, হাত পুড়িয়া গেল ; জনে উত্তাপ দিলাম, বাষ্প হইয়া গেল ; দুয়ারে আঘাত করিলাম, দুয়ার ভাঙ্গিয়া গেল, এ সকল স্থলেই এক একটা কার্যের পূর্বে এক একটা কারণ বর্তমান । আমরা আগুণকে হাত পোড়ার কারণ বলি, জল এবং উদ্ভাপকে বাষ্পের কারণ বলি, এবং আঘাতকে দুয়ার-ভাঙ্গার কারণ বলিয়া মনে করি । ইহা ব্যতীত অত্র কোন ঘটনাক্রমেই তাহা বলি না কেন ? অস্বাভাবন করিলে দেখিতে পাই যে, আগুণ বা আঘাত এই উভয় শ্রেনীর কারণই তাহাদের কৃত কার্য্য সকলের পূর্ববর্তী । এইরূপ সকল স্থলেই দেখিতে পাই যে, আমরা যাহাকে কারণ বলি তাহা তাহার কার্য্যের পূর্ববর্তী হইয়া থাকে । কিন্তু তাই বলিয়া সকল পূর্ববর্তী ঘটনাক্রমেই কারণ বলি না । হাত পোড়ার পূর্বে, বাষ্প হইবার পূর্বে, দুয়ার ভাঙ্গার পূর্বে, অন্ত্যাত্ম অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে, অথচ আমরা তাহাদিগকে কারণ বলি না । যেখানেই দেখিয়াছি, হাতে আগুণ লাগিয়াছে সেই খানেই দেখিয়াছি হাত পুড়িয়া গিয়াছে, যেখানেই দেখিয়াছি জলে আর উত্তাপে সংযোগ, সেই খানেই বাষ্পের উৎপত্তি ; যেখানেই দেখিয়াছি দুয়ার ভাঙ্গিয়াছে, তাহারই পূর্বে কোন না কোন প্রকার শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছি । এইরূপ সকল স্থলেই কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ববর্তী । কিন্তু রজনী দিবসের নিয়ত পূর্ববর্তী । তবু আমরা রজনীকে দিবসের কারণ বলি না কেন ? আমরা দেখি যে রজনী হইলেই যে পরে দিবস হইবে আর রজনী না হইলে যে দিবস হইবে না ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই । সূর্যোদয় না হইলে অনন্ত কাল পৃথিবীর দুখ অন্ধকারে ঢাকা থাকিলেও দিবসের উৎপত্তির কোন সম্ভাবনা দেখি না । অথচ আজ হইতে যদি সূর্য্যদেব অন্ত গম্বতী করেন, কখন রাজি না হইলেও চিরকাল দিবসের আশোক দেখিতে পাইব । অতএব দেখা যাইতেছে যে রজনীর পর দিবস হওয়া পক্ষে সূর্য্যো

স্বয়ং নিত্যান্ত আবশ্যক । এই জন্ত স্বর্গ্যকেই দিনের কারণ বলি, রাত্রিকে বলি না । কারণের কার্য্য নিরপেক্ষ (Unconditional) হওয়া আবশ্যক । স্বর্গ্যোগ্য হইলেই দিন হইবে, স্বর্গ্যের এই ক্রিয়া আর কোন ঘটনার অপেক্ষা করে না ।

গাণধারিতঃ কার্য্যকারণের মধ্যে এই লক্ষণগুলি দেখান হইয়া থাকে । গিল্ কারণের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে এই কয়েকটি ছাড়া আর কোন প্রকার লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই ।* কিন্তু, আজকাল, বৈজ্ঞানিকেরা কার্য্য এবং কারণের মধ্যে আর একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন । সকল স্থলেই কার্য্য এবং কারণের মধ্যে প্রকার এবং পরিমাণগত একটি অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধ লক্ষিত হয় । অর্থাৎ কারণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ ভেদে কার্য্যেরও প্রকৃতি এবং পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে । অর্থাৎ কতটা পরিমাণ উত্তাপে কতটা পরিমাণ আলোকের উৎপত্তি হইবে, অথবা কতটা পরিমাণ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে কতটা পরিমাণে আলোকের উৎপত্তি হইবে ইহার একটি নিয়ম আছে । আধুনিক বৈজ্ঞানিকবিদের মধ্যে এই নিয়মটির সম্বন্ধে এক প্রকার মত ভেদ নাই, সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্যেই এই বিশ্বাসটি নিহিত † । এই নিয়মটি যেমন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার কার্য্য কারণের নিয়মের নিত্যতা এবং সর্ব্বস্থল-প্রয়োগিতা ধরিয়া লইলে, তাহা হইতে যুক্তি দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে । অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা কার্য্য কারণের মধ্যে এই কয়েকটি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া থাকি ।

১। কারণ কার্য্যের নিরন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে ।

২। প্রকৃত কারণের কার্য্য নিরপেক্ষ ভাবে হইয়া থাকে ।

* We may define therefore the cause of a phenomenon to be the antecedent or concurrence of antecedents on which it is invariably and unconditionally consequent.

† The conclusion tacitly agreed on by physicists is not only that physical forces undergo metamorphoses, but that certain amount of each is the constant equivalent of certain amount of others.

H. SPENCER, *First Principles*.

৩। কার্য এবং কারণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ গত একটি অপরিবর্ত্তীয় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়।

কিন্তু এ সমস্তই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমা বর্ত্তমান এবং অতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যতে এই নিয়ম কতদূর প্রযুক্তা তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে বলিতে পারা যায় না। আমরা যে বিশ্বাস করি যে এই নিয়ম সকল সময়ে এবং সকল স্থলে খাটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কখনও কোথাও যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে তাহা আমরা কখনা করিতেও পারি না। মিল্ প্রকৃতির মতে এ বিশ্বাস জন্মান্বক। কিন্তু সে কথা থাক। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান ইহার বেশি যাইতে পারে না; কেবল বিজ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইলে এ বিশ্বাসের ভূমি কেবল অভ্যাস (custom) ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে বাহাই হউক, এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, আমরা যে যে লক্ষণ দ্বারা জড়জগতের ঘটনার মধ্যে কার্যাকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই, ঠিক সেই সেই লক্ষণ অন্তর্জগতের ঘটনাস্থলের মধ্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে। মাত্র তাহাই নহে। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের মধ্যে পরস্পরে যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যেও আবার এই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান। অর্থাৎ অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ যে স্বতন্ত্রভাবে এই নিয়মের অধীন, তাহা নহে, এই দুই জগৎ পরস্পরে পরস্পরের সহিত এই নিয়মে বদ্ধ। কখনও বহির্জগতের শক্তি অন্তর্জগতের উপর কার্য করিতেছে, কখনও অন্তর্জগতের শক্তি বহির্জগতের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে।

বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট থাকিয়া আমরা কখন কখন কোনও ব্যক্তিকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখি, কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি না; কখন বা কাহাকেও দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হয়, কিন্তু সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হইলেই তাহার আর কোনও তত্ত্ব লই না; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার যখন কোনও বস্তুকে দেখিতে পাই, অমনি চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আমরা চিন্তা জুগিয়া যাই, ক্ষুদ্রের গেমের উদয় হয়, সদরে বস্তুকে আলিঙ্গন করি। প্রথমত, আমার মনের উপর মাত্র

ইন্দ্রিয়জ্ঞানজনিত একটু পরিবর্তন হইল, তাহার কারণ অবশ্য কতক অন্তরে কতক বাহিরে। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর একটু দর্শনমুখ অমুহূত হইল, জ্ঞান হইতে ভাবের উৎপত্তি হইল। তৃতীয়ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর ভাববোধ হইল, কিন্তু তাহাতেই ইহার শেষ হইল না; ভাবের আধিক্যবশত; তাহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিলাম; শরীরের মধ্যে পরিবর্তন বিশেষ উপস্থিত হইল, প্রেমের সহিত বন্ধকে আলিঙ্গন করিলাম। কেহ কেহ বলেন, ঐ খানেই কার্যাকারণশৃঙ্খলের শেষ। উপসূক্তরূপ প্রাকৃতিক কারণ থাকিলেও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ না হইতে পারে। কিন্তু একথা কতদূর প্রামাণিক বা সমস্ত বলিতে পারি না। আমরা কি সকল সময়েই দেখি না, অন্য কোন প্রকার নাসনা উপস্থিত না হইলে প্রেম আলিঙ্গনের নিয়ত পূর্ববর্তী? এইরূপ প্রত্যেক ইচ্ছা শক্তি প্রকাশের মূলেই দেখিবে কোন না কোন প্রকার প্রাকৃতিক কারণ রহিয়াছে। উদ্দেশ্যশূন্য - বাসনামুখ্য, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ আমরা কোথাও দেখি নাই। যেখানেই ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ দেখি, সেই খানেই দেখি একটা না একটা বাসনা রহিয়াছে। বস্তুত এখানেও কার্যাকারণ লক্ষণ গুলি দেখিতে পাই। কষ্ট পাইলে তদ্বিমোচনে বস্তু পাই, সুখ পাইলে তাহা ভোগ করিবার চেষ্টা হয়, রাগ হইলে আততায়ীর প্রতি আক্রমণ এবং উপকার পাইলে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, অন্যায় কার্য করিলে আশ্রয়ানি এ সকল মূলেই আমরা পূর্বকথিত লক্ষণ গুলি দেখিতে পাই। এখানেও দেখি কার্যের পূর্বে নিয়ত তাহার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এখানেও দেখি কারণের প্রকৃতি ও পরিমাপ অমুসারে কার্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদ হয়। ক্রোধের পরিমাণামুসারে প্রতিশোধ-চেষ্টারও পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। উপকারের পরিমাণামুসারে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। এখানে সকলকেই স্বীয় অন্তরেপ্রিয় সাক্ষীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। মুক্তি প্রত্যক্ষ বিষয়ে কিছু বলে না। এই যে অনন্তবিলম্বিত ভড় জগৎ আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, যদি কেহ চক্ষু খুলিয়া বলে যে সে ইহার কিছুই দেখিতেছে না অবশ্য মুক্তি দ্বারা তাহাকে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় না। কেহ বলিতে পারেন কেন আমি কি মনে করিলে বন্ধকে দেখিয়া আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না।—আমি বলি, হ্যাঁ, মনে

করিলে পারিতাম, কিন্তু মনে করারও কোন কারণ থাকা আবশ্যিক। আমি যাহা মনে করি সেইরূপই ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি বটে, কিন্তু আমি যেক্রম মনে করি সেইরূপ মনে করিতে পারি না। বাসনার রাজ্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। হইতে গেলে, অন্য কোন বাসনা দ্বারা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়। ইচ্ছাশক্তির পূর্বে বাসনার রাজ্য। মনে করুন, সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন যে, এই যে সূচি-মোত্তা-শোভিত পাত্র সমুদ্রে বর্তমান রহিয়াছে, আর তিনি একজন ব্রাহ্মণকুলতিলক দেখানে বসিয়া আছেন, আমাদের মতে এখানে যেক্রম কারণ সমাবেশ হইয়াছে, নিশ্চয়ই শৌত্র জনার্দনের সিংহাসন টলিবার কথা। কিন্তু তবু যে সম্পাদক মহাশয় কিয়ৎ কালের জন্য 'ভোজনের জনার্দনঃ' এই শাস্ত্রীয় মহাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমায় বলিতেছেন—কই এখানে যথেষ্টরূপ এবং বিশিষ্টরূপ কারণ সমাবেশ সত্ত্বেও তিনি তো দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ বন্ধ করিলেন। আমি বলি, হে ব্রাহ্মণ-কুল-পুত্র যদিও অণুকালের জন্য দুর্বলি বশতঃ শাস্ত্রীয় বাক্য লঙ্ঘন করিয়া নরক গমনের উপায় করিতেছেন, অমুখ্যবন করিলে বুদ্ধিতে পারিবেন যে, এই মহাপাপের কোন কারণ আছে। নতুবা আপনার যে কুলে অমুখ্য আপনার পক্ষে এ মহাপাপ অসম্ভব। বাস্তবিক আমাকে তাঁহার ক্ষমতা দেখানই কি এই বাবহারের কারণ নয়? মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করিলে যে কি কষ্ট পাইতে হয় তাহা সম্পাদক মহাশয় বুঝিতেছেন। এং বোধ হয় এই পাপের জন্য তাঁহার কিছুদিন নরক-ভোগ হইবে। বস্তুতঃ যেখানেই মনে হয়—কোন কারণ বাতীত কার্য করিতেছি সেইখানেই বুঝিলে এইরূপ একটা না একটা কারণ আছে দেখিতে পাইব।

তবে, আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অন্তর্জগতের নিয়ম সকলও সম্পূর্ণরূপে এই বিশ্ববাপী নিয়মের অধীন। কার্য-কারণের শৃঙ্খল যেমন বহির্জগৎ তেমনি অন্তর্জগতকে বাধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এতক্ষণ আমরা অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতকে পৃথক করিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার একবার উভয় জগৎকে একত্রিত করিয়া দেখা যাউক। পূর্বে বলিয়াছি মনুষ্যজীবন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক শক্তির দ্বািত্ববাদের ফল।

ইঙ্গিতজ্ঞানকে প্রথমে আমরা মানসিক ক্রিয়া মনে করিয়া লইয়া তাহার সহিত ভাব ও ইচ্ছার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছি। এখন দেখা যাউক এই ইঙ্গিত-জ্ঞানের সঙ্গে বাহ্যিকের কিরূপ সম্বন্ধ। পূর্বেই বলা হইয়াছে কিছু দূর পর্যন্ত মানসিক শক্তিতে বাহ্যিক শক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে। বিশেষ মনোযোগের সহিত কোন কার্যে নিবিষ্ট থাকিলে হয় ত ছোট্ট একটা শব্দ কর্ণশ্রবণের উপর ক্রিয়া করিলেও শব্দবোধ না হইতে পারে। কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে। মানসিক চিন্তা যতই প্রবল হউক না কেন কামানের আওয়াজ, আগার শুনিতেই হইবে। বাহ্য হউক মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা এক দিকে, অপর দিকে বাহ্যিকশক্তির ক্রিয়া এই দুইয়ের মিলনে আমাদের ইঙ্গিতজ্ঞান। বাহ্য শক্তির উপর আমার হাত নাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমার মানসিক অবস্থা তৎপূর্ব্ববর্তী মানসিক অবস্থা ও অল্প কোন বাহ্য শক্তির সংযোগে ঘটনা থাকিবে। এইরূপ যতই পিছাইয়া যাই, কোথাও কার্যকারণ-শৃঙ্খলের শেষ পাই না।—কারণের পর কারণ, তার পর কারণ; এই করিতে করিতে জন্মের মুহূর্ত্তে পৌছিব। সেইখান হইতেই দুই শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। যে মানসিক ঘটনা লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়। পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত। যে অবস্থার মধ্যে জন্মিলাম তাহাও আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়। কিন্তু এই দুই অংশের একত্রীকরণেই জীবন। আমার ভবিষ্যৎ, সেই পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত মানসিক গঠন আর সেই পিতৃ-মাতৃ-কৃত অবস্থা ও সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ হইল। তার পর, ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা আমাকে যেমন আক্রমণ করিতে লাগিল, আমার মধ্যে তেমন পরিবর্তন হইতে লাগিল; জ্ঞান, ভাব প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত জীবনকে পরিবর্তন করিতে লাগিল।—আরও পিছনে দেখিলে দেখিব, আমার পিতা মাতার জীবন আবার সেইরূপ তাহাদের পিতৃ-মাতৃ-কৃত দেহ মন ও বাহ্য ঘটনা সমূহের ফল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বিশ্বব্যাপী কার্যকারণ-শৃঙ্খল অবশেষে রাজ্যে পিয়া পড়ে। অত্যন্তদূরীণ শক্তি যেমন আমাদের অনন্ত অনাদি কার্যকারণ শৃঙ্খলের

মধ্যে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ এই যে মনীষাত্মক আমার সমূহে রহিয়াছে ইহাও অনন্তের শৃঙ্খলের একটি অংশ। অন্তর্জগতের উপর বহির্জগৎ, বহির্জগতের উপর অন্তর্জগৎ মুহূর্তে মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য করিতেছে। কত বাহ্য ঘটনা আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছে। আবার কত আশা কত ভরসা এক দিনের ভৌতিক ঘটনায় নির্মূল হইয়া যাইতেছে। মানুষের ক্ষমতার সীমা আর কিছুই নয়, বাহ্যশক্তির উপর আভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত; মিলের (Mill) Fatalism ও আর কিছুই নয় আভ্যন্তরীণ জগতের উপর বাহ্যশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত। জগতের সর্বত্রই এই দুই শক্তির ঘাত প্রতিঘাত। সামান্য বালুকাকণাটি স্থানান্তরিত করণ হইতে মহা মহা সমাজবিপ্লব পর্যন্ত এই দুই বিপরীত শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে উৎপন্ন। অন্তর্জগৎ, কি বহির্জগৎ, কোথায়ও কার্য কারণের শৃঙ্খলের শেষ নাই।—আমাদের জীবনের মুহূর্তে মুহূর্তে এই দুই অংশ আবার কার্যকারণ সঙ্গজে বদ্ধ হইতেছে এবং উভয়ের ঘাত প্রতিঘাত আমাদের জীবনরূপ ঘটনা ত্রৈণীকে উৎপন্ন করিতেছে।

[ক্রমশঃ

ঐশ্বর্যদ মিত্র।

হেমচন্দ্র ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

গঙ্গার উপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার নাম আনন্দ গ্রাম। সচরাচর লোকে তাকে আনন্দ গাঁ বলে। অনেক কালের প্রাচীন ভাঙা ঘাট। সেই ঘাটের উপর এক প্রকাণ্ড বটগাছ। বটমূলে দেবশিলা। তাহা আনন্দগাঁয়ের বাবাঠাকুরতলা বলিয়া বিখ্যাত। সেখানে পূজা দিবস জন্য বহুদূর হইতে যাত্রী আগন্ত। ঠাকুর বড় আশ্রিত। আজ সেই বাবাঠাকুর তলায়ু ত্রীশোকের ভিড় আর ধরে না। কেহ নবীন—প্রীতিভরে কোমল

দেহ নত হইয়া পড়িয়াছে কেহ প্রাণী—আপনার শুকনো আপনাই ভাবস্বরূপ হইয়াছে; মাঝে মাঝে বালিকা—কেহ হাসিতেছে, কেহ খিঁচিতেছে, কেহ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আবার কেহ বা ছুটিয়া আসিয়া মদিনীর অঞ্চল ধারণ করিতেছে নিত্য বালিকা বাতীর সকলেই রত্নস্নান, আঙ্গুরকেশনি শিখাবন্ধনী গইয়া পৃষ্ঠদেশে ফুলিতেছে হাত এক এক ঘটি জল, সেই জল একে একে বাবাঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দিতেছে। সকলেই যে বলবৎ হইয়া এক লগ্নে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে কেহ জল ট লিতেছিল, কেহ জল ঢালিয়া চলিয়া যাঁতেছিল, কেহ বা স্নানান্তে জল ঢালিতে আসিতেছিল। তথাপি সে ভিড় কমে না। প্রহর বাড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল। বেলা যখন দশটা, তখন বাবাঠাকুরতলা প্রায় জনশূন্য। শ্রোতের জনের ন্যায় সে জনতা কোণার সরিষা গিরাছে। যে দুই এক জন করিয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। কতকণ পরে, দীরে দীরে একটি বালিকা চলতে সেই স্থলে আসিল। বালিকা একা। বয়স অস্থান এগার পার হইয়াছে। এ অল্পবয়সেই দেখে অধুনা ধরে না। বালিকা আসিয়া দীরে দীরে বাবাঠাকুরের মাথায় জল ঢালিতে আরম্ভ করিল। জল বাবাঠাকুরের মাথা হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া বটমূল ভিত্তিতে লাগিল।

অগ্নির নদীর উপর একখানি ছোট ভাউলে। তাহা সেই বটমূলের শিকড়ে বাঁধা ছিল। মাগিরা ডান্ডায় উঠিয়া তখন আহাৰাদির উদ্যোগ দেখিতেছিল। ভাউলের মধ্যে একটা বাবু ভিন্ন আর কেহই ছিল না। গাওঁলার ত্রীলোকের ভিড় দেখিয়া সে বাবুও অনেকক্ষণ ভাউলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দূর হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন—অপরূপ দৃশ্য। তখন সূর্যের ডেজ বাড়িয়াছিল; সূর্যের সেই অপরূপ বটপত্রের অগ্রভাগ হইতে করিয়া করিয়া বালিকার মুখমণ্ডলে পড়িতেছিল; বাতালে তখন বালিকার গায়ে কাপড় একটু একটু সরিয়া পড়িতেছিল। যে জল ধনানী ফুলিয়া পৃষ্ঠদেশে গড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা উড়িয়া সূর্যের উপর ফাপিয়া পড়িতেছিল, বালিকা ভক্তভাবে একাগ্রভিত্তে বাবাঠাকুরের মাথায় জল ঢালিতেছিল, চিত্তার্ণবের ন্যায় দাঁড়াইয়া বাবু

তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বালিকার রূপ দেখে ধরে না, লাভণ্য উজ্জলিলা পড়িতেছে। উষার মুহুর্তস্পর্শে সন্ধ্যঃপ্রোক্তিঃ শতনগের ন্যায় মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে। সেই মুখে সেই কৃষ্ণতার নয়নভটি সেই টুকটুকে হাসিহাসি চোঁটে হুখানি মুনিজন্যর মনোমোহন। অলপপ্রভাৎ নিখুঁত, লক্ষ্যানন্দময়, তাহা দৌকুমার্যের আগার স্বরূপ। পৃষ্ঠের উপর রাশীকৃত কৃষ্ণ কেশের গদা দিয়া সে দৌকুমার্যের মধুরমোহিতঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। অলপপ্রভাৎর মধ্যে নাকে একটি মূলক, হাতে গাছকতক বেণোয়ঃরি চূড়ি, আর পায়ে চারিগাছি মল। এ স্বপ্নপ্রতিমা সাংঘাটলে আরও না জানি কত শোভা দখিত !

অচণ্ডলোচনে বাবু দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ঘাটে এক বুড়া দান করিতেছিল। সে বাবুকে তদন্তর দেখিয়া একটু মুহু হাসিল। সে হাসি নিরর্থক হইল না, বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন; তাহার অর্থও বুঝিলেন। বালাকাল হইতেই একরূপ মুহু হাসির সহিত তাহার বপেট পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি প্রকাণ্ডো কিছু বলিলেন না। বুড়া তাহার মনের ভাব বুঝিল। বলিল—“সেই পর্য্যন্ত রেবেদ দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছেন?” বুড়া উত্তর পাইল না। একটু নিকটে আসিল, তাবার সেই প্রশ্ন করিল।

বাবুর চমক ভাঙিল। কে জানে কেন মনের ভিতর আশার ঈষৎ বৈজ্ঞাত্যী খেলা খেলিল। তাহা বুঝা আগে কথা স্মরণ করিয়াছে, কথা কহিবার সুযোগও ঘটিল। বলিলেন—“এ মেয়েটি কাদের গা?”

ওটমূলে বাবাঠাকুরের নিকটে সেই বালিকাকে বাবু দেখাইলেন। বুড়া তাহা দেখিল। দেখিল, তখন বালিকা অল ঢালা শেব করিয়া জাহ্নু পাতিয়া বসিয়াছে, বসনাগ্রভাগ ঢুলের উপর দিয়া গলা বেড়িয়া হুই হস্তে বন্ধ হইয়াছে, সেই হুই হস্ত অঙ্গলিধর, নয়ন মুদ্রিত, স্বর্গীয় প্রেমে মুখাওল অপূর্ণ স্ত্রী ধারণ করিয়াছে। বালিকার সেই ভাব দেখিয়া মুহূর্তের জন্য বুড়া অন্য কথা জুলিয়া গেল। একদৃষ্টে সেই চিত্র দেখিতে লাগিল।

বাবু বলিলেন—“বল দেখি, এ দেখিলে রোদরুটি কি জান থাকে?”

বুড়া বলিল—“সত্য, বসন্তভী আমাদের স্বার্থই লক্ষ্যী।

• বাবু বলিলেন—“বালিকার নাম বসন্তভী! মেয়েটির আন কে আছে?”

‘‘আহা ! সে কথা আর বলবেন না । রাজা বাপের মেয়ে, ছুই ভাই যেন শোণার কার্তিক । সে বাপ ভাই পেঁচে থাকলে আর কি ও মেয়ের এই দশা হয় ?’’

‘‘এখন তবে কে আছে ?’’

‘‘থাকিবার মধ্যে একা মা । সন্ত্রাস্ত্রাঙ্গের মেয়েও আর দেখিব না ।’’

‘‘উদ্ধারের তবে চলে কেমন করে ?’’

‘‘মেয়ের মামারা আছে । তাহারা এই দেখে শুনে ।’’

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবু বলিলেন—‘‘বিবাহ হইয়াছে ?’’

‘‘তবে আর বলিতেছি কি,—না ।’’

বাবুর জন্মে মারাবিনী আশা আবার আপন প্রতিবৃ্ত্তি স্থাপন করিল । কতক্ষণ পরে বাবু বলিলেন—‘‘আপনাকে একটি ভক্ত পরিবারের এত ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি সে অন্য মনে কিছু ভাবিবেন না ।’’

বৃদ্ধা বলিল—‘‘আমি তাহা ভাবিতেছি না, আমি ভাবিতেছি আর দাঁড়াইয়া থাকিবেন কতক্ষণ ?’’

‘‘দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি তো হয় না, তবে কেমন করিয়া বলিব আর দাঁড়াইয়া থাকিব কতক্ষণ ? এ স্বর্ণ প্রতিমা যার গৃহ উজ্জল করিবে সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান ।’’

বৃদ্ধা একবার বাবুর দিকে চাহিল । অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে বুড়ী হইয়াছে । মনে মনে বলিল, বাবুর মনের ভাব যদি ইহা না হয়, তবে বৃথাই আমার চুল পাকিয়াছে !

নবম পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে । ঘরে ঘরে সন্ধ্যার কার্যের আয়োজন পড়িয়াছে । গ্রামের মেয়েরা কেহ গা ধুইতেছে, কেহ গা ধুইয়া আসিতেছে, কেহ জল আনিতেছে, কেহ পানীয় জালিবার উদ্যোগ করিতেছে । নন্দমণ্ডীর

মাতা রকে বসিয়া পা তড়াইয়া শলিতা পাকাইতেছেন, নিকটে বসিয়া বহুমতী এক একটি করিয়া শলিতা গুলি জুড়াইতেছে ; এমন সময়ে কে ডাকিল—
 “কৈ গো তরফদারদের মেয়ে বাড়ী আছে ?” বহুমতীর মাতার বাপের পদবী তরফদার । মাতা বুঝিলেন, ব্রহ্ম ঠাকুরণ আসিয়াছেন । বলিলেন—“এস মা এস, অনেক দিনের পর যে গা ?” ব্রহ্ম ঠাকুরণ রকে উঠিলেন । মাতা বহুমতীকে বলিলেন—“বাও মা, ঘর হইতে আপন আনিয়া তোমার দিদিকে বসিতে দাও ।” বহুমতী আসন আনিয়া দিল । ঠাকুরণ বলিলেন বহুমতী বলিল—“দিদি আমাদের বাড়ী আর আস না কেন গা ?”

ব্রহ্ম ঠাকুরণ বলিলেন “আর ভাই, একে বুড় হইয়াছে, পুণ্য আত্মিক, খাওয়া দাওয়া করিতেই বেলা কেটে যায় । তার উপর আজ কাল আবার আরও একটা নতুন কাল ঘুটেছে ।”

“নতুন কাল কি দিদি ?”

“এই আইবুড় নারিনীদের ঘটকালি করা ।”

“কর আবার ঘটকালি হলো ?”

“ঘর জন্যে এসেছি ।”

বহুমতীর মা বলিলেন—“মা আমার কত রঙ্গই জানেন !”

“ওলো না বৌমা, সত্যি তোমার মেয়ের জন্যে বর ঠিক করেছি ।”

এমন সময়ে কে ডাকিল—“বহু আর গো, গা দুতে ঘাবি যদি আর, মঙ্গলা তোকে ডাকচে ।”

বালিকা প্রত্যাহই মরলার সঙ্গে গা দুইতে যাইত । প্রত্যাহ মঙ্গলা তাহাকে ডাকিত । মঙ্গলাদের বাড়ী তাহাদের বাড়ীর গায়ে । বালিকা বলিল—“দিদি বদ, আমি গা দুইয়া আসি ।” এই বলিয়া ছুটিয়া মঙ্গলাদের বাড়ী গেল ।

ব্রহ্ম ঠাকুরণ বলিলেন—“বৌমা তোর মেয়ের বিয়ের কি কচ্চিস্ মা ?

“আমি আর কি করিব মা, তোমরাই পাঁচ জন আমার ভরসা ।”

“তোমার ভাইয়েরা কি বলে ?”

“ভাইারা তো চেঠা দেখিতেছে, বলে ভাল পাজ পাওয়া দার ।”

“তোমার মন ভাল, ভগবান অবশ্যই তোমার ভাল করিবেন ।”

“আর মা, ভগবান যদি তাই কণ্ঠে ন। তবে আর এ দশা হতো না ।”

“কি কল্পে, সব কণ্ঠের ফল । কিন্তু এই মেয়ে হতে তুমি মুখী হবে ।”

“তুমিও যেমন, যুগ-চাওয়া সামগ্রী, ও আবার বাঁচবে, আমি আবার ওর হতে মুখী হব !”

“সে কি মা, তোমার এই কথা বলবার জন্যই আর আমি এসেছি ।”

এই বলিয়া অক্ষঠাকুরণ সেট বাবুটির কথা পাড়িলেন । বলা বাহুল্য, যে বুদ্ধা প্রাতে স্নান করিতে করিতে সেই বাবুর সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তিনিই অক্ষঠাকুরণ । প্রাতঃকালে সেট সমস্ত কথাবার্তার পর, বুদ্ধা দুই প্রহরের সময় আর একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিল । দুট জনে অনেক কথা হইয়াছিল । কিন্তু, সে সব কথা এখন বলিয়া কাজ নাই । বুদ্ধা টিপিয়া টিপিয়া সেই বাবুর সহক্ষে কত কথা বলিলেন । সেই কথার মধ্যে কত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, কে তাটা গণনা করিবে ? সে বাবু কত টাকার মাহুয, অমিহাবি কত বিদ্বৎ, অক্ষ ঠাকুরণ সে সকল কথা বলিতেও ভুলিলেন না । পাছে কেহ ভুলিতে পার, ভুলিয়া পাঁচ লক্ষতে পাঁচ রকমে ভাড়াভাঙি করে, এই জন্য এ দিক্ ওদিক্ গাতিয়া কথাটা অতি মুহূর্তেরেট চলিতেছিল । পর কখনও কখন, কখন কখনও হইতেছিল, কখন আধেক কথাটা হাগিতে চাহনিতে ও অস্বতস্রীয়েই শেষ হইতেছিল । বলিতে বলিতে পর একটু উচ্চ প্রায়ে উঠিল । অবশেষে, একটু উচ্চ বলিলেন—“আহা মাগো, বাহা দেখে একেবারে পাগল !”

ভনিতে ভনিতে মাতার অদর নানারূপ চিত্তার ভাগিয়া বাইতেছিল । আনন্ডে বসিয়া নিশ্চকভাবে সকল ভনিতেছিলেন । তিনি কোনও কথা কহিলেন না ।

অক্ষ ঠাকুরণ আবার বলিতে লাগিলেন, “আহা, হুটিতে যে সাজিবে যেন মদনের পাশে রতি । তুমি মা এ সবক্ষে অসমত করো না । তোমার ভাইদের বল, তাঁহারা গিরে একবার দেখে আহুন । তোমার বহু স্বার্থট নিবপূজা করেছিল, মা ।”

মাতা কথা কহিলেন । বলিলেন—“আশীর্বাদ কর মা, বহু আগার বেঁচে থাক ।” নিঃশব্দে একবিন্দু অশ্রু চক্ষের অধভাগে গড়াইয়া পড়িল । •

‘ছিঃ এমন মঙ্গল কথায় চক্ষের জল কেনিও না, মা।’ তথাগান অবশ্যই তোমার ভাল করিবেন। এখনও রাত্রিদিন হইতেছে। আজ আমি উঠি, দেখ, মা, ঘেন জ্বলো না।’

ব্রহ্ম ঠাকুরণ উঠিলেন। বহুমহীর মাতার মনে একেবারে পূর্বের সকল কথা আগিয়া উঠিল। কি ছিল আর কি হইয়াছে সে সকল কথা মনে পড়িল। দরদর ধারার চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

গা ধুইয়া বালিকা বাড়ী আসিল। ডাকিল “মা”। মা কথা কহিলেন না, অকলে চন্দ্রহর মার্জনা করিলেন।

“হ্যাঁ মা, কীদিতেছিঁস্ মা”—বালিকা মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা শোক জ্বলিয়া গেলেন। কন্যাকে জোড়ে লইয়া মুখ চুখন করিলেন। চক্ষের জলে বালিকার কপোল ভাসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ ।

প্রাতে এই কথা পাড়াময় হইয়া উঠিল। ব্রহ্ম ঠাকুরণ প্রভাতে উঠিয়া চলদর বহুর বাগানে ফুল ভুলিতে গিয়াছেন, ঘাটে বসিয়া যেনকার মা বাসন মাজিতেছে, তাহাকে দেখিয়া ঠাকুরণ আপন্য আপনি বলিতে লাগিলেন “আহা যদি এটা হয় বড় ভাল হবে।”

ব্রহ্ম ঠাকুরণ বার বার ঐ কথা বলাতে যেনকার মা বলিল—“কি পা দিদি?”

ব্রহ্ম ঠাকুরণ বলিলেন—“না হবে বা কেন? মেয়ে জনের মন বড় ভাল।”

যেনকার মা আবার বলিল—“কার কথা বলিতেছ?”

“তবে কি জানি বড় মামুষ, হয় তো এ কথা জ্বলে বেতে পারে।”

যেনকার মা ফাঁকরে পড়িল, বলিল—“দিদি, কি বলিতেছ, আমি তো বুঝিছে পারিতেছি না।

ব্রহ্ম ঠাকুরণ বলিলেন “ওমা, সে কি? তুই এ কথা ভনিস্ নি।”

“না, দিদি।”

ব্রহ্মঠাকুর একটা করবীর শাখা নোয়াইয়া ফুল তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন, “তা হটক বড়মাহুদ, এমন মেয়ের ঘোড়া পাওয়া ভার ।”

যেনকার মা এবার কোনও উত্তর করিল না । ইদং অনুচ্চ স্বরে বলিল—“মরণ আর কি, কথাটা কি তার ঠিক নেই, মজেন কেবল বকে বকে

ব্রহ্মঠাকুর দেখিলেন, যেনকার মা জবাব দেয় না । তখন করবীর ডাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—“আ গোড়া কপাল, তুই কিছুই জানিস্ নে !”—এই বলিয়া অগম সেই বাবুর পরিচয় দিয়া, তার পর তাঁহার সহিত তাহার যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল ও বশুসতীর মাকে সে যে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছিল, একে একে সমস্ত কথা বিবৃত করিল । কথাটা বেশির ভাগ অসত্যো পূর্ণ । কিন্তু প্রাতে উঠিয়া লোকের সঙ্গে কি বলিতে হইবে, বুঝা যাতে শুইয়া তাহা একটা মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল । তাহা শুনিয়া যেনকার মা বলিল—“আহা ব্রাহ্মণীর এমন কপাল কি হবে ?”

যেনকার মা জ্ঞাতিতে বৈবর্ত :

ব্রহ্মঠাকুর ফুল তুলিয়া চলিয়া গেলেন । যেনকার মা তাড়াতাড়ি বাসন তুলি রাখিয়া নিকটে পদ্মর মায় বাড়ী গেল । পদ্মর মা জ্ঞাতিতে ক্ষীরভাঁড়ি । সে তখন নেড়া মাথা আড়ু করিয়া ফোগলা গালে ওল ঠাসিয়া পা ছড়াইয়া বলিয়া চরকা কাটিতেছিল । যেনকার মা গিয়া বলিল, “ও দিদি আর তনেছিল ?”

পদ্মর মা বলিল “কিরে, সকাল বেলা কি খবর নিয়ে এলি !”

যেনকার মা তাহার সংবাদ বলিতে বাইতেছিল, এমন সময়ে পদ্মর মায় পার কাছে ওলের কোটা দেখিতে পাইল ; বলিল—“বলিতেছি, আগে তোর ওলের কোটাটা দে বোন ।”

পদ্মর মা ওলের কোটা দিল । যেনকার মা গালে ওল দিয়া, দুইবার ছেপ ফেলিয়া, বলিল—“বামনদের বশুর না কি বিয়ে ?”

“কোপা লো ?”

“কেন, ব্রহ্মঠাকুরের মুখে শুনু, কে এক বাবু তাকে দেখে নাকি একেবারে পাগল হয়েছে ।”

“বলিও কি, তা যা বস, অমন মেয়ে কিন্তু আর হবে না ।”

“ঠিক কথা ভাই । তা তুই গোস্ব, বাসন ভালো জলে ফেলে এসেছি, যাই ।” মেসকার মা চকিয়া গেল ।

পদ্মব মা তখন তাঁহার মেথেকে ডাকিল । ডাকিয়া সেই সব কথা বলিল । পদ্ম আশ্রম আনিতে গিয়া তাহা চালদারদের কনে বৌকে বলিয়া আসিল । কনেবৌ ঘাটে গিয়া সেই কথা ঘাটের স্ত্রীমহলে বলিল । মুহূর্ত্তমধ্যে ঘাটে সে কথা লইয়া মধ্য আন্দোলন আরম্ভ হইল ।

নিস্তারিণী বলিল “আচ্ছা হউক, বসুমতী বেশ সুখে থাকবে ।”

চাপা বলিল “হ্যাঁ, আর দুখানা পাঁচখানা ভাল ভাল গহনাও পরবে ।”

বসন্ত বলিল “দেখিও উহাকে সোণার অষ্টাঙ্গ ভূষিত করে ফেল্বে ।”

হেমাদ্রিনী বলিল “বসুমতীর মারও এ দশা থাক্বে না । হয়তঃ রাক্ষসটি এখানে পোতলা চকমিলম বাড়ি হবে ।”

সকলেই এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে দত্তদের মানার মা সেইখানে আসিল । সে শুনিয়া বলিল—“তা, যাই হউক, ভাতার তো সেই । আর মরি, যে চেতনার চটক ! যে নাক চোক ! যেন একটা কালপেঁচা ।”

কুসুম বলিল—“আবার সেই কোটর চোকে চাউনি দেখিচিস্ ।”

মানার মা বলিল—“পোড়া কপাল—পোড়া কপাল । তার চেয়ে মেয়েটাকে হাত পা খঁবে জলে ফেলে দিচ্ না ।”

অ্যাক্ত অমনি বলিল “বা বল্দি ভাই, সাজবে না ।”

চাপা বলিল “সোণাই পকন দানাই পকন, ভাতারের সুখ হবে মা ।”

এমন সময়ে বসুমতীর মাতা সেই ঘাটে জল লইতে আসিলেন । তাঁহাকে দেখিয়া সকলে চুপ করিল । মাতা জল লইয়া উঠিয়া যাইবেন, বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল—“হাগা অ্যাঠাই, নগুর নাকি বিরে ?” মাতা বলিলেন “কে বলে মা ?” তিনি আর ধাক্কাইলেন না, জল লইয়া গৃহে গেলেন ।

তখন সকলে মুখ চাওরাচাওয়ি করিয়া বলিল—“তবে কি মিথ্যা !”

—কনে বৌ এই খবর আনিয়াছিল, সে রাগিল । বলিল “সে কি, আমি দেখে এসেছি বের পত্র হয়েছে ।”

ম্যানার মা বলিল—‘দেখলি, মাগি ভাঁড়ালে ।’

কনোগো বলিল—‘অংখার—ঠাংকার ।’

স্বাধীন বলিল—‘ও মা, এগি মধ্যে ।’

আমার কন্যাদায় ।

আমার কন্যাদায় ! র’রে নিয়া নাট, দিনে নিয়া নাট, অচোরাজ সেট একই ভাবনা—একই চিন্তা—আমার কন্যাদায় ! গৃহে গৃহিণীর গজনার, পাড়ার প্রতিবেশীর গজনার, সমাজে আত্মীয় স্বজনের গজনা আমারে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে । চিন্তায় দোহ অর্জুরিত হইয়াছে, দিন দিন দোহ ক্রীণ হইতেছে, প্রতি নিশ্বাসে শরীরের আঘাতের করিয়া রক্ত শুক হইয়া বাইতেছে, তবু—তবুও সেই নিবাক্য চিন্তা আমার ছাড়িল না ! শরনে, স্বপনে, আহায়ে, বিহারে কেবল সেই মর্মভেদী ভয়ানক চিন্তা—আমার কন্যাদায় !

যে কন্যারস্ত্রের প্রফুল্ল মুখকমল দেখিলে আমার আর আনন্দের নীমা বাকিত না, আজ তাহাকে দেখিতে হইবে বলিয়া অন্তঃপুরে বাটতে আর পা উঠে না ! বাহার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে আমি পূর্বে আত্মহারা হইতাম, আজ তাহার সেই অমৃতময় বাক্য আমার কর্ণে যেন বিষ ঢালিয়া দেয় । বাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে আমি জ্ঞানশূন্য হইতাম, এখন তাহাকে দেখিতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না ! শৈশবে যে আমার নয়নানন্দায়িনি ছিল, এখন সেই নয়নপুতলি আমার চক্ষুশূল হইয়াছে । নিত্যন্ত হিংস্র পশুরাও আপনার রক্ত দিয়া তাহাদিগের সন্তানকে বুকে করিয়া পালন করে ; কিন্তু আমি কেন আজ আমার প্রাণের শায়ণী সেই মেহের প্রতিমার দিকে চক্ষু কিরাইতে পৰ্ব্বান্ত পারি না ? আমি কি মামুষ—না না—আমি হিংস্র পশু হইতেও অধম । কিন্তু,

হায় ! কেন এমন হইল ? আমাতে এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন কিরূপে হইল ? এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে ? এ প্রশ্নের আর অন্য উত্তর নাই ।— সেই হৃদয়বিনোদকারী একই উত্তর—আমার কন্যাদায় !

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ দায়ের কি উদ্ধার নাই ? এ সংসারে আসিয়া ত অনেক দায়ে পড়িয়াছি, একে একে সকল দায় হঠাৎ উদ্ধার হঠাৎ পারিলাম, আর এই দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না ? অনেক সময় এ কথা মনে হইয়া; হৃদয়ের আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই আশার ছলনায় ভুলিয়া কন্যার পাত্রাঙ্গসঙ্কানে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়া পাত্রও মনোনীত করিয়াছিলাম ; পাত্রপক্ষীঘেরাও আমার কন্যাকে দেখিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছিল । কিন্তু হায় ! তাহা শেষ বরফা করিতে পারিলাম না । আমার এ দায় হঠাৎ উদ্ধার হওয়া হইল না । আমি দরিদ্র । আমি দরিদ্র—তাহার উপর আবার আমার কন্যাদায় !

এত আশা, এত ভরসা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম সমস্তই আমার কৃপা হইল । বরকর্তার নর্দ পাইবা আমি মাথায় হাত দিয়া বসিলাম । তখন এক কালীন সহস্র বৃত্তিক দংশনের জ্বলা আমার অস্থিত হইতেছিল, আতঙ্ক নর্দ শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল, আমার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিলেও বরকর্তার আর্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইতে পারে না । এইরূপে একবার নগ্ন—সাত আটবার নিরাশ হইয়া আমার চিন্তার অকূল সাগরে কাঁপ দিলাম । চিন্তা ! চিন্তা ! কিসেব চিন্তা ? মনে অন্য চিন্তা আর স্থান পায় না, কেবল সেই একই চিন্তা—একই ভাবনা—কি হবে ? কি করিব ? আমার যে কন্যাদায় !

আহা! আর রুচি নাই, সংসারে আর সুখ নাই, হৃদয়েও আর উৎসাহ নাই । এখন শ্রম, যমতা, ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চ প্রবৃত্তি সকলকে বলিদান দিয়া হৃদয়কে শূন্য করিয়াছি আশা, ভরসা, উৎসাহ এ হৃদয়ে আর স্থান পায় না । জাতি, কুল, মান, সম্মান বৃদ্ধি আর রক্ষা হয় না । এখন আগাত কুৎসা প্রতিবেশীর দৈনিক আলোচনার বিষয় হইয়াছে ; আমাকে দেখিলে খনেকটী আর থাকালোপ করে না ; আর থাকার আগাত প্রতি বিশেষ অঙ্গুগ্রহ ও ভালবাসা আছে তিনি আমারই

সম্মুখে আমাকে নানাক্রম গল্পনা দিয়া আত্মীয়তা করিয়া থাকেন। যে দিকে চাই, সেই দিকেই বিভীষিকাময় দেখি। যে নিরাক্রম স্বপ্নাবলি দিব্যান্তর দণ্ড হইতেছি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে লাঘব হয় বটে, কিন্তু এমন লোক পাই না। যোগ্যকে এ স্বপ্নাবলি কথা বলিয়া জন্মের আলার লাঘব করি। বলি কি, বলিতে জন্মের বিভীষণ হয়, কোনক্রম পরামর্শ করিবার জন্য স্বসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদের নিকট সাহায্য করিতে গেলে। আমি কন্যাভাবে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি মনে করিয়া কেহ আমার সহিত সাহায্য পর্য্যন্ত করে না। হায়! কি পাশে আমার এক দণ্ড হইল! হিন্দুসমাজ! তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার উপর এই ভয়ানক কঠোরতম দণ্ড বিধান করিয়াছ। অপরাধ! অপরাধ!! আবার কি অপরাধ?—আমার যে কন্যা দায়!

নিষ্ঠুর বঙ্গসমাজ! তোমার জন্মের কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়া তোমার কি ইষ্টসাধন হয়? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে সমাজ এতদূর অত্যাচারের প্রসার দেয়, তাহার পতনের আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি দিবা চক্ষে দেখিতেছি, যদি অচিরে এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার না হয়, তবে এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যে দিন এই অত্যাচারী সমাজের চিরমাত্রও থাকিবে না। হে সমাজসংস্কারকগণ! এতদিনেও কি তোমাদিগের চৈতন্য হঠকবে না? কত দণ্ড সম্রাট পরিবার কন্যা-দ্বারে একেবারে সর্পস্বাস্ত হইতেছে, তাহা প্রতিদিন প্রচণ্ড দেখিয়াও কিরূপে কেমনা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ? হে শিক্ষিতাভিমानी স্বদেশ-হিতৈষী বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! তোমাদিগের শিক্ষার দিক, তোমাদিগের সভ্যতার দিক, তোমাদিগের স্বদেশ-হিতৈষিতারও দিক, আর তোমাদিগের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে খণ্ড দিক। যোগ্যদিগের সমাজ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদিগের এত উচ্চাভিলাষ করিতে কি সম্ভাব্য হয় না! যদি স্বার্থ স্বদেশ-হিতৈষী হও, তবে আগে আপনার সমাজের উন্নতি কর। কিন্তু হায়! আমার এই সকল কথা কে শুনিবে? কেইয়া বুঝিবে। আমার যে কন্যা দায়!

তাই বঙ্গবাসী! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই দুর্ভাগ্য প্রকার সমা-

জের কতকগুলি অনিষ্ট হইতেছে। এই প্রথার বেগ এখন না থামাইলে পরিণাম কিন্তু অবস্থার দাঁড়াইবে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। দেখ দেখি, এই কারণে অন্য আত্মিরা আমাদিগকে কতদূর স্বপ্না করিয়া থাকে। সে দিন একজন এই সহরের ইংরাজ সম্পাদক কেমন টিট্কারী দিয়া বলিল যে, বাঙ্গালীর বিবাহের একদিকে উৎসব আর একদিকে ভয়ানক নিরানন্দ, একদিকে marriage-ceremony অন্যদিকে ঠিক যেন funeral ceremony. ছি ছি ছি! আজ সকলে মিলিয়া যে ঘৃণিত প্রথাকে উঠাইয়া দিব মনে করিলে কাল আর সে তিলার্জ থাকিতে পারে না, তবে কেন সে প্রথাকে চিরকালের জন্য এষ্ট সমাজে বন্ধন হইতে দিবে? মনে করিলেই যে কলঙ্ক মোচন করিতে পারা যায় কেন সে কলঙ্ক চিরকাল মস্তকে বহন করিবে? যে এ দায়ে ঠেকিয়াছে, সেই জানে কন্যাদায় কি ভয়ানক দায়। যদি ইহাতেও কাহারও চৈতন্য না হয়, তবে অভিসম্পাত করি, বঙ্গদেশ বঙ্গসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হউক, ঘৃণিত “বাঙ্গালী” নাম এ পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া যাউক।

বহুশ্রমে জল-সিঞ্চনের দ্বারা যে বৃক্ষকে এত দিনে কত কষ্টে বর্দ্ধিত করিলাম, সেই বৃক্ষ কলহান হইবার সময় আমি কেমন করিয়া তাহা বহুশ্রমে ছেদন করিব! যথার্থস্বপ্ন পণ করিয়াও যে কার্যে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না, আমার আর কি আছে যাহা দ্বারা এ দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিব? তবে কি আমার কস্তার বিবাহ হইবে না! এ চিন্তা—এ ভয়ানক চিন্তা কি করিয়া জগদে স্থান দিব? জগতের প্রতি স্তরে স্তরে যে ভয়ানক চিন্তা অনিয়া উঠিল। জগদকে ত শ্রমণ করিয়াছি, তবে কি জগতের এ শ্রমণ-চিন্তা কোনকালে নিভিবে না? মা গরলা! কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর সমাজে আনিয়া লম্বগ্রহণ করিয়াছিলে? যদি লম্বগ্রহণ করিলে তবে কোন দনবানের গৃহে জন্মিলে না কেন? এ দরিত্র পিতার দ্বারা তোমার জীবনের সুখ, আশা, ভরসা সকলই নষ্ট হইবে। আমিই তোমার সকল সুখের কটক হইলাম। আমি আর কি করিব? প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তোমার সুখী করিতে পারিলাম না। তোমার জন্ত অনেক অশ্রু বিপর্জ্জন করিয়াছি, অশ্রুও আর নাই মা, তোমার জন্ত আমার সকল অশ্রু

দুরাইয়া গিয়াছে। আমার এত কষ্ট সহ্য করিতে দেখিয়া তোমাকেও গোপনে অস্ত্র ঘোচন করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু সে দৃশ্য এ জীবনে যেন আর আমার দেখিতে না হয়। এই সন্দেহভরী যন্ত্রণা বরং আমার সহ্য হয়, কিন্তু তোমার সেই মান মূল্য, তোমার সেই অক্ষপূর্ণ কাতর লোচন, তোমার সেই মধুস্পর্শী স্নেহীর্ষ নিখাস আমার যেন পাগল করিয়া ফেলে। আমার পাগল হইবার আর বাকিই বা কি? হে সৈবর! এ অভাগার অন্তরে কি মৃত্যু নিখিতে জ্বলিয়া গিয়াছে? আর এ যন্ত্রণা যে সহ্য করিতে পারি না। কোথায় আপনার উন্নতের চেষ্টা করিব, না দিবারাত্র এই ভয়ানক চিন্তাশ্রমে "দুঃ" হইয়া হাবখার হইতেছি। আমার সোণার সংসারও ভাবখার হইয়া গেল। এখন আমি কি করিব? কি করিলে এ দায় হইতে মুক্ত হইতে পারা যাব? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিয়াছি। মিষ্টর বঙ্গসমাজ গুন, সভ্য সমাজ, সকল ক্ষতি গুন, সে উপায়—সে উপায় অন্য আর কিছুই নহে তাহা—আ-ত্ম-হ-ত্যা!।

এটনক কহাফারপ্রস্ত দরিদ্র ত্রাকণ ।

ছাই ।

জীবনের পরপার নাই,
মানবের পবিধায় ছাই!
দেহ শুধু ভূতের ভবন
প্রাণ শুধু বাহুর মিলন।
আশা, তৃষ্ণা, স্বপ্ন হৃৎ, পেরান, দারিদ্র্য,
এ সকল ভূতের গোষ্ঠণা।
এ প্রকৃতি ছাইয়ের রচনা!
নিলাস ফুলে আমি ছাই!
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।

তবে কেন এত অ'ড়পর,
 কেন তবে প্রকৃতি স্তম্ভর,
 কেন তবে জনরে উগ্রাশ।
 তবে কেন আস প্রেম আশ,
 কেন তবে স্বপ্ন ভ্রম ভ্রাশ,
 কেন বা ম'র ভালবাসা ?
 কেন তবে অনন্তের ধ্যান
 তবে কেন সজীৱ মতান,
 তুমি আমি যদি শুধু ঠাই,
 জীবনের পরপার নাই।
 কেন তবে এতেক আকুল,
 তুমি যদি ভ্রমের পুতুল।
 বুঝা কেন, এই পাঠাগার,
 জীবনের নাই পরপার !
 ঘুচে গেল যত গহনোল,
 বল হরি, হরি, হরিবোল !
 ধরাগ্ন সকলি যদি ছাই,
 জীবনের পরপার নাই,
 কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
 কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম,
 কেন বা বিহগ করে গান ?
 লভিকার কেন হুটে কুল,
 গুরু ধরে পল্লব মুকুল ?
 কেনই বসন্ত হেসে হেসে
 ধরায়ে দাখায় কুল-বেশে ?
 বুঝা বহে সিদ্ধপানে নদী,
 নর নাথী ছাইয়ের অবশি।
 বুঝা কেন ইচ্ছাচাল বেলা ?

খেল, মৃত্যু ছাটেরনট খেলা ।
 ডাক কেন একেক কনিষ্ঠা,
 একেবারে লও না ডাকিয়া ?
 মধু পরে ডাক একবার.
 যোরা হই ভস্ম স্তূপাকার !
 কোটি কোটি, অণু বৃকে বৃকে,
 অচেতনে দুমাইব স্মৃতি,
 বাধ, বহু ছাই উড়াইয়া,
 মানবের অস্তিত্ব গাইয়া ।
 লগিল, বহু না বৃকে ছাই,
 মানবের পরিণাম তাই ।
 আকাশ পুরায়ে কেল ছাই,
 জীবনের পরপার নাই !
 ছাই যদি শেষেতে সকল,
 কেন তবে তুই অশ্রুণ ?
 ছাই যদি মানব-জীবন,
 তবে করি ছাই আশ্রয় ।
 যতটুকু সেছে আছে প্রাণ
 বলে বলে গাই ছাই গান !

ঐশ্বরী গিরীশমোহিনী দাসী ।

দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ ।

[পূর্বে প্রকাশিতের পর ।]

অর্থঃ ।

অন্য নাম—বিগ্ন, অচ্যুতাবাস, অহং, শিপর । স্বনামধাত বৃহৎ-
 বিশেষ । ইহার বহুল স্মরণ, কষার, কক ও পিত্তনাশক, কান্তিবর্দ্ধক, দুঃখনি-

বিশোধক, রক্তপিত্ত ও প্রদাহ নিবারক । ইহার পক কল শীতল, অতিশয় তপ্য । রক্তপিত্ত, বমন, শোথ, অকৃচি ও বিসদোহ নাশক ।

অথবা ছাল হুতে পিথিয়া লেপ দিলে ছুলী ও মাজুতে নিবারণ হয় । ইতা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে চড়াইয়া দিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্তিত হয় । ইহার শুক ছাল অগ্নিবদ্ধ করিয়া কোন পাত্রে অলে ফেলিয়া নিবাইয়া সেই অল ছাকিয়া পান করিলে গুণিবার্য বমন নিবারণ হয় । অথবা ছাল একবর্ণা পাণ্ডুর বৃদ্ধসহ বাটিয়া খাইলে ও যোনিতে লেপন করিলে সক্ষা নারীর গর্ভসকার হয় । অথবা পবিপুট চায়া-লক কল চূর্ণ করিয়া, ছুদের সহিত সেবন করিলে, শরীরের ধাতু পুষ্টি ও দৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় ।

অশ্বগন্ধা ।

অনানাম - কালী, কামরূপিনী হুরগী, আয়ুস্কাঁদা । অনমপাত ওষু ভেদ । ইহার মূলব গন্ধ অশ্ব-গন্ধের গন্ধের ন্যায় । ইহা কটু, তিক্ত, উষ্ণ । কামোদীপক, শুক্রবর্দ্ধক । বায়ুপ্রকোপ, খাস, কাস, পিত্ত (ধবল) ব্রণ ও ক্ষরোগে উপকারক ।

অথগন্ধার কাথ কিছু দিন চুড়ের সহিত মিলাইয়া পান করিলে দেহের পুষ্টি ও বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয় । বালকদিগের পক্ষে ইতা বিশেষ উপযোগী । ইহার কাথ স্তূত ও চুড়ের সহিত শয়নকালে পান করিয়া যে নারী শুভ্র স্নান দিনে পতি সহনাস করে, তাহার নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয় । অথগন্ধা ও বিক্রডক মূল চূর্ণ মতোক আধডোলা মাজায় চুড়ের সহিত সেবন করিলে ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় ।

অস্থি সংহার ।

অস্ত্রনাম—হাড়ঘোড়া, হাড়ক, হস্তিগুণ্ডী । শৃংখলবৎ লতা বিশেষ । ৬।৭ অঙ্গুলি অস্তর ইহাতে এক একটা গাঁট আছে । ইহা উষ্ণ, তপ্ত, শব্দ, লঘু । বলকারক, ককনাশক, কণ্ডুকারি, কৃমি ও চক্ষু রোগহ । অস্থিভেদে ইহার প্রলেপ বিশেষ উপকারী । ইহার চূর্ণের নস্য গ্রহণে সর্পবিষ নষ্ট হইতে পারে ।

অহিকেন ।

আঁড়ি ইতি খ্যাত । শৃগালকণ্টক জাতীয় বৃক্ষের নির্দ্যাসবিশেষ ।

স.মালপুত্র, মূব্রন, পাটমা প্রভৃতি স্থানে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত ইহার বিস্তার চাগ তর ।

ইহা গম্ভীক-উপেক্ষক, মাদক, মিত্রাকারক, বেদনামোচক, ধারক, আক্ষেপ নিবারক । ইহার আশ্বাস তিক্ত । মাত্রা ১ রতি পর্যন্ত । অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে । শৈশবাবস্থায় খুল সাবধানে ইহা ব্যবহার করা উচিত । অর, মস্তক প্রদাহ, অতি-বর্ষ, কোষ্ঠবন্ধ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদাধিনী স্রীলোকদিগের গর্ভে ইহা অহিতকারী । অনিত্রা, অস্ত্র-প্রদাহ, অভিসার, উদ্যাদ, বাত, বমন, হিকা, গ্ৰহকাস, রক্তস্রাব, মূত্রাশয়-প্রদাহ, এবং বিবিধ অধিরাম, প্রাদাহিক ও পর্যায় জ্বরে ও পঙ্কজ মদ্যে বেদনায় ইহারো বিশেষ উপকার হয় । অধিক কাল সেবনে পুংস্ত নাস হয় ।

৬ রতি আফিং ২ তোলা নিমিষাপাতার রসে ওলিয়া নস্য দিলে অপ-
হার (হৃদী) বোগের উপশম হয় । কিঞ্চিৎ আফিং ও আরকল খালকুনি
পাতার রসে ঘষিয়া মাড়ির চতুর্দিকে লেপ দিলে দাক্ষিণ রক্তমাশায় আশ
নিবৃত্ত হয় । আফিং ৬ রতি, পুষ্কতন শুড় ৬ রতি ও রক্তচন্দন ৪ রতি,
একত্রে মাড়িয়া ৬টী বটী করিয়া ক্রমে ক্রমে খাইতে দিলে ওলাউঠা নিবারণ
হয় । কিঞ্চিৎ আফিং নিমপাতার রসে ওলিয়া লেপ দিলে গণবেদনা ও কর্ণ
মূলের শোথ নিবারণ হয় । এক রতি আফিং চাগুহুদে ওলিয়া সেবন
করিলে বহু বেগবৃদ্ধ অভিসার জ্বরের নিবৃত্তি হয় । পুষ্কর পাতার রসে
আফিং মিলাইয়া লেপ দিলে বাতবেদনা আরোগ্য হয় । আফিং ও মুসলব
সিঙ্গপত্রের রসে মিলাইয়া অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলের ক্ষীভতা
ও বেদনা নষ্ট হয় । নারিকেলতৈল অন্ন গ্রহণ করিয়া, তাহাতে একটু
আফিং মিলাইয়া কর্ণের ভিতর ঢালিয়া দিলে প্রবল কর্ণশূল (কানকামড়ান)
অবিকল্পে নিবারিত হয় । আফিং ১ রতি ও কর্ণের এক আনা আন্ধাজ
লইয়া একত্র মিলাইয়া ৮টী বটী প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ ইহার এক একটী
সেবন করিলে শুক্রমেহ নিবারণ হয় । শূকরের রক্ত বা চর্নিতে আফিং
মিলাইয়া অর্শের বলিতে লেপ দিলে বলি পতিত হয় । কিঞ্চিৎ আফিং, ও
সমুদ্রফোঁড়া মন্যাসিঞ্জের পাতার রসে মিলাইয়া লেপ দিলে ক্ষীভতা ও
বাতের বেদনা আরাম হয় । ত্রাণশোধে আফিংয়ের পটী এক রাতি খাওয়া

রাখিলে উহা পাকিয়া আপনি কাটিয়া যায়। একটা অপক বেগের মধ্যে আকিৎ এক আনা দিয়া। রাজিতে দন্ধ করিয়া রাখিবে; প্রাতে সেই বেগের শাঁস বীজ রহিত করিয়া, উত্তমরূপে চটকাইয়া সেবন করিলে, কঠিন রক্ত-মাশয়, গ্রন্থী প্রভৃতি পেটের পীড়া সহর আরোগ্য হয়।

আফিংয়ের কণকে টেড়ি এবং তদ্ব্যবস্ত্র নীচকে পোস্তলানা বলে। ইহা পাকে মধুর; এবং কান্তি বীণা ও বনবর্জক। টেড়ি জলে গিল্ল করিয়া সেই জলের দোক দিলে বাতের বেদনা নিবারণ হয়। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিনাগ।

সমালোচনা ।

প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়মুদা।—শ্রীযোঃ প্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

উপন্যাসখানি একটি হিন্দুবিধবার জীবনের চিত্র। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য যে পতি-প্রাণা হিন্দুসমাজের পক্ষে অতি কম-লীল, পরম শাস্তিগ্রহ ধর্ম্ম। অস্বকারণ পরি-কাররূপে সেটি চিত্রিত কবিগণেছেন। তাঁহার আরও বিশেষ ক্ষমতা এই, তিনি বুকাইয়াছেন, হিন্দুনারীর একের প্রতিই স্থল সম্পূর্ণ নির্ভর করে; সেই একমাত্র স্বামীর সহিত তাঁহার উৎপত্তি, এবং তাঁহারই সহিত তাঁহার লয়। দেবার্জ্জনায় আত্মীয় বন্ধনের সেবার এবং পরোপকারে তাঁহার অপার তৃপ্তি, অনন্ত যত্নবার কিয়ৎ পরিমাণে লাভি হয় বটে, প্রবল স্বাধীনলে কথ-কিৎ বারি পতন হয় বটে, কিন্তু অভাগিনীও স্থল আর এ জগতে হইবে না। স্বামীর প্রেমে তিনি তন্ময় হইয়াছেন, পরশোকে তাঁহার সহিত না মিলিলে স্থল আর আদিবে না।

সমাজের একটি নৈমিত্তিক ঘটনা লইয়া উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলার বৈধবা এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন যে একটি নৈমিত্তিক ঘটনা, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। সে ত ইহার সর্ব্বপ্রধান কথা। আগবা আর একটি প্রাত্যহিক ঘটনার কথা বলিতেছি। সেটি হুঁসিল, অস্বকারণ অনাথকে প্রভাষণ—তাঁহার সর্ব্বস্বাপহরণ। সংসারের নি এই, পুত্রবলের প্রতি কেহ অভ্যাসিত করিতে কোন প্রকারেই সাধসী হয় না,

হৃদয়কে উৎপীড়ন করিয়া সকলেই আক্ষালন করে। ভ্রাতা বিধবা ভ্রাতৃ-
আরাকে, অথবা ভ্রাতৃপুত্র ভ্রাতৃভিনী পিতৃবা-পত্নীকে দামীবৎ ব্যবহার করিয়া
কিংবা পথের কান্দালিনী করিয়া আত্মসুখসম্পাদনে সজ্জাই লেটে। আমরা
এই উপস্থানে পিতৃভীন ভ্রাতৃপুত্রের দিগর আশ্রয়ান্তের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
দেখিতে পাই। ঐশ্বরিক নিয়ম এ প্রবঞ্চনার বিরূপ আশ্রয় প্রতিক্ষণ পাইতে
হইরাছিল, পুত্রক পাঠে পাঠকগণ আনিতে পারিবেন। আমরা এই
উপস্থানের কয়েকটি প্রধান চরিত্র সমালোচনা করিব।

প্রথমে উপস্থানের নারিকা প্রিয়দ্বন্দ্যর কথা। প্রিয়দ্বন্দ্যর জীবনযুদ্ধে
যে কল ফলিবে প্রথমেই তাহার সুখীণ গোপিত হইয়াছিল। তিনি অসীম
দগর্ভ-দ্বন্দ্ব, পরোপকারী স্বামীর পাইয়াছিলেন। এবং হিন্দু-জীবন-প্রণালী
অনুসারে তাঁহার মন সেই মহান আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার
মন একদা উন্নত হইয়াছিল, যে অন্তের দৃষ্টে তিনি কোনও প্রকারে সজ্জ
করিতে পারিতেন না। আমন্ত্রণ লোক তাঁহার স্বামী উপেক্ষনাথ এবং
তাঁহাকে পিতামাতাবিরূপ জ্ঞান করিত।

কিন্তু এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে একদা দেবতার স্থান নাই। উপেক্ষ-
নাথের জীবন কুটিতে না কুটিতেই করিয়া পড়িল! অকস্মাৎ বিহুচিকা
রোগে উপেক্ষের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁচার জীবনের মহাব্রত সাধনের
ভার প্রিয়দ্বন্দ্যর প্রতি দিরা গেলেন। প্রিয়দ্বন্দ্য স্বামীর পেস আত্মা করটি
এক মুহূর্তের জন্যও ছলেন নাই। ক্রূপে তিনি স্বামীর কারণে জীবন
অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমরা তাহার হৃৎকণ্ঠে একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বৈদ্যব্যবসায় সবে কয়েক কামাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রিয়দ্বন্দ্য বিধবা
হইয়াই ধান পরিলেন, সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন, যন্ত্রকের বেশ কাটিয়া
ফেলিলেন—একদা ব্রহ্মচারিণী সাজিলেন। আত্মকাল অনেকে বৈধবা
বেশ চক্ষে দেখিতে মর্মে বাপা পান, অল্প বয়সে সম্মানসিদ্ধি লাভান ঘোর
নিষ্ঠুরতা মনে করেন। এটি যে কি ভয়ানক ভয়, তাহা বলা যায় না। হৃদয়মণীর
রিপুর উচ্ছেদ করাই যদি বিদবার বর্জ্যতা হয়; কারমনোবাকো মৃত পতির
ধ্যানই যদি জীবনের প্রধান ব্রত হয় তবে কোন যুক্তিবলে তথ্যপ্রকারী
কার্য্য সকল তাঁহারা অনুমোদন করেন? কেন তাহাদিগকে শাস্ত্রিপথে

অগ্রগর হইতে বাধা দেন ! কেন আহাৰ ও বেণের আংশিক পারিপাটা করাইতে গিয়া তাঁহাদের পূৰ্ণস্থিতিজালা শত ওগ প্রজ্জ্বলিত করেন ।

প্রিয়স্বদার প্রথম একাদশীর কথা আমরা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি । অনেক সংস্কারা, অদৈব্যা রমণী সে অংশ পাঠ করিয়া গভীর উপদেশ পাইবেন । আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বিকৃত ব্যক্তিগণ দুৰ্ব্বিতে পারিবেন যে প্রকৃত শিক্ষালাভ পতিগতপ্রাণা রমণীর পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ বভাৱসম্ভব, আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ নহে ।

চপলা । বিদি বেলা যে আর নাই, স্নানাহার করিলে আর কখন ?

প্রিয়স্বদা । 'আজ যে আমার একাদশী বোন্' । • • বালিকা

চপলা কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল । অনেক কষ্টে পুনরায় বলিল "বিদি, পারিবে কি ?"

প্রিয় । কেন পাবিব না বোন্, ধৰ্ম্ম যদি আমার মতি থাকে আর সেই স্বর্গীয় স্বামীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে কেন পারিব না বোন্ ?

চপলা । জেঠাইয়া বলিতেছেন, আহাৰ না কর, কিছু জল খাও ।

প্রিয় । আমি যে চরণ ধ্যান করিয়াছি, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই ; চপলা, যখন সেই সৰ্ব্বভবাধর স্বামীর চিত্র-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিয়াছি, তখন আর সেই স্বামীর উদ্দেশে একাদশী করিতে পারিব না ।

চপলা । তুমি নিজের দেহ নষ্ট করিতে বসিয়াছ, তবে পোকা আর সরো-জিনী বাঁচিবে কিরূপে ?

প্রিয় । এ দেহ আমার নয়, বহুদিন পূৰ্বে এ দেহ, মন জ্ঞান যাঁহাকে অৰ্পণ করিয়াছি তিনি পৃথিবীতেই থাকুন আর স্বৰ্গতেই থাকুন, এ দেহ তাঁহারই । সত দিন বাঁচিব তাঁহারই কার্য্যে এ দেহ উৎসর্গ করিব । চপলা, তোমায় আমি ছোট ভদ্রীর ছায় ভালবাসি ; পোকা আর সরোজিনীকে আমি আজ হইতে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিত হইলাম, তুমি তাহাদিগকে দেখিও ; যদি ইহর বাঁচাইয়া রাখেন, তবে তাহার তোমারই । আমার দ্বারা তাহাদের ভালরূপ লালনপালন হবে হইতে পারে না । আমি তাঁহার শত্রু আত্মা রক্ষা করিব, সে কথা এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে ।

ইচ্ছা করিয়া এ দেহ নষ্ট করিব না, কিন্তু যদি জীবনের উদ্দেশ্যে পালনে এ দেহ নষ্ট হয়, যদি আমার সে শুভ দিন হয়, তাহা হইলে কেহ গেন বাধা না দেয়।”

শেষক যে স্থলে বিদবাবিবাহের কথা তুলিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার চিন্তা-নৈপুণ্যের কিছু ক্রটি হইয়াছে। এক ত প্রিয়স্বামীর মত স্ত্রী বিরল, তাহাতে এখনও ছয় মাস হয় নাই তিনি বিদবা হইয়াছেন; একরূপ স্থলে ও কথার অবতারণা করিলে চরিত্রে নাস্তি-রূপ ও গুরুত্বের হানি হইতে পারে; যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা হইতে পারে, যে অপরিণামদর্শী সংস্কারকের নিকট কালাকাল পাত্রোপাত্র বোধ সম্ভবে না। যাহা হউক, বিপরীত ও বিদবার শ্রেয় ও শিক্ষার কি প্রভেদ সকলেই তাহার পূর্ণ চিত্র এখানে পাইবেন।

প্রিয়স্বামীর ব্রহ্মচর্য্যার্থ সমাকরূপ পালন করিবার অসম্ভব অস্বা-
তলি লেখক বিশেষ দক্ষতার সহিত একটীর পর একটী প্রকটিত করি-
য়াছেন। প্রিয়স্বদা বাল্যকালে প্ৰথম ধাত্মিক, বিজ্ঞ, বহুদর্শী পরোপকারী
ব্রহ্মময় পিতা কর্তৃক লাভিত হইয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বামীর হস্তে
পড়িয়াছিলেন, তাহা যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। তার পর, তাঁহার গুরুদেব
সেই স্বামী কর্তৃক নির্দোষিত; তিনি এখনকার গুরুদেবদের মত মূর্খ,
কুচরিত্র, লোভী ছিলেন না। এবং সৌভাগ্যক্রমে প্রিয়স্বদাও বর্তমান কালের
রমণীদিগের মত পূজার্ত্তনায় দীক্ষিত হইলেন না। যে মন্ত্রের মর্ম্ম তিনি
বুঝিতে পারিবে, সে পুত্র, যে ব্রত তিনি কামনোবাক্যে সম্পন্ন করিতে
পারিবে, তাঁহার সেই প্রবীণ, পরম পণ্ডিত, পুণ্যস্বা গুরুদেব তাঁহাকে
সেই পুত্র, সেই মহান্ন রহিত দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পূজার্ত্তনা
সম্বন্ধে আমাদের মতের কেহ যেন বিপরীত অর্পণ না করেন। ভবিষ্যতে
এ বিষয়ে আমাদের মত পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্য করিবার উচ্ছ্য রহিল।

সংসারের নিয়মই এষ্ট, যে স্ত্রী চারিদিক হইতে তাহার স্রবের উপাদান
আপনা হইতে আসিয়া যুটে, এবং যাহাকে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়,
তাহার দুঃখ যন্ত্রণার আর অবধি থাকেনা। প্রিয়স্বদার শেষ আশ্রয়,
জীবনের অবশিষ্ট অবস্থান পিতা এই মনরে বহুলোক পরিত্যাগ করিলেন।
এখন ঈশ্বর তাঁহার একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসাস্থল। উইল মতে
তিনি পিতার বিশূল অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। এত ধনের

অধিকারিণী তত্ৰা তাঁহার “কিছুমান সম্ভ্রান্ত হয় নাই, সব মনে মনে বলিয়াছিলেন”—“ও ভগবন! এ আবার যেমন কি লীলা! শুভ, অমাগ মনের প্রলোভন কেন? প্রিয়দত্তা কিন্তু তখন স্থির করিলেন, দিনান্তে এক মুষ্টি হনিয়ার আর বৎসবে ২৩ থানি গেকরা বগন ভিন্ন নিঃসর জনা। ঐ অর্থের অন্য কোন ব্যয় হইবে না। তিনি তাহা কবিতা:ছিলেন। সে সব বিষয়ের পরিচয় পাঠকপাঠিকা পুস্তকপাঠে জানিতে পারিবেন। সেই সকল নিঃসর কার্যের মধ্যে পদজ্ঞে স্বত্তরালয়ে গমন ও সমস্ত তীর্থ পর্যটন আমাদের বিবেচনায় অপ্রযুক্ত ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়দত্তার মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া সে ক্রটি মার্জনীয় মনে করি।

উপস্থানের মধ্যে শশিকলার চরিত্র সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেখানে যে অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, বরাবর সেই এক ভাব—সেই ঘোর শল, ঈর্ষাপরাধন, গর্ভিত, নিষ্ঠুর স্বভাবের কোথাও এক চুল ব্যতিক্রম হয় নাই। উপেক্ষা যখন মুখা শয্যায় পতিত, দেশ শুদ্ধ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল; কিন্তু শশিকলা সেই বাড়ীতে থাকিয়া অমন দেবতুল্য দেহরকে একবারও দেখিতে গেল না, চকুলজ্ঞারও আশ্রিত রাখিল না। শলতা ও কঠোর জুংথের ইহা চূড়ান্ত প্রমাণ! আমরা বাহ্য ভবে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। এ জগতে অর্থ ব্যতীত তাহার ভাল বাসার পাত আর কেহ ছিল না। দুঃখের বিষয় এ পাপ সংসারে একজন স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, এবং আরও জুংথের বিষয় এইজন্য স্ত্রীর স্বামীই একান্ত জীপসারন হইয়া থাকে। সেরূপ অধম হস্তকাগগল শশিকলার চরিত্র পাঠে অনেক শিক্ষা পাঠিবেন।

ভারপর চপলা। তিনি নামেই চপলা, কিন্তু স্বভাবে এমন স্থির, শান্ত, বৈধাণীলা, সহিষ্ণু রমণী আর হয় না। এই সকল গুণের পূর্ণবিকাশ দেখাইবার জন্যই লেখক তাঁহাকে অশেষ যত্ন ও অভ্যাচারের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু দেহঘর স্বামীর মুখ চাহিয়া এবং প্রিয়দত্তার সন্তোদরার মত ব্যবহারে তিনি এ সব কষ্ট অবিকৃতভাবে সহিতেছেন। স্বীকৃত্যমাত্র ও তাঁহার প্রতি অভ্যাচার যখন পূর্ণমাত্রায় হইল, তখন সেই স্বামীর দুঃখে সম্বন্ধিতক বাধিত। হইয়া তিনি দাছা বলিয়াছিলেন, সে স্থল পাঠ করিয়া

কোন পানপান-জন্মের জন্ম না ভাঙিয়া যাইবে! সেট আপনভোলা ভাব বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। তাবপর যখন দীবেন্দ্রনাথ দ্বীপ বিষয়ে বক্তিত হইয়া অতি চীনভাবে জীবন কাটাইতেছেন, তখন সেট চিবসকিনী কিকুপে অটল পুরুষের ন্যায় সব সহিয়াছিলেন, তাহা পাঠিকা পড়িয়া দেখিবেন। কিন্তু করুণায় ভগবান অবশেষে তাঁহাদের গতি মূল তুলিয়া চাহিলেন। আবার দীবেন্দ্রের অতি সমৃদ্ধ অবস্থা হইল। কিন্তু চপলার চরিত্রের কিছু পরিবর্তন হইল না। তিনি সেই পরিচর্যা, শাস্ত, নগ্ন, সকলের প্রতি শ্রেয়সী, তথ্য—তথ্য—অবিকৃত রহিলেন।

দ্বীপ দীবেন্দ্রনাথ বিকৃত শিক্ষামোহে অভিভূত দীবেন্দ্র, নীক, সঙ্কীর্ণ-জন্ম, শৈশব মহেন্দ্রনাথ, পাণ্ডিত্য-অগিহাম পণ্ডিতের কোনও পরিচয় দিতে পারিলাম না। সে স্থান আমাদের মতে। প্রিয়স্বদার ভ্রাতৃত্বায়া সূহাসিনীর সহজে দুই চ'বি কথা বলিয়া আমবা সম্মেলোচনা শেষ করিব।

সূহাসিনী চিব-অনন্কময়ী, চিব-পক্ষ্ম, কাঁদিবার সময়ও তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া থাকিত। তাঁহার জন্মের এক প্রেম, এক স্নেহ, এক মারা, এক সমতা ছিল। যে তিনি যদি এক না হাসিতেন, যদি তাঁহার একপ বাগ্যচাপলা না থাকিত, তবে বৃষ্টি সে বেগ ধারণ করা তাঁহার অসাধ্য হইত। সে ক্ষুদ্র নগর প্রবল স্রোত উৎলিষা গুফল ভাসাইয়া চলিয়া যাইত। তিনি প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভালবালিয়াও পরিভ্রম্য হন নাই। কিন্তু তিনি সহধর্ম্মী ছিলেন না। তাঁহার পতি আক্ষ ছিলেন, তিনি হিন্দু ছিলেন। যখন প্রিয়স্বদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “ছি দিদি, স্বামীর ধর্ম্মের কি নিষ্কা করিতে আছে, খ্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, স্বামী যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন, জীকেও তাঁহার অনুবর্তিনী হইয়া সেই ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতে হয়।” তখন সূহাসিনী এই উত্তর দিয়াছিলেন, “প্রিয়স্বদা, তুমি বসার্থকী বলিয়াছ খ্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, কিন্তু আমি তাহার অর্থ এই বৃষ্টি যে খ্রীলোকের পক্ষে স্বামীই মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, কিন্তু তা বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে ধর্ম্ম বৃদ্ধিতে পারি না আমি কেমন করিয়া বলিব যে আমি সে ধর্ম্ম বৃদ্ধিহাছি।” ইত্যাদি। ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলি, যদি স্বামীর স্বভাবের কোনও দোষ থাকে, তবে স্ত্রী সেজন্য তাঁহাকে ঘৃণা করিবে না বটে, স্বাভাবিক প্রাণপণে সংশোধনের চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু স্বামীর সে স্বভাবের অনুবর্তন করিয়া সংসার বিষময় করিবে না। যথা শুভ সূহাসিনী অবশেষে স্বামীকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন করিয়াছিলেন। সূহাসিনী চিত্তে জু'এক স্থানে আমাদের বিশ্বকর্ম্মের কমল-মণিকে মনে পড়ে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত। -

(সাবিত্রী লাইব্রেরী।)

শিরোমিতি বিদ্যা।

মূল সূত্র।

শিরোমিতি বিদ্যা (Phrenology) এক প্রকার মনোবিজ্ঞান-বস্ত্র বিশেষ।
উহা মস্তিষ্কতত্ত্বের উপর স্থাপিত। আমরা দেখিতে পাই, শরীরের সহিত
মনের বনিষ্ট যোগ আছে এবং শরীর-যন্ত্রের সাহায্যে মনের কার্য সকল
বাহিরে প্রকাশ পায়। এই সত্যটির উপরেই শিরোমিতি বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যা মাত্রেই এক একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। এই শিরোমিতি
বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ কি?—না, মস্তকের আয়তন ও গঠন দেখিয়া
ব্যক্তি বিশেষের আভাবিক ও মানসিক প্রবণতা ও শক্তি-সকল নির্ণয় করা।

• ইহা প্রথমেই বল: অসম্ভব। এই বিদ্যা কি বিজ্ঞানক্ষেত্রে, কি ব্যবহারিক
প্রয়োগ ক্ষেত্রে, এখনও পূর্ণবিস্ফালা লাভ হইয়াছে নাই। উহার স্বত্বপাত হইয়াছে
মাত্র। কিন্তু শিরোমিতি বিদ্যার নিম্নলিখিত মূল সূত্রগুলির সত্যতা যে
অসংখ্য প্রত্যক্ষ ব্যাপারের দ্বারা সমর্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১। মস্তিষ্ক মনের বস্ত্র।

২। প্রত্যেক মনোবৃত্তির এক একটি বিশেষ বিশেষ পৃথক্ ধাতু মস্তিষ্কের
অত্যন্তরে অবস্থিত।

৩। মনোবৃত্তিগুলির নৈকট্য-সম্বন্ধ অনুসারে উহাদের বস্ত্রগুলিও
মস্তিষ্ক অভ্যন্তরে কাছাকাছি যে সাধেঁসি অবস্থিত।

৪। অনান্য বিষয়ে মনান হইলে, মস্তিষ্কের আয়তনই মনের শক্তি-
মাত্রার পরিমাপক।

৫। শারীরিক অবস্থার ইত্যর বিশেষ মানসিক শক্তি-প্রকাশের ইত্যর
বিশেষ উপস্থিত হয়।

৬। যে কোন মনোবৃত্তি হউক না কেন, অসুশীলন দ্বারা তাহার উৎকর্ষ
হইতে পারে এবং অবহেলা দ্বারা তাহার অপকর্ষ হইতে পারে।

• ৭। প্রত্যেক মনোবৃত্তিই স্বাভাবিক: ভাবজনক, কিন্তু তাহার অপব্যবহারে
অভ্যুৎকর্ষক হইয়া পড়ে।

মস্তিক—মনের মন্ত্র ।

মস্তিকই যে মনের মন্ত্র, ইহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন । যে কয়েকটি তথ্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটী সমর্থিত, তাহা নিয়ে দেওয়া যাইতেছে ।

১। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অন্তরাশ্রয় অভ্যন্তরে অনুভব করিয়া দেখিলে এইরূপ গভীরতাই হইবে যে, মন মস্তকের মধ্যে অর্থাৎ মস্তিকের মধ্যে অবস্থিত, অন্য স্থানে অবস্থিত নহে ।

২। যেখানে মস্তিকের ন্যূনতম সেইখানেই মানসিক শক্তির ধর্মতা দেখা যায় ।

৩। যে পরিমাণে মনোবৃত্তি-সকলের বিচিত্রতা ও শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণে মস্তিকও বৃহৎ ও জটিল বলিয়া বোধ হয় ।

৪। মস্তিকে কোন গোলাবোপ উপস্থিত হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলও গোলাবোপ উপস্থিত হয় । অর-রোগাক্রান্ত হইলে কিম্বা মস্তকে কঠিন আঘাত লাগিলে প্রথম দৃষ্টিমান ব্যক্তিদিগকেও একেবারে উন্মাদগ্রস্ত হইতে দেখা যায় ।

৫। মস্তিক হইতে রক্ত হঠাৎ অপসারিত হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়, এবং কিছুকালের জন্য চেতনা হ্রাসিত থাকে ।

৬। কোন প্রকার আঘাতে কখন কখন এরূপ ঘটনা দেখা গিয়া থাকে যে কোন ব্যক্তির মাথার ঘুলির কতকাংশ উঠিয়া গিয়া মস্তিক দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে । এইরূপ স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সেই মস্তিকংশকে কেবল অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরায় সেই ব্যক্তির চেতনা হ্রাসিত হইয়াছে এবং চাপ সরাইয়া লইলে আবার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে ।

৭। যে সকল স্থলে মস্তিক এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয় সেই স্থলে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, নিঃশব্দ নিভার সময় মস্তিক স্থিরভাবে থাকে ; পরে যে পরিমাণে হৃদয়ট হয় সেই পরিমাণে উহাতে আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং জাগ্রতাবস্থায় উহাতে অধিকতর গতি উপস্থিত হয় ।

মস্তিষ্ক—যন্ত্রসমূহের সমষ্টি ।

সমস্ত মস্তিষ্ক বৈকল্পিক সমস্ত মনের যন্ত্ররূপ—সমগ্র বিশেষ বিশেষ মস্তিকাংশ সকল বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির যন্ত্র-রূপ ।

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় ।

১। শরীর-ভিত্তির আর আর সকল অংশে—এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সাধনোপযোগী এক একটি পৃথক পৃথক যন্ত্র আছে । দৃষ্টির যন্ত্র চক্ষু ; শ্রবণের যন্ত্র কর্ণ ; পাকের যন্ত্র পাকানর ; ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বল্য হইতে পারে, যে স্থলে ক্রিয়া জটিল, সে স্থলে যন্ত্রও সেই অনুসারে জটিল হইয়া থাকে । যেমন মনে কর—দ্রিষ্টব্য । দ্রিষ্টব্যেতে একটি শব্দ আছে বাহার কর্ত্তব্য উহাকে নাড়ানো—উহা ব্যাধাতেই আমরা কণা কহিতে পারি । আর একটি শব্দ আছে, তাহার দ্বারা স্পর্শ বোধ হয় এবং আর একটি শব্দ আছে, তাহাতে আশঙ্ক্য বোধ হয় । এক কথায়, যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মানব-বহু-যন্ত্রে এমন একটিও দৃষ্টান্তস্থল দেখা যায় না যেখানে কোন একটি শব্দের দুই প্রকার ক্রিয়া আছে—একণে এই উপমানিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই অনুমানের উপনীত হওয়া হইতে পারে, যে সকল মনোবৃত্তি খুব ভিন্ন প্রকৃতির (যথা—পর্থাৎবেগবৃত্তি ও তুলনাবৃত্তি) সেই সকল বৃত্তির অনুরূপ পৃথক পৃথক যন্ত্রও অবশ্য আছে ।

২। ইহা সচরাচর দেখা যায় থাকে যে, কোন কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ ব্যবসার কিম্বা কার্যের কিম্বা আলোচনার উপযোগী অসাধারণ গমতা প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও হয়ত আশ্চর্য কৃতকার্য হইতে পারে না । যদি সমগ্র মস্তিকের ক্রিয়া-শক্তি একটি মাত্র হইত তাহা হইলে তৎসমুদয় প্রত্যেক বৃত্তিই সমান মাত্রায় সেই মস্তিকের দ্বারা প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই । কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীত দেখা যায় ।

৩। মহাবীর সকল মনোবৃত্তি একই সময়ে প্রকাশ হয় না । শিশু যে সময়ে ভয় ও ভাববাসায় চালিত হয়, তখন তাহার ভক্তিবৃত্তি কিম্বা ধর্ম্মবৃত্তির আনির্ভাব হয় না । সে বাহ্যবস্তুর ওপাঠ উপলব্ধি করিতে অনেক পূর্ণ হইতেই আরম্ভ করে, কিন্তু একটু বয়স বেশি না হইলে

তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না। ইহাতেই বোধ হয় যে, মস্তিষ্কের কোন অংশের পরিপূষ্টি দ্বারা ভালবাসার ক্ষমতা জন্মে—কোন অংশের পরিপূষ্টির দ্বারা তক্তি করিবার ক্ষমতা জন্মে; কোন বিশেষ যন্ত্রের সাপেক্ষে আমরা পরিশুদ্ধ করি এবং কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বিচার করিয়া থাকি।

৪। যখন আমরা বস্তু দেখি, তখন দেখা যায় আমাদের কতকগুলি মনোবৃত্তি সক্রিয় থাকে এবং, কতকগুলি মনোবৃত্তি নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে। ভালবাসা, ভয়, জোশ, হিংসা প্রভৃতি কত প্রকার ভাব-পরম্পরাক্রমে মনোমধ্যে উদয় হয়—কোনটারই শৃঙ্খলা থাকে না—সকলই অসম্বন্ধ ও অব্যবস্থিত। কখনও বৃত্তিমুক্ত—কখনও বা অভ্যাকৃত। মস্তিষ্কের সমাগণ অবস্থায় যেসকল দৃশ্যমূল ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি সমস্ত মস্তিষ্ক একটি মাত্র বস্তু হইত, তাহা হইলে মনোবৃত্তি সকলের এইরূপ আংশিক প্রকাশ হইত না—সকল মনোবৃত্তিই হয় এক সময়েই জাগ্রত হইত, নয় এক সময়েই নিদ্রিত থাকিত।

৫। আংশিক নির্মূর্ত্তিতা এবং আংশিক উদ্ভ্রাণ, মস্তিষ্কের যান্ত্রিক একতা বিষয়ক মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন জন্ম-নির্কোষ নীতি-বাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির নিত্য। অতঃ, তাহাদের মধ্যে কখন কখন বলবৎ নৈতিক ভাবের প্রাচুর্য দেখা যায়—কখন কখন বা কেবল নিকট প্রকৃতির প্রকাশ দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নির্মূর্ত্তি হইলেও কাহারও কাহারও কোন বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির পূর্ণ উদ্বেগ দেখা যায়—যেমন গণনা-শক্তি—কিন্তু হুরজ্ঞান বা ভালজ্ঞান। সমস্ত মস্তিষ্কের হীনতা যদি এইরূপ আংশিক নির্মূর্ত্তিতার কারণ হইত, তাহা হইলে এরূপ ব্যাপার সকল দেখা যাইত না। আংশিক উদ্ভ্রাণও এই বিষয়ের সত্যতা সম্ভবান করে।

৬। মস্তিষ্কের আংশিক হানি হইলে, এক কিনা ততোধিক মনোবৃত্তির ক্রিয়া সঞ্চিত হয়, কিন্তু অন্যান্য মনোবৃত্তি সকলের হানি হয় না। মস্তিষ্ক যদি একটি মাত্র সমগ্র বস্তু হইত, তাহা হইলে এরূপ ঘটনাও পাবিত না।

যন্ত্রসম্মিলন।

প্রত্যেক মনোবৃত্তির বিশেষ বিশেষ যন্ত্র সকল বহুল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একে একে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত হইবার পর আলোচনা করিয়া এইরূপ দেখা যায় যে, যে সকল মনোবৃত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরস্পর নৈকট্য সঙ্কট আছে সেই সকল মনোবৃত্তির যন্ত্র গুলিও কাছাকাছি যে সাধেঁসি সম্মিলিত। ইহাতেই প্রতীতি হয়, এই সকল যন্ত্রসম্মিলন স্বাভাবিক হ্রস্ব শৃঙ্খলা ক্রমে হইয়াছে—হ্রতরাং সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আয়তন—শক্তির পরিমাপক।

অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মস্তক সাধারণতঃ ক্ষুদ্র এবং নেপোলিয়ন ক্রম্‌ওএল ফ্রাংক্লিন প্রভৃতি অধ্যাত বড় লোকদিগের মস্তক বৃহৎ ইহা সকলেই জানেন। “অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে আয়তন শক্তির পরিমাপক” এই নিয়মটির উপর ভিত্তি করিয়া কি গতি-বিজ্ঞান ও কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—কি শরীর-তত্ত্ব বিদ্যা ইহাদের গণনা ও বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। শিরোমিতি বিদ্যাও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে।

শারীরিক অবস্থা।

“আয়তন শক্তির পরিমাপক” এই সাধারণ নিয়মটি যখন আমরা উপরে বলিয়াছি তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিয়া দিয়াছি যে “অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে।” মস্তিষ্কের সহজে এই ‘অন্যান্য বিষয়গুলি’ কি?—না—যথা, প্রকৃতি; রক্তম কিম্বা তপ; বাহ্য; বাসপ্রবাসক্রিয়া; বস্ত্র সঞ্চালন; পরিপাকশক্তি; কার্য-তৎপরতা; উত্তেজনীয়তা; সামঞ্জস্য ইত্যাদি। কোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যিক। এই সকলের মাত্রতম্যে মনোবৃত্তি সকলের শক্তি-মাত্রার তারতম্য উপস্থিত হয়।

উৎকর্ষণীয়তা।

বিশেষতঃ পূর্বে কৰ্ষণ করিলে সকল মনোবৃত্তিকেই পরিপূর্য করা যায়। যেসকল শরীরের অঙ্গবিশেষকে চালনা দ্বারা পরিপূর্য করা যায় সেইরূপ প্রত্যেক মনোবৃত্তিকে চালনা দ্বারা সৰল করা যায়।

সকল মনোবৃত্তিই শুভজনক ।

প্রত্যেক মনোবৃত্তিই স্বতঃ শুভজনক প্রত্যেক মানবের হিতের জন্য ও জগতের হিতের জন্য সকল মনোবৃত্তিই প্রয়োজনীয়। উদ্ভাদিপনকে অপব্যবহার ও অযথা নিয়োগ করিলেই অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে এবং উদ্ভাদিপনকে অযথা বর্জন করিলেও শুভ ফল প্রদান করে না। সমস্ত মনোবৃত্তি যথাযথরূপে পরিপুষ্ট হইলে—সামগ্রিকভাবে কার্য্য করিলে, নিরুপ্ত বৃত্তির সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীনে থাকিলে, মানবজাতির পক্ষে মঙ্গল সাধিত হয়।

হত্যা-পন্থতির যন্ত্র স্বরূপ কোন বিশেষ মস্তিষ্কাংশ নাই। কিন্তু এমন একটি বৃত্তি আছে যাহার উদ্দেশ্য উদ্যম, কার্য্য-তৎপরতা, বল ও তেজ প্রকাশ করা—এই বৃত্তি যুব সতেজ হইলে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির দ্বারা ইহাকে যথোপযুক্ত দমনে না রাখিতে পারিলে, ইহা অবশেষে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে পরিণত হইতে পারে। সেইরূপ মনে কর, সম্পত্তি-অর্জন ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমাদের মনে নিহিত আছে—ভবিষ্যতের জন্য যথ বঞ্ছনতার উপায় আয়োজন করিয়া রাখা এই প্রবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির দমনে ইহাকে না রাখিতে পারিলে ক্রমে উহা চোর ও প্রবকনায় পরিণত হইতেও পারে। সকল স্থলেই মনোবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত কার্য্য তুলিই অমঙ্গলের কারণ—কোন মনোবৃত্তিরই স্বাভাবিক পরিণাম অন্তত নহে।

শিরোমিতি বিদ্যার মূলসূত্রসকলের সঙ্ক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়া এইবার-কার মত প্রবন্ধটি শেষ করা গেল।

[ক্রমশঃ ।

ঐজ্ঞেয়তাবিশিষ্টনাথ ঠাকুর ।

অদৃষ্টবাদ ।

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

আমরা পূর্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যজগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের মধ্যে নিয়ত-পূর্ববর্তিতা প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ আমাদের নয়নগোচর হয়,

অন্তর্জগতের ঘটনাবলীর মধ্যেও সেই সেই লক্ষণ জ্ঞানীদের মন-চক্ষুর নিকটে লক্ষ্য পায়। "নৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রেই এক প্রকার নিয়মের ফিরা লক্ষিত হয়। বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ কখনও অসম্বন্ধভাবে কাজ করে না। দেখাইয়াছি যে, দেখানে আমরা মনে করি, আমরা ইচ্ছা করিয়া কোন বাসনা-বিশেষকে মনন করিলাম, দেখানেও বাস্তবিক অনাতর ভ্রাসনা-বিশেষই উক্ত ইচ্ছার প্রণোদক। ইহাও দেখাইয়াছি যে, যখন 'লোকে প্রাধান্যের কথা বলে, তাহার অর্থ বাহ্যজগৎ' সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ ঘটনা-রাজির কারণ হ'তির আর কিছুই নয়; আর Mill বাহ্যকে Fatalism বলিয়াছেন, তাহার অর্থও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে বাহ্যজগতের কারণ হ' ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতেছে, এই যে কার্যকারণ লক্ষণ সকল নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, এই গুলির দ্বারা আমরা ঘটনা সকলের কার্যকারণ নির্দেশ করি বটে, কিন্তু ইহাদের দ্বারা কার্যকারণ নিয়মের অবশ্যাস্তাবিতা এবং সর্বহল-প্রয়োগিতা সম্বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট করা যায় না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, অবশ্যাস্তাবিতা (Necessity) এবং সর্বহল-প্রয়োগিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলিবার নাই। বাহ্য ঘটিতেছে এবং ঘটিয়াছে তাহারই সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের (Experience) উপর। সুতরাং যে স্থান বা সময় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, সে স্থান বা সময় সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে তাহা কেমন করিয়া জামিৎ ? কাজেই, যদি কেবল বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে কার্যকারণ সম্বন্ধ হইতে অবশ্যাস্তাবিতার ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে। অদৃষ্টবাদের মূলে যে অবশ্যাস্তাবিতার ভাব রহিয়াছে তাহাও দূর হইতে হইবে। এই জন্যই Mill বলিয়াছেন।—

A volition is a moral effect which follows the corresponding moral causes as certainly and invariably as physical effects follow their physical causes; whether it *must* do so I acknowledge myself entirely ignorant, be the phenomena moral or physical, and I condemn accordingly the word Necessity as applied to either case. All I know is that it always does. (Examinations of S. W. Hamilton's philosophy).

এখন দেখা যাউক, এ কথা কতদূর ঠিক যে কার্যকারণের নিয়মের

মধ্যে অবশ্যজ্ঞাবিভার ভাব অসঙ্গত এবং অধৌক্তিক। মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, যখন স্বেচ্ছাভাবিতা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের নয়, তখন এ সকল বিচার কুসংস্কার এবং অত্যাশ-ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কথা, আমরা মায় দিতে পারি না। ইহা ভ্রমপূর্ণ। কে বলিল যে ইন্দ্রিয় ব্যতীত জ্ঞান-বুদ্ধির আর অন্য উপায় নাই? ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা যে অবশ্যজ্ঞাবিভার ভাব আসিতে পারে না, তাহা Hume অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, এবং আজকাল সকলেই সে কথা স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা অর্থাৎ দার্শনিক Kant-এর সহিত বিচার করি যে, স্থানীয় এবং সাময়িক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত আমাদের এক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ সন্দেহই এই অতীন্দ্রিয় বুদ্ধির ক্রিয়া আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞান যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লইয়া কার্য আরম্ভ করে, তাহার মূল এই দুই বিভিন্ন বুদ্ধির মিলন। এই বুদ্ধিকে যদি আমরা বুদ্ধি (Intellect) সংজ্ঞা প্রদান করি, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে প্রত্যক্ষজ্ঞান (Experience), ইন্দ্রিয় (sense) এবং বুদ্ধি (Intellect) এই দুই বুদ্ধির একীকরণ। বুদ্ধি-তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের অধীন হইতে পারে না। Mill প্রভৃতি বলেন, যদিও আমাদের এখনকার মানসিক অবস্থায় আমরা এই দুই বুদ্ধিকে বিভিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না, এমন সময় ছিল যখন এই সম্বন্ধ এত দৃঢ় ছিল না। আমরা বলি, বাহ্য কল্পনার অতীত তাহা লইয়া বুদ্ধি করা বাধ্য ব্যয় করা ব্যতীত আর কিছু নয়। যদিও Mill, বিশেষতঃ Bain এঁকেবারে বুদ্ধি স্বীকার করেন না, তবু তাঁহারা এই বুদ্ধির তত্ত্ব সকলের সংখ্যা সংক্ষেপ করিতে চান। সংযোগ (identification) এবং বিয়োগ (differentiation) এই দুই তত্ত্বই ইহার বুদ্ধির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এইরূপ মনে করেন। আমাদের বিচার ইহার ঠিক বিপরীত। আমরা মনে করি অগতে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে সমস্তই বুদ্ধির তত্ত্ব (principles of the intellect) * Kant-এর তত্ত্ব সংখ্যাও আমরা

* Like most English psychologists he (H. Spencer) tries to reduce the number of relations among things to a minimum, and * * * says that they are limited to likeness and unlikeness, coexistence in space and sequence in time. On the contrary, there is not a conjunction or a preposition and

সম্পূর্ণ মনে করি না। বস্তুতঃ বুদ্ধির তত্ত্ব অসংখ্য। জাগতিক সমস্তের সংখ্যা অনন্ত, বুদ্ধির তত্ত্বও অনন্ত। এ সকল কথাই প্রমাণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। Kant-এর পরে দার্শনিক জগতে যাহা কিছু প্রকৃত উদ্ভূতি হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। যাহা হউক, আমরা এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, কার্যাকারণ তত্ত্ব আমরা একটি বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়া মনে করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তির চেষ্টা ব্যথা; কেন না, এই তত্ত্বের অন্যথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই তত্ত্বের সত্যতা দিগিয়াই সম্ভব হয়। সুতরাং যাহা প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ববর্তী তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলরূপে বর্ণনা করা বাতুলতা। এই ভাবে দেখিলে আমরা বুদ্ধিতে পারিব যে কার্যাকারণ-সম্বন্ধ অবশ্যাস্তাবী এবং সর্বস্থান-প্রযুক্ত্য সত্য; কেন না, ইহা একটি বুদ্ধি তত্ত্ব। এখন আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি এই সম্বন্ধ কেবল বুদ্ধি-তত্ত্ব বাতীত আর কিছু না হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ জগতে এই সম্বন্ধ আছে কি না? Kant বলেন ইহা কেবল বুদ্ধিতত্ত্ব, বস্তুতঃ এরূপ কোন সম্বন্ধ জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে নাই; তবে আমাদের প্রত্যক্ষ (phenomenally real) জগতের মধ্যে ইহা নিত্য সত্য। কেন না, প্রত্যক্ষ জগৎ সত্যতাই বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায় এইখানে আমাদের Kant-এর সহিত বিবাদ উপস্থিত। আমরা বলি, জ্ঞানের তত্ত্ব (principles of knowledge) আর অস্তিত্বতত্ত্ব (principles of existence) এক। Kant-এর পরে সমস্ত দার্শনিকগণই তাহার এই বিশ্বাসটি তুলি বলিয়াছেন। যাহা হউক মোটের উপর এই দাঁড়াইল,—কার্যাকারণ সম্বন্ধ প্রকৃতি সমস্ত তত্ত্ব গুলিই অবশ্যাস্তাবী, সর্বস্থান-প্রযুক্ত্য এবং বস্তুতঃ সত্য। এ কথা স্বীকার করিলে আমরা বুদ্ধিতে পারি যে, অদৃষ্টবাদের ভিত্তি মিল্ প্রকৃতি বস্তু কোমল এবং চকুল মনে করেন বস্তুতঃ ইহা তত কোমল অথবা চকুল নয়। আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অনুসন্ধিৎসা 'হতে পারে'

hardly an adverbial phrase, syntactic form or inflection of voice in human speech that does not express some shading or other of relation, which we at some moment actually feel to exist between the larger objects of our thought * * the relations are numberless * *

XXXII Mind, Proff. W' James.

‘হয়ে থাকে’ ইত্যাদি উদ্ভবের সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানের বিষয় হইলেও অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব সকলের উপর স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আমাদের জ্ঞানের অসত্য নিবন্ধন সম্ভব (probable),—সম্ভব ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদের এ জ্ঞান এবং বিশ্বাস চাড়ান সম্ভব যে প্রকৃতপক্ষে জগতে সম্ভব (probable) বলিয়া কিছু নাই। সমস্তই অবশ্যস্বাতী—যাচা ঘটবে তাহা না ঘটাই পারে না। সমস্তঃ অদৃষ্ট-বাদের ভিত্তি শিলাখণ্ড অপেক্ষা দৃঢ়তর।

এই স্থলে একটি সাধারণ আপত্তির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে হইতেছে। যাহারা স্বীকার করেন যে এই নিয়ম অবশ্যস্বাতী এবং নিত্য। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, এই নিয়মের কার্য বাহ্যজগতে যে রূপ, অন্তর্জগতে সে রূপ নয়। বাহ্যজগতে ঘটনার কারণ ঘটনা বটে, কিন্তু অন্তর্জগতে ঘটনার কারণ আত্মা। বাহ্যজগতের কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থান এবং সময়ের সীমার মধ্যে বদ্ধ। অন্তর্জগতে অতীন্দ্রিয় কাল এবং স্থানের ব্রাহ্মগহবীর আত্মাই কারণরূপে প্রকাশ পায়। হুতরাং কার্যকারণ হুত ঠিক হইলেও তাহাদের প্রকাশের নিয়ম এক নয়। প্রকৃতপক্ষে, এখানে দুইটা বিভিন্নরূপ সম্বন্ধকে এক মনে করা হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কার্যশীল মনের যে সম্বন্ধ, প্রকৃতপক্ষে সে সম্বন্ধ, আর আমরা বাহ্যকে কার্যকারণ সম্বন্ধ বলিয়াছি তাহা এক নহে। অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে আমাদের ক্রিয়াশীল মনের, কিম্বা স্থান ও কালের ভিত্তির উপর স্থাপিত কার্যকারণহুতের, প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ আমরাও বিশ্বাস করি বটে যে, অতীন্দ্রিয় আত্মা ব্যতীত এই নিয়মের কোন অর্থই থাকে না; কিন্তু তাই বলিয়া আত্মাকে কারণ নাম দেওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। কার্যকারণহুত সময়সাপেক্ষ। কার্যকারণের মধ্যে পরবর্তিতা, পূর্ববর্তিতা প্রযুক্তি সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। আত্মাকে কোন তাবের পর বা পূর্ব বলা যায় না। কার্যকারণহুত পরিমাণ এবং প্রকার-বিষয়ক। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আত্মার পরিমাণ বা প্রকারের কথা কলা বাতুলতা যাত্র। আর, আত্মার সহিত সম্বন্ধ যে কেবল অন্তর্জগতের বিশেষত্ব, তাহা মনে করাও ভুল। বহির্জগতেও কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার

অস্তিত্ব গীকার না করিলে কার্যাকারণসূত্রের অর্থ থাকে না। পূর্বেই বলি-
যাছি, অতীন্দ্রিয় আশ্রয় সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিলেও ঘটনা সকলের অনশ্বাত্তানিতা
দূর হয় না। কার্যাকারণসূত্র অসং অর্থবা অবস্থার (phenomena) নিয়ম।
মতের সহিত অসমতের নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও সং হইতে অসমতের, বস্তু হইতে
অবস্থার সিদ্ধি হয় না। অসং সং হয় না, সং অসং হয় না। গীতার
বলিয়াছেন,—“নাসত্তো বিদ্যাতে ভাবো নাতানো বিদ্যাতে সত্যঃ।”

তবে কি স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই?—নিশ্চয়ই আছে।
অনিয়মিত স্বাধীনতার কোন অর্থ নাই। যদি স্বাধীনতা থাকে, তবে সে
নিয়মের মধ্যেই আছে। যেখানে নিয়মের কঠোর বাধুনি, সেইখানেই
স্বাধীনতা। এই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়াই Kant
স্বাধীনতাকে কতকটা নিরাসের বিষয় বলিয়াছেন। প্রথম, কার্যাকারণসূত্রের
প্রয়োগস্থল যে অসমতের (phenomena) রাজ্য, এইটী প্রমাণ করিয়া তিনি
বলিলেন, অতীন্দ্রিয় সত্তার রাজ্যে স্বাধীনতা বিরাজ করিতে পারে; তারপর,
তিনি দেখাইলেন যে, নৈতিক নিয়মের ভিত্তি—স্বাধীনতার নিরাস। Fichte
Hegel এতটি সকলেই বলিয়াছেন যে এইখানেই Kant-এর দর্শনের দুর্বলতা
বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীনতা এবং নিয়মের সামঞ্জস্য করিতে
হইলে এই দুই তত্ত্বকে বিচ্ছেদ করিলে চলিবে না। কিন্তু, এক চুল নিয়মের
সাত্ত্বিক্য হইবে না, অথচ স্বাধীনতা নষ্ট হইবে না, যোর অদৃষ্টবাদের মধ্যেও
স্বাধীন আত্মা নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—ইহাও কি সম্ভব? আলোক
ও অন্ধকারের নাশ এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে?—অসম্ভব
নয়। এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য তখনই হয়, যখন আমরা বুঝিতে পারি
যে, ইহাদের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অসম্ভব। ‘আমি’ বলিলেই, দাস্তবিক ‘আমি-নয়’
একটা কিছুই সঙ্গে সম্বন্ধ বৃদ্ধি। নিয়ম অর্থে বন্ধন, সঙ্গত অর্থেও
বন্ধন। আমার জীবন—সঙ্গত; সুতরাং আমার অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা—বন্ধন।
তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গত না থাকিলে আমি থাকিতে পারি না, বলতঃ তোমা
ব্যতীত আমার অস্তিত্ব নাই; সুতরাং আমি আজি বলিলেই বুঝিতে হইবে যে,
ভূমি আত্ম—আমার বন্ধন আছে—আমি নিয়মের অধীন। আমি তোমাকে
‘আমি’ এবং ‘আমার’ ভাবিতে পারি না বলিয়াই তোমাকে আমার বন্ধন

বলিয়া বোধ হয়। যখন ভাল করিয়া বুঝিব যে, তুমি আমি এক, তখনই স্বাধীনতা এবং নিয়মের সামঞ্জস্য হইবে। আর একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। মনে করুন, আমি আর আমার সমাজ।—বতকণ এই দুইটি বিভিন্ন বলিয়া ভাবিব, বতকণ মনে হইবে। সমাজের অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি। কিন্তু যদি একবার বুঝিতে পারি যে, সমাজ না থাকিলে আমি থাকি না, আমার জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, প্রেম বল, ভক্তি বল সমস্তই সমাজ নহিয়া; তখনই দেখিতে পাই যে, আমার নৈতিক অস্তিত্ব সমাজ ব্যতীত অসম্ভব। ইহার ভিত্তির রূপক কিছুই নাই—সমাজ আর আমি এক। আমার মনুষ্যত্ব ততটুকু, বতটুকু আমি এই একত্ব বুঝিয়াছি। এই ভাবটি যে একবার বুঝিয়াছে, তার কাছে কি সমাজের নিয়ম বন্ধন বলিয়া বোধ হইতে পারে?—এই ভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ঘটনা সকলকে অসম্বন্ধ ভাবে দেখিলেই নিয়ম স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, নিয়মকে নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্য গ্রহিয়াছে, বুদ্ধি তত্ত্বের দ্বারা তাহারা একত্রিত হইয়া রহিয়াছে, তখন দেখিতে পাই যে, ঘটনা শ্রেণীর আকার পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর বাহ্য বোধ হইতেছিল তাহা রহিল না।* এতক্ষণ তাহাদের বিভিন্ন বোধ হইতেছিল। এখন দেখি তাহারা এক। একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। পূর্ণক করিলে তাহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই।—সংযোগেই তাহাদের অস্তিত্ব। শত্রুকে আপনার মনে করিলে সে আর শত্রু থাকে না। আপনার গলায় আপনি রজ্জু দান করিলে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। একনকে যদি আমার জীবনের অংশ বলিয়া মনে করিতে পারি, কারণের বাহ্যিক ক্রিয়ায় মধ্যে যদি উদ্দেশ্যের এবং প্রেমের দৃঢ় বন্ধন দেখি, তাহা হইলে স্বাধীনতার মধ্যে নিয়ম থাকিতে পারে। আমরা পূর্বে যেখানে বৈজ্ঞানিক চক্ষুতে সম্বন্ধ ঘটনা সকলের বাহ্যিক

* The process of necessity begins with the existence of scattered circumstances which do not concern each other and appear to have no interconnection among themselves. These circumstances are "an immediate actuality which collapses, and out of which a new actuality proceeds. *Hegel's Logic, translated by Wallace.*

সম্বন্ধ দেখিতেছিলাম,—দেখিয়াছি সেখানে বাস্তবিক বুদ্ধিতত্ত্ব সকল তাহারিগকে এক করিতেছে। তাহারা দেখিলে বুঝিতে পারিব কারণের মধ্যে কার্য্য রহিয়াছে। ‘ন কারণং কার্য্যস্য বিভিন্নত্বং’। অন্তঃকণ্ঠের নীচ শক্তি সম্বন্ধে সহজে এ কথা বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি যে, যে আমি প্রথমে ভাব রূপে ছিলাম, পরে সেই আমিই আবার ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হইলাম। বুঝিতে পারি, বিভিন্নতার মধ্যে আমার একত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু বাহিরের শক্তি সকল যখন আমার আশার ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন কেমন করিয়া বলি যে তাহারও আমার পর নয়! যদি না পার, তবে ভূমি স্বাধীনতার অধিকারী নও।

বাস্তবিক, আমরা ভাল করিয়া অদৃষ্টবাদী নই বলিয়াই নিয়মের কঠোরতা অমুভব করি। অদৃষ্টবাদের মূল এই যে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে অথবা ঘটবে সমস্তই অবশ্যজ্ঞানী—অর্থাৎ জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলে বদ্ধ।—বাস্তবিক বলিতে গেলে ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই ভাবে দেখিলে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, সামান্য বালুকাবণের জীবনের সঙ্গে গগনব্যাপী নক্ষত্রপুঞ্জের জীবন অভেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—উভয়ের জীবন এক। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অনন্ত আকাশ এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া একই সত্তা বিস্তার করিতেছে। জগৎকে ভাগ করিয়া দেখ, তোমার আমার স্বাধীন সত্তা ভাব, দেখিবে অদৃষ্টবন্ধন বড়ই কঠিন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ,—ত্রিকালজ্ঞ সেই মহাপুরুষের জীবনে সমস্তই এক। বন্ধন বলিয়া কিছুই নাই—কেন না, ভূমি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই, বন্ধন জীবের কিছুই নয়, সে তোমারই জীবন। অবশ্যপ্রাতিভার ভাবকে কেবল উপরে উপরে দেখিলে অদৃষ্ট-বন্ধন মৌহ শৃঙ্খলাপেক্ষাও কঠোর বোধ হইবে।—উল্লাইয়া দেখিলে মনে হইবে সে বন্ধন পরচিত কুসুম-হার সদৃশ কোমল। বুঝিবে, ইহা বাতীত স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা নিয়মের মধ্যে। অনিয়মিত স্বাধীনতার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। চোর মনে করিতে পারে তাহার শাস্তি তাহার বন্ধন। তাহারা দেখিলে বুঝতে পারি যে, সে বন্ধন তাহারই আভ্যন্তরীণ স্বভাবের বিকাশ। তাহা অবশ্যজ্ঞানী—তাহা অদৃষ্টের খেলা। যদি এ কথা সে বুঝিতে পারে তবে সে স্বাধীন।

প্রকৃত স্বাধীনতা আমরা তখনই লাভ করি, যখন আমরা মুক্তিতে পারি সমস্তই অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্যই জার্মান দার্শনিক হিগেল (Hegel) বলিয়াছেন,—“The truth of necessity is Freedom and freedom presupposes Necessity.”

যোগীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর বলিয়াছেন,

জানামি ধর্মঃ নচ মে প্রবৃষি
জানাম্যধর্মঃ নচ মে নিবৃষিঃ ।
ত্বয়া অধিকেষ ভদ্রি স্থিতেন
যথা নিমুদেষামি তথা করোগি ॥

আবার তিনিই ‘মোহঃ’ ‘ভবমসি’র তাৎপৰ্য্য জগৎকে বুঝাইয়াছেন ।

সংগ্রহ ।

ঐবশব্দ মিত্র ।

গোপাল ।

(গাথা)

গভীর ঘামিনী, অঁধার আকাশ,
দূরেতে রটিকা বাসে,
দিগন্তের কোলে চমকে দামিনী,
—পথিক ছুটিছে ত্রাসে !

২

এ ধানের গর্জিতে অশ্বখের জেলী,
ও ধানে তটিনী ভাসিছে পাড় ।
হোথাব খামানে জলিতেছে চিত্তা,
—বড় আশ্র দেহ, চলে না আর !

সপ্ত বর্ষ পরে কিরিতেতে বসে ;
 ব্যাধুল দেখিতে দীপ্ত-দৃশ্য !
 অর্থের অভাবে ভেঙেছিল দেশ ;
 পেয়েচে সে অর্থ, পাবে কি হৃদ ?

৪

“গোল—গোল দ্বার !” শিক্ত কুটীর ;
 পুন কবাবাতি' ডাকিল হৈকে ।
 একটি নিদ্রান, হুধু শোনা গেল !
 চাল হ'ত পেঁচা ঠড়িল ডেকে ।

৫

“গোল—গোল দ্বার !” ভেঙ্গে গেল দ্বার ।
 —এ কি নিশ্চিন্তা ভর-সকালী !
 হাসিল বিদ্রোহ পিশাচীর মত, —
 মৃতপুত্র-বুকে হুধু নারী ! !

৬

ততড়, ততড়, বরষে জলদ,
 হুহু বড়েতে উড়ে যায় চাল ।—
 হুধু'র মাথা কোলেতে রাখিয়া,
 মৃত পুত্র-দৃশ্য চুমিছে গোপাল ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা ।

(প্রস্তাবনা)

প্লেয় এক শতাব্দী মাত্র অতীত হইতে চলিল, যুরোপীয়গণ সংস্কৃতানুশী-
 লনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । সত্য বটে মিকন্দর সাহ নামক ক্রীমদেশাধিপতির

দ্বিপ্রহরের পর দুই একজন গ্রীষ্মদেশীয় পণ্ডিতের সংস্কৃতভাষায়ের কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহার পর মধ্যে একেবারে ও চর্চা: বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা সেই সময়কে অবধি কথিয়া ধরিতে পারিলাম না। তারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার কতক পরিমাণে দৃঢ় সংস্থাপিত হইবার পর হইতেই পুনর্বার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতচর্চায় প্রবৃত্ত হন। বোধ হয় সার জোস নাইটের সময়ই প্রথম আশোলনের সময়, কারণ তাঁহার পূর্বে যুরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংস্কৃতভাষায়ের কথা নড় একটা শুনা যায় না।

যাণী হউক এই অস সময়ের মধ্যে যুরোপীয় পণ্ডিতগণ দৃঢ় অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের সহিত একরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছেন যে চিত্রা করিলে বিশ্বাসযুক্ত হইতে হয়। বেদ হইতে হিতোপদেশ পর্যন্ত বাবতীর সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ইউরোপীয় নানাবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এইরূপ প্রগতি বহুর সহিত সংস্কৃতভাষায়ের বলে ভাবাত্তর নামক একটি নতুন বিষয় সমুদ্ভূত হইয়াছে। এবং অনেক নিবিড়াকার-নিষ্ঠিত তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়া পূর্বাশ্রিত অপরাপর তত্ত্বকেও সম্যক আলোকিত করিয়াছে। কল, সংস্কৃতভাষায়ের যেমন তাঁহার অগতির উপকারসাধন করিতেছেন বটে, সেইরূপ অন্য দিকে অনেক স্থলে তা স কখনো বলে সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে নানাবিধ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া এবং অমৌলিক এবং অদৌক্তিক বহুসং ভেদ করিয়া, অগতির পক্ষে বতাই হোক, ভারতের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ধৃষ্টদর্শে প্রগতি বিশ্বাস থাকায় তাঁহারা ভারতীয় শাস্ত্রনিচয়কে ধর্মগ্রন্থ-পক্ষপাতী চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সুতরাং অনেকস্থলে বিশেষতঃ ধর্মগ্রন্থ নিচয়ের আলোচনায় বহুল পরিমাণে প্রমাণের বশীভূত হইয়াছেন। সচরাচর তাঁহাদের মত সকল ভ্রমপূর্ণ, প্রমাণ-শূন্য ও অদৌক্তিক বলিয়া লক্ষিত হয়। কাবেই উহার প্রতিবাদ। এক্ষণে প্রতিবাদ দ্বারা ঐ সকল ভ্রমপূর্ণ মতের তত্ত্ব তত্ত্ব করিয়া ধ্বংস না করিলে উহা চিরকালের নিমিত্ত বহুল হইয়া আমাদের পণ্ডিতের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের পৌরব বিলুপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে অজ্ঞানতা প্রতিবাদ করে কে? যুরোপীয়দিগের মত সকল ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয়। আমাদের দেশে বাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

তাহারা ইংরাজীর নাম গন্ধও জানেন না । তাহারা ইংরাজীতে ব্যাপ্ত
তাহারাও আবার সংস্কৃতের সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না । হুতরাং
ইংরাজেরা আমাদের শাপ সম্বন্ধে আমাদের চিরসংস্কার বিরুদ্ধে যাহা
বলিতেছেন তাহা অর্থোক্তিক ও ভ্রম-প্রসাদপূর্ণ হইলেও প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়
চিরকালের নিমিত্ত বন্ধন হইয়া যাইতেছে । উহারা একবার বন্ধন হইলে
সে ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কার সকলের লোপ করিয়া তৎস্বলক বর্ষের শরীর
কর্ষণ হস্ত দ্বারা মর্জনা করত তাহাকে একেবারে ক্ষয় করিলে তাহা
এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত । বিশেষ বোধিতেছি, আজকালের নব্যসম্প্রদায়ের
অনুগ্রহ বড় ভরানক ; তাহারা সংস্কৃতের দ্বার ধাবেন না, নিজের শাস্ত্রে কি
আছে না আছে তাহার তত্ত্ব লেখেন না, তাহাদিগের গুরু ইউরোপীয়গণ সে
সম্বন্ধে যাহা বলিল তাহাই তাহাদের ধারণা, তাহাই তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান,
এবং তাহাতেই তাহারা আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদির উপর, বাহা মনে
আসিল, ঐত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন । অমুবাদ মাত্র পড়িয়া, বেদের পাতা
না উল্টাইয়াই, কেহ যে ‘চাবার গান’ বলিয়া দীর্ঘজ্ঞানে প্রবন্ধ লিখিলেন ।
বড়ই সর্ব্বেন্দ্রিয় কথা । এরূপ আর কিছু দিন চলিলে শীঘ্রই হিন্দু নাম
লোপ পাইবার আশঙ্কা ।

এইরূপ নানাবিধ অনিষ্টোৎপত্তি চিত্রা করিয়া আমরা “ইউরোপীয় সংস্কৃত
শিক্ষা” এই নাম দিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম ।
ইহাতে প্রথমে কেবল ইউরোপীয়দিগের এক একটি শাস্ত্র বিষয়ক মত প্রকা-
শিত হইবে, পরে তাহাদিগের বধাসাধা প্রতিবাদ করিতেও চেষ্টা করিব ।
কিন্তু এরূপ প্রতিবাদ একজনের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে । এইজন্য আমরা পাঠক-
বর্গকে অনুরোধ করি, তাহারা ইউরোপীয় মতগুলি যদি পণ্ডিতদিগের নিকট
বিদিত করিয়া সেই সেই বিষয়ে তাহাদিগের অভিমত সংগ্রহ করিয়া আমা-
দের নিকট প্রেরণ করেন তাহা হইলে অনেক উপকার বোধ হয় । এখানে
ইহাও ব্যক্তব্য যে, আমরা যে বিষয় ধরিব সে বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিত
কর্তৃক যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে তাহা একবারে নিঃশেষ করিয়া না বলিয়া
তদ্বিবর প্রতিবাদ আরম্ভ করিব না । সর্ব্বত্রমান্য এবং সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া
আমরা অগ্রে বেদকেই আশ্রয় করিলাম । এক্ষণে বেদের বিষয় ইউরোপীয়

পণ্ডিতগণ যাঁরা কিছু নিবিয়াছেন, তৎসমুদায় ক্রমশঃ প্রকাশিত করিয়া পরে সেই সেই মতের প্রতিবাদ আরম্ভ করিব। বৈদ্য অতি নিম্নত। ইহার সম্বন্ধে বহুদিন সমালোচ্য 'বহিষ্যছে'। উচ্চদেশে যুরোপীয়গণ যেরূপ সূক্তি ও শিষ্টাব দ্বারা উহার অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাই প্রথম অণোচিত হইতেছে।

প্রথম পদ্য—প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেদের অনিত্যতা।

(খিখোডর গোল্ডষ্টকারের মত।)

চিরকাল হইতে নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রে বৈদ্যের নিঃশ্রুতা সিদ্ধ হইলেও এক্ষণে যুরোপীয় পণ্ডিতগণ উহার বৈপ্লবীতা অর্থাৎ বৈদ্যের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য সেই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মহামান্য প্রাচীন পণ্ডিত গোল্ডষ্টকারের মতের প্রথমে উপস্থাপন করিলাম। তিনি বলেন—‘বেদ’ এই কথাটি সংস্কৃত জ্ঞানার্থক ‘বিদ’ ধাতু হইতে উদ্ভূত; ইহাকে লাতিন *vid* এবং পণ্ডিত *vid* এর সহিত একার্থক বলা যাইতে পারে। ‘বেদ’ এই কথাটির মৌলিক বা প্রাকৃতিক অর্থ—জ্ঞান বা বিদ্যা; কিন্তু আজ কাল ইহা দ্বারা কেবল সেই প্রসিদ্ধ জনমণ্ডিতে সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়ের বোঝ হয়—যাহা ব্রাহ্মণীয় ধর্ম বা বর্ণাশ্রমশাস্ত্রের মূল-ভিত্তি-স্বরূপ এবং যাহাকে চিন্তাগণ দেবোত্তরাধিত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই বৈদ্যগণ প্রথমে তিনখানি মাত্র ছিল, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সামবেদ। কিছু কাল পরে ঐ তিন খানির সহিত অভিনব চতুর্থ বেদের (অধর্মবেদের) যোগ করা হয়। কিন্তু উহা কখনই যে পূর্ববর্তী বেদ ত্রয়ের সহিত সমান আদর বা অত্যাশ্রিততা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

(১) প্রথমতঃ ঋগ্বেদের পুস্তক সূক্তের নবম কণ্ডে কেবল ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং সাম বেদেরই নাম দৃষ্ট হয়, ঐ চতুর্থ বেদের নাম পদ্যে নাই।

(২) সমুদ্র-প্রবীত বর্ষশাস্ত্রেও ঐ চতুর্থ-বেদের কথাই নাই বলিলে

হয়, কারণ মধু সর্করই কক্, যজু এবং সাম এই তিন বেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল একাংশ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে অথর্কানিরম বেদের উল্লেখের বিষয় বলিয়াছেন, এ স্থলে, অথর্কানিরম এই শব্দ দ্বারা অথর্কবেদ তাহার অভিপ্রেত হইলেও তিহু নামে নামে ঐক্য নাষ্ট ।

(৩) মীমাংসকগণ বাহাণের সন্ধিত বৈদিক বাণ্যের বিশদ ব্যাখ্যান এবং বৈদিক বচনের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জনই একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল, তাহারোও কেবল প্রথমোক্ত তিনগানি বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন অথর্ক বেদকে স্পর্শও করেন নাই ।

আরও এক কথা, সকল বেদেরই পৃথক্ পৃথক্ যক্ষীর প্রয়োজন আছে । যেমন যজ্ঞাশুষ্ঠান কালে হোতা নামক পুরোহিত ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বকর্ম্য পূরণ করেন, অগ্নিযজ্ঞ, যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞে অর্চন বিধির অনুষ্ঠান করেন এবং উজ্জাতা, সাম বেদের মন্ত্র সকল দ্রব-সংযোগে গান করেন । এইরূপ অথর্কবেদের কোন বিশেষ যজ্ঞ কার্য্যে প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় না । এতদনুযায়ী কার্য্য করিতেও কোন বিশেষ পুরোহিতের কথাও বলা হয় নাষ্ট ।

মধুপদন নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়াছেন, অথর্ক বেদ কোন যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না । ইহাতে কেবল গৃহশাস্তি ও অভিষাপ প্রভৃতি কতকগুলি অভিচার কার্য্যের শিক্ষা দেওয়া হয় । এইরূপ নানা কারণে ইহা দ্বির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অথর্ক বেদ পুরোক্ত যজ্ঞকর্ম্ম-সাধক বেদত্রয়ের সহিত রচিত হয় নাই । অথর্কবেদ যে পুরোক্ত তিন বেদ অপেক্ষা অনেক পরে রচিত তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, বৈদিক কার্য্যের নিয়ামক হৃত ঋগ্বেদ ইহার নামোন্মেষ নাষ্ট, আর যদি ইহাকে একটা প্রমাণ বলিয়া না ধর, তাহা হইলেও মন্ত্রের ভাবাই ইহার আধুনিকতার পরিচায়ক, কারণ গুরুপ ভাবা আর কোন বেদে নাই ।

বাহা হউক আর একটা আশ্চর্য্য এই যে, কমহৃতনিস্যেষ যজ্ঞাশুষ্ঠান ব্যবস্থাপক নিয়মগুলি একত্র বিলাইয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইবে যে, যজুর্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্র সকল কোন না কোন যজ্ঞকর্ম্মের প্রয়োজনে আসে । কিন্তু কক্বেদের মধুপদ মন্ত্রই যে যজ্ঞের প্রয়োজনে আসে

তাহা নহে । ইহাতে এমন সকল মন্ত্র আছে যাতে বজ্রের কোনরূপ সম্পর্ক নাই বলিলে চলে । ঐ সকল মন্ত্রে উৎকৃষ্ট কবিত্ব এবং সামাজিক বা ঐতিহাসিক গূঢ় রহস্য দৃষ্ট হয় । ইহা স্বাভাবিক আমরা অন্যরাসে এইরূপ অজ্ঞান করিতে পারি যে পরবর্তী লোক সমুদয় বেন-মন্ত্রের যজ্ঞনিষ্পাদকতা সিদ্ধ করিতে সাতিশয় বছরান হইলেও তাহাদের ঐ যন্ত্র পূর্বোক্ত কাব্য-প্রসবকারী নৈসর্গিক কবিত্ব-শক্তির নিকট নিকট হইয়াছে ; যেহেতু তাহাদের শত চেষ্টা মত্তেও ঐ সকল কবিতা যজ্ঞীয় মন্ত্রের মতো পরিগণিত হয় নাই । কয়েকদর অস্ত্রিমমণ্ডলে একটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়, উহাতে একজন দাস্তকারের স্বীয় পাপোদ্দীপক গতিত্ব বৃত্তির নিমিত্ত অনুতাপের বর্ণনা আছে । ঐ সকল মন্ত্র যে তৃত্যাদিষ্টাৎ দেবগণের স্তুতির ব্যাক্ত ও যজ্ঞনির্মাণক মন্ত্র সমূহ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ভবিষ্যে কোন সন্দেহ নাই ।

[ক্রমশঃ

শ্রীজীবীকেশ শাস্ত্রী ।

কৃষি-কথা ।

আমি এইরূপ কৃষি, সংসারে থাকিতে হইলে যতকিছু বিদ্যার প্রয়োজন-তাগর মধ্যে কৃষিবিদ্যা সর্বাধিক্য পরীক্ষণী । অস্ত্রাশ্র বিদ্যার উপকারিতা আছে সত্য, কিন্তু ইহার সহিত সে সব তুলনা হইতে পারে না । টোলের পণ্ডিত যাবজ্জীবন কেনপুত্র-সন্ততিত্ব যবে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির সূত্র আওড়াইয়া তর্কসিদ্ধান্ত, স্তায়রত প্রভৃতি উপাধির হার গলায় ঝুলাইলেন, কিন্তু গৃহস্থীর গৃহস্থান্যতার জন্য তর্জনে গর্জনের ভয় ঘৃণিত না । শ্রীজীবীকেশ পাড়ায় পাড়ায় ব্যবস্থা বিধি বেড়ান, কিন্তু আপনায় অন্নহীনতার ব্যবস্থা আজও হইল না । শাস্ত্রবিদ্যার কথা যাউক, শত্রু বিদ্যার দশা তাহা অপেক্ষাও হীন । শত্রুবিদ্যার চর্চ্চা আমাদের দেশে নাই । বাহা আছে তাহার উপকারিতা অতি যৎসামান্য । সেনাপতির তর্জনী হাতে সকালনে সিপাহীরা যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য সদত প্রস্তুত,

তাহাদের মাসিক বেতন ৮ আট টাকা মাত্র। সঙ্গীত বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে বড় পান; কিন্তু সে ভ্রান্তি মাত্র। “পানাহ পরত্তরং নহি”—ভরতমুনির এ কথা যে মানে সে মানুষক, আমি মানি না। সঙ্গীত বিদ্যার পেট ভরে না, চালে খড় জুটে না। সঙ্গীতের আদর করজন নুকে? পাশকরা বিদ্যার আদর আজ কাল বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহারও উপকারিতা দেখি না। এম্ এ পাশ করিয়া শেষ যাবজ্জীবন উপার্জন করিলেও পাশ করিবার ধরচ পোষণ না। পোলামি ভিন্ন তাহার অশ্রু পতি নাই। যিনি রসিক, তিনি হয়তঃ বিদ্যার তুলনার কথা ভনিয়া বলিবেন, “চুগি বিদ্যা বড় বিদ্যা।” কিন্তু সে সব রসের কথা হইতেছে না। এই নিরন্তর হাহাকার মধ্যে কৃষিবিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার উপকারিতা ভুল নুশ্বিতে পারি না। “বাণিজ্যে বসতে লক্ষী তদর্জঃ কৃষিকর্ষণি”—এ কোন অপভ্রংশের কথা। কৃষি অগ্রে, বাণিজ্য তাহার পরে। আপনার অভাব পূরণ করিলে পর, বাহা উদ্ধৃত থাকিবে, তাহা লইয়া অপরের জীবের সহিত বিনিময় করার নাম বাণিজ্য। বাহার নিজের অভাব পূরে না—যে পেটে খাইতে পায় না, সে কি ধন লইয়া বাণিজ্য করিবে? প্রাচীনেরা এ কথা নুশ্বিতেন। তাই তাহারা কৃষির আদর এত বাড়াইয়া-ছিলেন। আধ্যাত্মিকের কথা কি বলিব, নুশ্বি তো তাহাদের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতিরাও ইহার আদর বড় নুশ্বিতেন। তাই, রোমক কঙ্গলেরা ফোরমেব রাজমক পরিত্যাগ করিয়া সমগ্রে সময়ে মাঠে পড়িয়া বহুস্তে হল চালনা করিতেন। কৃষিবিদ্যার জ্ঞান বিদ্যা আর নাই।

কিন্তু, কৃষির সে দিন কাল গিয়াছে। বিশেষ, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা এখন নষ্টচক্র হইয়া ঝাঁড়াইয়াছে। দেশ সভ্য হইয়াছে, কামিজ মোজার কাল পড়িয়াছে; এখন হলো মুঠি হইতে বাণেশ্বর চুড়ামনি পর্য্যন্ত সকলেই চাকুরে বাবুর দল। কৃষিকর্ষ যে কেহ করে, সে ঘুণার পাত্র। ঘুণার পাত্র বলিয়া তাহা এক প্রকার নীচ জাতীয়দিগের উপরেই বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে রোগটা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। নীচ জাতীয়রাও দুখানা ব'য়ের পাতা উন্টাইয়া আর লাঙ্গলের মুঠি ধরিতে

চাহে না। পাঁচ টাকা মাহিনার ডাকহরকরা হইবে সেও ভাল; তবু “চাকুরে” যেতাম। ভূমি চমিতে গেলে দেইতো বোলেনের আগনে ধরশান খাইতে হইবে! কিন্তু তাহা নাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর কি তাহা পারা যায় না? এখন মধে মনে ‘বন্ধি: ব্যাপ্য যুববান্’ চুরটের অপূর্ণ শোভা নিরাজ করিবে। পাছে পায়ে একটু ছুলা লাগে এ জন্য পায়ের উপর যোজা, তার উপর প্রিয়ার্ভর, তার উপর চিনের বাড়ীর বুট; ইহা না হইয়া কি না এক ঠাট্টা কাদার দাঁড়াইয়া বসদ ঠেগান—দে দৃষ্ট মনে ভাবিলেও স্তব্ধ উপস্থিত হয়। গরিব যুদ্ধ চাষা না সুকিয়া পেটের ক্ষুধা পেটে মারিয়া ছেলেকে ‘এ বি’ পড়াইয়াছিল। এখন সে জলে না চাকুরি করে. না লাঙ্গল চষে; কেবল তেড়ি কেটে, বাস ভাঙ্গে, আর পোষাক কেনে।

ইহাদিগেরই যখন এই অবস্থা তখন “ভদ্র”-আখ্যায়িকাদিগের কথা কি বলিব? যে কেহ পয়সার জোরে হইক, পোশাকাদিগের জোরে হইক, মুকুটি ধরিয়া ১০।১৫ টাকার একটা চাকুরি বুটাইতে পারিল, তাহারি ছেলে তরিয়া পেল. নচেৎ সে ছেলের অনন্ত অবস্থা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের ধারণা, চাকুরি ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই; এবং চাকুরিতে তাঁহারাই একমাত্র বংশ পরম্পরাক্রমে চিরসত্ত্ব সদবান্, অন্য কেহ দাবি দগুয়া করে তাহা নাগর্য্যন। তাঁহার। বাহাদিগকে নীচজাতীয় ভাবেন, তাহাদিগের মধ্যে আফিসে কেহ চাকুরি পাইলে অনেকের অসহ্য হইয়া উঠে। অনেকে ভাবেন কালে কালে সব হইল, এইবার ইহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের অন্ন মারিল। কেহ বা ঈর্ষা চাপিয়া না রাখিতে পারিয়া একটু ছল পাইলেই তাঁহাকে সন্দোহন করিয়া বলেন—“গাপু হে. যে হাতে লাঙ্গল ধরিবে সে হাতে কি কলম ধরা শোভা পায়?” কৃষিকর্ম ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের নিকট এতই হেয় কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরের দূরবর্তী কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণেরা কৃষিকার্য্য সহজে না করিলেও লোক জন রাখিয়া আজও চাম আবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের নিম্নার পরিসীমা নাই। যে বৎস টাকার চাকুরি করে. সেও তাঁহাকে ‘চাষা’ বলিয়া ঘৃণা করে। তাঁহারি অগরাধ তিনি কোট কামিজ পরেন না, ১০।১৫ টাকার চাকুরি করেন না;

নিজের চাকর রাখিয়া চাগ করেন, আর বৎসর বৎসর আপন ছাতে রাশি রাশি ধান মাটিয়া গোলায় তুলেন। অন্তরবে শুনা যায়, শীতাই সমাজে তাঁচার হাঁকা বন্ধ হইল।

কিন্তু কেন এমন হইল তাঁহা বুঝা যায় না। যে আর্ঘ্যগণের বংশাবলী বলিয়া আমরা এই অধঃপতনের দিনেও বিদেশীর নিকট স্ফীক করিয়া থাকি, সেই আর্ঘ্যগণ তো কৃষিজীবী ছিলেন। উপনিবেশ-স্থাপনার সেই আদি দিনে নবীন সূর্য্যোদয়ে প্রসাতমূর্ত্তি আর্ঘ্যগণ পঞ্চদশ ভূমে ভ্রমণ করিতেছেন— উন্নত দেহ বেড়িয়া শুভ যজ্ঞোপবীত লব্ধবান, পায়ের বন্ধনে মধুর হাসি উজ্জ্বলিতা পড়িতেছে, স্বস্তের উপর সুদীর্ঘ হল শোভা পাঠিতেছে, সঙ্গে অগণন দেহপাল ছুটিতেছে—সে দৃশ্য কি মনোহর! সেই দৃশ্যে ভুলিয়া পাটীন আর্ঘ্যগণ সেই হল-মুখে আপনার সুকাঙ্ক্ষিত ধন-রত্ন রাখিয়া ফেটাইল। আর্ঘ্যগণ শঠেন: শঠেন: আপনার পক্ষে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেক দিন পূর্বপুরুষগণ এই হলের আদর তুলেন নাই। রাজারাজ চক্রবর্তী হইলেও কেহ কেহ স্বহস্তে হল ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেন। রাজর্ষি জনক স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে করিতেই সীতামুখে সীতাদেবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষপদরাজ স্বহস্তে যত্রভূমি কর্ষণ করিতে করিতেই দ্রৌপদী লাভ করিয়াছিলেন। আজ কাল পেন-কলম হইয়া হলের মেরুপ অনাদর হইয়াছে, পূর্বে এমন ছিল না। তখন সকল যন্ত্র এবং সকল অস্ত্র অপেক্ষা হলের শ্রেষ্ঠত্ব সকলে মানিত। তাই উপাসক আপন দেবতাকে হল অগ্নে সাজাইল। বলরামের হলের নিকট অর্জুনের পাণ্ডীষ এবং কৃষ্ণের সুদর্শন পরাস্ত হইত। সেই হল আজ দুর্বল কেরাকির ঠিলপেনের নিকট হুণার সামগ্রী!

যাহা ইউক, কল কথা, কৃষিবিদ্যার বড় অনাদর হইয়াছে। এরূপ অনাদর ভাল নয়। কৃষিবিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সভ্যতার বাহ্য শোভায় আজ সমগ্র দেশ অভিমানভ্রান্ত, ইহাই আদিম সভ্যতার মূল কারণ। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বকল বলেন—সভ্যতার প্রথম কারণ সামাজিক ধনসঞ্চয়। ধনসঞ্চয় না হইলে কান্না কখনও উন্নত হইতে পারে না। কিন্তু ধনসঞ্চয় হয় কিরূপে? মানুষ যখন প্রথম সমাজে আসিয়াছিল, তখন কিছু প্রত্যেক লোক এক একটা টেকশালা সঙ্গে লইয়া আসে নাই, যে ইচ্ছা করিলেই

সকলে ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে। মানুষ দুই হাত দুট পা নইয়া আসিয়াছিল, সেই হস্ত পদে পরিভ্রম করিয়া আপনাতর উপায় আপনি করিল। মানুষ প্রথম কৃষিয়া দেখিল, তাহার হস্ত পদ সব ঠিক আছে, কিন্তু উদর শূন্য, ইহা এক দিনও না পূরাইলে চলে না। তখন মানুষের প্রথম কর্তব্য হইল, কোনও উপায়ে উদর পূরণ করা। ক্রমে উপায় স্থির হইল। মানুষ দেখিল তাহার চারি পাশে উদ্ভিদের রান্ধি। বাছিয়া বাছিয়া সে উদ্ভিদ আহার করিয়া আপনাতর প্রাণধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে লোক-সংখ্যা বাড়িল। সমাজের গঠন হইল। সমাজে সমাজে অনেক লোক, লোকে লোকে অনেক উদর, কিন্তু সকল উদরই শূন্য। কাজেই, উদরপূর্তির উপায় আরও প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন হইল। বাহা থাকিলে প্রাণধারণ হয় তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে ভরাইবার জন্য চেষ্টা বাড়িল। মানুষ কৃষিবিদ্যা শিখিল। সেই বিদ্যানলে সমাজের প্রাণও শূন্য উদর পূরিল। সকলে চিনিল, কৃষিবিদ্যার ন্যায় গৌরবমী বিদ্যা আর নাই, সকলে সেই বিদ্যায় মন দিল। ক্রমে সকলের পরিভ্রমে অনেক সামগ্রী উৎপন্ন হইল। তখন সমাজের আহার কুলাইয়াও কিয়ৎকাল উদ্ভূত হইল। সেই উদ্ভূত সামগ্রী সমাজের ভাণ্ডারে গেল। সমাজের ধনসঞ্চয় হইল। যতক্ষণ উদর শূন্য থাকে ততক্ষণ ধনসঞ্চয় হয় না। যে পেটের জালায় লালাগ্রিত—কুখা পাইলে বাহার আপন হাতে করিয়া খাইতে হইবে, তাহার অবকাশ কখন? লোক অবকাশ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিদ্যার চর্চা বা জ্ঞানের আলোচনা না করিলে উন্নত হইতে পারে না। এই কার্যে সমাজে এক ভাগ সাবকাশ হওয়া আবশ্যিক। সাবকাশ হইতে পাতা বাগ, যদি সকলকেই পেটের জালায় 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে না হয়। যদি সমাজের অপর একভাগ তাহাদিগের আহারীয় খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্তপরিমাণে যোগাইয়া দেয়। আর্থগণের ইতিহাসে কি দেখিতে পাই? প্রথম অবস্থায় সকলেই কৃষিজীবী, সকলেই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনে ব্যস্ত। তার পর, যখন আহারীয় সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইল, লোকের আহার কুলাইয়াও উদ্ভূত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সকলেই সেই এক কার্যে নিরত না থাকিয়া কেহ কেহ বিযয়ান্তরের আলোচনায় মন দিল। এইখানেই

বর্ণাশ্রমবিভাগের স্বত্বপাত । তখন, এক এক শ্রেণীর উপর এক এক বিষয়ের ভার অর্পিত হইল । কৃষি এক সম্প্রদায়ের জীবনের অবলম্বন হইল । তাহারা সমাজের আহার সোণাইতে লাগিল । স্বতরাং অন্য এক সম্প্রদায় সানকায় হইয়া জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করিল । সেই চর্চায় আর্দ্রাগণ এক দিন উদ্বিগ্নতার চরম সোপানে উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গোবৎস-দুর্ঘা সমস্ত অগ্নি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল । আর, তাহা না হইয়া যদি সকলকেই 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া বেড়াইতে চাইত ? তাহা হইলে কোথায় থাকিত সাংখ্য পাতঞ্জল, কে বা স্তমিত বাস বাস্তুকির নাম, কে বা গাহিত ভবকৃতি কালিদাসের গুণ-গাথা ! জীবন ধারণ সকলের আগে, তোমার বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য বা রাজনীতি তাহার অনেক পশ্চাতে । পেটের আলা বড় আলা । 'অন্ন-চিন্তা চমৎকার ।' তোমার মিল্ নেকন কোমৎ ঘূরারবাক, কি শকুন্তলা কানন্দী নৈষধ কিছুতেই কিছু হয় না । তাই বলিতেছিলাম, কৃষিবিদ্যার নাম বিদ্যা আদ্য নাই । সাহায্যে সকলে ইহার মর্ম্ম বুঝে, নুনিয়া আপনার উপায় আপনি করিতে পারে, আজিকার দিনে তাহা বড়ই কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে ।

আর কেনই না লোকে ইহার প্রতি একরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না । আগে তো এমন ছিল না । এ কি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল ? অনেকে দেখিয়া শুনিয়া তাই মনে করেন । বড় ভুল । পাশ্চাত্যগণ কৃষির আদর বুঝেন । তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সমাজের অগ্রণী, দেশের মাথা, তাঁহারাও স্বহস্তে লাভুল চাষিতে আনন্দানুভব করেন । রোমান ডিক্টেটর সিন্নিওনেটস, মহাবল ওয়াসিংটন, অগাধসহ গ্যারিবল্ডি—আরও কত লোকের নাম করিব ?—রাজমন্ত্রী হইতে সামান্য সৈনিক পর্যন্ত সকলেই চাষ করিতে বড়ই ভালবাসে । চাষ করিতে জানে, এবং তাহা করিতে পাইলে ধার পর নাই দুখী হয় । জর্জনি ও অষ্ট্রিয়ার এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহাদিগকে Farmer princes বলে । তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি ; সমাজে তাঁহাদিগের মান্যের সীমা নাই । ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর বড় লোক আছেন, তাঁহাদিগকে Gentlemen farmer বলে । House of Commons-এ তাঁহাদের অঙ্গুর প্রতিপত্তি । সেই House of Commons-এর মতে দেশ

চলিতেছে। ইংরাজ কখন কৃষির অনাধার করে না। তাহাদিগের শিক্ষার কখনও ইহা শিখাইতে পারে না। কৃষির উন্নতির জন্য ইংরাজ বড় বড় স্কুল কলেজ স্থাপনা করিতেছে। বে চাই একজন ভারতবাসী আজকাল কৃষি-বিদ্যা শিখিতেছেন, সেও ইংরাজের সেই স্কুল কলেজ হইতে। তবে, কেন আমাদের এমন নতি গতি হইল? কেন আমরা এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম? হ্যাটকোট, চেন চুনট ইংরাজের সব অনুকরণ করিলাম, কিন্তু তাহার মহৎ ওণ কেন শিখিতে পারিলাম না? সেই বাহ্য-শোভায় মগ্নিয়া আপনার নিজের যাহা ছিল, তাহাও কেন ভুলিয়া গেলাম? হ্যাটকোটে তো পোড়া পেট বুকে না; কথায় কথায় ইংরাজি চালে চলিলে এ বিষয় ফুলা তো মেটে না! গৃহে বাহার চামচিকা ও আরহুমার নৃত্য, ভাতের টাড়িতে যাহার মাকড়সার বাসা, তাহার আবার এ সব কেন? কার! কে বলিবে কেন?

তবে, দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, যেন একটু—একটু মাত্রায় স্রোত কিরিতেছে। শিক্ষিতের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতে গিয়া কৃষিবিদ্যা শিখিতেছেন; চাকুরে বাবুর মধ্যে কেহ কেহ আফিসে মনিবের ভীত ভৎসনার মর্দঙ্গীড়িত হইয়া বন্ধুর নিকট বলেন, ‘আর এ বন্ধুমাগি অপেক্ষা পাড়া-গায়ে গিয়া চাষ আবাদ করা ভাল।’ দেখিতে পাই, বিলাতকেরত কৃষি-তত্ত্ববিদ বেশে আসিয়া দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে নানা কাগজে কৃষি-সংকে নানা প্রবন্ধ লিখিতেছেন। মন্দর ভাল বটে। তবে কথাটা কি. কৃষি সাহিত্য নহে; ইহা সাধা স্ত্রীরামপুরী কাগজের উপর বড় বড় কাল কাল অক্ষরে শোভা পাইবার সামগ্রী নয়। কাগজের উপর কলম চালান. আর জমির উপর লাগল দেওয়া অনেক উচ্চ। তায়, বিলাতের কৃষিপ্রবালী ভারতের জমিতে কিকপে খাটে, অথবা আদৌ খাটে কি না, সে সব বিষয়ে দেখিয়া শুনিয়া বড় একটা লেখা হয় না। সে আন্দাজের কথা নহে, পরীক্ষার বিষয়। এখন, এ পরীক্ষা করে কে? চার্দীরা লেখাপড়া জানে না, এ সব প্রবন্ধ তাহারা পড়ে না। লেখকগণও কোথায় কোন্ জমির কি অবস্থা, মাঠে গিয়া তাহার কোনও তত্ত্ব লয়েন না। হুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত বাহার বিলাত হইতে Agriculturists উপাধি লইয়া আসিয়াছেন, তাহার

আজও কেহ বগলে কোনরূপ কৃত্যিকার্য্য মন দেন নাই। তবে কেহ কেহ চা-বাগান করিয়াছেন; কিন্তু সে বড়ই কথা। চা-তারতবাগীর খাদ্য নহে, সে তো বিলাসিতার অন্য উপকরণ মাত্র। কেহ কেহ Nursery বুলিয়াছেন; কিন্তু তাহারও তত উপকারিতা নুশি না। অরের দুকে ফুল ফুটে না। এই নিয়তা ও পরমুখপ্রেমিতার দিনে যাহাতে আপনি আপনার পেটের ভাত করিয়া থাকিতে পারা যায়, ইহা সকলের পক্ষে বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। ভারত বর্ষ-প্রসবিনী। কিন্তু কেন তাহার আশি এমন দুঃখা! তাহার সব দিয়াছে সত্য, কিন্তু আজও তাহার সোণার মাটি আছে। কলাইতে পারিলে, আজও সেই মাটিতে সোণা ফলে। নির্দোষ অরুণজ সন্তানেন্দ্রা ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না বলিয়াই, মাত্র মনের হুঃখে দিন দিন শীর্ণ ও অবশ্য হইয়া পড়িতেছেন; এবং সেই জন্যই হুঃসহ মর্শ্ববেদনায় এক একবার দুর্ভিক্ষরূপ ঘোর অতিশাপে সকলকে ছারপারে দিতেছেন।

[ক্রমণঃ]

বিবিধ।

প্রকৃতি।

প্রকৃতির বিবিধ সৃষ্টি—বিবিধ ভাব। প্রকৃতি, তাহা মনুষ্যকে কবিতা-সমীরণ দ্বারা নীরবে সুকাণ্টিয়া দেয়। প্রকৃতির কাব্য নীরব। কিন্তু শব্দ-খণ্ডিতধারী শব্দপ্রিয় মনুষ্য, সে নীরব কেবল-স্পর্শসূক্ত প্রকৃতির কবিতা-সমীরণের প্রতি লক্ষ্য করে না—লক্ষ্য করিতে জানে না। সেইজন্য মনুষ্য প্রকৃতির কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারে না। সেইজন্যই ত আমরা মাকে মাকে মগ্ন-শ্রোতের পিছনে পড়িয়া যাই। প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির সন্তোষমুসারে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। প্রকৃতির রাজপথে না চলিলে জ্ঞান্যদের উন্নতি কোথায়? প্রকৃতির প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেক ভাবের এক একটা অর্থ আছে। যতদিন না আমরা সে গুঢ় অর্থ বুঝিহে পারিব

ওতদিন তাহার একটি সভ্যও আবিস্কৃত হইবে না, এবং আগাদেরও কোন কার্যের কোন ফল ফলিবে না। কারণ, আমরা প্রকৃতির সহিত এক সৃজে বাধা। প্রকৃতির প্রতি পদ-বিক্ষেপেই ত সভ্য প্রতিভাত হইতেছে। হায় ! আমরাই কেবল তাহা দেখিতে পাই না—বুঝিতে পারি না !

.

.

ভাষা ।

"Words themselves are the common property of all men : yet, from words themselves, Thou, Architect of Immortalities, pilest up temples that shall outlive the Pyramids, and the the very leaf of the Papyrus becomes a Shinar, stately with towers, round which the Deluge of Ages shall roar in vain !"

ভাষা প্রাণের দর্পণ—ভাবের নীরব গুণ্ঠি—ভাবের প্রাণ—ভাবের নিকশিত যৌবন। ভাব, অদৃশ্য ভাষা-ফুল-বৃক্ষ। সাকার ভাষা তাহার প্রকৃষ্টিত ফুল। ভাব, ভাষায় পরিণত হইবার প্রাণগত চেষ্টা। ভাষা তাহার ফল। ভাষা কার্য্য; ভাব কাৰণ। ভাষা, ভাবের উন্নত অবস্থা।

ভাষা ফুল; ভাব গন্ধ। শরীরের যেমন সৌন্দর্য্য, ফুলের যেমন সৌরভ, গ্রন্থের যেমন কল্পনা, ভাব তেমনি ভাষার। আমরা সৌন্দর্য্যকে শরীর হইতে বিভাগ করিতে পারি না। শরীরই সৌন্দর্য্য। সকল শরীরে নহে। সর্পাদ্বসমান হুডোল শরীরে সৌন্দর্য্য। অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত দেহে সৌন্দর্য্য কোথায়? সেই জন্য অসম্পূর্ণ ভাষার সংকীর্ণ জগতের অন্তঃপুরে, উদার ভাবের পূর্ণমূর্ত্তির নিকশ অসম্ভব। ভাষা—অথও একর—অথও মণ্ডলাকার জগৎ। প্রণয়—প্রণয়-বৃক্ষের ফুল।

ভাষা, ভাবের—জীবনের পূর্ণ প্রতিকৃতি। ভাষা সঙ্ঘবনৌশক্তি। নৃত্য—চির-নিম্মৃত পুরাতন ভাব, ভাষার আঙ্গণী-বারি পাইয়া জীবিত হইয়া উঠে। ঠিক ভাষা—ভাষা-ভাব আঙ্গণ জন্মায় নাই। প্রাণকে ছাঁকিয়া ভাষা করিবার ক্ষমতা এ বাঙ্গালার কাহার নাই। তাই তাহাদের ভাষার মধ্যে এত গোলমাল। কথা বা ভাব একটিমাত্র। কিন্তু তাহাকে বিবিধ প্রকারে ফুলাইয়া বার বার বলা হয়। এইরূপ ভাষা, প্রাণ এবং ভাবের হৃৎস্পন্দ। ইহা ভাষা নয়। ভাষার প্রাক্ক। ভাষা ভাবের পরিমাণ-রজ্জু। ভাবেই চরিত্র।

ভাষা, ভাব-ফুলের মধু। মধু ফুলেরই। এবং আগে ফুল, তার পর মধু সভ্য

কথা। কিন্তু ফুল এবং মধু এক বস্তু নয়। আমরা মধু চাই। ভোগের তাহার পরিবর্তে কেবল ফুলই নিতেছি। মধুর কার্য্য ফুলের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। শরীর অভাবে আত্মা যেমন কণ্ঠশক্তিহীন, তাহা সেইরূপ ভাষা অভাবে। অথবা তাহাই বা বলি কেন? প্রাণের ক্ষুত্রিই এই শরীর। ভাষাও তাই। ভাবই ভাষা-ভাষাই ভাব। আমরা মূর্তির দ্বারা যত নুষ্টিতে পারি এবং দেখিতে পাই, তত নিরাকার অতীন্দ্রিয় পদার্থের দ্বারা নহে। প্রকৃতির ভণ, বৈচিত্র্য। সেই প্রকৃতি নীরবে সত্ত্ব প্রকার নৈসর্গিক চিত্রের দ্বারা তাহার সমস্ত কথা কত সুন্দরভাবে আশাশ্রিতক বসিতেছে। প্রকৃতির সে নৈসর্গিক রূপক-ছবি কত উদ্বোধক! কত ভাব-পদান! কত পরিশুট! কত কবিত্ব মধুর!

কবি প্রকৃতির কবি, ভাষার সহায়ময় প্রাসাদের প্রতিগৃহে প্রবেশ করিবার অপূর্ণ কৌশল-মন্ত্র জানে। প্রকৃতির চির-স্নেহের শিল্প কবি, প্রকৃতি-মাতার জগতের হৃৎকর্ষ নীরব কথা যত নুষ্টিতে সঙ্গম, এত আর কে? মার স্বর্গীয় চক্রে প্রবেশ নীরব কাহিনী কেবল সম্ভবই নুষ্টিতে পারে—ঠিক নুষ্টিতে পারে। কবি প্রকৃতির দর্পন। সমস্ত ভাষা এবং ভাবের বিবাহে কাব্য। কবি তাহার পুরোহিত। আত্মপরিচয় কবির এ পদ একান্ত। কবির ভাষা অমরবানী। ভাষাই কবির অমরতা। প্রকৃতি অবিদ্যার। ভাষা প্রকৃতি। সুতরাং ভাষারও মৃত্যু নাই।

ভাষা প্রথমে। সবই ভাষা। এ জগৎ ভাষার। মনুষ্যও ভাষা। ভাষার বিভিন্ন প্রকার মূর্তি দেখিয়া আমরা মনুষ্যকে চিনিতে পারি। জগতের সমস্ত কার্য্য, ভাষার অপূর্ণ বিজ্ঞানযন্ত্রে এক মহান শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। ভাষার আদর্শ—চরমদীপা—অনন্তলীলা জগৎ-গ্রন্থে। জগৎ এক ধানি সজীব কাব্য। আদর্শ। এত বড় আদর্শ আর নাই। সমগ্র জগতের আদর্শ জগৎকারণ কবিকে কেহ ভুলিও না।

মনুষ্য-ভাষার স্বষ্টি, অবিগ্রামপ্রসবিনী অনন্তকল্পনা প্রকৃতি দেখিয়া। ভাষা নৈসর্গিক নিয়মের ফল। ভাষার জীবন কত দিন, কেহ ঠিক বলিতে পারে না। ভাষার জীবনে কত যুগের কথা—কত শত মাহাত্ম্যের ইতিহাস গাথা। ভাষা জগতের encyclopaedia। এই ভাষাকে কত লোকে কত

রকমে গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জগৎ গড়িতে কেহ পারে নাই। এক দিক কিম্বা দুই দিক গড়িয়া জগৎ পড়া হয় না। যে মহা অনন্ত অমোঘ নৈসর্গিক নিয়মের অদৃশ্য শক্তির দ্বারা জগৎ, আর কিছু না হইয়া আপনা আপনি জগৎই হইয়া ফুটিয়াছে, সে অমোঘ নৈসর্গিক নিয়ম মনুষ্য-স্বভিত্তে জগতে নাই। জগৎ অনন্ত নৈসর্গিক নিয়মের। তোমার আমার জগৎ তোমার আমারই চিন্তাসরোবরের। ইহাদের মূলে অটনেকা। জগৎ-শক্তি-স্রোতের প্রতিফুলে দাঁড়ান বুধা। জগৎ-শক্তি বাতীর পুকারিণী নহে। মনুষ্য জগৎশক্তিগত।

ভাষা-জগতের স্বষ্টি-উপাদান যদি সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বষ্টি আপনি হইবে। জগৎ-স্বষ্টি এক দিনে হয় নাই—এক জনে করে নাই। জগৎ-স্বষ্টি অনন্তশক্তির কল। জগৎ-স্বষ্টির বিরাম নাই—শেষ নাই। কখন শেষ হইবে কি না, তাহাও কেহ জানে না।

স্বষ্টির—ভাষা-স্বষ্টির রাজমিস্ত্রি, প্রতিভা। প্রতিভা জগতের স্বষ্টিকর্তা। সর্বশেষে স্বষ্টি। প্রতিভার কানও সর্বশেষে। যুন যেমন বৃক্ষের, প্রতিভা তেমনি দেশের। বৃক্ষের প্রতিদিনের যত্নের কিরণ পাইয়া ফুল যেমন অতি অল্পে অল্পে হঠাৎ এক দিন মধুর পকুম্বরের সমস্তটা ফুটিয়া উঠে; কোন একটি বৃহৎ কাকও সেইরূপ কোন এক বেশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণগত যত্নের অসম্পূর্ণ ফল। সে কল প্রতিভার জন্য অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া থাকে। প্রতিভা ঠিক সময়ে এক দিন চকিতের ন্যায় আসিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া যায়। প্রতিভা, জগতের সামঞ্জস্য-মূলীভূত ঐক্য (fundamental unity)। ভাষাজননী-প্রকৃতি-পুস্তকের স্ত্রী,—বহন্যময় জগৎ-জীবনের ইতিহাস—ভাষার প্রতিভা—উদ্যানের পদ্মকূল।

ভাষা-জগতের মালি, প্রতিভা। মালি হইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। ভাষা-জগৎ-মালায় প্রতিভা-মালি-নক্ষত্র, সাহিত্যের অন্ধকারময় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া কবে দেখা দিবে? ভাষার প্রাণ প্রতিভার অভাবে আন্ধ ভাষা-জগৎ মানবশূন্য গ্রাম। প্রতিভার বিশ্বব্যাপিনী ভবিষ্যৎ-কল-গর্তা পূর্ণ-দৃষ্টি কাহার নাই। আমার এই ক্ষুদ্র বাস্তব ভাষা-জগতে প্রতিভা-মালি কবে জন্মাবে।

বাঙ্গালাভাষা—বর্তমান প্রাচীন বাঙ্গালাভাষা অপ্রকৃত। মৌলবীর বিকৃতি। কৃষ্ণের অধুকেরণ। জী-নের নুহা। নিশার পথ। প্রতিভা-গর্ত কর্তৃক।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের দুইটি শক্তি। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ। যোগ এবং বিয়োগ। প্রেম এবং বিরহ। জগৎ এই দুই শক্তির লীলাভূমি (manifestation)। শক্তির নিকাশ, কালভেদে। অথবা শক্তিভেদে কাল-কাল। এক সময়ে দুই শক্তির আবির্ভাব অসম্ভব। যেখানে প্রকৃতির প্রেমের চাঁদ-হাসি ফুটে, বিরহের বিজয়া-দশমী সেখানে কোথায়? ইহা জাগতিক নিয়ম। প্রকৃতির কার্য অদৃশ্য। সেই জন্য বিরাট প্রকৃতির প্রেমের এবং বিরহের আগ্রহ-বিপ্লব-সময় কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। অদৃশ্য প্রাকৃতিক পরিবর্তন-তরঙ্গ-মহাসাগরে কোন সময়ে জোয়ার আসে এবং কোন সময়ে ভাটা আসে, কি করিয়া বলিব?

বর্তমান প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নবপত্র, প্রকৃতির প্রেমের জীড়াভূমি। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির আশার প্রেম-মন্দিরে বাঙ্গালাভাষার অপূর্ণ আনন্দ-রিক মূর্তি প্রকাশিত। আধুনিক সাহিত্য ভাষার আকর্ষণীয়-শক্তি-সাহিত্য। সম্পূর্ণ নূতন। ভাষায় ভাষের নূতন জগৎ। নব বাঙ্গালাভাষা, ভাষাজগতের সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর মহারাজ্য বিচিত্র জীবন-ভাব-সাগরের পূর্ণবিকশিত অসংখ্য তরঙ্গ-উপাদানে গঠিত। জীবন-ভাব-সাগরের বাছা বাছা জীবন-ভাব-রসে গাঁথা। সে মহারাজ্যের প্রত্যেক গৃহ-অসংখ্য জীবন-ভাব-তরঙ্গের এক একটি কবচ। সে মহারাজ্য-কাহিনী কবিতা-শব্দের মধুরিমাযুক্ত চন্দ্রকর-লেখা—বসন্তপনন—রমণীঙ্গদের উজ্জ্বল-সমগ্রী তৈরবী রাগিনীর মধুর প্রেম-সঙ্গীত—শেলীর লজ্জাবতীলতা—কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গ—আগ্নেয়ার প্রণয়।

বাঙ্গালাভাষা—বর্তমানের নব বাঙ্গালা সাহিত্য—প্রকৃতির অনন্তসাহিত্যের অসম্পূর্ণ জাগতিক পুস্তকের আর এক নূতন পাতা। নূতন বাঙ্গালা সকলকার পরবর্তী। বাঙ্গালা-সাহিত্য সাহিত্য-জগতের নবযুগ। ইহা বর্তমান। নূতন—ইহার সবই নূতন। অতীতের সঙ্গে কোন সঙ্গ নাই। কেবল রাগিনী এক। রাগিনী অনন্ত ঐক্য। বর্তমান ভাষা রাগিনী রক্ষা করিয়া বাইবে এইমাত্র। তার পর সে তাহার নূতন প্রতিভার পথে চলিবে। গোলাপ, গোলাপই ফুটে। গোলাপ কখন মল্লিকা ফুটে না। যে সময়ের যে জিনিস

তাহা সেই সময়ে হইবেই । যখন প্রকৃতির অনন্ত আনন্দের শক্তি-চক্রের অদৃশ্য প্রেমতরঙ্গ ঘুরিতে ঘুরিতে গড়িতে গড়িতে বাহ্যজগৎ-অন্তর-সাগর পূর্ণ হইয়া এক নবীন দ্বীপ সৃষ্টি হয়, তখন তাহার সে তরঙ্গ-গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না । সমষ্টি-শক্তি-বৃক্ষ-ফলকে ব্যক্তিমাধ্যাকর্ষণ কবে নাড়াইয়াছে ? এক চুলও নাড়াইতে পারে না ।

ভাষার আদি কে ? কোথায় তিনি ? ভাষা-ভাবের আদি-অননী সেই অনন্ত অদ্বিতীয় নিরাকার পুরষকে জানিবার একমাত্র উপায়-পথ ভাষা—জগৎ—ভাষা । তিনি পূর্ণভাষা—জীবন । এই অনন্ত সৃষ্টি তাঁহারই বিকাশ । তিনি ভাব—তিনি ভাষা—তিনি পুস্তক—তিনি সাহিত্য ।

বিশেষণ

ভাষার আত্মা । প্রকৃতি-শব্দ-শরীরের চৈতন্য । বিশেষ্যের—জগতের সমস্ত বিকশিত অংশ—ওণ । প্রকৃতির একমাত্র ধর্ম-মন্দির-দ্বার । জগৎ-জগৎপতির বিশেষণ । আজ জগৎ না থাকিলে, কে তাঁহাকে চিনিত ? বিশেষণ আমাদিগকে সকল বস্তু সঠিক চিনাইয়া দেয় ।

আন্বেষণ বা জগৎ

জগতের বিশ্লেষণ জগতের মূর্ত্যু—প্রলয় । জগৎ আশ্রিষ্ট । ভাষাও আশ্রিষ্ট । ভাষার বিশ্লেষণ ভাষা-শরীরের ব্যবচ্ছেদ । জীবনের মূর্ত্যু ।

সৌরভ

অদৃশ্য অথও সত্য । জগৎঅতীত পারাবারের পথ । অসীম-সসীমের মিলন । ফুলের ভাষা । ভাষার ভাষা । সৌরভ—অসীম, সীমারূপ জগৎ-অক্ষর-আকারে বাস্তব । সৌরভের ব্যবচ্ছেদ অসংখ্য—অসংখ্য । ভাষা, সৌরভ । সৌরভের প্রতিক্রিয়া । তবে ভাষার ব্যবচ্ছেদ কি করিয়া হয় ? এক যে ; সৌরভ, ভাষা, জগৎ এক । এক—এক—এক । সব এক । ইহারা কেবল সেই মহান্ অনাদি বিভিন্ন একের বিকাশ-রূপ ।

কানন ।

অনন্তলীলাময়ী প্রশান্ত প্রশান্ত নদী—সেই সৌন্দর্য্যের রসভূমি—প্রকৃতির কীতি-মন্দির—কল্পনাবসর শান্ত কাননের অতি সুস্থ পাশ দিয়া সেই হরে—

সেই প্রাচীন প্রেম-জীবন-গীত — “ভালবাসিনে বলে ভালবাসিনা”র কি এক মধুর উদাসময় বিষাদ-গম্ভীর সুরের ন্যায়, স্থির মধুর-গতিতে জনকে মুগ্ধ করিয়া অদৃশ্য অনন্ত পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে । কানন সেট নদীর পাশে চিরদিন বসিয়া—চাহিয়া । নদীর উপর চিরপরিদৃশ্যমান কাননের সেই প্রগাঢ় প্রেমের কি এক অপূর্ণ নীরস অনন্ত-ভাণা-দৃষ্টি পড়িয়া ! নদী চিরদিন সেই কেশন এক ভাবের তর-ভর-কি-এক বিষাদ ঘোরময় সাক্ষ্যদৃষ্টি ধারণ করিয়া আছে কানন—কাননের নৃত্তি কি বিচিত্র রাগিণীময় ! কি অপূর্ণ রহস্যময় ! কি ঘোর যোগময় ! আবার নদীপর্বে সেই কাননের ছায়া ছায়া ! রহস্যের রহস্য ! জনকের জনক—অতীত,—আদি,—অনন্ত ! মহাঘোর অবিনশ্বরতা ! নদীর উপর কেবল ছায়া—কাননের সেই ছায়া তির, কেহ আর কিছু কখন দেখে নাই । আর কিছু দেখা যায় না । নদীর উপর সেই ছায়া-বেলা কি মধুর ! কি রহস্যময় ! লোকান্তর-সমাপ্ত বশীর গানের ন্যায় কি প্রথম ভাব ! কাননের জন্মের কথা কেহ জানে না । তাহার ভিতর যে, কি আছে তাহা আজ পর্যন্ত ত কেহ বলিতে পারে নাই । নদীর উপর দাঁড়াইয়াও কাননের অন্তঃপুরের কিছুই দেখা যায় না । সেট জন্য—অথবা যে অন্যই হউক, তাহার কারণ কে জানে?—কানন আরও এত মধুর—এত সমান আগ্রহের । কি বলিব সে কানন কি ? কাননের সৌন্দর্য চিরদিন সমান, অথচ তাহা নূতন অনন্ত-বৈচিত্র্যময় । সে কাননে হয়ত কত কি ফুটিয়া আছে ! কত রূপ ! কত রূপ ! কত গুণ ! কত হাসি ! কত কাণ ! সে কানন যেখিয়া মহাঘোর জন্মসংগোপনের কত সুরের নলিনী — কত না সেই ছায়া-ছায়া স্মৃতি হিরোল ফুটে ! কত লোকের প্রাণের কত কি—হয়ত কাহারও একদিন সেই অতুল কাননের সৌন্দর্যের চিরছায়া জন্ম-সিংহাসনের উপর বসিয়া কত কি মধুর অপরিচ্ছাদ লীলা—জগতে অতুল—সেই প্রেমের অতুল লীলা সাজ করিয়া গিয়াছে । সেট পুরাতন কাহিনী আজ কানন-শরীরে—বৃক্ষের পত্রে পত্রে—কুতুমের হাসির অন্ধরে অন্ধরে ফুটিয়া পড়িতেছে । কানন আজ সে সব প্রেমের কবিতা । কানন এতরূপ । কাননের সৌন্দর্য-স্বর, মনুষ্য-জীবনের সুখ-আশাবীন যদি প্রেম-ভার দিয়া চির-বাধা । সে কানন কি ভুলিবার ? মহস্য কখন তাহা

ভুলিতে পারে না। নদী-যাত্রী কত লোক সে কানন দেখিয়া হাসে। আনন্দের
কত লোক বীর কঁাদিয়া যায়। হায়! তাহাদের ভাগি-কামা কে দেখে!
কানন, মহাধোর—জগতের প্রত্যেক মৌল্যগোর—প্রত্যেক পরমাণুর আশ্রা।
পঞ্চভূতের জননী। কানন হৃদয়। কিন্তু অকস্মে তাহা মহা ভাগ্যত।
সে কাননের বংশীধ্বনি কানে লাগিয়াই আছে। সেই কাননই জগতের
একমাত্র হৃ। কাননখানি আবার কি নিভৃত! যেন কাহার ধানে যয়!
যেন কিসের প্রকাণ্ড সমাধি! যেন উত্তরাধিকারী-নিহীন কোন মহা কবির
পুরাতন কাব্য! যেন বাঙ্গালির জীবদ্ভূত দেবীচলিত পদবা! আর সেই
কাব্য-জগতের অপূর্ণ হৃটি চিরহৃঃখিনী কুসুমলিনীর যেন চিরন্তন জনন
অচল প্রেম! যেন, কে তাহার লবঙ্গের একমাত্র অপার্থিব ধনকে এই অনন্ত
নিবের মধ্যে কোথাও রাখিবার স্থান না পাইয়া এই জীবনবসন্তের চিরশুধ-
নিকেতন নিভৃত কানন-কুঞ্জে রাখিয়া কাননের কুলুপে ঢাவி দিয়া গিয়াছে।
যেন কোন আত্ম-বিসম্বর্তী প্রেমিকের অতুল প্রেমের কি এক সেই চুঃখ-ভরা
হৃথের চিরজাগ্রত বিদ্রোহাঙ্ক সমাপ্তি। কানন একাকী নীরবে ঠাঁড়াইয়া
কি এক স্থির উদাস নয়নে নদীর বিকে চাহিয়া আছে। হায়! একে একে
সকলেই যে চলিয়া গেল! কানন এখন কাহার জন্য চাহিয়া! কেন চাহিয়া?
কত লোক গেল, কানন ত তাহাদের একজনকেও ডাকিল না! সুনিয়াছি,
তাহারা নয়। কাননরূপ দর্শের শূন্য পুরাইবার তাহারা কেহই নহে।
কি দৃষ্টি! যেন প্রত্যেক পথিককে কাহার আগমনবার্তা জিজ্ঞাসা করি-
তেছে। হায়! সে কি গো আসিবে না! তাহার জন্য কানন কতদিন
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে? কে বলিতে পারে, আজ কতদিন ধরিয়া
কানন এই নদীর তীরে তাহার জন্য বসিয়া? হায়! তাহার অনন্ত আগ-
মন কি আর ফুরাইবে না। তবে ফুরাইবে যে! আজ আমি যেন তাহার
হৃ-দূর আগমন-বার্তা কাননের চারিদিক হইতে শুনিতে পাইতেছি। সে
কে? কে জানে কে?

“কতদিনে চাঁদকুণ্ডে হবেন মেলি?”

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

নশা-সংগীত ।

১
মধুর-মধুর তোর রূপ
ধামিনী !

হরমে হৃদয়ময়ী শনি-সেহাগিনী ।
তারকা-কুহর-বনে
ধ্বনিছ আপন মনে
কি যেন দেবি বলনে মায়ার মোহিনী !

২
নীল আকাশ-তলে
স্বর্গের প্রাণীপ জলে,
আকাশ গঙ্গার কল
করিতেছে চল চল
কালের জটর জালে দোলে নন্দাকিনী ।

৩
হাসিয়া উঠেছে কল,
কুটেছে মন্দার ফুল,
হবষে অমর-বালা
চারিদিকে করে খেলা
এ খেলা তোমার খেলা—তুমি মায়াবিনী ।

৪
বাসবের মাড়া গেয়ে
চমকি ধামিনী গেয়ে
পালায় সোণার লতা
ধানিয়া চ'বেব পাতা
সংস্র গোচনে চান্
আধ না দেখিতে পান
কোথায় লুকাল হয়ে নীরদ-নন্দিনী !

৫

পাতালে বাহুকি ধনী
ছড়ায় মস্তক-মণি,
হৃ-একটা শূন্য ছুটে
উঠেছে আলোক ছুটে,
এমন মাণিক আর কোথাও দেখি নি।

৬

সরুত দিহ্মল-প্রায়
অধীবে চলিয়া যায়,
টাড়াইয়া বিপত্তনা
কি উদার-দরশনা !
গভীর প্রশান্ত-মনা কার সৌমস্তিনী !

৭

নীরব ধরণী রাণী
হাসিতে আনন বানি,
বিগলিত কেশপাশে
কতই কুহুম হাসে
জামিছে অদূরে যেহে গিরি-নিব্বরিণী।

৮

সাগর লাফায়ে ওঠে
উদ্রাসে উদ্ভ্রত ছোটে,
আকাশ ধরিতে যায়
কি জ্ঞানি কি বেধে ভায়,
উদ্রাসে চমকে গায় চকল চাঁদিনী।

৯

হিমাজি শিবরপর
হাসিছে মানস সর,
মধুর মোহিনী বালা,
মুকুরে মুরতি-খেলা !

মধুর মাদুরী যন্ত্রে
করেতে মায়াব মন্ত্রে
আকাশ পাতাল একাকার একাকিনী !

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্তী ।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ ।

(পূর্ন প্রকাশিতের পর ।)

অন্নবেতস ।

অন্য নাম - চুক্র, ওল্ডকেডু, শতবেদী, মাংসদ্রাবী । রক্তসার অন্নকল
ওষধেদ । ইহার কল অত্যন্ত অন্নবস্তু, কষায়, উষ্ণ । বায়ু-প্রকেপ,
অর্শ, শূল, অরুচি, হৃদ্রোগ, হিকা, আনাহ (মল মুত্র রোধ) অধোগ ও বমন
রোগে হিতকর । ছাপ মাংস ভোজন করিয়া এই কল অন্ন পরিমাণে সেবন
করিলে, উহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয় ।

কোন কোন দ্রব্য-গুণস্ব ব্যক্তি অন্নবেতসকে "চুকাপালম্" বলিয়া উল্লেখ
করিয়া থাকেন । বস্তুত চুকাপালম, অন্নবেতস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । অন্ন-
বেতস অভাবে চুকাপালম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । চুকাপালম অতিশয় অন্ন-
রসযুক্ত শাক বিশেষ । ইহার পর্যায় শব্দ - অন্নশাক, অন্নচুক্রিকা ইত্যাদি ।
ইহা বায়ুনাশক, ও প্রদাহ নিবারক, এবং অন্নবেতসের তুল্য গুণবিশিষ্ট ।
ইহার রস অন্ন পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তাধিক্যজনিত
হস্তপদাদির আলা নিবারণ হয় ।

অকিরকরা ।

অন্য নাম - আকির করত । আরব দেশ ও বোম্বাই অঞ্চলে প্রচুর পরি-
মাণে জন্মায় । ইহার মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা অসুপ্লির
নাশ দীর্ঘ, কুণ্ডিত, ধূসরবর্ণ, কঠিন, ভঙ্গুর ও গন্ধবিহীন । উষ্মক, কাল-
নিঃসারক, প্রদাহকারক, স্থানিক প্রয়োগে উগ্রভাসাধক । দত্তশূলে ইহা

চর্ষণ করিলে লাগা নিঃসরণ হইয়া উপকার দর্শায় । অধিকক্ষণ চর্ষণ করিলে
জিহ্বা ও তালু ঝিনু ঝিনু কবে এবং উষ্ণ বোধ হয় । ইহা ভ্রমে শিক্ত
করিয়া, সেই ভ্রমের কৃপা করিলে তালু ও তালুপার্শ্বস্থ গ্রন্থির শিথিলতা
নিবারণ হয় । জিহ্বা ও গলদেশের পেশীর অবসরতা দূরীকরণ জন্য ইহা
বিশেষ প্রয়োজনীয় ।

আকন্দ ।

অন্য নাম - অর্ক, ক্ষীরকাণ্ডক, বহুক, মল্লার, সদাপুল্প, থাকণ্ ইতি হিন্দু-
স্থানে প্রসিদ্ধ । সনামখ্যাত ক্ষীরবান বৃক্ষ বিশেষ । যেত ও বক্রবর্ণ পুষ্প ভেদে
ইহা দ্বিবিধ । তন্মধ্যে যেতর্কই বিশেষ উপকারী ও পবিত্র । মাধারপতঃ
উভয়বিধ অর্কই স্বৈদম্বনক, পরিবর্ত্তক, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ভেদক, কটু
ও বিবর্ম্মিজ্ঞনক । বাত, শোথ, ত্রণ, অর্শ, কঠ, ক্রমি, বিষ-ত্রণ, স্রীহা,
যকৎ, তন্ম উগ্ররামণ, কফদোষ ও বিনিধ প্রকার চর্ম্মরোগে সচরাচর ব্যবহৃত
হইয়া থাকে । সমস্ত উদ্ভিদ প্রণীর মধ্যে ঐশদ্যেয় ভবে ইহা সর্ব্বপ্রাচীন ।
ইহার পত্র, পুষ্প, মূল, ছাগ, হৃদ, তুলা সমস্তই মানবজাতির নানাপ্রকারে
কল্যান সাধন করিয়া থাকে । হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কারক মহাত্মা হানিম্যান
যেমন “একোনাইট” নামক ভৈষজ্যশাস্ত্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও বহুবিধুত
কার্য্যক্ষেত্র অনুসারে, উহাকে ভৈষজ্যাত্ত্বের মৌলিক ও স্বরূপ বলিয়া উহার
অশেষবিধ গুণকৌতূহল করিয়া গিয়াছেন, আমাদের অপরিত্র ভ্রমশাস্ত্রে
“বৈহার্ককন্দ” সংক্ষেপে তদপেক্ষাও অধিকতর মাহাত্ম্য পরিকীর্ণিত হইয়াছে ।

অসীম-শক্তি-সম্পন্ন এই মহোপকারী বৃক্ষের তিনটি ভোট পাতার রস
২১টি গোলমরিচ সহ সেবন করিলে উষ্ণ ও শুণাল ও কুহুর ধংশন-জনিত গৌষ
নিগারণ হয় । সদ্যঃজন্ম ২১টি পাতা একটি নতন ঠাড়িতে তিন প্রস্থ সাজাইয়া,
তাহার উপরে, মধ্যে ও নিম্নে লবণ ১/২ এক সের দিয়া ঠাড়ি মুদ্রিয়া আল
দিলে, সেই পত্র সকল ভস্ম হইয়া লবণ আৱিঃত হয় । এই লবণ প্রত্যহ
প্রাতে শুন্যোদয়ে ১০ তোলা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবনে দুর্দমা
অস্ত্রশূল সপ্তাহ মধ্যে উপশমিত হয় । শুক পাতার রস প্রয়োগে হারপোকা
মারা যায় । পাকা পাতার কিঞ্চিৎ ছুত মাখাইয়া, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া,
তাহার রস কর্ণে প্রবেশ করিলে বর্ণশূল ও তজ্জনিত বাতনা তৎক্ষণাৎ

নিবারিত হয়। কাঁচা পাটার চূর্ণ ও শুষ্ক লেপন করিয়া, গলগণ্ড রোগে স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল উপলব্ধি হয়।

ইহার মূল বাসি মল দিয়া বাটিয়া খাইলে সপ্তর্ষি নষ্ট হয়। আমানিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোম-বৃদ্ধি নিবারণ হয়। রবিসারে লাল স্ফটা দিয়া পাণ্ডা বাধিলে পোন আরোপা হয়। কটিনেশে ধারণ করিলে প্রমেহের উপকার হয়। অবিসাহিতা বালিকা হাতের স্ফটা দিয়া মস্তকে বাধিলে ঐকান্তিক ঘর, অর্থাৎ এক দিন অস্থির যে জ্বর হয়, তাহা অবসারণা হয়। বেতাকর্ম্মমূল ও বেত অপবাজিতা মূল একত্রে বাটিয়া উষ্ণ তৈল সহ সেবনে সকল প্রকার জ্বর নিবারণ হয়। বেতাকর্ম্মমূল ও ছাল ঘোল দ্বারা পিথিয়া লেপ দিলে বোদেব উপকার হয়।

ইহার ত্রুণ বা আটা, মাসকলাষ্ট ও তিলচূর্ণ সহ একত্র মিশাইয়া, একটী মাটির পাত্রে করিয়া গৃহমধ্যে রাখিলে, সেটী গৃহে ইন্দ্রব ধাক্কিও পাতেন না। ইহার আটা ও হরিদ্রা একত্রে পিথিয়া মূত্রে লেপ দিলে, মূত্রের ক্রান্তবর্জ ও বাহুতা তিরোহিত হয়। দস্তশূণে ইহার আটা স্থানিক প্রয়োগ করিলে, বিশেষ আরাম বোধ হয়। বৃশ্চিক-দণ্ডে স্থানে আকন্দ-আটা ঘৃতসহ মিশাইয়া লেপন করিলে তৎকর্ণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

ইহার মূলের ছাল চূর্ণ ১০-১২ রতি মাত্রায় দুই বা একবার মাত্র সেবন করিলে প্রবল রক্তামাশয় আরোপ্য হয়। বেতাকন্দ-মূলের ছাল ১ তোলা ১১টী পোলমরিচ সহ বাসি মলে বাটিয়া সেবন করিলে একদিনেই নারী-দ্বিপের প্রবল রক্তপ্রদর আরোপ্য হইয়া থাকে। শুষ্ক সেবনে যদি গরম বোধ হয়, তাহা হইলে মৎস্যাদির কোল বা জিহ্বাদ্রব্যাদি কিঞ্চিৎ সেবন করিলেই, তাহা নিবারণ হইবে। বেতাকন্দ-মূল-চূর্ণ ১ রতি মাত্রায় দিবসে তিনবার করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, পারদ-অপ-ব্যবহারজনিত চর্ম্মপীড়া উপশমিত হয়।

ইহার তুল: শরীরের কোন স্থান ক্ষীণ ও বেদনাবদ্ধ হইলে তথায় বাধিয়া রাখিলে উপকার হয়। ইহার ডাঁটার মূল নানারক্কে গ্রহণ করিলে নানা আরাম হয়।

[ত্র্যমণ: ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিবাজ ।

পঠদশায় বিবাহ হওয়া কি উচিত ?

আজ কাল এক উঠিয়াছে, পঠদশায় বিবাহ হওয়া উচিত কি না। প্রথকারীরা বনিতেছেন, হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নিষেধ আছে। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শেষ করিয়া গৃহস্থাস্রমে প্রবেশ করিতে হইত, অতএব এখন যে নিয়ম প্রতিপালিত হয় না কেন ? বাস্তবিক, আমরাও বনি ব্রহ্মচর্যা ধর্ম ত্যাগ করিয়া আমরা অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদের দেহ অশেষ বেগের আবাসস্থি হইয়াছে, আমাদের আয়ু দিন দিন হ্রাস হইতেছে; আমাদের জ্ঞানের বজ্রত্যাগ ক্রমেই কমিতেছে; আমরা মনুষ্য হারাইতেছি; আমাদের নিকট বৃত্তিগুলি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কিছু কথা হইতেছে, সে ব্রহ্মচর্যা ধর্ম যখন একত্রে অবলম্বিত হয় না, তখন কোন বলে আমরা তাহার কোন একটী নিয়ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইব ? তবে ইহা বিচার করা যাইতে পারে, যে কারণে, যে শিক্ষার বলে, এবং যে জীবন-প্রণালী অনুসারে প্রাচীনকালে অধিক বয়স পর্যন্ত সকলে অবিবাহিত থাকিতেন, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগী কি না। অতএব আমাদের উভয়কালের শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়, প্রণালী এবং স্থান—এ সমস্তেরই আলোচনা করিতে হইবে। একরূপ ওরূপের বিষয়ের সম্যক আলোচনা একটা প্রবন্ধে হইতে পারে না। আমরা অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে, উদ্দেশ্যের কথা। শরীর মন ও আত্মার উন্নতিসাধন প্রাচীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। তদ্ব্যতীত আত্মার ন্য নৈতিক উন্নতির প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য ছিল। প্রাচীন কবিগণ বুঝিয়াছিলেন, নিকট বৃত্তি তিনিকে রীতিমত শাসনে রাখিয়া সংবৃদ্ধি সমূহের সম্যক ক্ষুদ্রিত ও অনুশীলন ব্যতীত মানুষ মানুষ হইতে পারে না; ইহারই উপর জীবনের সুখ শান্তি ও আনন্দ-প্রসাদ নির্ভর করে। এদিকে তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল না থাকিলে এবং জ্ঞান দ্বারা সদস্য বৃত্তির ভারত্যা করিবার এবং অনুশীলন-ক্ষমতা না জমাইলে নৈতিক উন্নতি কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারিবে না। সেইজন্য ব্রহ্মচারী-জীবনে এই

জিনেরই উচিত মত চর্চা হইত। বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ উদ্দেশ্য আমাদের নিজের নহে। পণ্ডের উদ্দেশ্য আমরা নিষ্করিতেছি। তবে উদ্দেশ্য যে আমাদের মর্মান্বীর্ণ মঙ্গলকর নহে, ইহা সত্যমিক। শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক উন্নতি নহে। বিজ্ঞতা বিজ্ঞিতের শারীরিক উন্নতির কামনা করেন না, নিয়মও করেন নাই। নৈতিক শিক্ষা দেওয়া বিজ্ঞতার আইনে নিষিদ্ধ; নিষেধ না থাকিলেও তাঁহাদের ক্ষমতাও যথেষ্ট নাই। হুতরাং বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মানসিক উন্নতি। অতএব যে শরীর রক্ষার জন্য পঠদশায় বিবাহ উচিত নয় বলিতেছেন, সে শরীর রক্ষার চেয়ে আমরা বহুকাল পূর্বে ত্যাগ করিয়াছি। এবং এ শরীর পরিচর্যা যে বয়সে সম্ভব উৎপাদন করি না কেন, সেই সম্ভব হুর্দল, ক্ষীণকার, ক্রম হইবেই। আর যে নৈতিক শিক্ষার বলে প্রাচীনকালে অধিক বয়স পর্যন্ত চরিত্র রক্ষা হইত, সে নৈতিক শিক্ষা দান এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের ক্ষমতা সে বল নাই।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার বিষয়। তখন নিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতি ব্রাহ্মণমাত্রকেই প্রথমে বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে হইত। তারপর ইচ্ছানুসারে কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ জ্যোতিষ ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা করিতেন। ইহাই ব্রাহ্মণ-পণ্ডের শিক্ষার বিষয় ছিল। ক্ষত্রিয়দের বেদে অধিকার থাকিলেও তাঁহারা প্রবাস্তঃ রাজধর্ম, সমাজধর্ম এবং শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বৈশ্যরাও বেদের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য তাঁহাদের প্রধান কার্য ছিল। চারি পাঁচ শত বৎসর হইতে শূদ্রদের প্রতি বৈরূপ আচরণ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকে অস্থম্যান করেন, কেবল নীচ দাসত্বই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল। তাঁহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত না। কিন্তু আমরা জানি, শিল্পকার্য শূদ্রদের জীবিকা ছিল। তাঁহাদের প্রতি কুরুপ ব্যবহার হইত জাহার আলোচনার এতলে প্রয়োজন নাই। যাহা হউক কাহাকেও একথা বুঝাইতে হইবে না, ব্রাহ্মণগণ সমগ্র সমাজ চালিত করিতেন। ক্ষত্রিয়-দের রাজনীতি ও সমাজনীতি, বৈশ্যদের বাণিজ্য, এবং শূদ্রদের কার্য সমস্তেরই শিক্ষাদাতা ও বিধানকর্তা ব্রাহ্মণগণ। সে ব্রাহ্মণগণ সে সময়ে

কি ছিলেন ? সংসারভাগী, সংসৃতজিহ্ব, পরোপকারী, একমাত্র ঈশ্বরচিন্তার
রত । সে মহাভাগ্যবান যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেদিনকার রাজপুত্রগণও
তাহার অলস দৃষ্টান্ত । পরের রাজ্য কাড়িয়া তখন রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ
হইত না ; পরের যুদ্ধের ঘাস লইয়া সে সময়ে বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হইত না !
কল কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষার পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা হইত । শাস্ত্র
বা শস্ত্র, বাণিজ্য বা শিল্প সকল বিদ্যারই এখনকার শিক্ষার বিষয় কেবলমাত্র
মানসিক (intellectual) উন্নতি । ইহাতে সাহিত্য, কিলকলি, গণিত, বিজ্ঞান
প্রভৃতি সবই আছে । নাই কেবল আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার
উপায় । বরং এ শিক্ষার বিষয়, আমাদেরকে স্বার্থপর, সন্তোষজনক করা । ইহাতে
কেহ যেন মনে না করেন আমরা বনিতেছি, পাশ্চাত্য ভাঙারে মূল্যবান
রত্নের অভাব আছে । উহাতে যে অনেক মহারী রত্ন আছে তাহা আমরা
কোন ক্রমেই অস্বীকার করি না । কিন্তু, স্মরণীয়তঃ আমাদের যে শিক্ষা
দেওয়া হয়, তাহাতে এ সকল রত্নের কিছু পাওয়া যায় কি ? আমাদের দেশের
কল্পনায় সে সকল রত্নের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন ? বিজ্ঞতার
উদ্দেশ্য কি নয়, আমাদেরকে পল্লভে পরিণত করা ? অতএব যে দেশে
শিক্ষার বিষয়ের-একটি স্পষ্টাঙ্গীকরণ অবস্থা, সে দেশের নবন্যায়গকে অধিক
বহুসংখ্যক অধিকারিত রাখা নিরাপত্তা কি না, জাতীয় পরিণামসমীক্ষা মাঝেই
আহা বিচার করিয়া দেখিবেন ।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার প্রণালী । পাঠকবর্গ দেখুন, প্রাচীনকালে শারীরিক,
মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা কিরূপে এক একে গ্রহিত ছিল, এবং সমস্ত
শিক্ষা কিরূপ হাতেহাতে (practically) দেওয়া হইত । আর এখনকার
শিক্ষা-প্রণালী কেমন কেবলমাত্র পুস্তকগত ; কার্যে পরিণতি কত কম হয় ।
মহুসংহিতার শারীরিক শিক্ষাপ্রণালীর কতকগুলি ব্যবস্থা আছে । শ্লোকগুলি
না তুলিয়া আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠকবর্গকে অবগত করাইতেছি । তখন হৃদ্যা-
বয়ের পরে গাত্রোধান করা এবং হৃদ্যস্তের সময় শয়ন করিয়া থাকা মহাপ্রাণ
বলিয়া গণ্য হইত ; স্নেহনয় উপযুক্ত প্রাশস্তিও কথিতে হইত । গুরু
শরনের পরে শয়ন করিবার এবং তাহার গাত্রোধানের পূর্বে শয্যা হইতে
উঠিবার বিধান ছিল । তাবপর প্রসঙ্গীল হইয়া দূর হইতে কলকাতা আনিয়া

তাহা রৌদ্রে শুকাইতে হইত। এবং তদ্বারা সাগংকালে ও প্রাতে অগ্নিতে হোম করিতে হইত। জলকলস, পুষ্প, পোমর, মৃত্তিকা কুশ প্রভৃতি আগার্যেরও তাবৎ প্রয়োজনীয় জন্ম আহরণ এবং প্রতিদিন তৈল্যচর্যা করিতে হইত। যেমন তেমন শয্যার শয়ন করিতে হইত, এবং ইচ্ছাক্রমে বেত-শয়ন করিবার বিশেষ নিষেধ ছিল। ঐ কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারীও তত নষ্ট হইত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শারীরিক পরিচালনা এখন কিছুই কণা হয় না। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানচর্চার আধিক্যে শরীরের প্রতি কিরূপ অবহেলা প্রকাশ হয়, সংক্ষেপে বলিতেছি। ছাত্রেরা এখন আর সূর্যের মুখ দেখিতে পান না। প্রভাতের নির্মূল বায়ুসেবনে পূর্নদিনের শারীরিক গ্লানি দূর করা প্রায় কঠোরও ভাণ্ডো ঘটে না। দুই তিন প্রহর পর্যন্ত রাত্রি জাগরণ না করিলে পাঠাভ্যাস চাইবার উপায় নাই। এখন প্রায়শ্চিত্তের ভয় নাই; নিদ্রারও সময় অসময় নাই। মধ্যাহ্নে, সারাহ্নে, বধন অবসর হয়, ছাত্রেরা তখন নিদ্রা যান। অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া প্রভাতে উঠিবার শক্তি থাকে না। ইহাতে যে অনিষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ কে করিবে? তখন যথাসময়ে শয়ন করিয়া এবং প্রভাতে উঠিয়া ওরূপ যে ছাত্রদিগের মধ্যে সেই নিয়ম বলবৎ রাখিয়াছিলেন, এখন সেরূপ কোন ওরূপ অধীনে ছাত্রদিগকে থাকিতে হয় না। অভিভাবকগণের দৃষ্টান্তে বাড়ীর ছেলেরা শয়ন ও উত্তান কাণ্ড সম্পন্ন করেন। প্রাচীনকালে শারীরিক পরিচালনার কি হুমকি, কি হুকো-শলমর ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় তাহার বাধ্য করিবার আবশ্যক নাই। উপরের শ্লোকের মর্মে সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন তখন শরীর কতদূর বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও কপুর্ট হইত। বাতাতপ সহ্য করিয়া নিত্য সূর্য্য কাশি ও অরুণের নিষ্ঠুর হস্তে পড়িতে হইত না। ব্রহ্মচর্য্যকালে যে শরীর পঠিত হইত, বাবজীবনে সে শরীর ভাস্করিত না। এবং সেই সকল বলবান্-সুস্থ, নীরোগ ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ হইয়া যে সম্মান উৎপাদন করিতেন তাহারও বলিষ্ঠ ও নীরোগ হইত। শরীর বাহ্যতে দৃঢ়, বলিষ্ঠ, এবং কষ্টসহ্য হয়, এখন সে সমস্ত কার্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, উৎকট মানসিক পরিভ্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে, আমাদের শরীরের মাংস ও অস্থি চিরকাল নরম ও অপক থাকে। এ হাড় কোনকালে পাকে

না, এ শরীর কোনকালে বাঁধে না ; শরীরে বলাধান ও দূরের কথা । এদিকে শারীরিক পরিচালনার অভাবে এবং রাস্ত্রভাগরণে মানসিক পরিভ্রমের আভির্ভাষো বীতিমত পরিণাম কার্য সম্পন্ন হয় না । কে না জানেন, ইহাই আজকালকার ছাত্রদের অসৌখ্য, উপগ্রামর, দৃষ্টিক্ষীণতা প্রভৃতি বোগের কারণ ? কে না স্বীকার করিবেন, ছাত্রজীবনের এই সমস্ত বন্ধনুল বোগেই আত্মকালের অধিকাংশ লোকই, চিরকণ, তথ্যদেহ, অজ্ঞ-সার শূন্য, অকর্মণ্য, এবং সকল কার্যেই নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহী ! এমন জিজ্ঞাস্য, যে বয়সেই বিবাহ হউক না কেন, টেহাদের ঔরসভাত সম্ভান দুর্দল, কণ ক্ষীণকার্য হইবে, না মহাবল, চট্‌কায় বীরপুরুষ হইবে ? প্রাচীনকালে শারীরিক শিক্ষার গৃহিত মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা কিরূপে একত্রে প্রসিদ্ধ ছিল আমরা যথাস্থানে তাহার বিচার করিব । কেহ কেহ এ প্রশ্ন করিতে পারেন, আমরা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের বিষয় বলিলাম, ক্রিয়, বৈজ্ঞ ও শূদ্রদিগের বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করা হইল না । আরও এক কথা, ১০। ১৫ বৎসর হইল বাঙ্গালীদের মধ্যে জীমছাটিক প্রভৃতির চর্চ্চাত আরম্ভ হইয়াছে । তদন্তরে আমরা বলি, ক্রিয়বদের শরীর পরিচালনার উদ্দেশ্য করিবার আবশ্যক নাই, সে কথা সকলের অন্তরে অন্তরে বোধিত আছে । বাণিজ্য ও শিল্প কার্যে রত দুই শ্রেণীর শারীরিক পরিচালনার কথা বলিতে গেলে প্রথম অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িলে । আমাদের অপেক্ষা অম বয়সে বিবাহকাণী পুরুষ বৎসরের পূর্বের বাঙ্গালী-দের জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে সে দিনকার লোকেরাও আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক বলশালী, কষ্টমতিশূ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন । এ কথাগুলিও বলিবার আবশ্যক ছিল না, কারণ আমরা পূর্বেরই দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মণগণ সকল বিষয়ে অল্প তিন শ্রেণীর আদর্শ ছিলেন । বাহাদুর এধনকার ব্যাঘ্রায়ের ভুলনা কেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য করি, দেশের করজন এ পর্য্যন্ত সে কার্যেই বা কোন দিগাহেন ? জনকদের ছাড়া এমন সকলে ব্যায়াম চর্চ্চা করা সমগ্র-অপসার ও অসত্যতা মনে করেন না কি ?

বিশ্বপ্রাণী সম্বন্ধে অত্যাশ্র কথ্য বলিবার পূর্বের শিক্ষার স্থানের কথা

বলিতে হইতেছে। সকলেই জানেন, প্রাচীনকালে ছাত্রদিগকে সমস্ত অব্যয়নকাল আচার্য্যগৃহে অধ্যয়ন করিতে হইত। ইহার তাৎপৰ্য্য এই, সংসারের কোলাহলের মধ্যে প্রকৃত বিদ্যাচর্চা হয় না; আত্মীয় পরিজনের শোক, তাপ, রোগ, ভোগ, বিনাদি, বিসম্বাদ সত্তত নানাপ্রকার নিষেধোৎপাদন করে। ২য় কারণ, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিলে মন সৰ্ব্বদাই সেই দিকে ধাবমান হয়। ত্র্যক্ষর্য্যাপ্রম সাক্ষ করিয়া গীহার। গৃহস্থান্নম প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহাদের অধুকাগ্রে মন সদাই উৎসুক হয়। ৩য় কারণ, তখনকার জীবনপ্রণালী অতি পবিত্র ছিল বটে, কিন্তু সকলের তাহা ছিল না। এত করিয়াও অধিগণ পৃথিবীকে স্পর্শে পরিণত করিতে পারেন নাই। যে সময়েও অনেক প্রলোভন ছিল। সেগুলি ব্রহ্মচারীর ব্রতের বিষম প্রতিফল। যে রিপুগুলি অয় করাই ব্রহ্মচারীর শিক্ষার মূল উদ্যোশ্য, সেই রিপুগণ কর্তৃক বেষ্টিত থাকিলে সে মহাব্রত নিকটে মিল্ক হইবে? ৪র্থ কারণ, শরীর ও মন দুট করিবার জন্য যেসকল কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, গৃহে তাহার যথেষ্ট বাধা ঘটে। স্থানের কথায় শিক্ষকের কথা উঠিতেছে। সুশিক্ষক বাতীত স্থান বিশেষ কার্য্যকারী হইতে পারে না। তাই সংযতেশ্রম, সংসারত্যাগী, সৰ্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, একমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ও পরোপকারে রত ব্রাহ্মণ আচার্য্যপদে বসিত হইতেন। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অমুসারে শিক্ষার স্থান গৃহে। সেই গৃহ প্রাচীনকালের সংসারশাস্ত্র অপেক্ষা কতদূর শোচনীয় তাহা বোধ হয় কল্পনা করা যায় না। শরীর সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছি, এবং চক্ষে বাহা সকলে দেখিতেছেন, তাহাতে অধুনা শোক, তাপ, রোগ ভোগের ইয়ত্তা নাই। আন প্রাচীন প্রথাগুলি শিথিল হইয়া তাহার স্থলে অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে বিদ্যাদি বিসম্বাদের যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বজ্রের প্রায় প্রত্যেক নরনারী। ভোগবিলাসের মধ্যে গৃহস্থের সহিত ব্রহ্মচারী বাস করিলে যে অনিষ্ট ঘটিত, এখন তাহার পরিমাণ সকলে আলোচনা করুন। শিক্ষার প্রণালী অমুসারে গৃহস্থের মন সঠিত হইতেছে। এখন কয়জন গৃহস্থ পবিত্রভাবে, সংকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন? কয়জনের বর্ণে বিশ্বাস—ঈশ্বরে মতি আছে? এখন কয়জনের জীবন আদর্শশীল? এখন উচ্চবৃদ্ধি সকল খোঁজ হইয়া নিকটবৃদ্ধি গুলি কি এখন হইতেছে না?

এবং এ কথা কি বলিতে পারি না, এখনকার ছাত্রদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা তাঁহাদের আত্মীয় পরিজনদের দৃষ্টান্তে এবং অনবধানতার ? তারপর, বর্তমান ছাত্রজীবনে কতপ্রকারের প্রলোভন দেখুন ! সংসার হইতে দূরে থাকিয়া বুদ্ধ ধার্মিক আচার্য্যের গৃহে এবং সংসহপাঠীগণের সহিত জ্ঞান-চর্চার পরিবর্তে এখন বারান্দালাগ্নে বেষ্টিত স্থলে কদাচারী সহপাঠীগণের সহস্রাসে এবং প্রায় তদ্রূপ শিক্ষকের শিক্ষাধীনে সমস্ত দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের জন্য প্রলোভন ছড়ান রহিয়াছে। এখনকার ছাত্রের কষ্টসহিষ্ণুতা ও কঠোরতার বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাইবে না। এ অবস্থার ঘটনা পঠনদর্শন বিন্যাসের বিরোধী, জানি না, তাঁহাদের নিকট পাঠের উদ্দেশ্য কি ? কোন্ মহাফল প্রাপ্তির জন্য তাঁহারা চাতুর্য্যকে জ্ঞানী ও বিদ্বান্ করিতে চান সুম্মিতে পারি না।

আমরা এক্ষণে বিচার করিব, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা কি প্রণালীতে দেওয়া হইত এবং শারীরিক শিক্ষার সহিত তাহা কিরূপে এক হুত্রে আবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারীগণ যে সকল কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতেন, সমস্তই তরুণ ও নিজেদের ধর্ম্মকর্তব্যার্থ। ভবিষ্যতের এবং পরকালের মঙ্গলের অন্তর্ভুক্তই শারীরিক পরিশ্রম সমস্তই বিহিত ছিল। বাল্যাবধি তাঁহাদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল হইত, শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে সংসারের কোনও কাজ তাঁহারা করিতে পারিবেন না। এই শারীরিক বলের সাহায্যেই তাঁহারা ঘোর কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম, ব্রহ্ম, তপস্শ্রাদ্ধি করিতে পারিতেন। কি আশ্চর্য্য ! এখন যে সামান্য মাত্র ব্যায়াম চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক না থাকিতে কি বিষমর কল ফলিতেছে ! আর দেখিতে পাওয়া যায় ব্যায়ামে পারদর্শী ব্যক্তি উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখেন না। তাঁহারা কেবল মাঝমাঝি লাঠালঠিতে রত থাকেন।

আমরা ইতিপূর্বে যে প্রাচীন শিক্ষার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সকলেই বুঝিবেন, কি সুন্দর প্রণালীতেই তখন জ্ঞানচর্চা হইত। উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত এখন কি কোনও দেশের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের তুলনা হয় ! এখনকার কোনও ধর্ম্ম গ্রন্থ কো সঙ্কলনের নিকটেও পৌছিতে পারে না। তাঁহারা যে জ্ঞান ও নীতি

শিখিতেন, তাঁহাদের জীবনে তাহা প্রকাশ পাইত। প্রাচীন দর্শনগণের তুল্য
 ব্যক্তি একালে কেহ কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? এখনকার ধর্ম্ম পাঠ-
 বিদ এবং প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রবিদগণের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল ভেদ
 বলিয়া বোধ হয় না কি? এখনকার কল্পন তাঁহাদের মত সমস্ত বিষয় স্থ-
 ভ্যাগী, নিঃস্পৃহ, ভিত্তিহীন? অনেকে বলিয়া থাকেন প্রাচীন কালে কেবল
 ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মশাস্ত্রাচরণ করিতে পারিতেন; ক্ষত্রিয়াদির তাহাতে অধিকার
 ছিল না। আমরা তাঁহাদিগকে বলি, এখনও সকলে সকল শাস্ত্রের অধিকারী
 হইয়াছেন, তথাপি এখন কয়জন সেই কল্পধামর সৃষ্টি কর্তার প্রতাপ
 আরাধনা করেন? আরাধনা দূরের কথা, কল্পজনের নির্দিষ্ট একটী ধর্ম্ম আছে,
 কল্পজনের ঐশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ বিবাদ এবং তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি
 আছে? আর প্রাচীন কালের ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ যে
 জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি এবং সেদিনকার
 রাজপুতানার ইতিহাস তাহার দলভ্রম্য প্রমাণ। তখন চারিবিধের চারি প্রকার
 শিক্ষার বিষয় থাকিতে এবং সেই সুন্দর প্রণালী অনুসারে সকলেই চূড়ান্ত
 শিক্ষা পাইতেন এবং সকলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন।
 এবং এই কার্য্য বিভাগ হেতু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অতি সুন্দররূপে
 সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার সকলকেই সকল বিষয়ে পণ্ডিত
 হইতে হইত না। কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ গণিত, কেহ আয়ুর্বেদ
 শিক্ষা করিয়া নিজের জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও সমাজের উপকার সাধন
 করিতেন। এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র এক এক বিষয়ে সুদক্ষ হইতেন।
 ইংলণ্ডে স ব ইচ্ছাযুক্তা শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। কি বিদ্যা বিষয়ে, কি
 শিল্প বিষয়ে, কি বাণিজ্য, কি শিল্প সকল বিষয়ে নিজের প্রবণতা ও ক্ষমতা
 অনুসারে সকলে এক এক বিষয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে
 তাঁহারা যে নিয়ম প্রচলিত করেন নাই। এক ব্যক্তিকেই সাহিত্য, বিজ্ঞান,
 দর্শন, গণিত, ইতিহাস সব পড়িতে হইবে। পাঠের অধিকাংশকাল এইরূপ
 করিয়া শেষ তিন চারি বৎসর তিনটি, দুটি বা একটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া
 হয়। ইহার ফল এই হয়, অতি অল্প লোকেই কদাচিৎ কোন এক বিষয়ে
 সুপণ্ডিত হইতে পেরেন না। কার্য্যে পরিণতি দূরের কথা, অনেকে

বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর কঠোর নিয়মে অকর্মণ্য হইয়া পড়েন। তাহার কাৰ্য্য করেন, তাহার নিজেদেরই কাজ করেন। এ শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জন-কর্মপ্রদান। এতদ্ব্যতীত বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী এরূপ অসম্পূর্ণ যে আজও আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানুষ অতি অল্পই অনুগ্রহণ করিয়াছেন। এখনও আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির হয় নাই; মহৎ উদ্দেশ্য জন্মে নাই। এখনও আমাদের মধ্যে অধিকাংশ নিষ্কর্ম, পণ্ডিত রহিয়াছেন। প্রায় সকলেই নিকটবৃত্তির অনুশীলনে মতি ও গতি। এতদূর বিপদের সময়, কিরূপে বিবাহকার্য্য বিলম্বে সম্পন্ন করা বুদ্ধিমান হইতে পারে?

আমরা প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য ও আধুনিক পঠদশার দ্বি-সমালোচনা করিলাম, তাহাতে জানি ও পরিণামবর্ণী ব্যক্তি মাত্রেই বুদ্ধিতে পারিবে, শরীর পাকিবার অপেক্ষা এবং বিদ্যাচর্চার মন স্থির রাখিবার প্রত্যাশায় তাহার অধিক বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী তাহার বিবাহ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই তাহার বুদ্ধিতে পারিবে, যতদিন আমাদের জীবন-ভ্রোত এইভাবে প্রবাহিত হইবে, ততদিন আমাদের শরীর কোন মতেই পাকিবে না; এবং এক কারণে আমাদের বাহ্য কিছু ক্ষতি হইতেছে, তৎ-পরিবর্তে অন্য সহস্র কারণ আমাদের সহস্রওগুণ অনিষ্ট করিবে। শরীর ও আত্মছাড়িয়া কেবল মনের উন্নতি করাই—কেবল বিদ্যান হওয়াই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে যত অধিক বয়সে বিবাহ দিতে পারেন তেন, তাহারও আপত্তি নাই। (জানি না তাহাতে বিদ্যান হইবারও ব্যাঘাত ঘটাইবে কি না) কিন্তু যে সকল বৃত্তির অধিকারী হইয়া সুখ্যা অগ্ন্যান্য সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেই সমস্ত বৃত্তির ক্ষুদ্র ও সম্যক বিকাশ করাই যদি জীবনের মহান লক্ষ্য হয়, তবে আমাদের তিনেরই—শরীর, মন এবং সঙ্গীপেক্ষা আত্মার উন্নতির জন্য প্রাণদণ্ড করিতে হইবে। তাই আমাদের প্রার্থনা, আপনারা অনুকরণ-মোহের তৃণ হইবেন না; হীরকের গিনিময়ে কাচ মুগ্ধ হইবেন না; প্রকৃত স্বপ্ন ও শাস্ত্রের মূলে কুঠারখণ্ড করিবেন না।

ঐগোবিন্দলাল দত্ত ।

ঈশ্বরের রূপ-পরিগ্রহ সম্বন্ধে রামমোহন রায় ।

ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত, রামমোহন রায়েরও সেই সিদ্ধান্ত । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার শাস্ত্র বিচারের গ্রন্থ সকল কেহ ভাল করিয়া পড়েন নাই । সে জন্য তাঁহার প্রকৃত মত কেহই জ্ঞাত নহেন । তিনি রানি রানি শাস্ত্র পাঠ করিয়া সৌর বাজালা গ্রন্থ-সমূহে আর্ধ্য-শাস্ত্রের সারমুখ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । শাস্ত্রের জ্ঞান কিঞ্চিৎ না থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থের রস পাওয়া যায় না । সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া বুদ্ধিতে পারে তাহার অধিকারী অতি বিরল । তাঁহার সময়ে তাঁহার যে সকল বিজ্ঞ বিজ্ঞ শিষ্য ছিলেন তাঁহারা অনেকে তাঁহার মত বুঝিয়াছিলেন । তখন বুদ্ধিবাদ অনেকটা সুবিধাও ছিল । ত্রাণক কার্যে প্রভৃতি সকল ভদ্র গৃহেই তখন শাস্ত্রের কিছু কিছু চর্চ্চা ছিল । যদি বেদান্তশাস্ত্রের চর্চ্চা না থাকুক ; কিন্তু ন্যায়, মূর্তি, পূবাণ, ভারত, ভাগবত ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা ছিল । ভদ্র সমাজেরা শাস্ত্র না পড়িয়াও সঙ্গ ওণে ঐ সকল আলোচনার কল লাভ করিতেন । তাদৃশ ব্যক্তিবিশেষ মধ্যে যাহারা রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সকল পড়িয়াছেন, তাঁহারা অল্প আয়াসেই তাহার রস পাইয়াছেন । শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত রামমোহন রায়ের বাণী সমূহের ঐক্য দেখিয়া তাঁহারা শাস্ত্র ও রামমোহন রায় উভয়কেই সম্মান দিয়াছেন ।

কণতঃ কোন একটা রব উদ্ভিত হইলে সাধারণ লোক সকল সে রবের কারণ জিজ্ঞাসু হন না ! তাদৃশ রবের হেতু কি, মূল কি, অর্থ কি তাহা জ্ঞাত না হইয়াই অনেকে তাড়াতে ভয় পান । বিধি-পরাধন, এবং কর্ত্ত্ব কাণ্ডের পক্ষপাতীগণের মধ্যে একটা রব উঠিল যে, রামমোহন রায় কিছুই মানেন না । সেই অবধি বঙ্গ দেশের সকলের জ্ঞানা হইল যে রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞানী । ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্থ কি ? না, নাস্তিক । তিনি ঈশ্বরের রূপ, প্রতিমা, অবতার, জন্ম, কর্ত্ত্ব প্রভৃতি মানেন না । সন্ধ্যা বন্দনা করেন না । জিয়া কর্ত্ত্ব মানেন না । সৌর গ্রন্থে তাহাই প্রচার করিয়াছেন । এই রূপ

রবের ফল এই হইল যে, অনেকে তাঁহার গ্রন্থ সকল স্পর্শ করিলেন না। আমরা বাল্যকালে অর্থাৎ ৩০ বৎসর পূর্বে অনেক বিষয়ী ভ্রামণ কাগজের গৃহে ফাওনি কেতাবের দপ্তরের মধ্যে কষিদিগের অস্ত্রের ধন—রামমোহন রায়ের জীবনের সার্থক—উপনিষৎ সকল দেখিয়াছি। বাটীর কঠা টের না পান এমনতর ভাবে সুযোগ্য সন্তান ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়াছেন। গোপনে পরমার্থ-সুধারস পান করিয়াছেন। তখন রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পড়িতে এতই ভয় ছিল। এখন আর সে ভয় নাই, তথাপি তাহা কেহ পড়েন না। অনেক হিন্দু সেট পূর্ব রবের পক্ষপাতী হইয়া ঘৃণা পূর্বক তাহা দেখিতে চান না। পক্ষান্তরে অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থে হিন্দুধর্মের উপ-দেষ্টা আছে জানিয়া তাহার পাঠ ও আলোচনা ভাগ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা জানিয়া রাখিয়াছেন যে রামমোহন রায় তাঁহাদের ন্যায় হিন্দুধর্মের দ্বেষী ছিলেন। কেহ কেহ পাশ্চাত্য বুদ্ধির অসুগামী হইয়া তাঁহার কৃত শাস্ত্র বিচার-সমূহের অর্থাত্ত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা অবশ্যই নিষ্ফল হইবেক। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে বাহারা রামমোহন রায়কে হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী জানিয়া তাঁহার মতস্থ হন তাঁহাদেরও ভ্রম, আর বাহারা সেরূপ জানিয়া তাঁহার প্রতি ঘেঁষ করেন তাঁহাদেরও ভ্রম।

আমরা রামমোহন রায়ের স্মৃতি বাক্য সকল দ্বারা স্পর্শাইতে পারি যে, তিনি জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন, শাস্ত্রানুসারে আহাৰ দিহাভের ও সম্ভাবন্যতা করার উচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, আশ্রমোপদেশ পক্ষে আশ্রম-বিহিত ব্রহ্মার্চন-বৃত্তিবৃত্ত নিকাম কৰ্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন; এবং জ্ঞানারূঢ় বিরক্তদিগের সম্বন্ধে কহিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি বশিষ্ঠ জনকাদির ন্যায় আশ্রমবিহিত ক্রিয়া কর্তব্য করেন ভালই, না করিলে ক্ষতি নাই। কেননা শুক ভরতাদি জানিয়া আশ্রম-বিহিত বৈদিক ক্রিয়া করেন নাই। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সকল ভাল করিয়া পড়িলে তাহার নানা স্থানে ঐ সকল উপদেশ পাওয়া যাইবে। তাঁহার প্রতি ঘেঁষ না করিয়া যদি ঘেঁষ দেবীর উপাসকেরা তাহা পাঠ করেন তবে কীত হইবেন। নবা ব্রাহ্মেরা অনেকে যে স্বকপোল-কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম রচনা করিয়াছেন, তাহার পক্ষপাতী না হইয়া যদি স্থির চিত্তে রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সমূহ দেখেন তবে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম লাভ করি-

বেন। তদ্বারা দেব দেবীর উপাসক এবং ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দুধর্মের ও হিন্দুধর্মের নিগূঢ় মর্ম্ভ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি যে মত ভেদ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবেক। ব্রাহ্মধর্ম নষ্ট হইবে না, হিন্দুধর্মও নষ্ট হইবে না। তাহাতে বরং যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মধর্মই হিন্দুধর্মরূপে, এবং হিন্দুধর্মই ব্রাহ্মধর্মরূপে পুনঃ প্রচারিত হইবেক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম শাস্ত্রোক্ত নিরুক্তি-ধর্মের নামান্তর মাত্র। সেই তাৎপর্য্যে তাহা প্রচারিত হইলে প্রকৃত ব্রহ্মার্চন বুদ্ধিতে সমস্ত বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়া সংসাধিত হইবেক। সমস্ত দেবারাধনায় ব্রহ্মেরই আরাধনা হইবেক। অল্পের জন্যে বিনা যেবে অনেক ব্রহ্মজ্ঞানের আশোচনা করিতে পারিবেন। এ স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে আর প্রতিমা পূজার সহিত ব্রহ্ম-উপাসনার ভেদ রহিল কি? ইহার উত্তর দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান নামক পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা যতদূর পারি দিয়াছি। প্রতিমা পূজার একপ উদ্দেশ্য নহু যে, কেবল তাহার সাজসজ্জা ও বাহ্যিক আড়ম্বরে মুগ্ধ হইবে; ইহার উদ্দেশ্য—উপাসক প্রতিমাতে ভগবদাবির্ভাব দর্শন পূর্ব্বক—সেই আবির্ভাবকে ব্রহ্মজ্ঞানে—ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবেন। তাদৃশ সাধিক ব্রহ্মারাধনা, উক্ত প্রকার পৌত্তলিকতা চইতে বর্গ নরকের নায় ভিন্ন। তাহা বিধিবদ্ধ, অনুভব বিহীন, ফল কামনা বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ড চইতেও স্বতন্ত্র। যে সকল কর্ম্মীগণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদবৃত্তন বিনা, ব্রহ্মে ক্রীতি ও তৎপ্রিয় কার্য্য জ্ঞান বিনা কেবল বেদে আছে বলিয়া, বেদের দাস চইয়া, ফল পাইব বলিয়া, পার্থের দাস হইয়া দেব যজ্ঞাদি করেন তাহারা আসক্তকর্ম্মী। যদিও নিকাম অর্জ্জনা ও কর্ম্মকাণ্ড অতীব কঠিন-সাধ্য, তথাপি যদি সুপারগ হন তবে যেন ব্রহ্মজ্ঞানীরা সেরূপ বেকবিধির দাস হইয়া ক্রিয়া না করেন। কেননা, তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানিগের ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানমূলক, ব্রহ্মক্রীতি ও ব্রহ্মার্চনাদিশিষ্ট নিকাম কণ্ড সকল অশুভ বিস্তৃত ভিন্ন। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের আক্ষেপের কারণ নাই। তাহারা সুপারগ হইলে কথিত প্রকার পৌত্তলিক ও আসক্ত কর্ম্মীগণ হইতে সদাকালই স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবেন, আর যদি পারগ না হন তবে তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনাও বৃথা। সে বাহা হউক, ভক্তিযোগে

সকল দেবতার নামই ব্রহ্মবোধক, এবং সকল অর্চনা ও সকল ক্রিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এইরূপ সমন্বিত হ্রাস। বৈদেশিক বুদ্ধি-সম্বন্ধিত ব্রাহ্মবিগের তো কথাই নাই; এখানে অনেক শাক্ত ও বৈষ্ণব আছেন যাহারা কৃষ্ণকে ও ভূগীকে একই পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা দেবগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ সাধু যত সে প্রকার নহে, তিনি অম্বর ব্যতিরেক বলে সকল দেবতাকে একই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। কোন উপাসকের সহিত তাঁহার বিরোধ থাকে না। কিন্তু উক্ত প্রকার শাক্ত ও বৈষ্ণববিগের দেবদেবী লইয়া পরস্পর বিস্তর বিরোধ থাকিতে পারে। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা পরস্পর রূপ নামে বদ্ধ। কিন্তু ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞ জানেন যে, ব্রহ্মের কালী কৃষ্ণারি রূপ ধারণ কেবল সায়ার কার্য; হুতরাং তিনি রূপ নামে বদ্ধ থাকেন না। কেবল ব্রহ্মই তাঁহার লক্ষ্য। সেই পরম লক্ষ্য জুসারে ধরিয়া তিনি সর্বত্রই ভগবানকে দেখেন। তাঁহাকে ভগবতের জন্ম স্থিতি-ভঙ্গের কারণ বলিয়া ভট্ট শঙ্করও তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন। আনন্দ স্বরূপ ও রস স্বরূপ ভাবেও তাঁহার আনন্দ অমৃতত্ব পূর্বক তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। বাণোদ্যম পরিপূর্ণ, শম্ব শক্তি নিনাদিত বেকমন্ত্রপুত, দেবোৎসবেও তাঁহার আনির্ভাব দর্শন পূর্বক তাঁহার পূজা করিতে পারণ করেন। তাঁহার মন যে প্রকার ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ তাহাতে কিছুই তাঁহার ব্রহ্মপূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের বাধক হয় না। প্রত্যুত প্রতিমা-উপলব্ধিত অর্চনা সমস্ত এবং এমন কি ব্রত হোমাদি কাম্য কর্ম পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে ঐশ্বর ভক্তির অরোপোদ্দীপক হয়। পরমেশ্বর সর্বজীবে ও সর্বত্র বিদ্যমান ব্যক্তি-প্রকৃতিতে বিরাজমান। ব্রহ্মজ্ঞ সাধু তৎসর্বত্রই ভগবানকে দর্শন পূর্বক তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবকে জুসারে স্পর্শ করেন। তাহা বাতীত তিনি ইহাও জ্ঞাত আছেন যে, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার ছাড়াই পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রূচিপরায়ণ সাধকের দৃষ্টিতে অধিক প্রতিফলিত। হুতরাং সেই সকল বিভিন্নাবি-কারীগণের সহিত যোগ দিয়া সেই সকল উপাধিতে বা সেই সকল উপাধিজন্য প্রতিমাতে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে তাঁহার বিধা বা

আলসা হয় না। অপরক, তিনি বেশ জানেন যে, পরমেশ্বরের বিচিত্র শক্তি। সেই শক্তি সহকারে তিনি ইন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বিশিষ্ট এই আন্তর্য্য বিষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুই ছিল না, তিনি সকলই করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় তো আবার কিছুই থাকিবে না। যাহার শক্তি এমন বিচিত্র তিনি নরলোকের বিশেষ কল্যাণার্থে অবশ্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেমন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ, জীবেতে অবতীর্ণ, সেইরূপ পেছা বিবচিত্র শরীর যোগেও অবতীর্ণ হইতে পারেন। শাস্ত্রে রামকৃষ্ণাদিকে সেই প্রকার অবতার কহে। রামকৃষ্ণাদির দেহ অদৃষ্ট ভোগের আয়তন ছিল না। তাহা ঈশ্বরের পেছাকৃত। প্রয়োজন বশতঃ ঈশ্বর সেই সেই উপাধিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে অবতীর্ণ হওয়া ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির মধ্যগত। হুতরাং ব্রহ্ম পুরুষের তাহাতে বিপ্রতি-পত্তি নাই। যিনি বিশ্বরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রত্যেক ভূত ও প্রত্যেক পদার্থে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি বিশেষ বিশেষ কালে আত্মশক্তি বলে উন্নত শরীর নির্মাণ পূর্বক তাহাতেও প্রবেশ করিতে কেন না পারিবেন? ব্রহ্ম-জ্ঞানী মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ করেন না। কিন্তু তিনি তাহাদের দেহের অহরাগী নহেন। তিনি জানেন সৃষ্টিসংসার সমস্তই মায়াবিরচিত। হুতরাং শরীর মিথ্যা। অদৃষ্ট-প্রেরিত জীবদিগেরও শরীর মিথ্যা, অবতারদিগেরও শরীর মিথ্যা। এই বিশ্বের রূপ ও গুণ সমস্তই মিথ্যা। কালে সেই সকল তিরোভূত হয়। অতএব ব্রহ্মই সত্য। মহাহুতা মায়াশক্তিকে নিস্তার ও সাম্যাবস্থায় আনয়ন করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত্ব। এতাবত! অজ্ঞান ভক্ত বা ব্রাহ্মসাধক বীর মায়ঃময় শরীরের, মায়িক জগতের, অবতারদিগের মায়িক দেহের এবং ঈশ্বরের পরিগৃহীত কোন প্রকার রূপ গুণ বিশেষণ ও শক্তির পক্ষপাতী হইবেন না। তিনি সে সকল মাত্রা ভেদপূর্বক ব্রহ্মের উপধাচক হইবেন। পারগ হইলে ক্রমে ক্রমে সর্গ, মর্ত্ত, আকাশ, পাতাল, দেব, অবতার, জীব প্রভৃতি মায়া-ব্যাপার ভেদ করতঃ তিনি কুটম্ব, ক্ষণ, সত্য, নিরঞ্জন ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, আর্ধ্যশাস্ত্রের এই আদেশ, এই উপদেশ। ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে ঈশ্বরের রূপ-পরিগ্রহকে অস্বীকার করিতে হয়, শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে। কিন্তু তাদৃশ রূপ সমস্ত মায়া-কল্পনা, হুতরাং মিথ্যা,

এই সিদ্ধান্ত জানিয়া রাখিতে হয় । দেহান্ধগণী যেমন দেহকে সত্য ও আত্মা মনে করেন, ত্রুষ্ণজ্ঞানী সেরূপ মনে করেন না । তিনি যেহেতু অড়-অনিভা ও মিথ্যা বলেন, এবং আত্মাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র জানেন । যখন-বুদ্ধি লোকে মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করিতে পারে, কিন্তু ত্রুষ্ণজ্ঞ মূর্ত্তিকে মায়াকল্পিত বলিয়াই জানেন, এবং ঈশ্বরকে তাহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন ।

এইরূপ দৃষ্টিতে মহাত্মা রামমোহন রায় সমস্ত অবতারত্বকে ও সমস্ত দেবগণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; অথচ তাঁহাদের তিস্র তিস্র মূর্ত্তিকে মায়াকল্পনা বলিয়াছেন । তাঁহার সেইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া শাক্ত-বাদীরা বিশেষতঃ গোপাধীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সত্য । কিন্তু তিনি অশাস্ত বলেন নাই । মূর্ত্তি সকল যদি মিথ্যা হইল তবে অবশিষ্ট এক ত্রুষ্ণ মাত্র রহিলেন । অশ্বত্থুর ঘট, মঠ, পট ভাঙ্গিয়া গেলে অবশিষ্ট একমাত্র আকাশ থাকে । সুতরাং ঘটাকাশাদির কল্পনা কেবল ঘটাদি উপাধি বশতঃ । দেবগণ ও রূপের কল্পনা কেবল মাত্রা বশতঃ । মায়াকল্পিতী কটিলজির বিচিত্র তাব । সেই বিচিত্র তাবের মধ্যে পরমেশ্বর নানা রূপে কল্পিত হন । বস্ত্রপ জল পৃথিবী অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে উন্মাদ প্রয়োগ দ্বারা বাষ্পাকারে পরিণত করিলে তাহার স্বরূপ আরো সূক্ষ্মতা লাভ করে, এমন কি চৰ্ম্ম চক্ষুতে তাহাকে দেখা কঠিন হয় ; তদুপলব্ধ্যে তাহাকে নিরাকার বলাও বাইতে পারে । তখন আকাশই তাহার অধার হয় । তন্নিয় তাহার সে অবস্থায় তাহাকে ধারণের নিমিত্ত কূপ, পুন্ডরীক, সুরোবর, নন্দ-নদী, বা সাগর-পৰ্ব্বত রূপ কোন আধারের প্রয়োজন করে না । আবার ঐ সকল আধার যদি জলবিহীন হয়, তবে তাহাদের ব্যবহারিক সংস্কারও সার্থক্য হয় না । কেমনা সুরোবর নদী সাগরাদি লম্বে লোকে জল সহিত তাহাদের সম্বন্ধ করে । জল সেই সকল আধারে পড়িয়া আধারাহসারে নাম রূপ গ্রহণ করে । নতুবা আধার-বিহীন জল আকাশ-বিহারী মাত্র । আকাশবৎ প্রায় সূক্ষ্ম । আকাশবৎ প্রায় নিরাকার । কিন্তু আধারে পতিত জল আধার-করাকল্পিত—সাকার । সেই জল, আধারাহসারে কূপ, পুন্ডরীক, সুরোবর, নদী, সাগর ইত্যাদি নাম রূপে উক্ত হয় । তদ্রূপ, ত্রুষ্ণ স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম-

সৃষ্টিাদি সর্বপ্রকার রূপ বিহীন। সৃষ্টির নানা ভাগে ব্যাপ্ত হওয়ায় প্রকৃতির বিচিত্রতা ও নানাত্বানুসারে নানা নামরূপে উক্ত হন। অল বেমন আধারানুসারে কোথাও সরোবর কোথাও নদী নামে কথিত হয়। কোথাও কূপ কোথাও মহাসাগরের রূপ ধারণ করে, কিন্তু নিজে একটী সৃষ্টি ওদ্ভাতা মাত্র। পরমেশ্বর সেইরূপ সৌর প্রভৃতি বা মাদারূপ আধারের বিচিত্রতা, নানাত্ব, বাষ্টি, সমষ্টি হেতু কোথাও দেব কোথাও দেবী। কোথাও বা একটী ব্যষ্টি প্রকৃতিতে বাষ্টি কোথাও বা মণাসমষ্টি প্রকৃতিতে সর্পেশ্বর ও জগৎ-কারণ বলিয়া কথিত হন। কিন্তু নিজে “বিনোদ্যামৃতঃ পুরুষঃ সবাধ্যা-ভ্যক্তরহস্যঃ”—তিনি দোতনবান এবং সর্পসৃষ্টি-বিবজ্জিত। সকলের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান আছেন। এই সৃষ্টির বিচিত্রতারূপ উপাধি সমস্ত যদি না থাকে তবে ভগবান দ্বন্দ্ব প্রকাশ মাত্র। তাঁহার সেই নিত্যক ভাবই মূল ভাব। আর তাঁহার দেব-দেবীত্ব ভাব মায়িক মাত্র। মূল ভাবই ভূমি। মায়িক ভাব অল্প মাত্র। তাহা মহা প্রণয়কালে থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আত্মাত্মিক প্রলয়াবস্থায়ও তাহা থাকে না। কেবল সৃষ্টি ও মায়ার অবস্থায় সেই সকল ভাবোৎপন্ন হয়। ফলতঃ ভক্তিমান বা জ্ঞানবান সাধকের দৃষ্টিতে মাত্রা ভেদ হইয়া একমাত্র ভগবানই দূর হন। সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐশিষ্টিক-স্বরূপিণী মহামায়ার অচিন্ত্যভাব। তিনি তাঁহার দ্বারা জীবের সংসার, ধর্ম, স্থিতি, বন্ধের হেতু না করিতে পারেন এমন কর্ত্ত্বই নাই। অতএব বাহ্যর বশে এমত অনির্জন্যীয় শক্তি তাঁহার নানারূপে প্রতিকলিত হওয়ায় আশ্চর্য্য কি ? যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রাহ্ম তিনি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা অবিশ্বাস করেন নাই।

সামবেদীয় তলবকার উপনিষদে আছে যে দেবাস্থর সংগ্রামে দেবগণের নিমিত্তে ব্রহ্ম তত্ত্ব বিধান করিতে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতার আভিমান প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন “আমাদেরই এই অগ্নি, আমাদেরই এ মহিমা। আমরাই এ মহিমার সাক্ষ্য কর্ত্তা।” এইরূপ মিথ্যাভিমান করিলে “ব্রহ্ম তাহাদিগকে জ্ঞান দিবার নিমিত্ত, বিশ্বের হেতু মাদ্যানিষ্ঠিত অর্দ্ধভূক্তপে বিদ্যাতের ন্যায় তাঁহাদিগের চক্ষুর গোচর হইলেন। ইনি কে পূজ্য হইলেন তাহা দেবতার আনিতে পারিলেন না।” প্রথমতঃ অগ্নি, পরে

বায়ু গিয়া পুনীক্ষা দ্বারা জানিলেন যে, সে পুঙ্খের নিকট তাঁহারের স্বীয় স্বীয় শক্তির দত্তর গৌরব নাই। তাঁহারা এইরূপে পরাক্রান্ত হইয়া দেব-সভায় আসিয়া কহিলেন যে, এ পৃথ্ভ্যাকে ভয়েন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। পশ্চাৎ দেবতারা তাঁহার পরিচয় লইবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র গমন করিবামাত্র সেই পৃথ্ভ্যাইন্দ্র চাইতে চকুর নিমিষের ন্যায় অক্ষত হইলেন। তখন সেই আকাশে এক নবশোভমানা, হেমকুতা-ভরণবতী, বিদ্যারূপিনী, হিমবতো জুহিতার ন্যায় উমাকরণাদিনী অল্পপমা বরনারী আসিয়া অক্ষত ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। তিনি ইন্দ্রকে কহিলেন যে, যে ব্রহ্মের ভয়েতে তেঁমবা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি এতমাত্র এখানে দর্শন দিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র জানিলেন যেই পুঙ্খনী দেবতা ব্রহ্ম।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই উপনিষৎ ভাষা তাৎপর্ঘ্যের সহিত বঙ্গ সমাজে প্রচার করার কেহ কেহ তাঁহার নিকট আপত্তিসূচক প্রশ্ন লিখিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতেন রামমোহন রায় ঈশ্বরের রূপ স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহারই প্রচারিত বেদের মধ্যে ব্রহ্মের রূপ পরিগ্রহের বিবরণ দেখিয়া তাঁহারা আশঙ্কিত করিলেন যে, “যদি ব্রহ্ম বিদ্যাতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন, আর ‘বাক্য কহিলেন তবে তেঁহ এক প্রকার সাকার হইলেন।’ এই আশঙ্কার সমাধান রামমোহন রায় এইরূপে করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি সংক্ষেপে কহিলেন “এরূপ আদেশ মারিক বক্তৃতঃ তাঁহার উপমা নাই।” তিনি পুনশ্চ বিস্তারিতরূপে কহিলেন যে, “যে ব্রহ্ম মায়াকল্পনায় আত্মকল্পনায় পর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন, তাঁহার বিদ্যাতের ন্যায় মায়াকল্পনা করিয়া যেখান কোন আশ্চর্য্য? আর যেরূপ বাহ্য শব্দকে কণের গোচর করিতেছেন, আর সেই শব্দ সকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাদি-সমূহকে বোধ করাইতেছেন, তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের গুণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান?” কিন্তু কোন কার্য্যোদ্ধার নিমিত্তে কোন রূপ ধারণ করা যদিও ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব নহে, ফলে সে প্রকার রূপ যে মারিক ও পরামার্ঘতঃ মিথ্যা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নতুবা ব্রহ্মের কোন কার্য্য-জন্য বা যথার্থ পারমার্থিক রূপ

আছে এমন कहিলে অশাস্ত হয় । এ কথা রামমোহন রায় উত্তমরূপে বুঝা-
ঠায়া দিয়াছেন, অথচ প্রয়োজন বশতঃ অকস্মাৎ কোন প্রকার মায়া-রচিত রূপ
ধারণ করা ত্রুটির পক্ষে যে অনন্তব নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন ।

পৰ্য্যাপ্তানের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে যে, অমেকে “পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ,
চৌর্ধ্য, পারদার্থ ইত্যাদি বার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন ।” এই কথার
উত্তরে রামমোহন রায়ের বিরোধী পক্ষ প্রথমতঃ লিখিয়াছেন “ঐতগবানের
জন্ম ও মরণ কি প্রকারে অর্থার্থ কথা যায় ?” পক্ষাৎ অনেক প্রমাণ দিয়া
সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, “অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের
ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু বাস্তব নহে,” অধিকন্তু “পরমার্থ বিবেচনায় মহাব্যোমও
জন্ম মৃত্যু কথা যায় না” । বিরোধী পক্ষের এই সকল কথার উত্তরে রাম-
মোহন রায় লিখিয়াছেন “এ প্রমাণ বটে যে কি জীবের, কি ভগবান রায় কৃষ্ণ
প্রভৃতির পরমার্থ বিবেচনায় জন্ম মৃত্যু কথা যায় না.” তবে কি প্রকারে
ধর্মসংহারক । উক্ত বিরোধীপক্ষ) লিখিলেন যে, “ভগবানের জন্ম ও মরণ
কি প্রকারে অর্থার্থ কথা যায় ?”

এই কথার পরে, গীতায় “বহুনি মে ব্যতীতানি” এবং “প্রকৃতিং
দামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া” এই অবতার-প্রতিপাদক বিখ্যাত শ্লোকের
উৎপাদন পূর্বক মহাত্মা রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় অবতারতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছেন,
এবং শেবোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা—(ভগবানের উক্তি) “আমি
সকল স্বরূপ আপন মায়াতে স্বীকার করিয়া সত্ত্ব ও তেজস্বী সত্যাত্মক মূর্তি
বিস্তৃষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হই ।” এ স্থানে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন যে,
“মূর্তি বদ্যাপিও বিত্ত্ব, তেজস্বী, সত্ত্বগোপ্যক হয়েন ওদ্যাপিও মে মায়ার
কার্য ।” পক্ষাৎ তিনি অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে,
রাম, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভেদে ভগবান যত প্রকার রূপ ধারণ
করিয়াছেন, সে সকলই মায়ার কার্য—যথার্থ নহে । বার্থতঃ তাঁহার রূপ
নাই ।

অতঃপর ঐ সকল শ্বেতাদিপের উপাধি ও শরীর মায়িক জানিয়াও
মহাত্মা-রামমোহন রায় তাঁহাদিগের তত্ত্ববহাগত ঈশ্বরত্বের প্রতি সমুচিত
সম্মান প্রদান করিয়াছেন । কবিতাকার নামক এক ব্যক্তি রামমোহন রায়কে

লিখিয়াছিলেন যে, “তোমরা রাম, রুক্ম ও মহাদেবের দ্বয়ী”। এই কথাই উত্তরে রামমোহন রায় “কবিতাকারের সহিত নিচার ঐশ্বর্য” জুঝিয়া লিখিয়াছেন যে, “হরিহরের ঘেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?” পশ্চাৎ নানা স্থানে সম্মানের সহিত যে তিনি ঐ সকল দেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও দর্শাইয়াছেন।

রামমোহন রায় “গোখামিছিব সহিত বিচার” নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে “আত্মকৃত্ত্ব পৰ্য্যাপ্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক?”

এতাবতী রামমোহন রায়, পঞ্চমেশ্বরের রূপ-পরিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রানুসারেই সে সমস্ত রূপকে মায়িক ও মিথ্যা কহিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির উচিত যে রামকৃষ্ণ হরিহর প্রভৃতি দেবতা শব্দে ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝেন। তাঁহাদের পূজাতে ব্রহ্মপূজা জ্ঞান করেন অথচ তাঁহাদের রূপ ও প বিশেষণকে মায়াজন্য ও মিথ্যা বলিয়া জ্ঞানেন। একরূপ ভাবে আচরণ-পরাদর্শ হইলে ব্রাহ্মদিগের কোন ঘোষ হইবেক না। তবে রাম কৃষ্ণ দ্বির “মূর্ত্তিকে” ঈশ্বর বোধ করিলে অথবা তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরী একরূপ বুঝিলে অথবা ঘোষ হইবে। কেন না মূল শরীর যেমন আত্মা নহে, মূর্ত্তিও সেইরূপ ব্রহ্ম নহে। তাদৃশ ভাবে “মূর্ত্তির” পূজাই পৌত্তলিকতা শব্দের বাচ্য। ব্রাহ্মেরা তাহা ত্যাগ করিবেন। ভগবানের বিবিধ মায়িক সম্বন্ধ ও মায়িক রূপ পরিগ্রহানুসারে বিবিধ ওণে ও বিবিধ রূপে তাঁহার পূজা হয়। সেই সকল মায়িক রূপ ওণ উপলব্ধ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণার্থে উক্ত রূপাবির অভিজ্ঞাপক প্রতিমা কল্পনা করা যায়। তাদৃশ প্রতিমা পূজার কোটি কোটি লোক সমবেত হয়। তাহাদের জন্মের আচ্ছাদনে ভগবান অশব্দাই কর্ণপাত করেন। সে কণা মনে করিলে কোন ব্রহ্মবাদের জন্ম আনন্দে প্রুত না হয়? তাদৃশ ব্রহ্মবাদী আনন্দিত জন্মে সে প্রতিমা পূজার ধোণ দিলে তাঁহাতে পৌত্তলিক অপবাদ অর্শিতে পারে না। বদরিকাশ্রমে গোপাসনে উপবিষ্ট, হস্তে ধ্বজ ও লেখনীদ্বত বাস দেবের যে শ্রমিমূর্ত্তি, বেণাজ্ঞাঘ্রে রহিয়াছে, উহা তাঁহার ঠিক প্রতিমূর্ত্তি নহে, উগা স্বয়ং তিনিও নহেন; তথাপি যখন ঘোষণা দেওয়া গেল যে, এটি বাস দেবের

প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া স্থাপন করিলাম, তখন তাঁহার গুণ সকল, যেমন শাস্ত্রে উল্লিখিত, স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। সেইরূপ দুর্গা কালী মহাশিব রাম কৃষ্ণাদির “প্রতিমূর্ত্তি” সকল স্মরণ করিয়াও নছেন, এবং সে সকল “প্রতিমূর্ত্তি” যে ঠিক তাঁহাদের ব্রহ্ম মায়িক রূপে সকলের অমুরূপে গঠিত হয় এমনও নহে। তথাপি যখন ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে তাদৃশ “প্রতিমূর্ত্তি” সকল স্থাপিত হয় তখন আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে। সে সকল “মূর্ত্তি”-অবলম্বিত অর্চনায় কেবলই যে, অল মেধা-বিশিষ্ট, দুর্ল্লাভিকারী ও ফলকামনাসক্ত ব্যক্তিদিগের মনোহর ও চিত্তশুদ্ধিকর উপায় লাভ হয় এমনও নহে। মহা মহা বেদান্তবিৎ ও যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম-দর্শনগুরু ও তদ্বারা বিস্তার ফললাভ হইয়া থাকে। বেদান্তনিঃ-স্রাক্ষেরা জ্ঞানেন পরমেশ্বর ত্র্যম্বক-স্বরূপিনী মায়ার সহিত বিচিত্র-মুক্তিমান। সেই বিচিত্রশক্তি হইতে জগতে অদৃষ্টযুক্ত অথবা অদৃষ্টযুক্ত বিচিত্র মায়িক কবি প্রতিকলিত হইতে পারে। তৎসম্বন্ধেই সেই একই ব্রহ্ম সমষ্টি বা ব্যষ্টি-ভাবে অবতীর্ণ। অদৃষ্টযুক্ত রূপে দেহীতে তিনি যেমন অন্তরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ, অদৃষ্টযুক্ত দেহেতে তিনি সেইরূপ দেহী বা আত্মারূপে অবতীর্ণ। শ্বেতাক্ত প্রকার শুদ্ধ সত্ত্ব ভোজ্যায় অদৃষ্ট-যুক্ত দেহের সহিত তিনি বিবিধ গুণ কৰ্ম্মাণুসারে ত্র্যম্বক বা কৃষ্ণাদি দেবতারূপে কথিত হন। সেই সকল দেহে তাঁহার অলৌকিকী গুণময়ী মায়ার যোগে তাঁহার বিবিধ অলৌকিকী শক্তি প্রকাশ পায়। তদুপলব্ধ এক এক প্রকার “প্রতিমূর্ত্তি” বেদান্ত শাস্ত্রেরই এক এক প্রকরণ পাঠের ন্যায় কার্য্য করে। কোন প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে তাঁহাকে সকল জীবের মায়ী সমষ্টিরূপ কারণ শরীরে উপহিত প্রলয় কারণরূপে, কোন প্রতিমূর্ত্তির উপলক্ষে তাঁহাকে তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরে উপহিত হিরণ্যপুরুষরূপে, কোন মূর্ত্তির সহিত তাঁহাকে তদ্রূপ স্থূল শরীরে উপহিত বিরাটপুরুষরূপে দেখা যায়। কোন মূর্ত্তির অবলম্বনে তাঁহার আনন্দপ্রচুর মহাকাল বা মহাকালী স্বরূপিনী শক্তির ভাব মনেতে চিত্তিত হয়। কোন মূর্ত্তি যোগে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, কথিত, স্মৃতি, জ্ঞান, পিপাসা, নিদ্রা প্রভৃতি বিজ্ঞানময়ী, মনোময়ী বা প্রাণময়ী শক্তির ভাব ও বৃষ্টি নিয়ামক হিরণ্যপুরুষাদি দেবত্ব সমস্ত মনে যুগ্মিত হয় এবং কোন মূর্ত্তির যোগে তাঁহার ভূতার-

হরণ, জগৎ-পালন পরায়ণ, বৃগধর্ম-সংরক্ষণ বৈরাটিক ণ্ডণ অথবা তাঁহার সর্কসম্পন্ন-প্রদাণিনী, সর্কপ্রভা, সর্কশোভা-সরুপিনী, পত্র-পুষ্প-ফলাদি-রচনাময়ী, পুত্র-কন্যা-প্রসবিনী, বিষয়ে শরুটে মরণে রূপে হুর্গতিনাশিনী, বরাভয়দাঘিনী প্রভৃতি বৈরাটিকী আভরণ-ভূষণা শক্তি বা অনির্কচনীয় দৈবী-মায়ী হুদয়ে চিত্রিত হয় । অতএব এ সকল মূর্তি-উপলক্ষিত উপা-সনাতে তৎ ও ভাবুক সাধু গৃহস্থান্ত্রমে থাকিয়া সেট ফলাকল লাভ করিয়া থাকেন, যাহা হুতিপণ মন্যাস যোগাবলম্বন দ্বারা, অরণ্যে তৈমচর্য্য করতঃ বেদান্ত-বিজ্ঞানে হুনিচিহ্নার্থ হইয়া উপভোগ করেন ।

পাশ্চাত্য মূর্তিবাদী মহাত্মাগণ বেদান্তের উপরি উক্ত মন্ততত্ত্ব সকল মূর্তি-বার প্রয়াস না পাইয়াও যদি কেবল ঈশরের অনির্কচনীয় শক্তি ও সর্কপ্রাব-তীর্ণ হুটবার ক্ষমতার পরম্পর অধ্যয় করেন ; তবে প্রতিমা-উপলক্ষিত পুণ্ডর প্রতি ভাঁহাদের অবশ্যই প্রভা হইবেক । কারণ, জগৎ তাঁহাকে বত প্রকারে প্রতিপাদন করে, তিনি যে হুতির ভিন্ন ভিন্ন হুটার সহিত তত্তরুপী তাহাতে সংশয় নাই । একদিকে গ্রন্থ সকল যেমন মূর্তি বা কাব্যরসের দ্বারা সেই সকল ভাব সাধকের মনে মূজিত করিয়া দেয় ; অন্যদিকে মূর্তি ও কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে এমনত “প্রতিমা” সকল সেই ভগবদৈশ্বর্য্য তাদৃশ সাধকের মনে কেননা মূজিত করিবে ? কেনই বা না তাদৃশ সাধক-সম্বন্ধে জগৎগ্রন্থ ও লিপিগ্রন্থের ম্যায় প্রতিমূর্তি-গ্রন্থ বা চিত্র-গ্রন্থ হিত-সাধিনী হইবে ? এতবতা যে জগৎকারণ মহা কবির নিয়মে এক দিকে জগৎ-ছবি, অন্য দিকে দর্শনকার ও কবির বিরচিত গ্রন্থ-ছবি, অপদ্বদিকে প্রতিমূর্তি-নির্ম্মিত । ও চিত্রকরের কৃত ঈশরের ণ্ডণ ও শক্তিসমূহ বিভূষিত দেব-ছবি সমভাবে জ্ঞান দেয়, তাঁহারই স্বীয় নিয়মে যুগে যুগে প্রয়োজন কালে তিনি নটের ন্যায় স্বীয় অনির্কচনীয় শক্তি যোগে কি বিবিধ রূপ ধারণ করতঃ একে-বারে জগৎ ছবি, দর্শনকারের ছবি, কবির ছবি, চিত্রকরের ছবি, মূর্তি-নির্ম্মা-তার ছবি, অথবা সর্কপ্রকার মানসিক ছবির ন্যায় ফলদান করিতে পাবেন না ?

ঐচন্দ্রশেখর বহু ।

মরীচিকা ।

দিন দিন গনি দিন ; পায় পায় পায়
না জানি রে কোন্ পথে চ'লেছি কোথায় ?
তথা ত হ'লো না স্থখ, অনিরত বলি—
জানি না কি স্থখ-আশে কোথা যাই চলি ।
সকলেই কৈদে যায়, তুলে এক তান,
পুরিল না সাধ বলি মুদে হু-নয়ান ।
তুলে গিয়ে কখনার অগত মধুর বোলে,
পাগলের মত যায় ছুটে কখনার কোলে !
—কে বলিবে সেথা গিয়ে পূরে কি প্রাণের আশ ?
অথবা আঁধারে বসি ফেলিবে দীর্ঘ-বাস !
ওরে—ওরে মন মোর, কে আগাস দিল তোরে,
আশার রতন আছে ভাবীর আঁধার ঘোরে !
নিশ্চিতেরে হেলা করি অনিশ্চিতেরে যার আশ,
লোকে বলে, তার ভাপো ঘটে স্থধু হা-হতাস ।
তবে—
আতুল হইয়া হেন, ঘাসনে ঘাসনে ছুটে !
মরিবি কি অবশেষে আঁধারেতে কাঁটা ছুটে ?
হেথা—
আছে স্থখ শেষে শুখ, দিবা পরে রাত্তি,
নিরাশায় স্থখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাতি ।
নদীতে তরঙ্গ আছে, জন্মে উচ্ছ্বাস,
পরানে সঙ্গীত আছে, মেহের বাতাস ।
হরষের হাসি আছে, স্থখের নিবাস,
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বপ্ন, প্রবাস ।
আছে বিহ্বলের গান, কুসুম বিকাশ,

রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ ।
 উষা আছে, সন্ধ্যা আছে, আছে সাধ, আশা,
 স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, আছে ভালবাসা ।
 সাগর, ভূধর আছে, নগর, কানন,
 নিদ্রা, জাগরণ আছে, বিম্বুতি, স্বপ্ন ।
 খেলা আছে, হুলা আছে, আছে আলোচনা,
 জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, কবিতা, সাধনা ।
 জন্ম, মরণ আছে, আছে স্বাস্থ্য, রোগ,—
 নিত্য নব লীলায় জগতের ভোগ !

তবে—

আকাশের পানে চেয়ে, সজল নয়নে,
 কি অভাবে ভাবিতেছ অকাল মরণে ?

ভাব—ভাব একবার

জীবনের পর-পার !

যে চির-বিম্বুতি চাও—

সেখা যদি নাহি পাও ?

সেখা যদি থাকে শ্রুতি—আর কিছু নয় !

কি করিবি—কি করিবি—তখন, স্থগর ?

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ।

ইরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা ।

(বেদের অনিত্যতা—সাহেবদিগের মত ।)

যে ঘাহাই বলুক, ঋগ্বেদের সংগ্রহ যে প্রথমতঃ কোন রূপ বর্ণ্য ক্রিয়া
 সম্পাদনাভিপ্রায়ে সম্পাদিত হয় নাই, তাহার আর একটি প্রমাণ এট যে—

যে সকল গাথা কেবল দেবতার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহারা প্রায়ই এক একটি ধর্মকার্যের উপযোগী মন্ত্রনিচয়ের সহিত এক স্থলে বিন্যস্ত হয়। কিন্তু অন্য দিকে আবার গাথা সকল যদি অন্তরাত্মার নৈসর্গিক কবিতাধারা বা ভক্তিনির্কর হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহারা কালক্রমে বলপূর্ব্বক ধর্মকার্যের সহিত ব্যবহৃত বা নিয়োজিত হইলেও, তাহাদের ঐরূপ একত্ৰোপন্যাস কখনই পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনা-বিষয়ক গাথা সমূহের মত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যজুর্বেদের এবং সামবেদের সংগৃহীত মন্ত্রগুলি ধেরূপ সুন্দর সঙ্গতির সহিত উপন্যস্ত হইয়াছে কবেদের মন্ত্রোপন্যাসে তাদৃশ সঙ্গতি আদৌ নাই বলিলেই চলে।

যজুর্বেদের অন্তিম অধ্যায় বাতীত অপর সমুদয় অধ্যায়েরই মন্ত্র সকলও যে সকল ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানের সময় তাহাদের উচ্চারণ আবশ্যক হয়, সেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম কার্যের অনুষ্ঠানে নানাবিধ প্রেক্ষিতে বিভক্ত হইয়াছে। সামবেদ সংহিতায় কেবল সেই সকল মন্ত্রের সংগ্রহ করা হইয়াছে বাহা কেবল দোম যজ্ঞ স্থলেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কবেদীয় মন্ত্রনিচয়ের উপন্যাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত রীতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে অল্পক্ৰমে কোন একটা সম্পূর্ণ যজ্ঞ উক্ত হয় নাই। কবেদের মন্ত্র সকল কোনরূপ যজ্ঞ ক্রিয়ার অনুসারে প্রেক্ষাবিভক্ত হয় নাই, তাহারা কোন কোন স্থানে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য দেবতাদিগের অনুসারে এবং কোন কোন স্থানে স্ব স্ব আবির্ভূতা ঋষিদিগের অনুসারে সিন্যস্ত হইয়াছে। যেমন ইন্দ্র দেবতার স্তোত্রবিষয়ক কতকগুলি মন্ত্র একত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে অথবা মধুচ্ছন্দাঋষিদিগের কতকগুলি মন্ত্র একত্রে উপন্যস্ত হইয়াছে।

বৈদিক পূজাপদ্ধতি এবং তদানীন্তন বঙ্গমানদিগের ধাড়া ও পত্তরফা প্রভৃতির প্রার্থনাব্যয়ক মন্ত্রনিচয় দর্শন করিয়া অনেকেই এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ সকল মন্ত্রে যাদৃশ জীবিকাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহা পশু পালোপজীবী ও তদর্ধ নানা স্থানে ভ্রমণকারীদিগের অবস্থা তিন্ন আর কিছুট নহে। ফল, সম্পূর্ণ কবেদ সংহিতাকে এককালীন সংগৃহীত বলা অপেক্ষা আর অধিক ভ্রমের কার্য কিছুই নাই। কারণ, ইহাতে একদিকে যেমন পূর্ব্বোক্ত অব্যবহৃত পশুপালোপজীবীদিগের অবস্থা লক্ষিত হয়, অন্য দিকে

ইহাতে একরূপ প্রমাণেরও উপলব্ধি করা গাইতে পারে। বাহা দ্বারা স্বদেশ-সমকালীন আর্থগণ গ্রাম ও নগরাদি স্থাপন করিয়া বাস করিতেন, তাঁহাদের শিল্পকার্যে বিলকণ অভিজ্ঞতা কৃষিগাভির, তাঁহারা নগ্ন বুনিত, খাতু গলা-ইতে, নৌহ ও হৃবর্ণ প্রভৃতি গলাইয়া আভরণ নির্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন, এই সকল বিষয় সিদ্ধ করা গাইতে পারে। অধিক আর কি বলিব, ক্রমেণে তৎকালীন ব্যক্তিদিগের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে এবং বাণিজ্য কার্যে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বদেশের তৃতীয়াংশে প্রথম অষ্টকের ১১৬ খৃস্টের কোন একটি মন্ত্রে সমুদ্র যান দ্বারা স্বীপান্তর আক্রমণের কথাও পাওয়া যায়।

তুঙ্গ নামে অশ্বিনীকুমারদত্তের কোন বন্ধু তুঙ্গ নামক আপন পুত্রকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন। ঐ তুঙ্গ অশ্বিনীকুমারদত্তের প্রসাদে তাঁহাদের দত্ত বানারোহণ করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া পুনরায় নিরাপদে পৃথিবী প্রত্যগমন করেন। অশ্বিনীকুমারেরা ঐ তুঙ্গকে তিন দিন তিন রাত্রে তিনধানি স্তব-গামী শকট অর্পণ করেন। প্রত্যেক শকটের একশত করিয়া চক্র ছিল এবং উহা ছয়টি ঘোটক দ্বারা মহাসাগরের তলের উপর দিয়া চালিত হইয়াছিল। কেবল ইহা নয়, আমরা স্বদেশসংহিতা-সংগ্রহ-সমকালীন মনুস্মৃতির সঙ্গীত শাস্ত্রীয় বস্তাদিতে, বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদি ব্যবহারে এবং সময়ের ক্ষুদ্রাঙ্গনি ক্ষুদ্রতর অংশ করণেও সম্পূর্ণ অধিকার দেখিতে পাই।

অপিচ, স্বদেশ সংহিতায় এমন সকল মন্ত্রও আছে, বাহা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময় কেবল ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি কতকগুলি মোটা বিষয়ের আইন মাত্র ছিল না, কিন্তু দায়ভাগ প্রভৃতি অটল বিষয়েরও আইন সকল নিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ইহা এক প্রকার সত্যসিদ্ধ যে, সমাজ যখন উৎকর্ষ উন্নতাবস্থায় পদা-র্পণ করে তখন ঐ উঃতির আত্মবিস্মিক কতকগুলি পাপ এবং শোষ আসিয়া উহাকে ভিতরে ভিতরে আক্রমণ করে; এই নিমিত্তই আমরা স্বদেশ সংহিতায় এইরূপ সকল মন্ত্র দেখিতে পাই বাহাতে দ্রুতক্রীড়া, ডাকাইতি, চৌর্য্য এবং আরোহণপতি প্রভৃতিরও উদ্বেগ করা হইয়াছে।

স্বদেশসংহিতা অতি প্রাচীন কালে যেরূপ ছিল এখন অবধি ঠিক সেই

রূপ আছে দেখিয়া হিন্দুরা বলেন বেদ নিত্য । কিন্তু আমরা স্বস্থারস্তে পুরাণ
হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে পুরাণমতে বেদ ব্রহ্ম
কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে । পুরাণে বেদকে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ
করিলেও পুর্নতন আগাধ্যাপন সে মত গ্রহণ করেন নাই । তাঁহাদিগের মতে
বেদের নিখ্যাতা কেহই নাই । কোন কোন পুণ্যশীল কবিগণ বেদের মন্ত্র সকল
ঈশ্বরের অমুগ্ধে স্ব স্ব হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন, যিনি যে মন্ত্রের উদ্ভা
তাহার নামে সেই মন্ত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।

মুদ্র সাহেব আপনার প্রসিদ্ধ Original Sanskrit Texts নামক
গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তার প্রমাণের সহিত ঠকা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন
ও মধ্য সাময়িক ভারতে কি দর্শনশাস্ত্র, কি কাব্য শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বেদের
নিখ্যাতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তবে, এক্ষণে যে মধ্যে মধ্যে বেদমন্ত্রের
পাঠ-ভেদাদি লক্ষিত হয়, ঐ গ্রন্থেই বড় কোশলে তাহার কারণ নির্দেশ করা
হইয়াছে । যথা,—প্রলয়কালে বৈদিক পুস্তক সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ।
তাহার পর প্রতি মন্বন্তরের আরম্ভে নতুন করিয়া বেদের উদ্ভাব বা প্রকাশ
করা হয় । ঐ সময় অর্থাংশটি সম্যক্ রূপে অপরিবর্তিত থাকিলেও মন্ত্রের
অবশ্যবশত্যাংশে কোন কোন স্থলে পরিবর্তন ঘটে, তদ্বিমিতই পাঠ-ভেদ ।
হায় ! আমাদের এক্ষণে সম্পূর্ণ হৃদ্যাগা বলিতে হইবে । আচার্য্যগণ এইরূপ
কোনমত প্রকারে বেদের নিখ্যাতা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও আদি স্থিতিতে
বের বেরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল প্রতিমন্বন্তরায় উহার ঐরূপ পরিবর্তন ঘটিতে
ঘটিতে আমরা হয় ত উহার সেই আদি রূপ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হই-
য়াছি । ইহা একটি কম শোচনীয় ব্যাপার নহে ।

কয়েকের সমুদয় মন্ত্রের নিখ্যাতা অর্থাৎ কোন এক সময়ে একেবারে
সংগৃহীত হইয়া বরাবর একভাবে থাকা এরূপ অনন্তব্য যে, ইহার বিষয়ে যত
কিছু সুকিঞ্চ মতের উপন্যাস করা যাউক না কেন, ব্রাহ্মণীয় ধর্ম্মে প্রত্যা-
হীন ভারতীয় প্রকৃত-জিজ্ঞাসুর তাহাতে কখনই সন্তোষ লাভ হইবে না ।
ঐ তবজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমুদয় কয়েদ পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন
কে, সমুদয় বেদের মধ্যে কতকগুলি মন্ত্ররূপ আছে, যাহাতে মনুষ্যজাতির
আদিম অবস্থা স্পষ্ট চিত্রিত রহিয়াছে এবং কতকগুলিতে আবার, যেমন

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, অনেকটা উন্নত সামাজিক অবস্থার দৃশ্যই ঐতিবিশ্ব লক্ষিত হয়। এইরূপ কতকগুলি মত্রে কেবল ধর্মের দৃষ্টলোকসম অবস্থা মাত্র দৃষ্ট হয়, আর কতকগুলিতে উহার বৎকাল-দৃষ্টলোকসম অবস্থা লক্ষিত হয়; সুচিরচিত্তা ও অসুখীলন ব্যতীত সেরূপ পরিণতি পাওয়াই অসম্ভব। তির কথার বলিতে হইলে এইরূপ বলিলেই হয় যে, ঐ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রাচীনতম পুস্তক ভেদে সংহিতার মধ্যে অবশ্যই বহুকাল-সাংক্রম্যেণ ঐতিহাসিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে কোন কিস্তিধর্ম বিধাসী তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও ইহা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বেদের নিজ মতগুলিই উহার নিত্যতাবাদের সম্পূর্ণ বিবোধ। ঐ নিত্যতাবাদ বেক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অস্বাভাবিক অজ্ঞান করা বাইতে পারে পৌরহিত্য-প্রবল সময়ে, অর্থাৎ পুরোহিতগণ যে সময় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সকল বিষয়েই স্বকপোল-কমিত দুষ্-পরামর্শ-সম্বলিত কার্য্যকারণ ভাবের বিন্যাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই সময়েই, এই নিত্যতাবাদ আবির্ভূত হইয়া থাকিবেক।

আমরা সচরাচর এইরূপ অনেক মত্রে দেখিতে পাই তাহাতে প্রবিশণ আপনাদিগকে পনানাক্তিত মত্রে বর্ষক মাত্র বলিয়া জ্ঞাত হন নাই, কিন্তু উহাদের নির্দ্বাভা, উৎপাদিত্ব বা রচিত্বা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একটি মত্রে আর লেখা আছে যে “বহুবিধগণ দেবতাদিগের সন্তোষ সাধনার্থ এই মত্রে রচনা করিয়াছিলেন।” আর একটি মত্রে লেখা আছে—“হে ইন্দ্র, পৌতমেয়া তোমার নিমিত্ত এষ্ট পবিত্র স্তব নির্ধান করিয়াছেন। হৃতধার বেক্রম রথ নির্ধান করে, তাঁহারা সেইরূপ ধন প্রাপ্তির আশয়ে তোমার নিমিত্ত এষ্ট স্তব নির্ধান করিয়াছেন, এবং মনুষ্যেরা যেমন পথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ গৃহসম্বলগণ পটিলাতার্ব এই মত্রে প্রস্তুত করিয়াছেন। ভেদে সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের মত্রে সকল গৃহসম্বল নামক প্রবিশণ কর্তৃক বিবচিত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৃতীয় মণ্ডলের মত্রে গুলি বিধামিত্র কর্তৃক, চতুর্থ মণ্ডলের বাসুদেব কর্তৃক, পঞ্চম মণ্ডলের অত্রি কর্তৃক, ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বজ কর্তৃক, সপ্তমের বশিষ্ঠ কর্তৃক, অষ্টমের কণ্ব কর্তৃক, এবং নবমের অশ্বিনস

কর্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । প্রথম ও দ্বিতীয় মণ্ডলের বচনিতার ইয়ত্তা মাই ।

মুদ্র সংগ্রহ মলেন, ওয়েলশের অন্যান্য মন্ত্রেও একরূপ বাক্য আছে বাহা সমকালীন এবং পূর্বকালবর্তী কবিদিগের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া তেজ নির্দেশ করিতেছে, অথবা কোন কোন মন্ত্রে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর কবির মধ্যে একতরের আক্ষেপ করিতেছে । এইরূপ পূর্বাঙ্গবর্তিতাই বেধে ঐতিহাসিক উপাদানের অন্তর সামগ্রী হইয়াছে । যদি এইরূপ পূর্বাঙ্গবর্তিতা কেবল কবিদিগের সম্বন্ধেই থাকিত, তাহা হইলে না হয় কোনরূপে পূর্বনির্দিষ্ট সূক্তি অল্পসংখ্যে প্রাক্কবদিগের মত অবলম্বন করিয়া বেদের নিত্যতা স্বীকার করিতাম । কিন্তু যখন বর্ণিত ঘটনা সকলেও ঐরূপ পূর্বাঙ্গবর্তিতার লক্ষিত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কোনরূপেই এককালীন বা অতিথি বলিয়া গণনা করা বাইতে পারে না । অতএব অন্যো বেক্সপ বিবেচনা করুক না কেন, আমার মতে এই এক হাজার আটাইনটি সূক্ত বাহা বর্তমান ওয়েদ সংহিতার পরিমাণ, উহার কখনই এক সময়ের সংগৃহীত হয় নাই । উহাদের সম্পূর্ণরূপ সংগ্রহের নিমিত্ত অনেক যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে । যতদিন অবধি ঐ সকল সূক্ত রচনার সময় ঠিক ঠিক নিরূপণ করিতে না পারা বাইবে, ততদিন অবধি প্রাচীন ভারতের দান্য ও সামাজিক জীবনের উন্নতির বিষয় ভাল করিয়া বুঝা যায়নি না । কিন্তু ঐ সকল সূক্ত রচনার সময় এখনও অবধি যোরাঙ্ককারে নিগূঢ় রহিয়াছে, কখন যে উহার প্রকাশ হইবে এরূপ আশারও কোন কারণ দেখা যায় না ।

যদিও মন্ত্র সমূহে ঘটনা, সামাজিক ও পারিবারিক অঙ্কুরান বিশেষের উল্লেখ, বর্ষ-ভাবের বৈশিষ্ট্য এবং বর্ষ ক্রিয়ার পদ্ধতি অবলোকন করিলে কতকগুলি মন্ত্রের মধ্যে পরস্পরের সামাজিক সম্বন্ধ (পূর্বাঙ্গবর্তিতা) লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের উপর নির্ভর করিয়া একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা বাইতে পারে না । বেঙ্গেল, উহাদের অভিপ্রায় মানা জনে নানা রকমে প্রকাশ করিয়া থাকেন । তবে যদি কোন মন্ত্রের এক জন কবি দ্বারা পূর্ববর্তী অপর এক জন মন্ত্রকৃত কবির উল্লেখ করিয়া থাকেন, অথবা আপনায় পূর্ববর্তী কবির অংশে বর্ণিত ঘটনা-বিশেষের উল্লেখ

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সকল মন্ত্র দ্বারা তদুত্তরের ত্রিমকালভার নিঃসন্দেহরূপে গির করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্র যে ত্রিম কালে রচিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আর কোন রকম 'কিছ' থাকে না; তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই তাহাদিগের পূর্ণাঙ্গপরিচিন্তা অনুমিত হয়। কিন্তু এরূপ মন্ত্র অতি বিবল, নাই বলিলেই হয়। কাজেই মন্ত্র সকলের পূর্ণাঙ্গ-বিস্তৃতি নির্ণয়ের প্রকৃত ভাণ সেই সেই মন্ত্রের ভাষার অবস্থার উপর ন্যস্ত হইতেছে। পরবর্ত্তি বেদ-বিভাগাদি পরিবর্ত্তন বেদের অনেক বিষয়ে গোলমাল উপস্থিত করিলেও ভাষার উপর একটি রেখাও টানিতে পারে নাই। ভাষা-জ্ঞানের শেখর তাহাদের হস্তস্পর্শ হইতে অনেক দূরে উঠিয়াছে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত ভাষান্যত্ব এখনও এরূপ পরিস্কৃত হয় নাই যে সেই শুভসংচ্ছন্ন বৈদিক সময় নির্ণয়ের পথকে আলোকিত করে আমরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে যে, বৈদিক কথার অর্থ ও ইতিবৃত্ত পাঠিয়াছি তাহা ঠিক কি না, ইহাই লইয়া এক্ষণে মহা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের বেদের মধ্যে প্রবেশ করিবার একমাত্র উপায় ভারতবর্ষীয়গণ কর্তৃক প্রদর্শিত পথ; তাহা লইয়াই যখন বিবাদ, তখন বৈদিক সময় নির্ণয়-বিষয়ক প্রশ্নের শীঘ্র মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

অপর দুই খানি বৈদিক সংহিতা সম্পূর্ণরূপে অথবা অধিকাংশ ঋগ্বেদ হইতেই সংগৃহীত হয়। উহাদের মধ্যেও আবার পূর্ণাঙ্গরীত্যাব আছে। সামবেদ যজুর্বেদ হইতে একটু পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ যজুর্বেদের সময় দর্শন শাস্ত্রের অনেকটা অনুসরণগম হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব ঋগ্বেদের শেষে যে কতকগুলি দর্শন মত-প্রকাশক মন্ত্র দৃষ্ট হয়, সেগুলি বোধ হয় যজুর্বেদের সময় সংগৃহীত হইয়া ঋগ্বেদের শেষ ভাগে সংলগ্ন হইয়াছে। সাহন্যচার্য্য যজুর্বেদের ভাষার প্রস্তাবনায় যজুর্বেদকেই সকল বেদের শ্রেষ্ঠ এবং মূলোদ্ভূত বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঋগ্বেদ এবং সামবেদ সংহিতা চিত্ররূপ, যজুর্বেদ সংহিতা তাহার ভিত্তি।

আরও একটা খিচার কর,—যজুর্বেদের দুইটি অংশ আছে, একটি কৃক যজুর্বেদ আর একটি শুক্ল যজুর্বেদ। এই দুই অংশ হইবার পক্ষে একটি এইরূপ ইতিহাস আছে যে প্রথমে একমাত্র কৃক যজুর্বেদই ছিল। বৈশ-

স্মারন নামক কোন কবির শিষ্য বাজবন্দ্য গুরুর নিকট গুরুত্বাব প্রকাশ করায় গুরু তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ব'লিলেন, আমি তোমায় পরিচয় করি-
লাম, তুমি আমার নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা বমন করিয়া দেও,
এই কথা শুনিয়া বাজবন্দ্য তৎক্ষণাৎ সমগ্র যজুর্বেদ বমন করিয়া দিলেন
এবং গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থান চইতে অনাত্র
গমন করিলেন। বাজবন্দ্য বেদ উপদ্রব করিলে কবির অন্যান্য শিষ্যগণ
তিস্তির পক্ষীয় রূপ ধারণ করিয়া সেই উপদ্রব খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাটয়া কেলিলেন।
এই অন্য কৃষ্ণ যজুর্বেদকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে। বোধ হয় উহা
মলের মত বাস্তব হওয়ায় কৃষ্ণ অর্থাৎ মলিন এই বিশেষণ লাভ করিয়া
থাকিবে। বাজবন্দ্য পুনরায় ধোরতর তপস্যাচরণ করিয়া স্বর্ণদেবকে সন্তুষ্ট
করতঃ অপর একটি বেদ লাভ করেন। ঐ বেদ শুক্র যজুর্বেদ নামে
বিখ্যাত হয়। এইগুণ যে ভাবেই রচিত হউক, ইহা দ্বারা ইহা দ্বির হই-
তেছে যে, শুক্র যজুর্বেদ কৃষ্ণ-যজুর্বেদ অপেক্ষা আধুনিক এবং অনেকাংশে
পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত।

[ক্রমশঃ

ঐজয়ীকেশ শাস্ত্রী।

বঙ্কিমচন্দ্র । *

অপভ-সাহিত্যে বাঙ্গালী এ পর্যন্ত স্থান পায় নাই। বাঙ্গালার গুর্ভাগা !
আশার কথা—জাতীয় জীবনের এই ত আশ্রয়। নীলদুর্গণ দুরোপায়
বহুবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, সত্য। তাহা দীনবন্ধুর গুণে নহে,
আমাদের গুর্ভাগা কৃষকদিগের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে। আজ বঙ্কিমের বিব-বৃক্ষ
কপাল-কুণ্ডলা হৃদয় পশ্চিমে আলোচিত হইতেছে। অনন্ত-কালের মহা-
নাটকে বাঙ্গালীর ডাকু পড়িয়াছে।

কিন্তু, সাজ-ঘরে বড়ই গোল বাধিয়াছে। আমাদের হইতেছে যেন সব-ই,
অথচ কিছুই হইতেছে না। দর্শকেরা নাট্যাভিনয়ে প্রহসনাভিনয় দেখিতেছে।

* বঙ্কিমচন্দ্র। ঐ-গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

একজন অনুবাদক জুম্বিকা কাম্বিসাভেন,—৪মেশ১৩ বাঙ্গালার প্রধান উপ-
ন্যাসলেখক!—বাঁহারা ভারত সাহিত্য-বৃদ্ধ ভর করিয়া। বহাবিক বংসর হইতে
মহোপাধ্যায় বেতাবটা, কোম ওজর আপত্তি বিনা ভোগ বখল করিতেছেন,
ইনি সেই লক্ষকল্প-পোটিরই একজন।—বাপু হে! আমরা বাঙ্গালী।
বভাবতঃ 'সংসার'-বিরাগী। প্রতি পদক্ষেপে বিজিত, 'বিজ্ঞতা' নতি।
আমাদের 'জীবন' নাট্য কুজ্জটিকাঙ্কর। হেবার 'প্রত্যাত সঙ্কার' জোরার
তাটা নাই।

আর একজন অনুবাদক নহে, অনুবাদ-কর্তা, অর্থাৎ কমলাকান্তের
আধধান। মানা—পোড়ার আর একজনকে গাড় করাইয়া, বুক্কিরানা
ফলাইয়াছেন।

আজ্জা, ব্রিটনের অনুবাদক বলিয়া গর্ব করিবার ত অনেকগুলি প্রকৃত
জনী আছেন। কারলাইল, মাইকেল রসেট, গোট, জর্জ ইলি-
য়ট, ব্রাউনিং, লর্ড ডার্বি* প্রভৃতি ত এই ব্রিটন-সন্তান। তবে
আমাদের কপালেই নিগ্রহ-ভোগটা কেন? দেখিতে পাই, ক্ষমতাশালীর
হস্তে যুরোপীয় কোন এক ভাষা যুরোপীয় অন্য এক ভাষার প্রায় অক্ষরে
অক্ষরে অনুবাদিত হয়। কিন্তু ভারতীয় ভাষার প্রত্যেক যুরোপীয় অনুবাদক—
উইলসনই হউন, আর মোকম্মলারই হউন—প্রায় এক একটা গল্প সাজিয়া
বসিয়া আছেন। অন্যদিকে, ভারতীয় ভাষার ভারতীয় অনুবাদক, তা বাঁহারা
কেন অনুবাদ পড়ি না,—বহুতলাই পড়ি। আর সাংখ্য-দর্শনই পড়ি, বুকিতে
পারি।

এজন হয় কেন? কথটা এই,—সমস্ত যুরোপ এক জাঁচে গঠিত। সমাজ,
রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম অর্থর্ম, মূলতঃ এক। আমরা মূলতঃ আর
এক। আমাদের সমাজ, রীতি নীতি, ধর্ম অর্থর্ম ভিন্ন দুখে; আমাদের রোখ
কোঁকু ভিন্ন দুখে। এক কণার আমাদের দাত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর উপর
যুরোপীয়েরা প্রথম হইতেই আমাদেরকে শিখিতে না আদিয়া, যেন শিখাইতে
আসেন। না উঠিরাই কাঁকি পাড়িতে ব্যস্ত।

* As translators of Wilhelm Meister, Dante, Aristotle, Life of Jesus, Tragedy of Agamemnon and Iliad, respectively.

অনেক দিন বুকা গিয়াছে, এ সব আপনি মোড়লে আমাদের গাঁয়ের তত ভীত হইবার কারণ নাই। তাঁহাদের জন্য—আমাদের বক্তাদের মূখবন্ধ-বন্ধন। হিমালয় হইতে কুমারিকা, দিছু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত—গালভরা লম্বা চৌড়া, বখেট স্থান পড়িয়া আছে। তাঁহারাও জানেন, তাঁহাদের কারবার খুব ক্যালাও।

তার পর দ্বিতীয় গোলযোগ, আমাদের একচালা-অধিবাসীদিগের। তাঁহাদের ব্যস্তবাপীলতার বড় মাথা ঠোকাঠুকি হইতেছে। সাংঘাতিক আবার লাগিতেছে। বিদ্যাকৃষণ মহাশয় ও ‘উকৃৎতের’ চোটে লড়াই কতে করিতেছেন। বহু বাবু ঘরের কোণ হইতে চেমিসনের ধূলা কাড়িয়া ‘মল্লরী’ দাঁড় করাইয়া চিত্তাশীলতার পরিচয় দিতেছেন। আবার গিরিজা-এসম বাবু আজ জীবিত বন্ধিমচন্দ্রকে Surgery করিতে বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমেই, ছুরী না বসাইয়া, লগা চালাইয়াছেন।—হা বন্ধিম!

উপস্থিত পুস্তকখানি বন্ধিমের সমালোচনা নহে। গ্রন্থকার বলেন,—“বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা যাত্রা।” উপন্যাসের ব্যাখ্যাটা কি ভিনিষ, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না। অ্যামিতির প্রথম সাতটা সংস্কার মতন, শুদ্ধ অনুভব করিতে হইবে, নহিলে চলে না,—এমন কি একটা কিছু? এই ত জানি, নাটক এবং ব্যাখ্যার সংযোগেই উপন্যাস।

এর উপর আবার বিশ্লেষণ! বন্ধিম বাবু তাঁহার কাব্যে এমন কি কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহার একটা বিশ্লেষণ এতদিন প্রকাশিত না হওয়ায় সমস্তটা গোল ঠেকিতেছিল? কোন কোন স্থানে এমন কিছু আছে সত্য,—যাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক মনে হয়—অবগতনামের বটে। বুদ্ধিমান পাঠক মাতেই জানেন, বন্ধিম বাবু আরো ভাল জানেন, স্বপ্ন আবরণের দ্বারা ই সে স্থান তিনির পূর্ণ মৌল্য, প্রকৃত কবিত্ব হুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটু যাত্র রঙ নাড়িলে, বা চড়াইলে, উহার সে মাদুরী ভাঙ্গিয়া যাইবে, লঙ্ঘ্যার সে ঔদাস্য ঘুটিয়া যাইবে। কবিত্বে বিশ্লেষণ হয় না। স্পর্শ করিলেই লুতা-ভক্ত ছিঁড়িয়া যায়।

সমালোচক মলাটে হেমচন্দ্র হইতে তুলিয়া দিয়াছেন, “তোমারি ভাবেতে বেধিব তোমার।” ছুমিকায়ও এই ভাব। লেখকের ভাব-বিকারাবস্থার লেখা

প্রায়ই সর্বাঙ্গমূলক হয় না। একটা না একটা বিশেষ দোষ থাকিয়া যায়। হয় art-এর অভাব হয়, নয় লেখা mystic হইয়া পড়ে। কিন্তু, লেখক ভাবকে তাঁহার সমুদ্রে ফেলিয়া, তাহার চারিদিক দেখিয়া লিখিলে, তাঁহার যতটুকু কমতা থাকুক, প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, লেখক ভাবের অধীন না হইয়া, ভাবকে জয় করিয়া লিখিবেন। লিখনবহু্য লেখকে ও ভাবে যেন একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে। যখন আপনার ভাবে এবং আপনাতে একটা স্বাতন্ত্র্য রাধিতে হয়, তখন আপনাতে এবং পরে, কবির সাহিত্য সমালোচকের কতটা স্বাতন্ত্র্য রাখার প্রয়োজন! সমুদ্র বর্ণনা করিতে হইলে, আগে আপনার একটা দাঁড়াইবার স্থান চাই ই। বঙ্গিম-সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়া পাঠকের কাজ, বঙ্গিম-সমুদ্র বর্ণনা করা বঙ্গিমের সমালোচকের কাণ।

“সমকালীন এণ-ভক্ত লোকের দ্বারা সমকালীন গুণীর সমালোচনা হইতে পারে।” গুণীর হইয়াই থাকে; সমকালীন অদ্বিতীয় লোকের হয় না। বিজ্ঞানে বাহ্য চির-সত্য, সাহিত্যের ইতিহাসেও কি তাহা চির-সত্য নয়? চন্দের পার্শ্বে হারকা নিম্নত, বড় প্রতিভার পার্শ্বে ক্ষুদ্র প্রতিভা নিম্নেষিত। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গিমের সমালোচনা করিবে কে? উপস্থিত বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গিমের সাহিত্য। বঙ্গিমেরই প্রতিভাশ্রোতে উরুজারিত। এ বিষয় দুর্গোতে ভয়-চঞ্চল হন নাই—এ কুসু-ধ্বনিতে বিকলজ্বর হন নাই—উপস্থিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কে মহাপুরুষ আছেন?

সমালোচন ধানি “ঐযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এবং ঐযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।” ভালই। কিন্তু, সত্যের অহ-রাধে বলিতে হইতেছে, সাহায্য করা “প্রজ্ঞাপন মহাশয়দ্বয়ের” কমতা-ভীত। তাঁহারা বঙ্গিমের জ্ঞান বা পারিপার্শ্বিক (Satelite) বঙ্গিমের কিরণে আন্দোলিত, ওঠঃপ্রোত। ভবিষ্যতে বঙ্গিমের আলোকে সকলেই লীন হইয়া বাইবেন! বঙ্গিমের পরে আর কেহ অলিবেন না। একা বঙ্গিম এ গুণের।

বঙ্গিমের সমালোচনা করা সহজ নহে। বঙ্গিমের প্রকৃত সমালোচনা বিশেষ সময় ও প্রকৃত কমনী মাপেক। বঙ্গিমের সমালোচনা কুরিতে হইলে আর এক বঙ্গিম চাই। চাই—একজন লেখিত, বাহার প্রতিভা

বা জীবনই সমালোচনা। চাই গেইটের মতন অন্ধ ভক্তির অধীন নহেন এমন একজন artist ; অথবা একজন যেরূপ আৰ্জুনের মতন দোষ-ওণ-বিচার কম এবং সুইনবার্ণের মতন ভাবোৎক কবি-সমালোচক ।

তবে, যদি “উপন্যাস সুন্নিবার কমতা স্তবেও উপন্যাস সুন্নিবার উঠিতে পারেন না,” এমন কেহ দৃষ্টি-অগ্নি উপন্যাস-পাঠক থাকেন, তাহারাই এই “বন্ধিমচন্দ্র”-চলয়া বিয়া ঘেন বন্ধিমের উপন্যাস পাঠ করেন,—সমালোচকের সহিত আসিও এ অমুযোগী করি ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ।

বনের ছায়া ।

কোথারে তরুর ছায়া,
বনের শ্যামল মেহ !
ডট-ডট কোলে কোলে
সারাদিন কল রোলে
ভ্রোডঙ্গিনী যায় চোলে
হৃদয়ে সাধের গেহ ;
কোথারে তরুর ছায়া
বনের শ্যামল মেহ !

কোথারে সুনীল বিশেষ
বনান্ত রয়েছে মিলে,
অনন্তের অনিমেষে
সন্নন নিম্নে-হারা !
দূর হতে বায় এসে
চলে যায় দূর-দেশে,
গীত গান যায় তেসে
কোন্ দেশে যায় তারা !

হাসি, দানি, পরিহাস,
 নিমল হৃদয়ের হাস,
 মেলা-মেলা বারো হাস
 মদীর স্যামল তীরে ;
 কেহ খেলে, কেহ দোলে,
 সুমার ছায়ার কোলে,
 বেলা শুধু যায় চোলে
 কুল কুল নদী নীরে ।

বহুল কুড়োর কেহ
 কেহ গাঁথে মালাধানি ;
 ভাষাতে ছায়ার প্রায়
 বসে বসে গান গায়,
 করিতেছে কে কোপায়
 চুপি চুপি কানাকানি !

খুলে গেছে চুলগুলি,
 বাধিরে গিরেছে তুলি,
 আঙ্গুলে ধরেছে তুলি
 অঁাধি পাছে ঢেকে যায়,
 কাকন ধসিয়া গেছে
 ধুঁকিতে গাছের ডায় !

বনের মর্ষের মাকে
 বিছনে বাশরী মাকে,
 তারি হুরে মাকে মাকে
 দুম্বু দুটি গান গায় ।

কুক কুক কত পাতা
 গাহিছে বনের পাখি,
 কত না মনের কথা

তারি মাথে মিশে যায় !

লতা পাতা কত মত্ত
 খেলে কাঁপে কত মত্ত,
 ছোট ছোট আলোছারা
 ঝিকিঝিকি বন ছেয়ে,
 তারি সাথে তারি মত্ত
 খেলে কত ছেলে মেয়ে !
 কোথায় সে ওন ওন
 কর কর মরমর,
 কোথা সে মাথার পয়ে,
 লতাপাতা ধরধর ।
 কোথায় সে ছারা আলো,
 ছেলে মেয়ে, খোলাখুলি,
 কোথা সে ফুলের মাঝে
 এলোচুলে হাসি গুলি !
 কোথারে সরল প্রাণ,
 পতীর আনন্দ গান,
 আলস্য শান্তির মাঝে
 কালের সাধের স্নেহ,
 ভরষা নীতল ছারা
 বনের শ্যামল রেখ ।

শ্রীমদীশ্বরনাথ ঠাকুর ।

হেমচন্দ্র ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

আনন্দপ্রাণে রামতনু চক্রবর্তীর এক দিন বড়ই মায় ডাক ছিল । যেমন
 রূপ, তেমনি গুণ । প্রবক্ত-বন্ধঃশোভিত হৃৎক-নিশিই উন্নত শরীর ; নিরু

মনোহর কাঠি ; সুকুমার গঠন ; এসময় পরিষ্কার চক্ষু ; সদা-প্রসন্ন হাসি হাসি মুখ ; দেখিলেই আপনা আপনি মনে উজ্জ্বল উদয় হইত । কি কথা ! অমৃত-পুরিত, বালরুচ সকলেই তাহাতে মুগ্ধ । ছোট বড় সবাই প্রতি সমান বয়স । সে দৃশ্যের সগাঠ বশীভূত । হৃদয়ে হৃদয়ে, সম্পদে বিপদে সকলে চক্রবর্তী মহাশয় ত্রিঘ্ন অম্মা লোক জানিত না । রোগে ব্যবস্থা দিতে চক্রবর্তী মহাশয়, বিপদে সাহসে দিতে চক্রবর্তী মহাশয়, দ্বারে পরামর্শ দিতে চক্রবর্তী মহাশয় । চক্রবর্তী মহাশয়ও তাহাতেই মহা আনন্দ পোষ করিতেন । যে দিন তিনি কোনরূপে কাহারও একটু উপকার করিতে পারিতেন, সে দিন তাঁহার আত্মার সীমা থাকিত না । লোকের কষ্ট দেখিলে তাঁহার চক্ষে জল আসিত, বতরুণ না তাহার কঠোর মৌচন করিতে পারিতেন, ততক্ষণ আহার নিভ্রা করিতে পারিতেন না । কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে যেমন মন দিয়াছিলেন তেমন ধন পেন নাই । বিধাতার এ অন্ধ-পক্ষপাতিতা সকল কালে সকল স্থলেই আছে । তা, ইহাতেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিকার ছিল না । লোকের উপকার করিয়া বিনামূল্যে থাকতাত খাইয়াই মত্তষ্ট । সামান্য অমি-জোয়াত ছিল, তাহাতেই একরূপ চণিয়া বাইত । কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ প্রকার লোক এ পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিতে পারে না । অকস্মাৎ চক্রবর্তী মহাশয়ের এক দিন অর হইল । দেখিতে দেখিতে অর বাড়িল ; বিকার ধরিল । আমের স্ত্রী পুত্ৰস সকলে দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল । অনেকে আহার নিভ্রা ভুলিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল । কিন্তু রোগের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে আরম্ভ হইল, সকলে মনে মনে হায় হায় করিতে লাগিল । আট দিনের দিন চক্রবর্তী মহাশয়ের পূর্ণ প্রাপ্তি হইল । আমমর ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল । চক্রবর্তীর দুটি পুত্র হইয়াছিল, সে দুটাই মার নাই । সে দুঃখের কথা কি বলিব ? যে পোলাপ দুটি এক বৃত্তে এত শোভা ধরিয়া উঠিয়াছিল, তারা দুটিতে পাইল না । মুকুলেই শুক হইয়া পড়িয়া পড়িয়া গেল । কি জানি, বর্ণে কি মাধুরীর অভাব হইয়াছিল, তাহাদের শৈশবেই বিধাতা তাহাদ্বন্দ্বকে হরণ করিয়াছিলেন । থাকিবার মধ্যে একমাত্র দুই বৎসরের কন্যা । সেই কন্যা লইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণী বিধবা হইলেন ।

কন্যার নামারা কিছু পোড়াল গৃহস্থ । অগ্নিনিপতির মৃত্যু সংঘ

ভনিবামাত্র ভগিনীকে লইতে আনিল। বধারোতি শ্রাদ্ধাদির পর বিধবা পিত্রালয়ে বাইবার উপযোগ করিতে লাগিলেন। গ্রামের আশাল বৃদ্ধ সকলে ভাড়িয়া আসিল। বলিল—“সে কি মা, তুমি আমাদের কেলিয়া কোথায় বাইবে? চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ী শূন্য পড়িয়া থাকিবে আমরা তাহা দেখিতে পারিব না। তবে একান্ত বাও যদি, বলিয়া যাও, আবার শীঘ্রই আসিবে। আমরা সকলে থাকিতে তোমার কিসের অভাব মা?” বিধবা সকলকে বুকাইয়া তাহার সঙ্গে গমন করিলেন। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। দুই মাস না বাইতেই আবার আনন্দগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মেয়েটী ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কি সুন্দর রূপ! কি মধুর স্বভাব! কি মিষ্ট কথা! যে দেখিত সেই আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না। সকলেই তাহার মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে ভাল বাসিত। ছেলের ছেলের খেলা করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে। কিন্তু কেহ কখন সে বালিকাকে কাহারও সহিত বিবাদ করিতে দেখে নাই; কেহ কখন তাহার মুখে একটিও উচ্চ কথা শুনে নাই। মুখ ধানি সদাই-প্রফুল্ল, সদাই হাসি হাসি। ঠোঁট দুখানিতে ঘেন হাসি মাখান রহিয়াছে। সেই হাসি মুখে বালিকা কত কথা কহিত, কত গল্প করিত, কত শ্লোক বলিত; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া লোকে তাহা শুনিত, আর সেই ঠোঁট দুখানি কিরূপ ভাবে নাড়িত, কিরূপ ভাবে স্নেহ হান্যো বালিকার সেই কৃন্দনিষিদ্ধ দস্তগুলি সেই ঠোঁটের তিতর নিয়া দেখা বাইত, কিরূপে মুখের উপর যে ছোট ছোট কৌকড়া কৌকড়া চুলগুলি উড়িয়া পড়িত বালিকা তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুখানি দিয়া সরাইয়া দিত, সেই সমস্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকলে একমনে দেখিত। মাতার কাছে গিয়া সকলে মেয়ের সুখ্যাতি করিত। মাতা কত্নাকে বকে লইয়া তাহার মুখ চূষন করিতেন। ধীরে ধীরে চকোর অগভাগে একদিনু অক্ষ গড়াইয়া পড়িত।

‘বৎসর যায়, না জল যায়।’ দেখিতে দেখিতে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া পেল। দেখিতে দেখিতে বহুমতী একাদশ বৎসরে পড়িল। তখনও যে বালিকা সেই বালিকা। সেই স্বভাব—সেই হাসি—সেই কথা! বহুসে আরও রূপ বাড়িয়া উঠিল। যে কমল হৃদিত থাকিয়া এতক্ষণ সরোবরের

শোভা বর্ধন করিতেছিল, তাহা যেন নবীন সূর্য্যাগে বিকাশোন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রদেশ আলোকিত করিল। সে সূর্য্যার গঠনে সৌর্য্যার্থ্য উভয় উঠিল। চিত্রকর যে প্রতিমা চিত্রিত করিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর যেন 'বাম তেল' মাখাইয়া দিল। একে সোনার চাপার রঙ, তাহা সেই ঢল ঢল মুখ থানির চারিপার্শ্বে নিবিড়রূপে কৃকিত অলকাশ্রেণী সর্কিয়া বেড়িয়া থাকিত—সে মুখমণ্ডল কি অনির্বচনীয় সূর্য্যার, কি মধুর, কি ঔপার্ধ্য-বিশিষ্ট! সেই সৌর্য্যার্থ্য, বালিকা বছরের সেই ঔপার্ধ্য, মূগে, চোখে, দেহে, প্রতি অবরনে প্রতিকলিত। সে হাসি, সে চাহনি, সে কথা, সে চলন—সকলই স্বন্দর, মধুর, কমনীয়, মজ্জামোহন;—শারদপূর্ণিমার স্নিগ্ধ চন্দ্রকর সদৃশ! বসন্তসমীরসঞ্চালিত নন্দহুমিত ব্রততীর মন্ডালোলন তুল্য। দেখিলে, দর্শন-নুভুত্যা আরও বহুত হয়, দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি চিত্ত অকুণ্ট হইয়া পড়ে, আপনা কুলিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা যায়। অসীম রূপরানি লইয়া বালিকা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে রূপের ন্যায় তপেরও ইচ্ছা নাই। বালিকা এখন ডাগর হইয়াছে, এখন আর তেগন খেলা করে না, পুতুলের বিহে দেয় না, বিড়াল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করে না। বালিকা এখন ভোর না হইতেই বিছানা হইতে উঠে; উঠিয়া বাগা পারে সে সংসারের কাজে মায়ের সাহায্য করে। মা আর কি, সংসারের কাজই বা কত? কিন্তু লোক না থাকিলেও সময়ে সময়ে তাহাদের সংসারে কাজ পড়িত। মাতার বার ব্রত ছিল। অতিথি কুটুম্ব ছিল, পালপার্কণ ছিল। ভাড়া, গ্রামের বাহার রোগ চাইত, বাহার ক্ষতি হইত, অথবা অনেক কেল মাতার হাতে পাইতে ভাল বাসিত বসিয়া, তাহার বাড়ী খাণ্ড সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া প্রসাদ পাইবার কথা বলিয়া পাঠাইত; মাতা অতি যত্নে রন্ধনাদি করিয়া বসিয়া থাকিতা ভোজন করাইতেন। সে সকল কাজে বালিকা যথাসাধ্য মাতার সহায়তা করিত। মাতা প্রাণান্তেও বড় কাজ মেয়েকে করিতে দিতেন না।

বাড়ীর পাশে তাহাদের একখানি বাগান ছিল। বহুমতী তাহাতে কত গাছ পুতিয়াছিল। দুই, মরিচা, গোলাপ, টপর, করবী—কত ফুল গাছ, ফুল হুটিয়া বাগান আলো করিয়া থাকিত। নুতন গাছে ফুল ধরিলে বালিকার

আফ্রাণের সীমা থাকিত না। তাহার পাশে পাশে কোথাও রাঙাশাকের কাড়, কোথাও লাউশাকের মাচা। কোথাও বেগুন গাছে বেগুন ফুলেউছে। বালিকা প্রত্যহ সেই সকল গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিত, বৈকালে স্বহস্তে জল সিকন করিত। বালিকা প্রত্যহ সকালে সাজি তরিয়া ফুল তুলিত, চূণড়ি তরিয়া শাক তরকারি তুলিত। অত্যাশ্চর্য্য যেন যে সময়ে যে ফল হইত তাহাও তুলিয়া লইত। সেই সকল সামগ্রী লষ্টয়া বালিকা প্রত্যহ পাড়ায় পাড়ায় ঘাইত। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যদিগকে পূজা করিবার জন্য ফুল দিয়া আসিত; বাহারা গরিব তাহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া সেট তরকারি ও ফল দিয়া আসিত। আমি কি কাঁঠাল পাকিলে, পাড়ায় ভেলেদিগকে ডাকিয়া আনিয়া মাকে তাহা ভাগ করিয়া সকলকে বসিয়া খাওয়াইতে বলিত। সেই বালিকার জন্য সেই গ্রামের গরিব দুঃখী সকলকে কখন শাক তরকারি কি ফল মূল কিনিয়া খাইতে হইত না।

কাহারও বাড়ী সময়ে সময়ে কর্ণের লোক না থাকিলে বালিকা গিয়া তাহার কাজগুলি করিয়া দিয়া আসিত। মানা করিলে শুণিত না। শুল্ক কলমটী লইয়া হুড় হুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইত, অনেক পরেই জল আনিয়া সেখানকার কলসী সেখানে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইত।

কাহারও অস্থখ করিলে বহুমতীর আর আহাৰ নিদ্রা হইত না। সমস্ত দিন তাহার শিরের কাছে বসিয়া তাহার স্ত্রাব্য করিত। কখন গারে হাতে তুলাইত, কখন মাথা টিপিয়া দিত, কখন ঔষধ খাওয়াইত।- যতদিন না সে সারিয়া উঠিত, ততদিন প্রত্যহ অধিক সময় বালিকা তাহার স্ত্রাব্য কাটাইত। রোগীও মাথার কাছে সেই বালিকার চিন্তামালা বধ ধানি দেখিয়া অর্ধেক রোগ-বস্ত্রবা তুলিয়া যাইত।

গ্রামের কাহারও বিপদের কথা শুনিলে বালিকা আকুল হইয়া পড়িত। তাহার সেই ক্ষুদ্র জন্মস্থানি ভাবনার ভাবিয়া যাইত। শুইয়া শুইয়া মাথের সঙ্গে সেই কথা বলাবলি করিত, বলিতে বলিতে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িত। স্বপ্নে সেই কথা ভাবিয়া ঘুমন্ত বালিকা কখন বা আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিত। প্রত্যহে হুটী চক্কোকেণে অক্ষরকার হুটী শুক রেখা দেখা যাইত।

বাড়ীর কাছেই গঙ্গা। বালিকা নিত্য সেই গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত।

আনের ঘাটের উপরেই গঙ্গাবাসীদিগের একটা ঘর। প্রধানঘাট তাহার নিকটেই ছিল। মাঝে মাঝে সেই ঘরে দুমুহুরে গঙ্গাবাসীরা কঠোর অনেক দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া থাকিত। বালিকা প্রভাৎ আনের পক্ষে সেই গঙ্গাবাসীদিগের নিকটে যাইত; দুমুহুর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিত। কিছু খাইতে চাহিলে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। সন্ধ্যায় দুমুহুরে লইয়া বিব্রত থাকিত, বালিকা চালা খুঁটনা, কুটুনা কুটিয়া, উনান ধরাইয়া, তাহাদের পাকশাকের গোপাড়া করিয়া দিত। যে দিন দুমুহুর অবস্থা বড় মন্দ দেখিত, সে দিন প্রায় সমস্ত দিন তাহাদের কাছে বসিয়া থাকিত। তাহারা বালিকার এই আন্তর্য্য ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইত; দেশে গিয়া সন্ধ্যার নিকটে সেই বালিকার লোকাভীত ভণের কথা পরিচয় দিত। সেই ভণের সঙ্গে তাহার সেই অনিশ্চিতগৌর প্রিয়ভ্রাতৃপুত্রের অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া অনেকে তাহাকে সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী বলিয়া মনে মনে ভাবিত। দেবতা ভিন্ন এত রূপ এত শব্দ কি মানুষের কখন থাকে? সেই বিশেষে প্রধানভ্রাতৃ সেই বালিকাকে দেখিখামাত্র সকলের হৃদয়ে ভরসার উদয় হইত। যে কোন গঙ্গাবাসী সে ঘাটে আসিত, সে কখন সে বালিকার কথা ভুলিতে পারিত না।

বেলা ৫টা বাজিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিমে একেবারে হেলিয়া পড়িয়াছে। অপরাহ্ন-সূর্য্যের দর্প-কিরণ বৃক্ষের মাথার মাথার, পাতার পাতার জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিতেছে। শীতে হরিবর্ণ ক্ষেত্রের উপর কোথাও নীতল ছায়া, কোথাও দ্রব রোদ্র, কোথাও একটু বেশি ঝিকিমিকি, কোথাও বা প্রথম সূর্য্যোদয়। দেখিতে দেখিতে রোদ্র ক্রমেই পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে; দেখানে আগে বেশী রোদ্র ছিল। সেখানে কম রোদ্র, ক্রমে পূর্ণ ছায়া। আর এক ঘণ্টা পরে সমস্ত স্থানে ছায়া পড়িয়া আসিল। একটা কলসে জল লইয়া বহুসতী ধীরে ধীরে তাহার বাগানে আসিল। ধীরে ধীরে গাছে গাছে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। গাছ শাখা ঝোলাইয়া পাতা নাড়িয়া সে বালিকার কাছে কতই রুতরুতা দেখাইতে লাগিল। কলসের জল ফুরাইয়া গেল, বালিকা আবার জল ভুলিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে ঢালিতে লাগিল। আবার জল ফুরাইল, আবার আসিল। সে জল ভুলিতে, জল ঢালিতে কষ্ট নাই।

হাস্যব্যথা নাই, শ্রমবোধ নাই । মা এত বলিডেন, লোকে এত বারন করিত, বালিকা শুনিত না ; যতক্ষণ না তাহার সেই গাছ ওলিতে জল দিতে পারিত, ততক্ষণ তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিত, কিছুতেই স্বস্তি পাইত না । মাতা পিত্রাণয়ে ঘাইতে চাহিলে, বালিকা তাহার গাছ ওলির মায়ায়— কার প্রতিই বা তাহার মায়া না ছিল ?—ঘাইতে চাহিত না । দেখিতে দেখিতে হৃদয় ডুবিয়া আসিল । বালিকা তখনও গাছ ওলিতে জল দিতেছে । নাপিতদের মঙ্গলা গা ধুইয়া সেইখান দিয়া ঘাইতেছিল, ডাকিল—“বহু !”

বালিকা বলিল “কে, মঙ্গলা ?”

ম। হাঁ, এখনও বাগানে ! গা ধুইবে না ?

ব। এই আর গোটাকত গাছ আছে, তা হলেই যাব । তুমি কি গিয়াছিলে ?

ম। হাঁ, আমি গা ধুইয়া আসিতেছি ।

ব। বাটে সেই বুড়ীকে দেখিয়া আসিয়াছিলে ? কেমন আছে, তাই ? আহা মার অহুধ বলে আজ আর একবার বৈ ঘাইতে পারি নাই ।

ম। সে সেই হুপুরেই বুড়ীর শেষ হইয়া গিয়াছে । তাহার সব চলিয়া গিয়াছে ।

ব। অ্যা ! আহা আর একটীবার গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিলাম না । তাহার সেই ছোট ছেলেটি, আহা না জানি কতই কাঁদিয়াছে !

বালিকার চক্ষে দুই বিন্দু জল পড়িল । তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, মঙ্গলা তাহা দেখিতে পাইল না । বলিল—“দেখ, তাই, দেখে এলেম, আর কারা একটা স্ত্রীলোককে সেই বাটে দাঁহ করিতে আসিয়াছে ; তাদের সঙ্গে তত বেশি লোক নাই, তাহারা আছে তাহারাও বোধ হয় আপনার জন নয় ; তাদের মধ্যে একটা—আহা তাহারই বোধ হয় মা মরিয়াছে—চিঁতা জ্বালাইয়া দিয়া তার যে কামা ! অা মরি মরি, দেখে তাই, বুক ধেন ফেটে যেতে লাগল ।”

“স্থির হইয়া বালিকা শুনিল, প্রাণের ভিতর ঘেন কেমন করিতে লাগিল । বলিল—“তা, কেহ সাঙ্গনা করিতেছে না !”

যা কৈ, কাহাকেও তো দেখিলাম না। তারি বোধ হলো, সঙ্গে আপনার জন কেহ নাই।

বালিকা গাছে আর জল বিতে পারিল না; হাত কাঁপিতে লাগিল; মাথা যেন কিসে ঘূরিয়া আসিল; সেই ক্ষুদ্র জনদের অন্তঃস্থল হইতে কি এক হুপ্ হুপ্ শব্দ হইতে লাগিল, হুই চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল।

মহলা বলিল—“তা, সন্ধ্যা হইল, ঘরে যাও; আমি বাড়ি যাই।”

মহলা চলিয়া গেল। যে পাছ কটিতে জল দেওয়া বাকি ছিল, তাহা আজ আর হইল না। সন্ধ্যার সেই প্রথম অন্ধকারে দ্বিতী চক্ষের জল ঘূরিয়া, বালিকা ঘরের ধীরে বাগান হইতে উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। স্তরে স্তরে অন্ধকারের পর অন্ধকার নামিয়া। আকাশ, নক্ষত্র, নীলিমা সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণ প্রতিপদের রাত্রি,—সে অন্ধকার অতি সামান্য, অণুকাল মাত্র স্থায়ী। হৃদয়ের পর সে অন্ধকার কোথায় সরিয়া গেল। আকাশে চাঁদ উঠিল। চাঁদের আলো পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল।

কিছু, দেখে শনি, মানি বটে তোমার রূপের তুলনা নাই, তুমি অনন্ত-হৃদয়ী, কবিতা তোমার রূপে চিরকাল উদ্বৃত্ত; কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া যার তার কাছে ও রূপের বাধরা বুলিও না। বাহার ও রূপ ভাল লাগিবে তাহারই কাছে ও রূপের আদর; নহিলে যে অর্থর-আলস্য আলাতন, কি ততোধিক নিদারুণ অস্থিতেন্দ্রী শোকের আলায় যে অরজর, তাহার কাছে তোমার ও রূপের কিসের আদর? সে একবার তোমার দিকে চাহিয়াও দেখিবে না। তোমার হাসিতে কি এক অনির্বচনীয় উদ্ভাসকর সুখ করে জানি; কিন্তু যাহার পক্ষে সুখ, তাহার পক্ষেই হুধা; অন্যের পক্ষে তাহা বিষ! যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে, যে পেটের আলায় হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ধুকিতেছে, যে আদম্ব বিপদের তীব্র-ছায়া দেখিয়া অস্তরে অন্তরে শীহরিয়া উঠিতেছে, সংসার-বন্ধন জবীন-সর্ব্বদ

নয়ন-পুতলি হারাইয়া যে শিরে করাবাত করিতেছে, তাহার কাছে তোমার ও হাসি বিষ নয় তো কি ? কিন্তু তিঃ তুমি আপন পরবেই মত্ত, তুমি এ সকল বুঝ না, কালকাল পাত্তাপাত্ত তুমি বিবেচনা কর না,—তাই তুমি রাহুর আহার, তাই তোমার জদয়ে কলঙ্কের নিশানা ।

অই যে ভাগীরথীতীরে শ্মশান-বাটের উপর কোন এক হতভাগিনীর চিতা ধীকি ধীকি জলিতেছে,—সে শ্মশানের বৃত্তি কি ভয়ঙ্কর, কি রোমহর্ষণ, কি ভীষণ ঐক্যনাময় ! চারিদিকে যেন কিসের অশ্রু তারাত্ম্যে স্রূপে স্রূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যেন কে আসিয়া দেহের ভিতর হইতে প্রাণ ছিঁড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে ; কিসের জুড়ী,—কিসের হাদা,—কিসের করাল মৃত্যু ! এই সংসার—ঐই পৃথিবী—এই জগৎরক্ষাও সেই এতটুকু জ্বালায় মধ্যে যেন কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে ; ভয়ানক নিস্তরক, ভীষণ গভীর, চারিদিকে রাহু পালা যেন কি এক বিখস্তম্বন ত্রাসে আড়ষ্ট হইয়া নিঃশব্দ শরীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; কচিং চিতার পট্ পট্ শব্দ, কচিং শিখাকুলের অশ্লিষ চীৎকার, কচিং ভাগীরথীর অলোচ্ছাসে চলচ্চলৎ ধ্বনি,—কি সে ? শব্দগুলি সব যেন একত্রে নীবা, একত্র মিলিয়া যেন কোথায় ডাকিতেছে ; কি ভীষণ স্থান !—এই ভয়ানক বিপত্রাস শ্মশানভূমে সেই জলন্ত চিতার কিছু দূরে এক পার্শ্বে বসিয়া অই যে হতভাগা, যে চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য, কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, এ সময়ে, হে সুখাংশো, তাহার সম্মুখে তোমার ঐ নারিকেল-পত্রাঙ্কুরাল মধ্যে লুকাচুরি, ঐ দিগন্তবিস্তারি নীল মেঘের উপর তর তর করিয়া ছুটীছুটি, ঐ ভাগীরথী-বক্ষে মলোদ্ধিত উর্দ্ধিরাশির পটলে পটলে বিস্তারে বিস্তারে ঝিকঝিকি—এ সকল করিও না । তোমার ঐ রূপের বড়াই, হাসির ঠাট, রক্তের তুফান তুলিয়া রাখিয়া, পার যদি, মেঘের উপর হইতে তোমার সকল কিরণ, সকল শব্দ একত্র করিয়া গভীর ভাবে ঐ ব্যথিতের দক্ষপ্রাণে ঢালিয়া দিয়া তাহা শীতল করিতে চেষ্টা কর । কিন্তু হি ! তুমি কলকী, তোমার জদয় নাই, পরের দুঃখ দুঃখ বুঝ না ; এ কথায় হাসিয়া উঠিলে ? চাঁদ হাসিয়া উঠিল । সংসার শীতলরশ্মি জ্বলিত করিয়া নীল আকাশের গায় চাঁদ হাসিয়া লুটাপটি খাইতে লাগিল । এ সংসারে

চাঁদের ন্যায় হৃদয়হীন নোকের সংখ্যাই অধিক। সবাই আপনার মুখে উদ্ভট, বাবিতের প্রতি কেহ মূণ তুলিয়া চাহে না। কিন্তু ঈশ্বর চাঁদের জন্য তাহার হৃদয়ের সার ভাগ তুলিয়া কলহ লেলিয়া দিয়াছেন; পোড়া স্বার্থপর মানুষের জন্য মেরুপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন ?

ধীরে ধীরে ধীরে চিত্তার জলন-কাঁচা শেষ হইয়া আসিল। অগ্নি নিভিয়া আসিতে লাগিল। হতভাগা মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মাতার শেষ চিহ্ন কোথায় ভাঙে মিশাইয়া গেল। সে চিত্তার তন্দ্রা, অস্থির ও অর্ধবুদ্ধ কাঁঠবুওতির কিছুই লক্ষিত হইল না। তবুও একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। মুখে কথা নাই, চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে স্পন্দ নাই। যে চক্ষু এতক্ষণ জলে ভাসিতেছিল তাহা জলশূন্য। দৃষ্টি উদান, তরু, শূন্যময়। জাহ্নবীর উপর আপ্য রাখিয়া পাষণ-মূর্তির ন্যায় বসিয়া আছে; একজন ডাকিল—“হেম !”

বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য, হেমচন্দ্র। মাতার সংস্কার করিতে এই ঘাটে আসিয়াছিলেন। যে ডাকিল, সে রামকৃষ্ণ।

হেম কথা কহিল না। কথা কহিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। শূন্যদৃষ্টে রামকৃষ্ণের প্রতি চাহিল। রামকৃষ্ণ বলিল—“উঠ, জল আনিয়া চিত্তার ঢালিয়া ধাও।”

নির্দাকে হেম উঠিল। এক কলস জল আনিয়া চিত্তার ঢালিয়া দিল। তন্দ্রা মূম উড়াইয়া চিত্তা ভীষণভাবে উচ্চ রবে শো-শো-শব্দ করিয়া উঠিল; জাহ্নবীসদৃশে প্রতিহত হইয়া সে শব্দ সেই নিস্তরু শ্মশানভূমে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। হেম শীহরিয়া উঠিল; তাহার হস্তের কলস কাঁপিতে লাগিল। তখন, তাহার হাত হইতে কলসী লইয়া আর আর সকলে জল ঢালিতে লাগিল; সে শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিভিয়া আসিল। জলে চিত্তা ধুইয়া গেল। হেম মাতার শেষ অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন। তাহার সেই মাতার আর কোন চিহ্নই এ পৃথিবীর অঙ্গে থাকিল না। হেম গঙ্গাজলের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, সে অস্থিটুকু আর দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত মধ্যে ভাগীরথী তাহা উৎক্লিষ্ট তরঙ্গরাশির স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অনেকে নিস্তরুর পর হেম বাষ্পবিকৃত রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—“মা !”

রামকৃষ্ণ হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া গঙ্গায় নামিয়া স্থান করিল। স্থান করিয়া উপরে হেমকে কাটা পরিতে দিল। হেম তাহা পরিল। এতক্ষণে তাহার যেন সংজ্ঞা হইল; আপনার বেশের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণে যেন বুঝিল যথার্থই সে মাতৃহীন হইয়াছে; তাহার সেই আনন্দময়ী করুণার আধার জননীকে আর এ জীবনে দেখিতে পাইবে না, সেই স্নেহপরিপ্লুত আশ্রয়-মাথা ডাক আর শুনিতে পাইবে না, জন্মের মত তাহার ‘মা বলা’ কুরাইয়া গেল; মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের ভিতর কত কপাই উৎসব হইল; মাথা ঘুরিতে লাগিল, হেম বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় ‘মা মা’ শব্দে রোদিন করিতে লাগিল।

আর আর সকলে স্থান করিয়া উপরে উঠিল। হেম তখন একটু শীঘ্র হইয়া রামকৃষ্ণকে বলিল—‘বাও, তুমি ইহাঙ্গিকে লইয়া দোকানে বাও। আহা, আমার অন্য সকলের কতই কষ্ট হইয়াছে; বিনি বাহা ধাইতে চান, সকলকে পরিতোষ করিবা বাওগাওগে। আর আপনিও একটু কিছু বাওগে।’

রামকৃষ্ণ বলিল—‘আমরা যাইব, তুমি যাইবে না?’

হে। না, তোমরা এস, আমি এখানেই আছি।

১রা। একা থাকিবে?

হে। তা হউক, তোমরা এস।

রামকৃষ্ণ অত্যন্ত বুঝিল না। সব বুঝিয়া কাজ করা তাহার অভ্যাস ছিল না। তায় তাহার মৌতাত্ত্বের সময় বহিয়া গিয়াছে, বেশার খোঁক ধরিয়াছে, আহাঃটাও অনেকক্ষণ হয় নাই; বলিল—‘তবে একাই থাকিবে—’

রামকৃষ্ণের কথা শেষ হইতে না হইতে সঙ্গীরা বলিল—‘এক!—ও মা! তত্ত্ব করিবে না?’

হেম বলিল—‘না।’

রামকৃষ্ণ বলিল—‘তবে আর কোথাও যাইও না, আমরা শীঘ্রই আসিতেছি।’

সকলে চলিয়া গেল। হেম একা বসিয়া রহিল। সেই নির্জন নিস্তব্ধ বিভীষিকাময় আতঙ্কপূর্ণ স্থানভূমে একা। সে অগান ঘাটের নিকটবর্তী

হইলেনও সেখানে লোক জন বড় ঘাইত না। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোপ, মাঝে মাঝে বড় অস্বাভাবিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ—কি গভীর—লোকের দিনা দ্বিপ্রহরেও সে প্রদেশে ঘাইতে ভয় পাইত, সেই স্থানে রাত্রিকালে হেম একা! আকাশে তখনও চন্দ্র হাসিতেছে;—চন্দ্রালোক আকাশ হইতে বৃক্ষশিরে, লতাভিতানে, সৌখচূড়ে, সৈকতভূমে, গঙ্গাতরঙ্গে, আর সেই ভীমকাত শ্মশানের কালবক্ষে সর্বত্রই নাচিয়া বেড়াইতেছে। শ্মশানের ভীষণ ছায়া চন্দ্রকরস্পর্শে আরও ভীষণতর দেখাইতেছে। সম্মুখে ভাগীরথী অনন্তনীর-ধওবৎ বিশালবক্ষ বিস্তার করিয়া গভীরভাবে বহিয়া বাইতেছে; সেই ভাগীরথী-বক্ষে সচলতরঙ্গ আকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়া তরঙ্গমালায় তালে তালে নৃত্য করিতেছে। মাঝে মাঝে বিরলবিন্যস্ত ঘনপত্রবিশোভি বিশাল বিটপী চাঁদের আলো মাথায় ধরিয়া ঠাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি হাদ্যময়ী। সে শ্মশানভূমে প্রকৃতির এই হাসি আরও ভীষণ, আরও রোমহর্ষণ। ভয়ের স্থানে অন্ধকাই ভাল, নহিলে সেখানকার প্রত্যেক জিনিষটা যে আলো মাথিয়া চক্ষের উপর কি এক ভাবে চাহিয়া থাকিলে, সে ভয়ানকে আরও ভয়ানক। ভয় পাইলে মানুষ আলোক দেখিতে পারে না, তাড়াতাড়ি আগে চক্ষুৰ্দূর মুদ্রিত করে। সেই জ্যোৎস্না-বর্জিত-ভীতি প্রতিপদ-ভয়-সঞ্চারী শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়া হেমও একা!

মুখে কথা নাই—কোথাও দৃষ্টি নাই। নীরব অবনতমুখে একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন, আর নয়নের অপাঙ্গদ্বয় দ্রাবিত করিয়া দুই গও বহিয়া অশ্রুজল ভাসিয়া বাইতেছে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—মাতার এক একটা কথা মনে পড়িতে-ছিল, আর বাগবের ন্যায় উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে রোদন করিতেছিলেন। সেই মেহ-পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সেই মেহ-পরিপূর্ণ চক্ষু, সেই মেহ-পরিপূর্ণ কার্য—হায় হায়, সকলই বগ্ন হঠাৎ গেল! মরি মরি, সে স্নহের কত সাধই ছিল—হেম মানুষ হইয়া উঠিতেছে, হেমের চাকুরি হইবে, হেমের বিবাহ হইবে, বধু লইয়া কত আত্মলাভ করিবেন, তার পর হেমের ছেলে লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহাকে খেলা দিবেন—সে কত সাধ—তাহার কিছুই পূর্ণ হইল না! চিরকাল দুঃখ পাইলেন, পরের সংসারে মুখ ও জড়িয়া দিন কাটাইলেন,

একখানি কাপড়ের জন্য কতই কর—পর—একবারের বেশি দুইবার বলিতে গাহস হইত না, পরিধানের দ্রব্য জিঁড়িলে ভগ্নে ভাংনার সারা হইতেন ; একটী পরসার জন্য কত লাঞ্ছনা—বাড়িতে খাবারওয়ালী আদিলে, অন্যান্য ছেলেরা কত খাবার কিনিয়া খাইত, তাহার দেখাদেখি হেম কি মনোরমা কিছু গাহিলে তাঁহার দুটী চক্ষু অমনি জলে জাসিয়া খাইত ; হায় হায়, সে সব কথা কি ভুলিবার ? হেম চাকুরি করিবে, হস্ততঃ কত টাকা উপার্জন করিবে, কত কাপড় পরিবে ; কিন্তু সে যা আর একদিনের জন্যও তাহা বেশিতে আশিষেন না, একদিনের জন্যও আর হেম মাতার সে মর্মান্তিক দুঃখ বুচাইতে পারিবে না ! একদিন—হেমচন্দ্রের মনে পড়িল—একদিন মনোরমা একটু দুধ খাইবার জন্য বড়ই বাধনা গেল, মাতা কত নুসাইলেন, কত সাস্থনা করিলেন, মনোরমা কিছুতেই শুনিল না, কাঁদিতে লাগিল, মাও কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন “কেন মা কাঁদাস্ ! যেমন পেটে জন্মেছিলে ভাল খাবে ভাল পরিবে কোথা হইতে ? আমি দুধ কোথায় পাইব. মা ?” বালিকা তাহা বুঝিল না ; নিকটে মহামায়ার মাতা কড়াঘ করিয়া দুধ জাল দিতেছিলেন, তাহা মাতাকে দেখাইয়া দিল । অমনি মহামায়ার মাতা মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—“মা মা মা ! এমন হাঘরে আদেধ্লে মেয়ে বাবার জন্মেও দেখিনি, তা হবে না, ও সব গর্ভের দোষ !” মাতার দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, একটীও কথা না কহিয়া বালিকাকে কোলে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন । আর এক দিন—তখন হেমের বড় ব্যাম, এক মাস হেম বিকারে অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই একমাস মাতার আহ্বার নিমিত্ত ছিল না । সকল ছাড়িয়া কেবল তাহার মুখের কাছে বসিয়াছিলেন । এক মাস ধরিয়া পাকশালায় ঘাইতে পারেন নাই বলিয়া মহামায়া মাঝেমাঝে কটু বলিত, মাতা একটীও কথা বলিতেন না, পাছে হেমের অমরল হয় এজন্য একদিন এক কোঁটা চক্ষের জলও কেলিতেন না, কিসে হেম সারিয়া উঠিবে সেই চিন্তায়ই আকুল,—সেই হেম সারিয়া উঠিল, মাতা পুত্রকে কোলে করিয়া দেবতার নিকটে তাহার কল্যাণে আপনার বুক চিরিয়া রক্ত দিলেন—“হেমের সব প্রত্যক্ষ মনে পড়িতে লাগিল—হায় হায়, সেই মা আজ কোথায় ! তাঁহার গীড়ার সময়ে হেম তাঁহার কিছু করিতে পারিল না

কেন ? হেম আর ভাবিতে পারিল না ; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষু অন্ধকার-ময় হইয়া আসিল ; বাণকের ন্যায় উজ্জ্বল কাঁদিয়া উঠিল—“মা ! ”

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—“আর কাঁদিও না, চুপ কর ।”

হেম স্তম্ভিত হইলেন, কে এ কথা বলিল তাহা নুঙ্কিতে পারিলেন না ; কিন্তু যে এ কথা বলিয়াছিল, সে বোধ হয় নিজেও অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল, স্বর বাষ্পণীড়িত । হেমচন্দ্র মুখ কিরিয়া দেখিলেন । এ কি দেবী ? না, অশ্বানের কোন ভৌতিক মায়া ? চক্ষু পরিকার করিয়া হেম দেখিলেন—মানবী ! সেই চম্পকরমণিত প্রভতির প্রাণাধ মধো বালিকা মূর্তি ! বিম্বিত হইয়া হেমচন্দ্র তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

বিম্বিত হইয়া হেমচন্দ্র তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন । বালিকা বলিল—
“কাঁদিও না, উঠ, জিঃ এখানে কি একা থাকিতে আছে ?”

এতক্ষণে হেম কথা কহিল । বলিল—“কোণায় ঘাব ?”

বা । কেন, আমাদের বাড়ী ।

হে । তুমি কে ?

বা । আমি বহুমতী ; এই কাছেই আমাদের বাড়ী । এস, আমার সঙ্গে এস

হে । তুমি বাড়ী যাও, আমি যাইব না ।

বা । যাইবে না !—যাইবে না তো কি করিবে ?

হে । এখানে থাকিব ।

বা । একা !

হে । একাষ্ট থাকিব ।

বা । আর কাঁদিবে ?

বালিকার কথা শুনিয়া হেম আরও বিম্বিত হইলেন । আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন । বালিকার নিখিল পবিত্র সরল মূর্তি তিম্র

কিছুই লক্ষিত হইল না। কিন্তু বালিকার এ কথাই হেম কি উত্তর দিবে ? উত্তর দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। ধীরে ধীরে ধীরে চক্ষের অগ্রভাগে দুই বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িল। বালিকা তাহা দেখিল ; বলিল,— “ছিঃ আবার কাঁদিতেছ ! তুমি একা থাকিলেই কাঁদিবে। তুমি যদি আমাদের বাড়ী না যাও, আমিও এখান হইতে যাইব না ; তোমাকে একা থাকিতে দিব না।”

হেম আবার সেই বালিকার দিকে চাহিল। প্রতিবারেই সেই মুখমণ্ডলে নূতনতর সৌন্দর্য অধুভূত হইতে লাগিল। সত্যই কি কোন দেববালা ? এ মুখ, এ কথা, স্তম্ভ হৃদয়ে এতখানি ভাব, এ কি পৃথিবীতে সম্ভবে ? আরি মরি, কোন্ বিধাতা এ প্রতিমা গড়িয়াছিল রে ? হেম বলিল—“তুমি বাড়ী যাও, আমি একা নহি ; আমার সঙ্গীরা আছেন।”

বালিকা বলিল, “আমাকে ভুলাইতেছ ! সঙ্গী কেহ থাকিলে এমন আর-গায় এ অবস্থায় কি একা ফেলিয়া যায় ?”

হে। তাহারা যাইতে চাহে নাই, আমিই তাহাদিগকে কোকানে পাঠাইয়া দিয়াছি। আজ তাহাদের আহার হয় নাই।

বা। তাহাদের আজ হয় নাই ; কিন্তু তোমার কয় দিন হয় নাই ?”

হেম নীরবে রহিলেন।

বা। তুমি কিছু খাইবে না ?

হেম নীরব।

বা। না খাইলে কত দিন এ শরীর বহিবে ?

হেম তর্জনও কথা কহিতে পারিলেন না ; শূন্য দৃষ্টে একবার বালিকার দিকে চাহিলেন।

বা। কিছু না খাও, তৃষ্ণা পায় নাই কি, মুখে একবিন্দু জলও দিবে না ?

এবল গুরুত্বক্ৰম গম্ভীর যে বাঁধে এতক্ষণ বদ্ধ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা যে দারুণ উচ্ছ্বাস বহিল, তাহার বেগ সহিতে পারিল না, বাঁধ ভাঙ্গিয়া, বেলাতুমি অতিক্রম করিয়া বারি রাশি উছলিয়া পড়িল। হেমের দুই চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল।

বালিকা বলিল—“ছিঃ আবার কাঁদ কেন ?”

তখনও হেমের চক্ষে অবিরল ধারা বহিতেছিল। হেম সেই অঙ্গাসিক মুখখানি তুলিয়া বলিল—“কি বলিল, কেন কঁাদি তাহা তোমাকে কি জানাইব ? এ অশ্রু এ কাহা কি আন ফুঁাইবে ? বলিতে বুক কাটিয়া যায়—”

বালিকার দুঃকর ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় জলে ভাসিয়া পেল, গাণ জাহ্নব হইয়া পড়িল, হেমের কথা শেষ হইতে না চেষ্টাতে কাতর কণ্ঠে বলিল—“চুপ কর চুপ কর ; যাহা বলিতে এত কষ্ট তাহা তোমার বলিয়া কাক্স নাই।”

হেম বলিল—“না, বলিল বৈ কি ; এ হতভাগ্যের হৃদয়ে কেত কখন দুঃপ করে নাই ; তুমি বালিকা—না, বেনকন্যা—কি যেই হও, তুমি আমার ব্যাধির ব্যধিত। তোমাকে বলিল বৈ কি—” বলিতে বলিতে আবার হেম চতুরের দর বাস্তব হইয়া আসিল, আবার চক্ষের জলে গণ্ডহল ভাসিয়া পেল। হেমচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—“মা আমার জলের জন্য কতই ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন ! কত জল চাহিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে জলের জন্য কত হা করিয়াছিলেন, হায়, আমি অভাগা তখন মুখে একবিন্দু জল দিতে পারিলাম না। সে দিন একাদশী বলিয়া সকলে আমার হাত হটতে জলের ঘট কাড়িয়া লইল। আমি কেন তাহাদের কথা শুনিলাম ? কেন জল দিলাম না ? মা বুঝি আমার জল তল করিয়াই মারা গেলেন ; বুঝি, তখন মুখে এক কোঁটা জল দিতে পারিলে এ যাত্রা তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতাম। হায়, শেষ কাহারও কথা না শুনিয়া জল দিতে গেলাম, মা আমার মনের হৃদয়ে কৃতজ্ঞ সন্তানের জল গ্রহণ করিলেন না। দুই কস বহিয়া সে জল গড়াইয়া পড়িল। আমি তাহা দেখিলাম। সেই আমি এখনও বলিয়া বহিয়াছি ; এ মুখে আবার তল দিব কোন্‌ প্রাণে ?” আর হেম বলিতে পারিল না, “মাপো” বলিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কঁাদিয়া উঠিল।

তখন কে কাহাকে সাহায্য করিবে ? হেমের কথা শুনিয়া, তাহার কান্দা দেখিয়া বালিকাও অজ্ঞপ্রধারে কঁাদিতে লাগিল। পরহৃৎখকাতরের হৃদয় পরহৃৎখ-কথায় গলিয়া গিয়াছে, সাহায্যের তাহা তখন মনে আসে না। যে পরের হৃৎখ আপনার স্বপ্নে অমৃতত্ব করিতে পারে না, সেই তুচ্ছল অন্য-পাঁচটা হৃৎখের তুলনা পাড়িয়া হৃৎখের তার কমাইতে চেষ্টা করে। যে

বাধিত, সে তাহা পারে না। তখন, পীড়িতও যে, সেও দে। তখন, বুকি, দুইজনের কেহই কিছু বলে না, কেবল কাঁদে। হেমচন্দ্র কি বালিকা দুইজনের কেহই কিছু বলিতে পারিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

পন্থাৎ হইতে কে বলিল—“কে বহু—বহু দিন?”

বালিকা চাহিয়া দেখিল; একটু শান্ত হইয়া বলিল—“তা, দোকানী দাদা?”

দোকানী নিশ্চিত হইয়া বলিল “রাতিকাল—আশানুভূতি—এ সময়ে ভূমি এখানে!”

দোকানীর কথা শুনিয়াই হেমচন্দ্র চূপ কবিতাছিলেন। আগের মত দুইজনের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাহাতিপেক্ষ সম্ভাবণেই বুকিলেন, এ বালিকাকে তিনি যে দেববালা ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে; বালিকা মানব। কিন্তু যেই হউক, এ বগদে এত খন তিনি আর কখন সমুদ্রা-শরীরে দেখেন নাই, এ বালিকার স্থান এ পৃথিবী নয়, ‘দেবলোক’ই ইহার যোগ্যস্থান। এই প্রথম চিত্তান পর হেমের মনে আর এক চিন্তার উদয় হইল। হয়ত এই দোকানী বালিকার কেহ হইবে, হয়ত এ বালিকাকে কত বকিবে? মূর্ত্তের অন্য হেম আপনাব চিন্তা ভুলিয়া গিয়া বালিকার অন্য চিন্তা করিল। মনে একটু আশঙ্কার সঞ্চার হইল। আমার ভাবিল—তাও কি হয়? নিসর্গহৃত্ত বভাবা এই বালিকা কি তিরস্কারের পাতী? হেম একমনে তাগদিগের উত্তরের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন।

বালিকা বলিল—“দোকানী দাদা, তোমার দোকানে কাগরাও গিয়াছেন কি?”

দোকানী বিস্মিত হইল। বলিল—“হাঁ, একদল লোক আজ শব্দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা ই আমার দোকানে জলটল খাইতেছে। তা, অমন তো প্রায়ই আসে, তোমার সে কথা কেন?”

বালিকা বলিল—“সকলেই গিয়াছেন, কিন্তু ইনি যান নাই, এখানে একা গিয়া কেবল কাঁদিতেছেন, তাই আমি ইহাকে আমাদের বাড়ী লইয়া খাইতে আসিয়াছি।”

বালিকা হেমচন্দ্রকে দেখাইল। দোকানী তাহা দেখিল। সে বালিকার

বস্তাব জানিত, সমস্ত বুঝিল। দোকানী বৃদ্ধ, বৃদ্ধের হৃদয় গলিয়া গেল। আদরে বালিকাকে একবার কোলে লইতে ইচ্ছা হইল। বলিল ‘তা, ত্রুমে রাত্রি হইতেছে, এখনও এখানে কেন, দিদি?’

বালিকা বলিল—“আমি তো তাহাই বলিতেছি, কিন্তু উনি শুনেন না, ঘাইতে চাহেন না, তা কি করিব? দাদা, তুমি একবার উহাকে বল না?”

দোকানী বলিল—“ঘাইতে চাহেন না, কি বলেন?”

বালিকা উনি বলেন, এখানে একা থাকিবেন। হাঁ দাদা, এখানে একা থাকিতে কি আছে, দাদা?

দোকানীর সহিত বালিকা যেরূপে কথা কহিতেছিল তাহা দেখিয়া হেম আরও আশ্চর্য হইতে লাগিল। আবার সেই সঙ্গ—না না, একি যাহ্নব! নিশ্চয় কোন দেবতার ছলনা। হেমের চক্ষে জল আসিতেছিল, এমন সময় দোকানী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—“মহাশয়, আর কেন বিলম্ব করিতেছেন, এ বালিকা আপনাকে ছাড়িবে না, আপনি ইহার সঙ্গে গমন করুন।”

হেম চক্ষের পল্লব হইতে পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু মার্জনা করিয়া বলিল—“আমি তো বলিয়াছি, আমি একা নহি, আমার সঙ্গে অনেকগুলি ভ্রাতৃলোক আছেন, তাঁহারা একটু পরেই আদিয়া আমাদের খুঁজিবেন।”

দোকানী বলিল—“আমি তাঁহাদিগকে গিয়া সমস্ত বলিব, তাঁহারা আপনার জন্য চিন্তিত হইবেন না।”

হেম। কিন্তু এই বিশেষে রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে নিরাশ্রয়ে রাখিয়া আমি কেমন করিয়া অনাত্র গিয়া স্থির থাকিব?

দোকানী বড়ই কোমলচিত্ত; বলিল—“সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আমার দোকানে তাঁহাদিগকে পরম যত্নে রাখিব। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, ইহার সঙ্গে গমন করুন। দেখিতেছেন না, আমার দিদির চক্ষে জল!” বৃদ্ধা বালিকার সেই অশ্রুসিক্ত মুখ ধানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিল; জ্যেষ্ঠার স্নিক্ত আলোকে তাহা বড় হৃদয় দেখাইল। সাদরে বৃদ্ধা বালিকার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল।

স্থির হইয়া হেমচন্দ্র এ সমস্ত দেখিলেন। আপনার সকল হৃৎকের কথা

তুলিয়া গেলেন। আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—“ওবে, চল যাই।”

তখন, সেই কৌশলী-শ্রদ্ধা বিবল-লোক-সকার অনতিপ্রশস্ত পথভাগ দিয়া বালিকা আগে আগে বাইতে লাগিল, ধীরে ধীরে হেমচন্দ্র নীরবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। চাঁদের আলোকে যতদূর দেখা যায়, বৃদ্ধ দোকানী সেইখানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাবিগের প্রতি চাহিয়া রহিল।

দায়িত্ব ও কর্মফল ।

It is not necessary to moral freedom that on the part of the person to whom it belongs, there should be an indeterminate possibility of becoming and doing anything and everything. A man's possibilities of doing and becoming at any moment of his life are as thoroughly conditioned as those of an animal or a plant.

T. H. Green.

আমরা অদৃষ্টবাদ-শীর্ণক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষের দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই অবশ্যত্বাধী। জড় জগতের ন্যায় অস্তর্জগতেও ঘটনা সকল নিয়মের দ্বারা। মানবের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয়বিধ কার্যই, তাহার সামাজিক এবং রাষ্ট্রগত চরিত্রের ফল। তাহার চরিত্রে আবার পূর্বকৃত কর্মফল। মানবজীবনের প্রতি এই ভাবে দৃষ্টি করিয়াও যে কেমন করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বদায় রাখা যায়, আমাদের শেষ প্রস্তাবে আমরা তাহার কিকিৎ আভাস দিয়াছি। এই প্রস্তাবে আমরা দায়িত্ব এবং কর্মফল সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ শোকে মনে করে যে, যদি সমস্তই অদৃষ্টের নিয়মে সংঘটিত হইতেছে, তবে আমাকে আমার কাজের জন্য দায়ী করা অন্যায়, এবং আমি যে কর্মফল ভোগ করি তাহাও অন্যায়। স্বাধীনতাবাদী (Libertarians) দার্শনিকগণও এই মত ধরিয়া, যথেষ্টরূপ বাগাড়ম্বর করিতে ছাড়েন না। জগতের সাধারণ আশিকিত (unsophisticated majority) লোকেরা যে তাঁহাদের পক্ষে—এই কথাটা তাঁহারা নিয়মবাহী দার্শনিকদিগের কাছে পুনঃ

পুনঃ বলিতে বড়ই ভাল বাসেন। জানি না, ইংরেজী — the majority is always in the wrong, a man is not worth a rabble — ইত্যাদি মত শুনিলে কি বলিগেন। য হা হউক বড় বড় পণ্ডিতের যুগে ওসব কথা শোভা পায়, মাথিউ আর্থার (Mathew Arnold) ল্যান্ডোর (Landor) লাণ্ডরের দোহাই দিয়া সাধারণের বিশ্বাস অবজ্ঞা করিয়া নিস্তার পাইবার আমাদের সম্ভাবনা নাই। আঃ নস্তরঃ আমরা পূর্ণেও বলিয়াছি যে, আমাদের বিশ্বাস এই যে মানব সাধারণের সাধারণ-জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলেও একবারে কখন ভুল হইতে পারে না।

এই জন্য আমরা প্রথমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে, সাধারণে দায়িত্ব বলিলে কি বোঝে। তারপর দেখিব, স্বাধীনতাবাদীদের Libertyর সহিত বাস্তবিক তাত্ত্বিক কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে কি না।

কিন্তু আমরা যেকোন সাধারণ লোক খুঁজিতেছি সেজন্য সাধারণও খুঁজিয়া পাওয়া বড় সহজ নয়। এই উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন সকলেই মত লইয়া চারিদিকে কলহে প্রবৃত্ত, — যে সময়ে সকলেই জানে বেশি করে কম — যে কালের শিকার অর্থ কোন একটা বিশেষ মতাক্রান্ত হওয়া; তখন আমাদের সাধারণ লোক পাওয়া যে বড় কঠিন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখন সকলেই অসাধারণ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, যদি কাহার মনে এখনও কোন তর্ক উঠে নাই (unreflecting), ‘অথবা কোন বিশেষ মত রাসিয়ার দূষিত হয় নাই এমন লোক খুঁজিতে হয়, তবে কিছু কালের জন্য দার্শনিক জগৎ ছাড়িতে হইবে।

এইরূপ সাধারণ অশিক্ষিতকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সে দায়িত্ব বলিলে কি বোঝে; সে নিশ্চয়ই বলিবে, সে দায়িত্ব অর্থে লাভি বোঝে। বোঝে এই যে, সে তাহার কাজের জন্য দায়ী, কেন না, তাহার কাজের জন্য সে কাহারও কাছে জবাব দিহি করিতে বাধ্য। (Accountable)। কাব কাজে জবাবদিতে হইবে সে বিভিন্ন প্রশ্ন। সে সম্বন্ধে হ্রস্ত তাহার অনেক রকম মত থাকিতে পারে, আমরা সে মত গ্রহণ করিতে নাও পারি। — কিন্তু সে যে তাহার কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য, ধর্মের আবালতে আবশ্যক হইলে তাহার জবাব দিতে হইবে, এ বিশ্বাস ছাড়াইতে পারে না। — আমরাই

কি পারি ?—কিন্তু, সে কি সকল কার্যের জন্যই আপনাকে দায়ী মনে করে ?—না। যে কাজ না কি সে করিয়াছে, সেই কাজের জন্যই, — তাহার নিজের কৃত কাজের জন্যই— সে দায়ী ; যে কাজ না কি তাহাতে আরোপিত হইতে পারে তাহারই জন্য সে দায়ী। এই আরোপণ (imputability) জনাবদিহির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যে কাজ তাহাতে অর্শ্য না— তাহাতে আরোপিত হয় না— সেজন্য তাহাকে অব্যব দিতে বাধ্য করা যায় না, সেজন্য সে দায়ী নহে।

বুঝা গেল, দায়িত্বের পক্ষে আরোপণ নিতান্ত প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, এই আরোপণের পক্ষে আবশ্যক কি কি আবশ্যক।

এ সম্বন্ধে প্রথম আবশ্যক এই যে, যে কাজের জন্য আমার উপর দোষারোপ হইতেছে, সেই কাজ যে করিয়াছিল, সে আর আমি এক হওয়া দরকার। যে আমি সে কাজ করিয়াছিলাম, সে আমি যদি আর এখনকার আমি না হই, তাহা হইলে এখনকার আমি পূর্বের আমার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য নই। সুতরাং যদি আমাকে পূর্বকৃত কার্যের ফলভোগ করিতে হয়। সময়ের পরিবর্তনের মধ্যে আমার ব্যক্তিত্ব অপরিবর্তিত থাক। দরকার।

আরও একটু কিছু দরকার। কাজটি আমার হওয়া দরকার। আমার ব্যক্তিত্ব অপরিবর্তিত থাকিবে এবং কাজের কতা আমি হইব। এই ধানে একটু গোলযোগ উপস্থিত। আমরা পূর্বের অদৃষ্টবাদ-শীর্ণক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে প্রত্যেক কার্যের কারণ, কাল এবং স্থানের (Time & Space) অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। পাঠকের কিঞ্চি স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা ইহাও বলিয়াছি, যে এই কাল এবং স্থানের অন্তর্গত প্রাকৃতিক ভগতের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ আকার কথা ভুলিলে এ প্রাকৃতিক ভগতের কোন কথা থাকে না। পুরুষ প্রকৃতির জীবন। সেই পুরুষই আমি। অজ্ঞান অর্থে আমিহ। এ অহংকার প্রকৃতির জিয়া নয়। এই আমি, সেই আমি, ঐ আমি, তুমি, আমি, তিনি এ সব প্রকৃতির বিকার—পারবর্তনশীল—মলবুদ্ধ এবং কণহারা;—কিন্তু আমি প্রকৃতিঃ ক্রিয়মানানি ওঠেঃ কর্ম্মাণি সর্জনঃ' এ কথায় পুরুষ-হীন প্রকৃতি বুঝিলে তাহা ভুল মনে করি। অবিদ্যার, বিকার-

শূন্য পুরুষ। এ সাধারণ অহঙ্কারের বিনাশ নাই। সব গেলেও এ টুক থাকিবে। এই এক আমিই সকলের মধ্যে ক্তারূপে ছুটিয়া উঠিতেছে। “অহঙ্কার-বিমুক্তা ক্তাহমিতি মন্যতে”-অর্থে যদি এই মহা আমি বুঝা হয় তবে এ কথা আমি মানি না। ক্তা বলিলে কি বুঝা যায়? ক্তা বলিলে যে অনিয়মিত কার্য্য করিবার ক্ষমতা বুঝায় না, তাহা আমি পূনের প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। কর্তৃত্ব অর্থে কার্য্যের সাহিত সজ্ঞান সম্বন্ধ। এইভাবে কার্য্যের প্রাকৃতিক কারণ তলিরও ক্তা আমি। আমার স্বভাব আমার, আমার কার্য্যও আমার। অধচ আমার স্বভাবও নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, কার্য্যও নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের প্রস্তাবে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

এ দুইটি ছাড়া আরও একটি বিষয় আবশ্যক। দায়ী ব্যক্তির পক্ষে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে কি কাজ করিতেছে তাহার ওণাওণ বিচারের ক্ষমতা তাহার যে পর্য্যন্ত, তাহার দায়িত্বও সেই পর্য্যন্ত। এইজন্য বালক অথবা উগ্রাণকে আমরা দায়ী মনে করি না। পত্তজাতিকে এইজন্য দায়িত্বের বহির্ভূত মনে করা হইয়া থাকে।

বোধ হয় আমাদের সাধারণ লোকের মনে এই তিনটি ভাব ব্যতীত আর কিছু নাই। সে যে চিন্তা করিয়া এরূপ একটা স্থির করিয়াছে, তাহা নহে। আমরা তাহাকে মোজামুজি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিতে পাই যে, তার মনের ভাব এইরূপ। এর বেশি হয় ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে অবাক হইয়া থাকিবে। কার্য্য কাহাকে বলে? আমার কার্য্য বলিতে হইলে কি কি দার্শনিক তত্ত্বের আবশ্যক করে? কতদূর পর্য্যন্ত ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে দায়িত্ব-বোধ সম্ভব হয়?—এ সকল কথার পরিষ্কার উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। আর যে সকল স্থলে কেহ কোন উত্তর দিয়া থাকে, সেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে নানাপ্রকার মতের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ হয় ত

* এক এবহি ভূতাস্তা ভূতে ভূতে ব্যবহিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

নিভাঃ সর্গগতোহ্যাস্তা কুটস্থো দোষবর্জিতঃ

একঃ স ত্ৰিদ্যাতে শক্ত্যা মায়ায়া ন স্বভাবতঃ ॥

অতিঃ ।

উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও দোষীকে সম্পূর্ণ বঞ্চিতান করিবে। কেহ বা কেবল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই শাস্তি দিরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবে। তবে, মোটের উপর স্মৃতিতে পারি যে যদিও সাধারণ লোকের কাছে, আট ঘাট বাধা, সুপরিষ্কৃত মত শ্রেণী পাওয়া সম্ভব নয়, তথাপি কতকগুলি বিষয়ে তাহার যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহা সে কোন মতেই ছাড়িতে পারে না। তাহার বিশ্বাস যে, কোন ব্যক্তির দায়িত্বে প্রথমতঃ তাহার ব্যক্তিত্ব (Personality) অপরিবর্তিত থাকা আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ কার্য তাহার হওয়া আবশ্যক, এবং তৃতীয়তঃ তাহার ন্যায্যন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এ বিশ্বাস কেন হয়, ইহার মূল কি, সে বিষয়ে কোন পরিকার উত্তর না দিতে পারে; কিন্তু আমাদের দর্শন কি ইহার মধ্যে কোন ভুল দেখাঠিতে পারেন? আমার বিশ্বাস যে, সাধারণ লোকের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিপক্ষে দার্শনিক জগতে যাহা কিছু বলি হইয়াছে সমস্তই বৃথা। অবশ্যই তাহাতে নানা স্মৃতির অবতারণা আছে; কিন্তু সে সকল ছেলে-ভুলান কথা। Mill প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে একাধারে ভাবসংক্ষেপ নিয়মের (Laws of association) দ্বারা দায়িত্ব জ্ঞান বিশ্লেষণ করেন আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

Bain এই ভাবে Mill-এর মত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

“Responsibility means either that we should deserve for those acts. The first alternative may be thrown out of account. The question then is whether Free-will is then involved in the justness of punishment. In this discussion Mr. Mill assumes no particular theory of morals; it is enough that difference between right and wrong be admitted and a natural preference for the right. Whoever does wrong becomes a natural object of active dislike and perhaps of punishment. The liability of the wrong-doer to be thus called to account has probably much to do with the feeling of being accountable. Oriental despots and persons of a superior caste show not the least feeling of accountability to their inferiors. More-over, if there were a race as mischievous as lions and tigers, we should treat them precisely as we treat wild beasts though they acted necessarily. The real question however is, would the punishment be just? If an end is justifiable the sole and necessary means to that end must be justifiable. Now the Necessitarian theory proceeds

upon two ends, the benefit of the offender himself and the justification of others."*

নিরম সম্বন্ধে Mill-এর মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাট এবং পুঙ্খ-বিহীন প্রাকৃতিক ভগ্ন যে কল্পনার ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়, আমরা কতক পরিমাণে তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। এখানেও আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাকৃতিক শাস্তি ও ভয় হইতে দায়িত্ব-বোধের উৎপত্তি করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমি যে জবাব দিতে বাধ্য, আমার দোষের জন্য শাস্তি পাওয়া যে ন্যায্যমাত্র, এ বিশ্বাস ভাবসংঘে পের নিয়মে অস্বাভাবিক পাবে না—অন্ততঃ তাহা প্রমাণ করা হয় নাট, করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ঠিক কিনা তাহার সমান পুনরাবিরূপিত পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। এখানে তাহা অসম্ভব। শাস্তি যে হিতকর (expedient) ইহা হইতে কর্তৃকল হ্রাসমাত্র (just) ইহা প্রমাণ করা যায় না। শাস্তি কেবল শিকার যন্ত্র নয়, অতীতঃ যন্ত্রের সে উদ্দেশ্যে শাস্তি দিবার অধিকার নাট—কথা করিয়া তাহার যদি সহস্র শিকা হইয়া থাকে তথাপি তাহার শাস্তি ভাগ করা উচিত। ভাবনা

* বাংলা ভাষা করিয়া আঁতে চাহেন তাঁহারা Mill's Examination of Hamilton's Philosophy দেখুন।

† Judicial punishment can never be inflicted simply and solely as a means to forward a good other than itself, whether the good be the benefit of the criminal or of civil society; but it must at all times be inflicted on him for no other reason than because he has acted criminally. That is the maxim of the Pharisees, "it is expedient that one man should die for the people and that the whole nation perish not," but if justice perisheth, then it is no more worth that man should live upon the earth.

Even if a civil society were to dissolve itself by the vote of all its members (e. g. if a people inhabiting an island were to resolve to separate from one another and scatter themselves over the surface of the globe) nevertheless before they go the last murderer in the prison must be executed. And this that every man may receive what is the due of his deeds, and the guilt of blood may not rest upon a people, which has failed to exact the penalty, for in that case the people, may be considered as participators in this public violation of justice.

KANT.

দার্মনিক-জোর হিগেলেরও (Hegel) এই মত।

পাঠকের শিক্ষার অভাব ছিল না, তবু সে কর্মফল গ্রহণ করিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল—এই যথার্থ শাস্তি । যাহা ঈউক, এমন বুদ্ধিতে পারিতোহি Mill-প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রথা অনুসরণ করিয়া যদি নিয়মের কথা বলিতে হয়, অনুষ্টবাদের প্রতি যদি কেবল মনোবিজ্ঞানের উপর স্থাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে দায়িত্ববোধ বন্ধার রাখা দূরে থাক, দায়ী হইবার কেহই থাকে না । মাথা নাট তার মাথাবাবা । ব্যক্তি নাই তার আবার দায়িত্ব । আমিই নাই, স্ত্রীরাং আমার কর্ণও নাই ; আমার অপরিবর্তিত ব্যক্তিবৎ কল্পনা মাত্র । ইহাদের মতকে উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত সর্বাথই বলিয়াছেন *The Doctrine of Determinism * is a will wills nothing.*

এ ভাবে দেখিলে অনুষ্টবাদে বস্তুতই দায়িত্ব নষ্ট করে । তবে একবার দেখা যাউক যাহা-না সাধারণ লোকের দোহাটী দিয়া আকাশ পাতাল বিলোড়িত করেন, তাহাদের মতে দায়িত্ব কিরূপ দাঁড়ায় । আমি যে-রূপ ইচ্ছা (desire) করি, সে-রূপ কাজ করিবার পক্ষে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে আমার দায়িত্ব নাই । যদি এই শর্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত সাধারণের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । কিন্তু এই কথা বলিয়াই কি চরিত্র ক্ষান্ত ? না, ইহার আরও বলেন যে আমরা যে কেবল ইচ্ছাক্রমে কার্য করিতে স্বাধীনতা চাই তা নয়, ইচ্ছাক্রমে (as we desire) ইচ্ছা করিবারও স্বাধীনতা চাই । এ কথা অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই যে কেবল বাসনা (desire) দ্বারা আমাদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় না, আমি না থাকিলে কেবল বাসনা বিশেষ ইচ্ছা বিশেষের প্রবোধক হইয়া কোন কাজ করিতে পারিত না । বাসনাও আমার, ইচ্ছাও আমার । এ পর্যন্ত আমরাও স্বীকার করিতে লজ্জত আছি । এবং সে অবধি না বলি যে আমরা একেবারে বাসনানুগ হইয়া ইচ্ছা করিতে পারি, সে পর্যন্ত সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব জ্ঞানের সঙ্গে কোনও বিবাদ লক্ষিত হয় না । কিন্তু এ সমস্তে স্বাধীনতা-বাদীর মত যে কি নয় তাহাটী বুঝিলাম । এখন দেখা যাউক তাহার মত কি । বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে তাহার বাহা বক্তব্য তাহা

* Erdmaine, as quoted by Bradley.

তিনিলাম, এখন তাঁহার নিজের মতটা কি দেখা যাউক। তাঁহার নিজের মত—আমি কর্তা। আমি কর্তা অর্থে প্রথমতঃ এই বৃত্তিতে হটেবে, যে আমার বাসনা, ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত ছাড়া এক অন্তীন্দ্রিয় আমি এই সকলের পশ্চাতে নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু এ ছাড়া আর একটু কথা স্বাধীনতাবাদী বলেন এবং সেইটুকুই তাঁর বিশেষত্ব। সে টুকু এই যে, আমাদের ইচ্ছা যে কেবল কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হয় না তা নয়, অধিকন্তু সে কিছুই দ্বারা প্রণোদিত হয় না। আমি সর্বত্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেছি, এবং সে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কোন সময় এবং কালান্তর্গত কেন তাহার কারণ নাই। আমি কেন ইচ্ছা করি এবং কেনইবা যে বিশেষ একটি ইচ্ছা করি তারও কোন কারণ নাই। স্বয়ং কর্তা হইবার অর্থ এ ভাবে দেখিলে এই দাঁড়ায়। স্বাধীনতার অর্থ—নিরমের অভাব—দৈবাৎ ঘটনা (Chance)—তোমার চরিত্রের সঙ্গে তোমার কার্যের কোনরূপ সম্বন্ধ নির্দিষ্ট নাই, তোমার চরিত্র জানিলে তোমার কাজের কথা কেহ বলিতে পারিবে না—তোমার কাজ দেখিয়া চরিত্র নির্দেশ করাও বাতুলতা—এই মতে দায়িত্ব রক্ষা করিবে—স্বাধীনতাপ্রজ্ঞাবাদীদের এইরূপ বিশ্বাস। হার, মতের অমু-
রোধে—একটা কথার অমুরোধে—মাছুষ কত ভ্রমেই পতিত হয়! বাস্তবিক
যথার্থই বলা হইয়াছে,

"You are accountable because you are wholly an unaccountable crea-
ture."

F. H. Bradley.

আমাদের বিশ্বাস, দায়িত্ব এবং কর্মকল বজায় রাখা দূরে থাকুক
পুঞ্জোক্ত চিত্রটি উদ্ভাবনের পক্ষেই শোভা পায়। যদি জানিয়া গুনিয়াই কাষ
না করিলাম, যদি কি করিলাম, কেন করিলাম এ কথার উত্তর দিতে না পারি,
যদি আমার কাজে আমার চরিত্রের বিকাশ না হয়, তবে সে কাজ আমার
বলিতে পারি না, তাহার জন্য আমার দায়ী করিতেও পার না, তাহার
জন্য শাস্তি ও অমৃত্যুও অসম্ভব। ন্যায়ান্যায় বিচার দায়িত্বের পক্ষে
বিশেষ আবশ্যক এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যদি আমাদের
জ্ঞান ও ভাবের সহিত ইচ্ছা শক্তির কোন সম্বন্ধ না থাকে তবে ন্যায়-
ন্যায় বিচারের সঙ্গেও নাই; হতরাং সেরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রণোদিত

কার্যের জন্য কেহ দায়ী নয়। ঠিকই বলা চাইয়াছে একজন চছাশক্তি
wills nothing !

অতরাং দেখা বাইততে যে, পাবোনতাপ্রকীর্ণা যে বলেন সাধারণ লোকের
সঙ্গে তাঁতাদের মত মিলে এ কথা যথার্থ নয়। অম্বকের পক্ষে অম্বক কাহ
কণা অসম্ভব, আমাকে এত ছেনে তনেন তোমার এ কথা বিশ্বাস হয়,
ঈত্যাদি সহস্র রূপ কথা যে প্রত্যহ আমরা শুনি তা কি এই মতের বিরোধী
নয় ?

এ কথা ও আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে Mill অথবা Bain-এর মত আমি-
শূন্য আমিহর কথা বলিলেই অশিক্ষিত লোকে কত ভয় পায়। আমরা
দর্শনাদি পড়িয়াছি, অতরাং বায়ুগ্রস্তকে আমরা আর শক্তা করি না, তথাপি
আমরা এহলে Mill প্রভৃতির অঙ্গারণ করিতে পারিলাম না। আমরা পূর্বেই
বলিয়াছি যে আমি থাকিলে নিয়মের কোন বাঘাত না হইয়া বরং নিয়মের
স্বরূপ বিশেষ বিকশিত হয়। কণ্য বদণ অনন্তের সঙ্গে প্রথিত, তবু সে
আমার কর্ম। আমিও অনন্ত। বস্তুরঃ অদৃষ্টবাদের প্রকৃত অর্থ কর্মফল-
বাদ না হইলে পরিষ্কৃত হয় না। কর্মফল ব্যতীত অদৃষ্টবাদের অন্য ভিত্তি
বালির বাঁধের ন্যায়। আমরা যে মহাশয়ার একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এই
প্রবন্ধের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়াছি তাঁহা এই কথাই এই প্রবন্ধ আমরা
লেখ করিলাম ।

The view then that action is a joint result of character and circum-
stances, if we know what we are about when we speak, does not render
shame and remorse unaccountable and unjustifiable. * * * * On
the contrary, rightly understood it alone justifies them. If a man's
action did not represent his character, but an arbitrary freak of some
unaccountable power of unmotivated will, why should he be ashamed of it
or reproach himself with it.

ঐশ্বর্যদ মিত্র ।

সংস্কার ।

যতই উৎকৃষ্ট মূল্যবান উপকরণে অট্টালিকা নির্মিত হউক না কেন, ইহার ভিত্তি যতই সরল, মজবুত ও দৃঢ়স্থিতি হউক না কেন, প্রকৃতির শত শত অত্যাচারেও যতই অটলভাবে অস্থিহীত থাকুক না কেন, ইহা যে চিরকাল অক্ষয় থাকিবে, একই ভাবে থাকিবে, কোন স্থানে সংস্কারের আবশ্যক হইবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু অট্টালিকা যেমন তাহার সংস্কারও সেইরূপ হওয়া চাই; সামান্য মৃত্তিকা-গৃহ অথবা পর্ণ-কুটীরের উপকরণে অট্টালিকার সংস্কার হইতে পারে না। প্রথমে যে মাল মশলার অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল, সেই মাল মশলা ব্যতীত ইহার সংস্কার অসম্ভব। হিন্দুসমাজ-অট্টালিকা যে উপকরণে গঠিত, পৃথিবীর কোনও সমাজ গঠনকারী সে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। দেবরূপ মূর্তীশলী, শ্রমজ্ঞ, বহুবর্শী নির্মাতা কোনও সমাজে জন্মেন নাই। সকল সমাজই আজ গঠিত হইতেছে, কাল ভাঙ্গিয়া যাউতেছে। কিন্তু এই হিন্দুসমাজের উপর এত যে বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গিয়াছে—কত কত জাতির প্রভাব ইহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া একাকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেও ইহা পর্বতের ন্যায় অটল রহিয়াছে। এ অট্টালিকা ভাঙ্গিবার নয় বটে, এবং ইহারই আদর্শে পৃথিবীর যাবতীয় সমাজ-অট্টালিকার ভবিষ্যৎ গঠন-প্রণালী অবশ্যম্ভাবী হইলেও, ইহার স্থানে স্থানে যে চূর্ণ ধসিয়াছে, ময়লা ধরিয়াছে, কাটিয়া গিয়াছে, এক আধু টুটিয়াছে, এই সমস্তটি কি কোন নিরপেক্ষ, সন্নিবেচক পরিণামদর্শী ব্যক্তি অস্বীকার করেন? হিন্দুজাতির যে একান্তবর্তী পরিবার প্রথা সকল সংস্কারিত কৃষ্টি ও বিকাশের, কুপ্রসূতির দমন ও বিনাশের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, মানুষকে নিঃস্বার্থ, নিজাম করিবার, মনুষ্যত্ব শিখাইবার, দেবতা করিবার, প্রকৃত স্থবী করিবার বাহ্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী, হিন্দু সমাজ-অট্টালিকার সেই সর্বোপেক্ষা বৃহৎভাগের চূর্ণ ধসিয়াছে, ময়লা ধরিয়াছে,

‘মানে বিশেষ ফাটিয়া গিয়াছে, হু’ একস্তান ভাঙিয়াও গিয়াছে । আমরা দুটোত স্বরূপ এক ভাগের—প্রধান ভাগের কথাই বলিলাম, অট্টালিকার সকল অংশেরই এই রূপ সংস্কার আবশ্যিক হইয়াছে ।

আবশ্যিক হইয়াছে সত্য, এবং সংস্কার করিতেও হইবে । কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কাদা দিয়া মাটির বরই নির্মিত বা সংকুত হইতে পারে, খড় দিয়া পর্ণকূটীর ছাওয়া যায়, অট্টালিকার সংস্কার তাহাতে হয় না । কিন্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি অসহিষ্ণু, অপকৃৎসিক, অপরিণামদর্শী ব্যক্তি দেই সকল বিজাতীয় অপকৃষ্ট উপকরণে সংস্কার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন । একারবর্তী পরিবারে এখন হিংসা, ঘেব, ক্রোধ প্রভৃতি নানা প্রকার পশুভাব প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাঁহারা এই হুম্মর, মহতী প্রথার মূলে কুঠাওয়াত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাঁহাদের ইচ্ছা, দেশ হইতে এ প্রথা উঠিয়া যাউক, এবং তৎপরিবর্তে বিলাতী খাত্তা-প্রথা প্রচলিত হউক । তবেই গৃহে গৃহে হুম্মলা, শান্তি, শ্রেয় ও হুখ বিরাজ করিবে । যে যে কারণে এই সকল দোষ ঘটয়াছে, সে সকলের মূল্যমুসন্ধান করিতে এবং সে সব দোষ দূর করিতে তাঁহারা কোন মতেই রাজি নন । এই হুম্মর প্রথার পূর্ণ সৌন্দর্য, পূর্ণ মহত্ত্ব সাধনে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইবেন না । ইদানীন্তন ত্রাঙ্গগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব দেখিয়া অনেকে পূজা, পদ্ধতি, উপাসনা, আরাধনা, প্রতিভাগ করিয়াছেন ; তৎপরিবর্তে দিগন্তে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না । আমাদের ঘোর আলস্য, ভীকতা, নিজীবতার প্রকৃত কারণ বাহির করিতে চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা শুধু জনের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের অধীনে থাকি, ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কার্য করা, এবং সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি মহৎগুণগুলির অনুশীলনই এই সকল দোষের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করেন । নৈরাশ্যে, দুঃখে, ব্যর্থতায় এবং প্রধানতঃ লিঙ্কার দোষে তাঁহারা সমাজের শত শত বিষয়ের সংস্কার কার্য এইরূপেই সাধন করিতেছেন ; চিন্তা প্রণালীর গতিও এই ভাবেই ফিরাইবার চেষ্টা হইতেছে । সমাজ সংস্কারকের নামে তাঁহারা সমাজ-ক্ষয়সকারী কাজ করিতেছেন ।

এই পেন এক পক্ষের কথা । আর এক পক্ষ—প্রবল পক্ষ সমাজ-ক্ষয়সে প্রবৃত্ত না হইয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এখন

হইতে আরম্ভ না করিয়া শেষ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন অট্টালিকা সংস্থারে স্থির করিয়া, বাণির কাজ ছাড়িয়া একবারে চূর্ণকাম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহ সংস্থার ছাড়িয়া একবারে সমাজ সংস্থার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সামান্য কাজে তাহাদের মন বসে না, তাই তাহারা বৃহৎ কার্যে প্রবৃত্ত। সামান্যই যে বৃহত্তর প্রবৃত্তি ইহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝেন না। তাহারা ভাবেন, বৃহৎ কার্যগুলি অসুষ্ঠিত হইলে তদ্বারাই ছোট কার্যগুলি সম্পন্ন হইবে। এই ভ্রম বশতই আমরা লওতও হইতেছি। সেই জন্য এপর্যন্ত যত বৃহৎ অভাব সৃষ্টিয়াছে, তাহার প্রায় সব গুলিই বর্তমান। কিন্তু তাহারা বাহ্যকে বৃহৎ বলিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাই কি বৃহৎ এবং বাহ্যকে সামান্য বলিতেছেন, কার্যতঃ তাহাই কি সামান্য? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা সত্য নহে। সংস্কারকেরা বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আজ কাল বিধবা-বিবাহ সংস্কারকদের একটা প্রধান আন্দোলনের বিষয় হইয়াছে। তাহারা বলিতেছেন, ব্রহ্মচর্যই বিধবা গণের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। দু' এক স্থল ব্যতীত সমগ্র শাস্ত্র ব্রহ্মচর্যেরই পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয় পরিতোষ পশুত্ব করিয়া থাকে; ইহার দমনেই মানুষ হইতে পারে। হিন্দু বিধবা-গণ আবহমান কাল এই জন্যই হিন্দু সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপূজ্য পদলাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মচর্যই তাঁহাদিগকে এতদূর নিকাম, নিঃস্বার্থ, পুরোপকারিণী করিতে পারিয়াছে। অতএব এ উৎকৃষ্ট শিক্ষা, এ মহৎ ব্রতের পরিবর্তে পুনর্বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগকে ধোঁপদ হইতে পশুপথে অবতরণ করান যোর দুর্য্যহ। কথা গুলি সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু সমাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া ত আর এ কঠোর ও অস্বাভাবিক পালিত হইবে না। গৃহ তাহার ক্ষেত্র। কিন্তু সে গৃহ যে এখন শ্মশানক্ষেত্র! সে শ্মশানক্ষেত্রে এখন সকল প্রকার কদাচার, সকল প্রকার বীভৎস ব্যাপার যে অসুষ্ঠিত হইতেছে! পূর্বে শিশু কাল হইতে যে শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের বলে হিন্দু-রমণীপণ উক্ত ধর্মধর্ম পালন করিতে পারিতেন, গৃহে সে শিক্ষা, সে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার কি চেষ্টা হইতেছে? চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বিজাতীয় শিক্ষা তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কুসংস্কার, অশাস্ত্র আলস্যপরাধতা, মানবজ্ঞাবিরোধী কার্য বলিয়া প্রায় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরুষগণ নিজেরা যেক্রপ

ঘোর বিলাসী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইতেছেন, নারীজাতির মধ্যে তাহার প্রভাব যথেষ্ট সংক্রমিত হইতেছে। যুগে বলা হইতেছে, পুস্তকে লেখা হইতেছে, যে সংসারের দেনীগণ, তোমরা কর্তৃগহিষ্ণু, নিঃস্বার্থ, নিকাম, সংযতেজিয়া হও। কিন্তু গৃহে সে শিক্ষা, সে দৃষ্টান্তের বিপরীতাচরণ করা হইতেছে। এইরূপে যে যে বিষয়ে সংস্কারকেরা হাত দিয়াছেন, সকল বিষয়েই তাঁহারা গোড়া ছাড়িয়া আপা ধরিয়াছেন। তাঁহারা অগ্রহ করিয়া বিবেচনা করিবেন, কোনটি প্রথমে করণীয়, কোনটি কারণ, কোনটি তাহার ফল, অতএব কোনটি উক্ততর। আরও এক কথা, গৃহের সমষ্টি যে সমাজ, গৃহের উন্নতির নামান্তর যে সমাজোন্নতি, এ কথা ত তাঁহাদের বলিয়া দিতে হইবে না।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই, সংস্কার করিতে হইলে গৃহে তাহার আরম্ভ করিতে হইবে। আগে আত্মীয়ের সহিত এক হও তবে বাহিরের পরের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে পারিবে। আগে আপনাকে আপনাব করিতে নিখ। তবে পরের প্রতি মমতা হইবে। আগে গৃহকার্যে অনলস, হুপটু হও, তবে সমাজের জন্য কার্য করিতে পারিবে। আগে ঘরের অভ্যুচ্চার, অবিচার, নির্ভরতা সংশোধন করিতে সাহসী হও পরে বাহিরের শত্রুর উপীড়নাদির প্রতিবিধানের সক্ষম হইবে। ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, নিঃস্বার্থ ও নিকাম না হইলে সমাজ সংস্কার করিবার ক্ষমতা আদৌ জন্মিতে পারে না। সে দুই মহৎভাবের বীজ গৃহে। আগে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে নিঃস্বার্থ ও নিকাম বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কর, তবে বন্ধু বান্ধব এবং সমগ্র দেশের কার্যে নিঃস্বার্থ ও নিকাম হইতে পারিবে। এইরূপ ভক্তি, ঐতি, মেহ, দয়া, মার্য, মমতা, প্রভৃতি মানবের বাহ্যিক সংবৃত্তির—যে সকলের সম্যক অনুশীলনই মানবের ধর্ম, এবং যে সকলের পূর্ণ ক্ষুতিতে ভবিষ্যতে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে পশুতাব ত্যাগ করিয়া দেবতা হইতে পারিবে—সেই সকলের বীজ গৃহেই অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া সমাজে তাহার স্তম্ভ ফল প্রদান করিবে। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়াই আমরা মনন করিয়াছি, হিন্দু গৃহের কিরূপ সংস্কার আবশ্যিক ক্রমে ক্রমে তাঁহার আলোচনা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। আগ সংক্ষেপে উপক্রমণিকা স্বরূপ দু' চারি কথা বলিলাম।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ।

কবি কীটসের প্রতি ।

দেব !

বসন্তে, বিটনীতনে,
প্রান্তে ভাঙনীতনে,
বিশ্ব বিশ্ব বৃষ্টিপাতে বিহগ-কৃতনে,
ছুটে যে সঙ্গীত সদা,
মানবের কণ্ঠে তাহা গাহিলে কেমনে ?

কই প্রভাতের তাবা
যোহমাধা, বহুকরা
অরধ ফল্গুট এই আলোক-অধায়ে,
ভেমনি ভোমার গান
ফোট ফোট সঙ্গা যেন বিহরে অন্তরে ।

কতনে ।—বারেক ছুটে
দেখাও কোথায় ছুটে
সে হুম-হুম—হুমে বা শুধাইল ভবে ;
পারিজাত, এ সংসারে—

মাটির সংসারে এই ছুটিয়াছে কবে ?
কোথা সে সঙ্গীত আজি,
ত্রিদিবে ভ্রমিছে বাজি,
শূন্য উত্তরোল করি, অনন্ত পুরিরা,
মেঘ হ'তে ছুটে মেঘে
শান্ত করে অশনিরে চপলা চাপিরা !

নক্ষত্রে ছুটিছে গীত
আলোকে ছুটিছে গীত,
পবনে পুটিছে তাহা সে ত্রিদিবে বাজি ;
আকুলি দেবতাকুলে
আকুল সঙ্গীত সেই গুরঙ্গিত আজি ।

ঐসতীশচন্দ্র ঘোষ ।

কোথায় গেল ?

এই যে বসন্তের ফুলটি,—প্রভতির অনন্ত কাল-গৃহে কত দিনের আশা-কিরণে—কত যত্নের স্নেহ-মলিলে—কত সৌন্দর্যের আলোকের বিস্তারণে কানন—ত্রিভুবন—আলো করিয়া, আমার নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া, সৌন্দর্যের চরম-ভীষণ স্বপ্নের অদৃশ্য-ছবি ধরিয়া হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-আকাশে কত আশার বিচিত্র রামধনু ফুটাইতেছিল, সে ফুল আজ কোথায় গেল ? বর্তমান স্মৃতির অদৃশ্য গৃহে তাহার কেনল গফইচ্ছা রাখিয়া অতীত-পাখীর অনন্ত কাল-পাখায় আরোহণ করিয়া অনন্তের অজানা পথ দিয়া অনন্তের কোন্ গৃহে সে গেল ? কি করিয়া অদৃশ্য হইল ? কেন গেল ? কে লইয়া গেল ? কোথাকার ফুল সে ? কোন্ দেশের পথিক ? আকাশের কোন্ তারা ? যে অনন্ত প্রকৃতিশক্তির বিরাট আকর্ষণ-প্রেমের আধ্যাত্মিক চিরপ্রবাহমান স্রোতে সে ফুটিয়াছিল, সেই শক্তির গৃহ হইতে কি টান পড়িয়াছে ? তাই কি একটির পর আর একটি করিয়া তটির সমস্ত স্মৃতি, ধুলিয়া গেল ? কোন্ ভাবী জগতের অদৃশ্য যোগ-অণু ? কোন্ অপসারার অপ্রের হাসি ? কোথাকার আত্মা ? কাহার গীত গানের লয় ? এ কানন চির-অন্ধকার করিয়া কোথাকার কানন আলো করিতে গেল ? আমার ইহ-জন্মের একমাত্র সাধের মণ্ডপে বিজয়া-দশমীর বিবাদের উদাসময় চির-শুভ্রতা রাখিয়া কাহার মণ্ডপে তাহার আগমনীবার্তার আনন্দ-শব্দধ্বনি হইল ? মৃত্যুর ভীষণ শ্মশানজাত বিবাহের চিরবিবাহ-বৃক্ষ আমার এই মহা-উজ্জ্বলিত কাননে রোপণ করিয়া, কোন্ কাননে হাসির চির হৃৎ-মিলন-পারিজাত হইয়া দেখা দিল ?

কোথায় সে ? তাহাকে কত স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছি।—ফুলের সেই স্মৃতি-জাগরণ মদিরাময় গন্ধের নীরব কবিতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়াছি, পাই নাই ত ! শারদীয় পৌর্ণমাসীর নিখল রাত্রির পাষণ নিভ্রজ-তার রাজ্যে খুঁজিয়াছি, তাহাকে ত পাই নাই। নব পম্বের উছলিত কচি হাসির ভাষার মধ্যেও দেখিয়াছি, কই, সেখানেও ত সে নাই ! চিরনবরূপবতী কমোলিনীর সেই কি এক কু-লু-পু-কু-তথ-বিবাদ-তরঙ্গ-

নাগাধও ত সে নাই ! আগার চির-নাশ্তনীয় কবি-কবনার চরম সৌন্দর্যে
 প্রকাশিত আদর্শ বস্তুর সেই অপ্রকাশিত অদৃশ্য স্বর্গীয় ভাবের তরল
 জগন্ময়ের মধ্যে অদৃশ্যমান করিয়াছি, তাহাকে পাই নাই । তাদৃশ ব্যক্তির
 চির-প্রিয় সেই স্তানমুখী সফা-বিধবার কবিতাত্মক নীরব বিরহগানের ভিত্তি
 বুঁজিতে বুঁজিতে আশ্রয়হারা হইয়াছি, কিয় সে কই ? সেই কাল অমা-
 বস্যার ভীম সমাপ্তির প্রজ্জ্বলিত শ্মশানের চিরশাশি-নিকেতনেও ত নাই ।
 সেই জীবনোন্মুক্তিবিধিষ্ট সৌন্দর্য্য পরমাণুর সার পরমাণুর সমভাবে—
 আধ্যাত্মিক সমভাবে এক—কি বলিব ? অগতে অতুল সেই শরৎ-
 জ্যোৎস্নাত্ত ফুলের হাসির প্রতিমা স্বরূপ—যে দেব-নির্দিষ্ট তমু হৃদিত
 হইয়াছিল, তাহার আশ্রয় মধ্যেও ত সে আর নাই ! নিশীথ অচেতনতার
 সুখ-চেতনার অদৃশ্য জগৎগতম কালেও ত তাহার দেখা পাই না ! প্রেম-
 তিমি-পরিপূর্ণ প্রণয়ের সেই প্রথম হাস্যময়-স্বপ্নময়-আশ্র-বিম্বাতিময়
 দৃষ্টির মূহ-বিকলিত সুখ-কিরণের অভিনয়ের মধ্যেও তাহার সেই—সেই
 স্মৃতি-মাধা মুখখানি দেখিতে পাইলাম না ! সেই কি এক বাতাস আসিয়া
 তাহার বহুদিনের কথা তাহার বিরহীও কাছে বলিয়া গেল, তুমিয়া বিরহী অতি
 দীর্ঘে একটি নিশ্বাস ফেলিল, আমি পৌড়াইয়া তাহার মধ্যে বুঁজিতে
 বাইলাম—হার হার, সেখানে নাই ! সেই জীবন-মৃত্যু,—প্রতিষ্ঠা বিসর্জন,—
 আলোক-অন্ধকার, হাসি-কান্না এবং স্বপ্নমর্ত্যের গ্রীতপূর্ণ মহামিলনের
 উজ্জ্বল সন্ধি-নক্ষত্রের মধ্যেও ত তাহার অতীত, আমার চিরশ্রুত গান
 শুনিতে পাইলাম না ! বিনাশের বশীর কণ্ঠ সেই সুখ-হাসি-গজ্জা-পরিপূর্ণ
 মধুময় কর্ণধরের মধ্যেও ত তাহার কোন চিহ্ন নাই ! সেই Shelleyর সেই

The Heavens had wept upon it, but the Earth
 Had crushed it on her unmaternal breast-

এর বশীতল ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া আছে মনে করিয়া চুরি করিতে বাইলাম ।
 নাই ! সেখানে নাই ! কৌমুদী-সমুদ্র-ময় অনন্ত নিশীথাকালার মধুর সরলতা
 মাধা,—অতীত স্মৃতির চকিং আবির্ভাবের ন্যায়—আমার হারান সেই
 এলোথেলো সংগীতটিকে ত পাইলাম না ! সর্গজনহৃদি-বিরাজিত সেই বে
 অমর সুন্দর প্রাচীন কবিতা-গান—“সখিরে কি পুছিস অমৃতব মোহর”—

তাহার অজানা। যুগ্মমায়ায় স্মৃতি-কাননের কত কি মায়ায় অদৃশ্য ফুলরাশির
অন্তঃপুরেও ত আমার তাহার কোন অস্তিত্ব নাই ! যেখানে বসন্তের বাতাস
প্রাণ-গান এবং রসগীর প্রেমালসে সুখ-সুখ-বোরময় নয়নের আলিত নীরব
হাসি মিলিয়া এক হইয় গিয়া প্রেম হইয়া ফুটিয়াছে, সেখানেও ত তাহার
আত্মায়ত্ত্বী যুক্তি-দেখিতে পাইলাম না ! শুষ্ক তরুতলের মধুর মোহ-সাগরে
ত আমার সেই স্মৃতিমত্তী বাসনা-উদ্ভি-মালা আর দেখিতে পাইলাম না !
সে বীণীত আর শুনিতে পাই না ! আমার গৃহ-সরোবরে তাহার নগন-কিরণ
পড়িয়া প্রতিদিন যে রামধনুক ধানির সৃষ্টি করিত, এখন ত আর তাহার সৃষ্টি
হয় না ! সে তবে কি নাই ? সে জ্ঞানময়ী কি একেবারে চলিয়া গিয়াছে ?
এই অনন্ত বিশ্বের কোন স্থানেও কি তাঁহার একটিও পরমাণু নাই ! সে কি
বিশ্বের কিছু কিছুই ছিল না ! তবে কি কেবল সে একটি স্বপ্ন ! স্বপ্নজাত
ভ্রম ! অস্বাভাবিক স্মৃতি ! যাগ !—“O Heaven, whither ? Sense
knows not ; Faith knows not ; only that it is through Mystery
to Mystery, from God and to God !

হায়, কেন গেল সে ! এখানে তাহার কিসের অভাব হইয়াছিল !
কি এখানে সে পায় নাই ! কি এমন দুঃখ হইয়াছিল ! জগৎ-পারাবারে
কি তাহার স্থান ছিল না, তাই আমার সোণাদুর্লভ তবীধানি ভাসিয়া
গেল ? কঠিন জগতের মাটি কি তাহার প্রতিপদক্ষেপে নায়ে বাজিত !
প্রথর সংসার-উত্তাপে কি আমার সেই চাঁদনের কুহুমটি শুকাইয়া
গেল ! বসন্ত সমীরণ আর বহিল না দেখিয়া কি সে তাহার অনন্ত
গৃহে ফিরিয়া গেল ! অনভিজ্ঞ বাগকের হাতে পড়িয়া কি তক্তীর তার
ছিঁড়িয়া গেল ! না, সে নীরব সাগীরে তাল রক্ষা হয় নাই ! মনে
ধারণা করিতে পারি না যে, রুদ্ধ গৃহের প্রদীপ কি করিয়া—কোথাকার
অনভুতবনীর বাতাস লাগিয়া—নিশিয়া গেল ! কি একটা গোলমাল
হইয়াছিল ! কি গোলমাল কি করিয়া বলিব ? হায় ! প্রকৃতির লীলা—
রহস্য কিছু বুঝি না ! প্রকৃতির চুরি কে কবে ধরিতে পারিয়াছে ? প্রকৃতির
পরপারে বাহা বায়, তাহা একেবারে যায় । জন্মের মত যায় ।

হায়, কতদিন ধরিয়া—কত চেষ্টা করিয়া—একটি ফুল ফুটে ! ফুল—মাহুদ,

প্রকৃতির অনন্ত প্রেমের ফল। সেই মানুষ-তুল কি বুধা হুটে? তাহার কোটার কি কোন উদ্দেশ্য—কোন অর্থ নাই? যদি থাকে, তবে প্রকৃতি কেন আবার তাহাকে অগন্ত-মাট্যশাণার নৈপথে সরাইয়া কেলে? তাহার দুখের দিকে কেন প্রকৃতি একবার চায় না? একপে অকহিত হওয়াই কি তাহার জীবনের পুরস্কার? অগতের কি এই নিয়ম? আমাকে এ নিয়ম কে বুকাইয়া দিবে? কে বুকাইয়া দিবে আমরাও কেন প্রতিদিন প্রতি পলে পলে বিন্ বিন্ করিয়া—কপূরের ন্যায় বাষ্পীভূত হইয়া—বিস্মৃতি-মাগরে মিশিয়া যাইতেছি? মৃত্যু আমাদের প্রতিদিন কেন এত আকর্ষণ করিতেছে? তাহার ভালবাসা—সহজ প্রকারের বন্ধন—আমরা কেন এড়াইতে পারি না? আমরা কি মৃত্যুর মৃত্যু? তাই আমরা মরি?—বাঁচি? মরণের পর চির-জাগরণ।—অতৃপ্তির পর অসীম তৃপ্তি। জীবনের পর আশ্রয়! ইহা স্তোকবাক্য। প্রকৃতি, তুমি কি রহস্যময়ী, কি অসীম অন্ধকার! “Man begins in darkness, ends in darkness; mystery is everywhere around us and in us, under our feet, among our hands.,,”

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দু আচার ব্যবহার।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

সমাজ কি, সমাজিকতা কি এবং হিন্দুসমাজের পূর্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ এতক্ষণ তাহাই সাধারণতঃ বলিলাম; এক্ষণে সামাজিক আচার ব্যবহারের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বিশদ করিবার জন্য গ্রন্থাবলীকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইল।

- ১। পজাতিধর্ম।
- ২। সামাজিকতা।
- ৩। সন্তাতি।

- ৪। শিষ্টাচার
- ৫। বেশভূষা।
- ৬। উৎসব, ক্রিয়াকর্ম ও সামাজিক দান।
- ৭। আয়োদ্য অজ্ঞান।

এই সপ্ত প্রকরণের প্রত্যেকের পূর্ণ, মধ্য ও বর্তমান অবস্থা দেখা উচিত। কিন্তু যাহা সচরাচর সকলেরই জানা আছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হওয়াও অসম্ভব আর, যে সকল বিষয় সাধারণের জ্ঞান নাই, যাহা জ্ঞানিবার উপায়ও অতি কঠিন, তাহা, যতদূর পারা যায়, বিশদ কথিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১। স্বজাতি ধর্ম।

হিন্দুজাতির স্বজাতি ধর্ম বিষয়ের প্রথম উৎপত্তি মতেই সর্বপ্রায়ে বর্ণভেদের কথা আদিয়া পড়ে। চাতুর্ভর্ণ ও পুরুষাধিকৃতিক প্রথাতে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন কার্য ও ব্যবসার, যাহা আবহমান নির্দিষ্ট আছে, তাহা কে না জানেন? তথাপি শাস্ত্রীয় উপদেশে, সংহিতার বিধানে এবং পুরাণের বিবরণে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে, এখনকার মত পুরাকালে বর্ণভেদের এত দুটংকনী ছিল না; ওয়াহুসারে ও কর্ম্মপ্রসারে অদম্য বর্ণের লোক উত্তম বর্ণে ও শ্রেষ্ঠ বর্ণের মতই নিকট বর্ণে প্রবিষ্ট কিম্বা গণনীয় হইত। রাজনারায়ণ বাবুর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতায় তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এতলে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক। কিন্তু সম্ভ্রান্তি উক্ত পুস্তকে সকলেই যখন তাহা দেখিতেছেন, তখন আর প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন কি? মহাসংহিতা ও মহাভারতে স্পষ্ট দেখা আছে, উচ্চনীচ কর্ম্ম হুয়ানে মানবগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্ত হন, বংশোদ্ভব হেতুতেই নহে। বেদোনিষিত কবস ঋষি এবং পুরাণোক্ত বিখ্যাতই তাহার প্রমাণ। এখনকার হিন্দুরা ব্রাহ্মণের মুখে ত্রিষ পুরাণ কথা শুনে না, কিন্তু স কালের ঋষিগণও পুত্র লোমহর্ষণের নিকট সমুদায় পুরাণ তনিরাছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে সেই সব পুরাণেই লিখিত আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম বহু ভিন্ন রূপে বিচার

করিলে এই কল্পমান হঠাৎ পারে, যে, অপেক্ষাকৃত নবাতর কালে যখন ব্রাহ্মণেরা স্বভাৱীয় কঠোর ধর্ম পালনে অশক্ত, অপর বর্ণের ন্যায় বিলাস-সুখাশক্ত এবং তৎক্ষণ্য বেতনগ্রাহী ও বাদিত্যাবসারী হইরা উঠিলেন, তৎকাল হঠাৎই তাঁহারা পুরুষাঙ্কমিক বর্ণভেদের নিয়মটী বিশিষ্টরূপে স্মৃষ্ট করিয়া লইলেন। কারণ, তৎকালীণ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিকট বর্ণে বাটতে হইত। ঠাকুরদেব ইচ্ছা, “রামও, বলিও, কাপড়ও তুলিও!” চাপড়ীও করিও, মান্য ও চইও। বেদের জ্ঞান ও ব্রাহ্মণের আচরণীয় শত শত অঙ্গুষ্ঠান, বাহ্যর কন্যাই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সে সব ত্যাগ করিও, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পদটী ছাড়িও না! নীচ বর্ণের কর্ম করিও, কিন্তু নীচ বর্ণে বাটব না! হুতরাং ব্রাহ্মণের পুত্র সহস্র কুকর্ম্ম চইলেও তবু তিনি ক্ষুদ্রবে। তবু তিনি পরমপুণ্য, তবু তিনি সেই বিশিষ্ট জনক, এ শাস্ত্র না করিলে উন্নতি রূপে সর্গভিক রক্ষা হয় কৈ? বাহ্য। হউক, কিন্তু সমাজে এ বিষয়ের সহিত ধর্মের সম্পূর্ণ সংযোগ, এজন্য ইচ্ছার ঠিকিতানীতিতা আমবা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। চতুর্দিকে শিক্ষিত সমাজে এট পুরুষাঙ্কমিক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ প্রকট হয়, এবং প্রাচীন-পক্ষ বর্ণভেদের যেরূপ অবিচলিত পক্ষপাতী তাহাতে নিরপেক্ষ লোকের কথা কওরাই দায়! বিবেচন: বাহ্যরা ধর্ম-বিষয়ের আলোচনার বিরক্ত, তাহাদিগের পক্ষে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়:। কেবল নিরাপদে দুই পক্ষের পক্ষে ও প্রতিপক্ষে এই দুইটী কথা বলা বাটতে পারে, যে, সভ্যতাভিমাত্রী আভিরা আপনাদের মধ্যে জন্মভেদ-ভাবের বড় ঝাঁক করেন। কাৰ্য্যে কিন্তু তাহা সংরক্ষিত হয় না। এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, সভ্যতায় ইংলণ্ডীয় সমাজে ও বর্ণ-ভেদের ন্যায় অথবা কুলীন মৌলিকের ন্যায় লড় ও কমনস্ শ্রেণী, ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী আছে, “নিম্নাশ্রেণীর” পুত্র সর্বজনীন হুশীল হইলেও “নিম্নাশ্রেণী” উপাধি পাইয়া থাকে। তবে যে, নিম্নশ্রেণীর যোগ্য বাজি রান প্রসাদে উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারে, এ কথাটা অনেক ভাল বটে। আমাদের দেশে সেই নিয়মের অভাবে অনেক অনিষ্ট ঘটে। ফলত: এ বিষয়ের পক্ষে প্রতিপক্ষে এত তর্ক উদ্ভিত হওয়া সম্ভব, যে, তদ্যালোচনার জন্য স্বতন্ত্র-প্রবন্ধ না লিখিলে চলে না।

হিন্দুজাতির স্বর্জাতি ধর্মের দ্বিতীয় অঙ্গ এট, যে, অপর জাতীর লোককে অর্থাৎ রেচ্ছ যবনাদিকে সঙ্গতি যথো গ্রহণ না করা। পূর্বকালে অধম বর্ণ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু এটা প্রায় চর্য নাই।—চণ্ডাল শ্রীরাঘচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে, তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিয়াছে, বাধ অজানিত রূপে শিবরাত্রি করিয়া মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যবন জাতীর কেহ প্রায় হিন্দু হইতে পারে নাই। আধুনিক কালে হিন্দু সমাজের এক বর্ণের লোক যখন অপর বর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন ইংরাজ কি মুসলমান যে হিন্দু হইবে, ইহা সম্ভব-পর নহে। তবে দরপর্দার কাহিনী যাহা শুনা যায়, তাহার সঠিক কোনো বিশেষ সংবাদ নাই। তাহাকে হিন্দুসমাজে পরম শুদ্ধ বলিয়া মান্য করিত, কিন্তু আহার ব্যবহারে তাহাকে লইয়া চলিত শি না তাহা আমরা জানি না। নবদ্বীপের ভৈরবদেব মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছেন, এমন কথা শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীমুখ রাঘগতি ন্যায়বত্ত মহাপ্রবর সহিত গোম-প্রকাশের অনৈক পত্র প্রেরকের যে প্রকার বাণীবাদ হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত হইতেছে না, চৈতন্যের সেই সব শিবা প্রকৃত হিন্দু কি মুসলমান? যাহা হউক, আজ্ কাল্ সেরূপে জাতি দিতে পারেন, এমন ক্ষমতামণী মহিমা-বিত হিন্দু কেহই নাই।

২। সামাজিকতা ।

হিন্দুসমাজের সামাজিকতা বলাতে লোক লৌকিকতা, আচার ব্যবহার, দলাদলি, সামাজিক অপরাধের দণ্ড এক-ঘরিয়া ও কাতঃস্বর প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। টহার প্রত্যেকের পূণক পৃথক্ আলোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, এজন্য সামান্যতঃ কতিপয় প্রধান কথার উল্লেখ মাত্র করিব।

সকল জাতি মধ্যে নিয়ম, শিষ্টাচার, শুদ্ধ ব্যবহার প্রভৃতিকে সামাজিকতা বলে। বঙ্গীয় সমাজে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে সামাজিক ব্যক্তিগণকে বসন, ভূষণ, অর্ঘ্যাদি উপহার প্রদানকেই এক্ষণে সামাজিকতা নাম দেওয়া হয়। ইহা নম্রতা-প্রকাশক মানদায়ক সুন্দর প্রথা। বাটীতে পদার্পণ পূর্বক সকলে আহ্বার করিলেন, ওজ্জনা কর্তৃকর্তা আপনাকে দম্য ও কৃত কৃতার্থ জ্ঞানে ভোক্তৃবর্ণের গৌরবার্থে মর্যাদা দান করেন। নম্রতা-জ্ঞাপক না হইলে

ভ্রাতৃত্বের বাটীতে শূদ্র আহার করিলে মর্যাদা পায় না কেন ? মর্যাদা না পাইয়া বরং ভ্রাতৃত্বকে প্রণামি কিছু দিয়া আসে। যে সমস্ত দেশে বর্ণভেদ ও জাতি বিচারের আবশ্যিকতা নাই, তত্বতঃ একেই সামাজিকতার প্রেরণনও নাই। কিন্তু অল্প বিচারক হিন্দুসমাজে একের সহিত অন্যের ভ্রাতৃত্ব প্রচলিত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্য সংস্কার আছে, বাঁহা-দিসকে ঐ সামাজিকতা অর্পিত হয়, তাঁহারা যে মহা সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। এমতে ইহারা দ্বারা উভয় পক্ষেরই ভুলি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সামাজিকতার অপর একটী মহত্তর ব্যুৎপত্তি যে আছে, তাহাকে বদেশাচুরাগের সহোদর ভাই বলিয়া বাখ্যা করা সঙ্গত, দূর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীর সমাজে সে সামাজিকতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা আমরা ইতিপূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

সামাজিকতার মধ্যে লিপি-সৌকার্য্যার্থ দলদলিকেও পরা গিয়াছে। সকল বিচার্য্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও পক্ষ প্রতিপক্ষ আছে। একথা শুনিয়া আমাদের সুশিক্ষিত উন্নতিশীল ভ্রাতারা হরতো বলিবেন “কি আশ্চর্য্য ! এ দেশে ইংরাজি চর্কার বাহুল্য হওয়াবধি যে বিষয় শিক্ষিত সমাজে নিত্য পুণিত ও সর্কধা পরিত্যজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে; যে দলদলিতে নিরবচ্ছিন্ন দোষ ভিন্ন কোন গুণ নাই, যদ্বারা প্রতিবাদীদের মধ্যে স্বেদ-ভঙ্গ, বেদ, হিংসা, প্রতিহিংসা, বিবাদ, মনোহর, বলতা, নির্ভরতা, ধর্ম্ম-বিরাগ ইত্যাদি সর্কধারক অমাহুবি ও শৈশাচিক কাণ্ড ঘটয়া থাকে, তাহার আবার বিপক্ষ বই পক্ষ কেহ আছে ?” কেহ বা বলিবেন “সহস্র শত্রুতা থাকুক, কাহারো বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে আহার করিতে না বাওয়া নিত্য কুলালতা ও নীচতার কর্ম্ম।” ইহা সকলই সত্য, কিন্তু কেবল যদি আহারের বিষয় লইয়া দলদলি হইত, দল বাধিবার জন্য গুরুতর কোন হেতু না থাকিত, তবে ঐ কথাগুলিন সকলই মুক্তিমূলক বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু দলদলির আরো নিগূঢ় কারণ আছে;—দলদলির প্রধান অঙ্গ, কোনো দোষী ব্যক্তিকে এক-ঘরিয়া করা। সমাজ মধ্যে যে সকল পাপ অত্যন্ত

চরিত্র ও স্থপাণ্ডনক এবং হিন্দু রাজত্বের অবশ্যাবধি রাজদ্বারে যে সব অপরায়ের বিচার ও দণ্ড হইতে পারে না, সেই সেই দোষের প্রতিফল দেওয়া এবং আর কেহ এমন কর্ম না করে, তদতিপ্রায়ে তদুদ্ভূত প্রদর্শন করাট এক-ঘরিয়ার মূখ্য উদ্দেশ্য । হিন্দু-আচার বিচার আচার ব্যবহার সকলট ধর্ম-মূলক—সকলই টে পরকালের শুভাশুভ প্রভায়-মূলক । কোনো কোনো বিশেষ অহিতাচার করিয়া কোনো ব্যক্তি পতিত হইলে, লোকের বিশ্বাস আছে যে তাহার সহিত যে অহাচার ব্যবহার করিবে, সেও পতিত হইবে । সুতরাং ঐরূপ দুঃখদায়িত্ব ব্যক্তি বা পরিবারকে সমাজে রহিত করা কর্তব্যরূপে গণ্যীয় হয় । যখন মূল অভিপ্রায় মিন্দনীর ও নিম্নপ্রজাতির হইতেছে না, তখন দলাদলিতে অহুসঙ্গিক আর আর কাজ বাগ হইয়া থাকে, তাহার জন্য অত আটসে যায় কি ? ইহাতে মচবাচের দেব, হিংসা, কলহ, কুটিলতা সত্যই ঘটয়া থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন গুণবিশিষ্ট, যাহা নিস্তাত্তাই নির্দোষ, যাহা অমিশ্র উত্তম, যাহা সর্বোত্তোত্তোবে সম্পূর্ণ ? ইহাতে সামাজিক প্রথা, যে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থা মহাপ্রাজ্ঞ রজনীতিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইতেছে, তদ্বশে পদে পদে ঘোষ রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে ! নিয়ম-পরিচালক ও নিয়ম-পালক এই উভয় পক্ষ দাবধান হইয়া না চলিলে সকল সুব্যবস্থাই কুব্যবস্থা হইতে পারে ! ফলতঃ যেখানে সমাজ, সেইখানেই মত ভেদ । যেখানে মত-ভেদ সেইখানেই দলাদলি । এবং যেখানে সমাজ, সেইখানেই সামাজিকতা-ভঙ্গা দোষী ব্যক্তি । কে ধানে একরূপ দোষী, সেইখানেই একরূপ দণ্ড হওয়া বাতাবিক । সেই দণ্ডের নাম এক-ঘরিয়া হউক আর দেশ ভেদে যে নামেই অভিহিত হউক, কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা এক । যে ইংলণ্ডের অহুকরণ ক্রিমে গিরা তাহার আপনাদেও সকল সামাজিক বিষয়েই দোষ দর্শন করেন এবং পূর্ক প্রথা সকল অবচ্ছিন্নাবচ্ছিন্নে শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া দিতে চান, সেই ইংলণ্ড দেশেও কি দলাদলি নাই ? সেখানে বরং ইহার ভয়ানক প্রাচুর্ভাব । এ দেশে শাক্ত বৈকবে যে দলাদলি, সে তো মাধুর্য্য-ভাবগয় ; সে দেশে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মানব প্রকৃতিকে স্থগা করিতে ইচ্ছা করে ! তৎপরে ইংলিসচর্চ ও প্রেসবিটেরিয়ানের

দলাদলি সামান্য লজ্জাতর নহে! রাজকীয় দলাদলিতে অদ্যাপি যেক্ষণ হিংসা, ঘেদ, শঠতা, কপটতা, চাতুর্য্য, অবিচার, লক্ষপাত প্রভৃতি পাপাচারণ ইংলণ্ডের বড় বড় লোক করিয়া থাকেন, তাহার কাছে বঙ্গীয় দলাদলির দোষ সমূহ কিছুই নয়! তজ্জাতা সেই সব কদর্যা প্রথা যদি ক্ষমতার কৌশলে মণ্ডিত ও সভ্যতার চাকটিকো স্তরিত না থাকিত, তবে তাহার নিন্দাবাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত সন্দেহ নাই! অধিক কি, আমাদের মধ্যে যে শিক্ষিত লোকগণ এই দলাদলির প্রতীকী : যাঁহারা দেশের লোককে ঈশ্বরের বিত্তক উপাসনার পবিত্র পথ দেখাইছেন; যাঁহারা অবিভা ও বলিয়াও থাকেন, যে, তাঁতাদের বাক্য শুনিলে ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে লোকে সভ্য ও ধার্মিক হইবে—লোকে সরল হইবে ও দলাদলির কুপ্রথা ত্যাগ করিবে : যাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ সমাজে স্বাধীনতা ও দর্শনের লজ্জা উড়াইয়া একদিনেই পোড়া বস্ত্রকে সোণার বিলাস করিয়া তুলিতে উদ্ভাস; তাঁহারা নিজেই দলাদলির কোটলাভূমে মগ্ন হইয়া মধ্যে কি চলাচলই বা না করিছেন। সে সব কথা এখানে আর তুলিয়া কাজ নাই। কিন্তু তাঁতাদের মধ্যেই যখন সারস্বত, ধৈর্য্য ও সধিবেচনার এত অভাব এবং হেব হিংসার এত বাড়াবাড়ি, তখন অনিচ্ছিত অসভ্য বঙ্গীয় সামাজিকগণ যে তাহা হইতে মুক্তপুরুষ হইবে, এও কি আশা করা বাইতে পারে?

৩। সভ্যতা।

হিন্দু সমাজকে সভ্যতম ইউরোপীয়েরা অর্জসভ্য বলিয়া থাকেন। উভয় দেশের আধুনিক অস্ত্রার হুগনায় আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এককালে এই ভারতবর্ষ প্রায় সর্ববিষয়েই ভূমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা সভ্যতম ছিল। কালের কুটিল চক্রে পেষিত হইয়া ইহার সর্বদ্রাবীণ উন্নতির অবরোধ হইল, উন্নতি দূরে থাকুক, অবনতি ঘটিয়া উঠিল। এখনও যে ইহা অসভ্য নাম না পাইয়া অর্জসভ্যের শ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বাবহারিক বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থ-ব্যবহারিক শাস্ত্রাদির আলোচনা ও তদনুসারে কার্য্য করা; তৎফলস্বরূপ নৃতি, দাঙ্গা, রাভা, ঐর্ষ্যা-দি লাভ করা; মনুষ্যের চিন্তাশক্তি

ও লেখনীকে বাধীন করিয়া দেওয়া ; সামান্য প্রজ্ঞাকেও অমৃত্যুবান্ধু অভিচারীর হস্তে রক্ষা করা ; ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাভ্রষ্টক ব্যাপার সমূহ ধরিয়া সভ্যতার সীমা করা যায়, তবে ইউরোপের তুলনায় অস্বদেশে রুদ্ধ কেন, বোড়শাংশের একাংশও সভ্য হইতে পারে না । কিন্তু এসমস্ত বিষয় সভ্যতার কেবল মাত্র উপকরণ নহে, ইহার মধ্যে অধিকাংশতো বাহ-চিহ্ন । এ সব ব্যতীত আরো বহু বিষয় আছে । তন্মধ্যে ধর্ম ও সামাজিকতা প্রধান বিচার্য বিষয় । যতক্ষণ না মনুষ্যের পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্মনীতি-সম্মত ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির অঙ্গযোগিত্ব হয়, ততক্ষণ অন্যান্য উন্নতি সকলই বৃথা । ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রসাধে সেই প্রাথমিক উন্নতির পথও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আছে । যদিও অত্রত্য অধিকাংশ সামাজিকগণ আশ্রয়িত সে পথের পথিক নন, অত্যাংশত তাহাতে যথোচিত নির্বিষ্ট বটে । এবং সমস্ত ইউরোপের যেমন প্রভাপ, তেমনই দয়া ; এইজন্য তাঁহারা এক্ষণে সভ্যতম শ্রেণী হইতে পরিগৃহ্যেন । ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ পরাধীনতা ভুগিয়া ভুগিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-জনিত জ্ঞান সমুদয় বাহ্য উন্নতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের আভ্যন্তরিক পূর্ণগুণাবলীর অধিকাংশকে অবলম্বন করিয়া আছেন । অনেক বলেন, হিন্দুজাতি চুই সহস্র বৎসর পূর্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে । যদিও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, যদিও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু সমাজের মূলপ্রকৃতি অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে । হিন্দু সমাজের মূলপ্রকৃতি ধর্ম্মমূলক । সেই ধর্ম্মাস্তক ধাতুটি সমাজের অদ্যাপি আছে । তাহা আছে বলিয়াই এখনও অর্দ্ধসভ্য নাম পাওয়া যাইতেছে । তাহার পরিবর্তে ইহা যদি বাহ্যসভ্যতামূলক হইত, তবে হৃদ্যন্ত যবন আক্রমণে কোন্কালে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যৌর অসভ্যরূপে পৃথিবীর ঘৃণিত পদার্থ হইয়া পড়িত । কিরূপে তাহার দ্বারা কি কারণে আমাদের শাস্ত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শাস্ত্রানুসারে আচার ব্যবহার চলিতেছে, তাহা আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি । যদি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা আর গারোজাতির দশায় কোনো ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইত কি না ? অন্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও আচার ব্যবহার রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাহাও নহে । সেই সঙ্গে নিম্নকর্ণেরও ধ্বংসাবশেষ

অদ্যাশি দৃষ্ট হইতেছে । হিন্দুভাস্করের কীৰ্ত্তি দেখিয়া আতো ইন্দিরোপীয়েয়াও নিম্মখাপন্ন হয় । আতো আনাদের কান্দীরের শাল, জয়পুর ও কাশী অবোধাদির পাবান-শাস্ত্র ; ঢাকার বয় ও ধাতুকার্য ; কটকের স্থল বজনিস্থিত সূক্ষ্মরোপা কাচ ইত্যাদি নিপুণতা বর্ত্তমান রহিয়াছে ! আতো জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভগচ্ছন্দরূপ আশ্রয় জ্যোতিঃচক্র, আশ্রয় গ্রহন-গণনা, আশ্রয় চান্দ্র সৌর দিনকণ তিথি নক্ষত্রের নির্দেশ প্রভৃতি কতক প্রকাশমান, কতক বা কীট-চর্চিত মনুষ্যের করস্পর্শ-বর্জিত তুলট ও ভূৰ্জপত্রের পুথিমধ্যে অপ্রকাশমান আছে । আতো শারীর-বিদ্যার অদ্ভুত আবিষ্কারের ধ্বংসাবশেষ লইয়া কনিরাজগণ এমন সকল উৎকট পৌড়ার উপশম করিতেছেন, যে সে সকল ব্যাধি সভ্যতম আতির চিকিৎসা-আজ্ঞাদারা আরোগ্য হওয়া দুঃস্থ ! আতো হিন্দু-বিজ্ঞানের নিচিহ্ন পতাকার একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া দরুণ এই জ্ঞানটুকু আছে, যে, বৈজ্ঞানিক পদার্থের সহিত পার্থিব ধাতু-পদার্থের আকর্ষণ-সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া যেন ডাকিলেই জীলোকেরা বটী বাটী ঘরের মধ্যে লইয়া যায় ।

কিন্তু পান্ডাভ্য আলোকে আমাদের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায় । পূর্বের কথা আমরা সব ভুলিয়া দাই । পূর্বপুরুষগণ যে অস্ত্র ও অসভ্য ছিল এবং তাহাদিগের বংশধর হইয়া আজ আমরা সভ্যতার উজ্জলধরে উঠিতেছি, ইহা ভাবিয়া আপনাবিগকে কৃত কৃতার্ণ জ্ঞান করি । অনেকে এখন সেই আর্ঘ্যাদিগের নাম শুনিবা মাত্র, পত্রিকার তাহাদিগের সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ দেখিবামাত্র গম্ভীর অন্তরাগ হইতে উপহাসের হাসি হাসিয়া থাকেন । আর্ঘ্য-কথাটা অনেকের পক্ষে এতই ত্রু ও কল্কশ ঠেকে যে সে নাম উচ্চারিত হইবামাত্র ত্রস্তে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন । আমাদিগের সভ্যতা এখন এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আমাদিগের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ, কিন্তু অভিমান বিস্তীর্ণ, শিক্ষা পন্নপ্রাচীমাত্র, কিন্তু উপদেশের ছটার বেশ সম্ভ্রান্ত । কীৰ্ত্তির মধ্যে পরের অমুকরণ ও দাস্যগতি । আমাদের বত কিছু বুদ্ধি ও দর্শন-কমতা “ধৃতি পরি, কি পেটদূন পরি” এই মহা তর্কেই এখন পর্য্যবসিত হইতেছে ।

[ক্রমশঃ

জীমনোমোহন বসু ।

ডারউইনের মতের সমালোচনা।

অমুসন্ধিৎসা মনুষ্যজীবনের একটা প্রধান ধর্ম। অতি শৈশবাবস্থা হইতে চরমকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবন কেবল কার্যের মূলতত্ত্ব জানিবার জন্যই উৎসুক হইয়া সেড়ায়। জীবের জীবতত্ত্বের যে কি এক মোহিনী-শক্তি আছে তাহা বলা যায় না। সেই জীবতত্ত্ব আশা-মরীচিকার ন্যায় দ্রুত—বহুদূর-বাণী। আজ তুমি একটা প্রয় কর—ল্যাম বা রাম—তাহা-দিগের সাধ্যমত সেই প্রয়ের উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে ও বোপ হয় দিতেও সক্ষম হইবে; তাহাদিগের সেই উত্তর বা উত্তরগুলি তোমার প্রয়ের সর্ব-কার্য সম্পন্ন করিলেও তাহা হইতে তোমার মনে শত সহস্র কোটি কোটি প্রশ্নপ্রণী পর্য্যায় ক্রমে নির্গত হইতে থাকিবে, কাহার সাধ্য সে প্রয়ের উত্তর দেয়? তুমি সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেও সেই প্রশ্ন শুনিয়া তোমাকে স্থির নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। মনুষ্যজন্মের যে প্রশ্ন পতঃ উৎপন্ন হয়, কল্পনন তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে সক্ষম? করজন তাহার প্রকৃত মর্ম্ম দুনিয়া চারিদিক বজায় রাখিয়া উত্তর দিতে পারে? মানবজন্মের এই অমুসন্ধিৎসা না থাকিলে জগতে কে আজ বাগ্মীকি বা নাস, দাস্তে বা হোমার, শঙ্করাচার্য বা নানক, লুথার বা চৈতন্য, কালিদাস বা সেক্সপীরকে পূজা করিত? কে আজ নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিত? কেইবা বিশাল নদী জন্মেরে প্রস্থ পাঠ ও মনরীয়ে পূর্ণমর্ত্ত্য বিচরণ বিশ্বাস করিত? এই অমুসন্ধিৎসার জন্যই মনুষ্য ইতর প্রাণী হইতে এত বিভিন্ন, এত উচ্চ। ইহাতে যে শূনিকা লাভ হয় তাহাতে মনুষ্যকে উচ্চ কার্যোপ-যোগী করে, মনের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করে ও সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা উচ্চতর বৃত্তিকে মানব প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে লইয়া যায়। এই শক্তির পরিচালনার সহিত মানব-জীবনের এতদূর নিকট সম্বন্ধ যে ইহা ব্যতিরেকে মানব জীবনের উন্নতি কদাপি সম্ভবে না। আজ যে শক্তির বলে তুমি প্রকৃতত্ত্ব গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করিতেছ, আজি যাহার জন্য সাংসারিক শ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া উচ্চ কার্যে উদ্ব্যস্ত হইয়াছ, সেই শক্তি তোমার শৈশবাবস্থা হইতে পরিণত হইয়া পূর্ণাবয়বে আজি তোমাতে বিদ্বাদ করিতেছে মাত্র।

সেই অমুসন্ধিস্থার বলে একজনের গবেষণার শক্তির অঙ্কে পরিচয় লয়, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবুঝকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করে—সেই গবেষণায় যে প্রমাণ দৃষ্ট হয় সেই প্রমাণ দূরীকরণের জন্য আর একজন চেষ্টা করে ; হয়ত উভয়েই সেই এক ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়া সেই পূর্ব প্রমাণ অধিক-তর বর্দ্ধিত করে, কিম্বা সেই প্রমাণ বেথাইয়া সাধারণকে সেই ভ্রান্তপথ হইতে প্রকৃত পথে লইয়া আসিবার চেষ্টা করে। Darwin, Lord Monbodds এবং Lamarck এই তিন মহাত্মাই পর্য্যায় ক্রমে একই কার্যো নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, উক্ত তিন মহাত্মাই একই প্রকার প্রমাণগ্রস্ত। তাঁহাদিগের মতে "The nature in former times, proceeded towards gradually developing one class of beings from another so as to establish a graduated chain, not of simultaneous but of successive links ; and thus produced in the end human species by a metamorphosis ; one race of these, probably of that Angola Orang, from some unrecorded reason lost the habit of climbing trees, or holding by their hind as well as by their fore limbs. After thus walking on the ground for many generations, the former changed into a shape more suited to their habits and became feet and they gradually acquired the habit of walking erect."

কাল্পনিক চিন্তার বলেই পূর্বোক্ত তিন মহাত্মাই মনুষ্য মর্কট বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের দেখা আবশ্যক যে উক্ত তিন মহাত্মার এই প্রতিপাদ্য বিষয় কতদূর সম্ভব। তাঁহাদিগের মতের সমালোচনা করিবার পূর্বে ঐতিহাসিক কথা আমাদের বলা আবশ্যক, কেননা সেই সকল বিষয় আমাদের গম্য পথের সম্মল হইবে। প্রথমতঃ তাঁহারা যে মতের বশবর্তী হইয়া মনুষ্য মর্কট-বংশোদ্ভব বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদিগের শিক্ষা ভিন্ন জগতে আর কিছু আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ—তাঁহারা যে বলেন, ইতর প্রাণীপণ উন্নতিলাভ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, একটি সামান্য কীট ক্রমে ক্রমে পতঙ্গ রূপে পরিণত হইয়া অন্তত্ব প্রাপ্ত হয়, তৎপরে উন্নতির শেষ অবস্থায় মনুষ্যত্ব লাভ করে ;—ইচ্ছাই

উন্নতির মূল, এই ইচ্ছার বলেই জীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ; অগতঃ এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত কি না ?

একগে আমাদের দেখা আবশ্যিক, এ কথা কতদূর সম্ভব ও যুক্তিসিদ্ধ । মনে করুন, যে পাপিয়ার কর্তৃত্বের জয় প্রাপ্ত হইয়া যায়—জয়নের নিমিত্ত কক্ষ কত দিনের সুখ আশা জাগিয়া উঠে—সেই মন-ভুলান পক্ষীর মনে হইল আমি আর আকাশে উড়িন না ; রাজহংসের ন্যায় নদীতীরে ঘুরে ঘুরে গায়ে গায়ে ভাসিয়া বেড়াইব—স্বোভে গা ঢালিয়া দিয়া প্রাণ তরিয়া সেই কলনানদী বহুদূর-প্রসারিত চকুল মালার শোভা বাড়াইব । জিজ্ঞাসা করি, সেই ভেমন হৃদয়ের পাখী বা তাহার বংশের কেহই কি সে আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে ? জিজ্ঞাসা করি—তাহার বা সেই পক্ষী জাতির মধ্যে কাহারও রাজহংসের অবয়বের ন্যায় অঙ্গের কোন প্রকার সৌন্দর্য্য বাটিয়াছে কি ? কৈ, তাহার ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না । ভগবান বটপত্রে শয়ন করিয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর বাবতীর বস্তু যেমন দৃষ্টি করিয়াছিলেন তদ্রূপ—এখনও তাহাই আছে, তাহার কিকিৎ মাত্রও পরিবর্তন হয় নাই—শত শত বর্ষ পূর্বে বেৎন্যাস তাঁহার মহাপ্রভে যে পক্ষীর যে যে রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন আজিও ঠিক সেই বর্ণনামুযায়ী পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও কিকিৎ মাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই—স্বভাবে, কার্যে বা অন্তরে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না ; তবে কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, সামান্য কীট ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য-আকার ধারণ করিয়াছে ? স্বীকার করি—বানর বা অন্যান্য জীবের সহিত মনুষ্যের কিছু সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কিসের ? সে সৌন্দর্য্য অবয়ব সম্বন্ধে নহে, প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে নহে ; সে সৌন্দর্য্য হিতাহিত বিচার ও সুখ দুঃখ অনুভব সম্বন্ধে । একটি বালককে তাড়না করিলে সে বেরূপ চীৎকার করে, একটা হুকুরকে তাড়না করিলে সেও সেইরূপ চীৎকার করিবে । আবার তাগকে মাদরে আহ্বার দিলে ও একটু বস্তু করিলে সে বেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিবে, বালকও ঠিক সেইরূপ করিবে তাহাতে কিছুমাত্রও বৈলক্ষ্য্য দৃষ্ট হইবে না । এটাই ত প্রাণীদিগের বেরূপ স্বরূপমতি আছে তাহা মনুষ্যের ন্যায় ও কোন কোন স্থলে মনুষ্য অপেক্ষা অধিক এরূপও

দেখা নিগড়ে । তাহারা অবমানিত হইলে তৎপ্রতিহিংসার জন্য চেষ্টা করে, অধিক কি, সে প্রতিহিংসা বৃদ্ধি যতদিন না চরিতার্থ হয় ততদিন তাহা কেহ তাহাদিগের ক্ষম্য হইতে অপসারিত করিতে সক্ষম হয় না—ইহা মনুষ্যেরও ধর্ম বলিলেও বোধ হয় অস্বাভাবিক হয় না । তাহারাও মনুষ্যের ন্যায় জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা প্রতি লক্ষ্য রাখে ও কিসে আনন্দের বিষয় না ঘটে তদ্বিষয়ে সমান যত্নবান হয় । কিন্তু তাই বলিয়া কি স্বীকার করিতে চাইবে যে, এই সকল জীব ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যের প্রাপ্ত হইবে ? এ সকল সম্বন্ধে আমরা আশা এক কথা বলি, মনুষ্যের বাহা আছে তাহা ইতর প্রাণীর নাই । পণ্ডিত মোক্সমলার বলেন ;—“ Man speaks, but no brute has ever uttered a word. Language is our Rubicon, and no brute will dare to cross it.*” আমরা সিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত মোক্সমলারের পূর্বোক্ত বাক্য বলি শুনিলে উক্ত মহাত্মা কি বলিতেন ? তাহারা কি বলিতেন যে বানরদিগের বিকৃত স্বরই ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ? পণ্ডিতগ্রেট লক বলেন ;—

If it may be doubted whether beasts compound and enlarge their ideas that way to any degree, in this, I think, I may be positive that the power of abstracting is not at all in them ; and that the having of general ideas is that which puts a perfect distinction betwixt man and brutes. †

আরও একটা কথা আছে । পশু পক্ষীদিগের উন্নতি নাই, সেই প্রাচীন কাল হইতে একই রকম চলিয়া আসিতেছে । বাবুই বা টুটুনি একই প্রকার বাসস্থান নির্মাণ করিয়া আসিতেছে—তাহাতে শিক্ষার প্রয়োজন নাই, কোন আদর্শ দেখিবার প্রয়োজন করে না, অথচ সর্বদা স্থানে, সর্বকালে একজাতীয় পক্ষী একই প্রকার কার্য্য করিয়া আসিতেছে । তবে কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে ইতর প্রাণীদিগের ক্রমে উন্নতি লাভ হইতেছে ?

কিন্তু মনুষ্য প্রতিদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, দুই বৎসর

* Maxmuller's Ninth Lecture on the Science of Language.

† Locke's Essay on Human Understanding.

পূর্বে যাহা লোকের মনে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজ তাহা কার্যে পরিণত হইয়াছে ; আবার আজ যাহা আমরা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতেছি এমন সময় আসিতে পারে যে সেই সকল অসম্ভব কার্য কার্যে পরিণত হইবে । ইতর প্রাণীদিগের সেই প্রকার সম্ভাব দেখিয়া কে স্বীকার করিবে যে, পত পক্ষী—বা মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণী—ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে, বা হইয়াছে ? আশাদিগের একথাও অনেক বলিয়া উঠিবেন যে, যদি মনুষ্য ও ইতর প্রাণী এক বিভিন্ন তবে তাহারা যে এক শ্রেণীভুক্ত একথা কোথায় রহিল ? স্বীকার করি, মনুষ্য ও কোন কোন ইতর প্রাণী এক শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু সে শ্রেণীত্ব অন্য কিছুতে নহে—তাহা কেবল সাদৃশ্যে। মনুষ্য আহার বিহার, সুখ সজ্জনতা অভিনাষ করে, ইতর প্রাণীরাও তাহাই করিয়া থাকে । মনুষ্য আহার করে, বৃক্ষগণও মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া দেহ পুষ্ট করে ; সেই রস দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া কল ফুলে সুশোভিত হয়। মানবদেহও ঠিক সেইরূপ । এই উভয়ে সাদৃশ্য আছে । কিন্তু, তাই বলিয়া কি মানব দেহ ও উদ্ভিদ এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ? না, উক্ত মহাপ্রাণিগের ন্যায় স্বীকার করিব যে, উদ্ভিদ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়াছে ? আধুনিক বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Proctor বলেন যে ডারউইন আপনার অল্প বিবাসের উপর এই অমূল্য প্রতিপাদ্যটি স্থাপন করিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন।* প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, মহাপ্রাণ Proctorএর কথাই সত্য । এই কথা লইয়া বৃটান ধর্ম্মবাজক Mivart যখন ডারউইনের মতের পোষকতা করিতে গিয়াছিলেন তখন বৃট্টীয় ধর্ম্মবাজকদিগের অন্য সম্প্রদায় তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে স্পষ্টত Darwinএর ন্যায় ভাঙ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন । Mivart আরও আশ্বপক্ষে তাহার কোন সহস্র দিতে পারেন নাই । অথচ Mivart একজন বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ । কিন্তু সে সব কথাই এখানে বিস্তৃত সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই । আমরা ডারউইনের কথা বলিতেছি, সেই ডারউইনের মতে জমাক্তা কি, তাহা বারাতরে বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব ।

ঐনুরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

* See "Knowledge" July number of 1886.

নব সন্তাষণ ।

আজ বাজা ব'লেছে রে মা,
ডেকেছে রে বাবা ব'লে—
শৈশব কি ফিরে এল,
মা পুনঃ আদর করে ?

কুসু কুসু নিকরিনী,
স্বপন ভাঙিল আজ—
নীল আলোভরা নভঃ
নামিল হাণের মাক।

সে কি রে অমৃত ভাষা
বলেছিল তমসায়
করুণা-প্রাবিত কবি
সম্পাত ফুরালে হায় !

তা চেয়ে মধুর বাণী
ভরিল রে মোর প্রাণ ।
তেসে যেন আসে কানে
অপ্সরা-কণ্ঠের গান ।

বসন্ত-কুসুম ধরা
ধরে না এমন আশা,
এমন মধুর তারি
শ্যাম পল্লবিত ভাষা ।

বলে নি ধরারে কভু
নদীর করুণ প্রাণ
এমন মধুর কথা,
এমন তরল তান ।

আজ এ প্রথম শুনি
বেদের পবিত্র গাথা,
আজ মানবের বাণী
হরিল রে সব ব্যথা ।

মধুর প্রশংসা হেন
আছে কি রে এ ধরায়—
শিশু যবে বলে বাবা,
আদরেরে ডাকে মায় ।

আজ দেববানী মোর
পশেছে আঁধার ঘরে,
বাহা আজ বলেছে রে মা,
ডেকেছে রে বাবা ব'লে ।

ঐপ্রিয়নাথ সেন ।

আমরা কি বিদেশী ?

আমরা বিদেশী। ভারতবাসী আৰ্য্য ভারতের সন্তান নহে, ভারত তাঁহাদের মাতৃভূমি নহে। মধ্য আশিয়ার ভ্রমণশীল অসভ্য বর্বর হিন্দুস্থানিধর হইতে অবতরণ করিয়া, পঙ্গপালের ন্যায় ভারতে আপতিত হইয়াছিল। ইহারাই আদিম আৰ্য্য। পরম্পরাগত, পরম্পরাগত পটু তাহারা ভারতীয় কোল, ভিল সান্ততালগণকে দেশছাড়া, রাজ্যছাড়া, এবং ভিটাছাড়া, করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে স্বায়ত্বাধীন করিল। এই পরাজিত, প্রপীড়িত আদিম নিবাসীগণ বিজেতার দৌরাত্ম্য অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল; বাহারা পলাইতে পারে নাই তাহারা দাসত্ব স্বীকার করিয়া আৰ্য্যগণের সেবায় রত রহিল। ইহারাই শ্রমগণের পূর্বপুরুষ। আর বর্বর

বিভেদতা, ভ্রান্ত্যনু কৃত্রিয় বৈজ্ঞ জাতির পূর্বপুরুষ। “পাশ্চাত্য” নবাবিক্ত, শিশু ভাষা-শাস্ত্র হইতে আমরা আমাদের এষ্ট পরিচয় পাইলাম। কেবল আমাদেরই নহে; ইংরাজ, ফরাসি, পারস্যাদি সকল মনুষ্য জাতিরই এই জন্মবৃত্তান্ত। পরিচয়টি নবাবগণমান্য হইলেও, আমাদের মধ্যে অনেককেই বোধ হয়, সংসারে এ পরিচয় দিতে নারাজ হইবেন। বাস্তবিক কথাটা যেন কানে ঠেকে। দেখা যাউক, এ ক্ষয়-কোপী পাশ্চাত্যগণ কোথা হইতে পাইলেন।

যে দিন হইতে যুরোপবাসী সংস্কৃতভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন— উইলসন, কোলক্রক, সার উটলিংহাম প্রভৃতি মহোদয়গণ যখন আধ্যাত্মিক মনন করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহারা যুরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতভাষায় আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিয়া চমকিত হন। মনন-ব্যাপার প্রায় অর্কশতাব্দী ব্যাপিয়া চলিতেছিল। শেষে গ্রিম, বপ, গোল্ডষ্টেক্স অধ্যাপকগণ এই নবীন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত করেন। আমাদের মাতৃমলারও আরও কত হলহল উথিত করিয়াছেন। অধুনা এই বিজ্ঞান শাস্ত্র বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসারের ঘটক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকল জাতিরই বংশের ধরর বলিতে পারে। এই অভিনব শাস্ত্র বলেন যে :—যেহেতু পৃথিবীর অনেক তালি ভাষার মধ্যে অনেক সৌন্দর্য্য দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, বাক্য বিন্যাস প্রণালীতে, শাস্ত্রিক আকারে এবং অর্থে অনেক সাদৃশ্য আছে; অতএব যে কয়টি ভাষার মধ্যে অধিক ঘনিষ্ঠতা তাহারা একজাতীয়। এবং যাহারা এই সব সাদৃশ্য ভাষা বলিয়া থাকেন, তাহারা অবশ্য আত্মীয় এবং একজাতি। সেই জন্য তাহাদের ভ্রমভূমিও পূর্বে একস্থানে ছিল, এখন ছড়াইয়া পড়িয়াছেন! এই হিসাবে মানুষের আর্ধ্য, তুরানী, সেমিতি এবং হাব্সী জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। সকল মানুষই এই চারি জাতির মধ্যে একজাতীয়। হিন্দু, ইংরাজ, ফরাসিস, পারস্য দেশীয় মুসলমান, কাবুলীরা একজাতি—আর্ধ্য! এই আর্ধ্যগণ বহুপূর্বে মধ্য আদিয়ার জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন তথায় বাস করেন; পরে সংসারে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

কথাটা মহা মহা পণ্ডিতের উক্তি, হুতরাং তাহা কটিতে ভয় হয়। কিন্তু, একজাতি না হইলে, একস্থানে বাস না করিলে যে এক প্রকার ব্যবহার-সাদৃশ্য বা ভাষা-সাদৃশ্য হয় না, এমন কিছু কথা নহে। অন্য কারণও থাকিতে

পারে। আমরা সেই সব কারণের উদ্ভাবনা এবং আলোচনার করিবার জন্য আজ এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

দেখা গিয়াছে যে, সমভাবে এবং একাবস্থায় যদি দুইটি জীব উৎপন্ন হয়, তাহাদের পদ্ধতি, গতি ও স্থিতি প্রায় এক প্রকার হইয়া থাকে। কারণ, জীব উৎপন্ন কালেই একটি প্রকৃতিকে অবলম্বন করে, ঐ প্রকৃতিই উহার গতি ও স্থিতি নিয়মিত করে এবং বৃদ্ধি ক্ষমতে উহার জ্ঞাতি ও স্থান নির্ধারণ করিয়া দেয়। জীব জগৎতে মানবী প্রকৃতি অবলম্বন করিলে পর, তাহার মনুষ্যোপযোগী শরীর বৃদ্ধি ও পুষ্ট হয়। যদি দুইটি জীব এক জগৎতে, এক প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া তরুণাবস্থা পরিবর্তিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায় সকল বিষয়েই এক হয়। মানুষের এক প্রকৃতি, সকলেই এক ভাবে উৎপন্ন হয়; তাই মনুষ্য মৌলিকতার এক। গতি ও স্থিতি সকল মনুষ্যেরই প্রায় এক রকমের। শব্দ গতির একটি শারীরস্থরূপ মাত্র। তাহা ঐ শব্দ-সমবাদের একটি বাস্তবিক ক্রিয়া। সুতরাং মানব মানবই এক ভাষা হওয়া উচিত। তবে কেন ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য মধ্যে ভাষার পার্থক্য দেখি?—বিচিত্রভাষায় প্রকৃতিই (বাহ্য প্রকৃতি) এই বৈষম্যের মূলোদ্ভূত কারণ। সত্য বটে জাতীয়ত্বের নিয়মানুযায়ী সকল মনুষ্যই সকল বিষয়ে এক হওয়া উচিত; সিংহ ভারতে ও যেমন, আফ্রিকাতেও তাই। কিন্তু মনুষ্য-বৃষ্টি-কৌশলের এই টুকু বাহ্যিকতা, মানুষ বৃদ্ধি জীব হইয়া বেন স্বভাববিরুদ্ধ কার্যে লিপ্ত। কথটা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল, একটু সরল ভাবে বুঝা যাউক। দেশের জল বায়ু, শীতোকতা এবং স্বাভাবিক স্থিতি ও বস্তু দ্বারা মানুষের অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। বস্তুতঃ মানুষের (সকল জীবেরই) দুইটি প্রকৃতি আছে। প্রথম জগৎমুখ অর্থাৎ মৌলিক প্রকৃতি—মানবী ধর্ম, বাহা না থাকিলে মানুষ হওয়া যায় না; দ্বিতীয় হৈতুকী প্রকৃতি—অর্থাৎ দেশোপযোগী যে আচরণ, ব্যবহার, নীতি নীতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে, স্বাভাবিক হিন্দুর হিন্দুত্ব, ইংরাজের ইংরাজত্ব সংগঠিত হইয়াছে। বাহা না থাকিলে বৈষম্য থাকে না, বিচিত্রতার মূল, তাহাই হৈতুকী প্রকৃতি। একটা বৃষ্টাক্ত দ্বারা ও কথটা আর একটু সহজ ভাবে বুঝা যাউক। ইংরাজ

ও কাকি দুই অনেকই মাছব। ইংরাজের মধ্যে মৌলিক মানবী প্রকৃতি বতখানি বিকসিত, কাকিতেও প্রায় ততখানি। ইংরাজও যেমন আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন, কাকিও বহুতপ। কিন্তু তব্রাত হাবসী ও ইংরাজ আকাশ পাভাল ডকাল। শিশু মন্থ গ্রহণ করিবার সময়ে সকল লিভই এক, কিন্তু তাহার পরেই বৈষম্য স্থাপিত হয়। মৌলিক প্রকৃতির পাখেই বৈষম্যের আকার হৈতুকী প্রকৃতি জড় হইতে থাকে—অর্থাৎ জন্ম-ভূমির জল বায়ু, আচার ব্যবহার, শিক্ষাদির সমষ্টি ভাব মাত্র তাহাতে সঞ্চিত হয়। ইংরাজ ইংলণ্ডে জন্মিয়াছে, তাই সে ইংরাজ, চাব্‌সি আফ্রিকার জন্মগ্ৰহণ করিয়াছে, তাই সে মহুযাদম নিগর। আফ্রিকার জন্মিয়াছে তাই বালিকা কদম্বা কাকিনী, ঠংলও জন্মভূমি তাই সে ধরাহুন্দরী মের ঠুয়াট। দোব দেশের, দোব জলবায়ু। মৌলিক প্রকৃতিতে হাঁচটি ঠিক করিয়া দেয়, হৈতুকী তাহা চাচিয়া। ছুলিয়া মনের মত করে, তাহার উপর রসান দিয়া, মনোমুগ্ধকরী করিয়া দেয়। মৌলিক প্রকৃতিতে মহুযোর মহুযাত্বকে পত্তয় হইতে পূপক করে, হৈতুকী তাহার আভরণ যোগায়। মৌলিক প্রকৃতি খড়, মাটি, জল ও একমেটে মৃতি; হৈতুকী তাহার কো-মেটেম, তাহার রং—পুতুলের ডাকের সাজ সজ্জা! ইংরাজীতে হৈতুকী প্রকৃতিকে কখনও accident বলিয়া থাকে। ইংরাজ ভারতে অনেক দিন থাকিলে ক্রমে তাহার রং কালো হয়, একটু একটু করিয়া আচার ব্যবহার ও বিকৃত হইয়া পড়ে—এমন কি দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহার ইংরাজত্ব ঘুচিয়া যায়। তখন ইংরাজের হৈতুকী প্রকৃতি ভারতীয় হইয়া পড়ে, ভাষা উন্টাইয়া যায়, ভাব বিকৃত হয়। তখন ইংরাজের জিহ্বা ‘ড’ ‘ট’ র বিভিন্নতা বৃদ্ধিতে পারে।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি ভাষা একটি ব্যাপ্তিক ক্রিয়া মাজ। ভাষা, ছোট ছোট, সামান্য সামান্য শব্দ ক্রিয়া গুলির সমষ্টি ব্রহ্ম ক্রিয়া—শব্দ সমবায়ের বাক্যব্রহ্ম ভাবের সমুদ্ভাবনা। অতএব ব্যাপ্তিক বিভিন্নতাদ্বয়াদ্বা শব্দোচ্চারণ মনালীও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। হিন্দুর নাদ, স্বর ও রব বতটুকু পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া। যে ভাবে ধনিত হইবে, ইংরাজের ঠিক সেই ভাবে সকল ক্রিয়া হইলেও ব্যাপ্তিক পার্থক্য বলত: সব উন্টাইয়া যাইবে। মনে করুন চইজন ইংরাজ ও হিন্দু পথিক মরপ্রান্তে জমণ করিতেছে। দুইজনই

তুমার্ত—হুইজেনই এনের অন্য কড়র; কিন্তু ইংরাজ প্রাণের জালায় বলিয়া উঠিল 'ওয়াটার' (water), হিন্দু বাস্তবায় ফ্রিট হুইয়া বলিল 'উদক' হুই জনেরই মনোগত ভাব এক. এক আবেগে হুইজেনই শব্দোচ্চারণ করিয়াছে, তবে একজনের জিহ্বা 'ওয়াটার' শব্দিত করিল, আর একজন 'উদক' বলিল কেন ? একটি শব্দ উচ্চারণ করিতে অনেক গুলি জিজ্ঞাসা হয়। মানসিক ইচ্ছা বাহু মণ্ডলে গিয়া আঘাত করে—যজ্ঞিককে কেমন যেন একটু উজ্জ্বল করে—স্বাপেক্ষগুলিকে যেন একটু কাঁপাটয়া দেয়। এই কল্পনায় না উদ্বেগে একটি বস্তুর (Energy) উৎপত্তি হয়—বাহ্যকে ভগবান পুণিনি আভ্যন্তর প্রবৃত্ত বলিগাছেন। আভ্যন্তর প্রবৃত্ত যে আবেগে (Intensity) বাক-যন্ত্রকে উদ্বেলিত করিবে, ঠিক তত খানি পরিমাণে উহার বিবৃতি (expansion) এবং সংকুচ (contraction) হইবে। এই বিহার, সম্ভার অসুখাধী বায়ু কঠিনাদী হইয়া, তালু, মূৰ্দ্ধণা অথবা অন্য কোন উচ্চারণ হানে আঘাত করিলে। এই আঘাতে জিহ্বা সে ভাবে নিপীড়িত বা সঙ্কুচিত হইবে, শব্দ ঠিক সেই ভাবে উচ্চারিত হইবে। শিত্তকে যখন 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে বলা যায়, তখন সে যতটুকু প্রবৃত্ত করিয়া কথাটি উচ্চারণ করিবার উদ্যোগ করিবে, যুবা, বুদ্ধ সকলেই প্রায় ততখানি বৃত্ত করিয়া থাকেন; সমান বৃত্ত সকলেরই বাগিত-হয়। তবে যান্ত্রিক সংস্রবের ব্যাপার কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়ে। শালক 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে যে টুকু চেটী করাত্তে তাহার মূলটির মতন কচি বাক্যব্রখানি মুকুণিত (সংকুচ) বা প্রফুটিত (বিবৃত্ত) হইল, করত তাহার চেয়ে আর একটু সংকুচ ও বিবৃত্তি অধিক না হইলে 'রাম' উচ্চারণ হয় না। তা ছাড়া রসনা দেবী যে রীতিতে বায়ুবেগাঘাত বারণ করিবেন সেই প্রকারেই শব্দের জ্যোতি বিকশিত হইবে। অথবা জিহ্বার ফিয়া দোশে এক বর্ণ উচ্চারণ করিতে তাহার সর্ব উচ্চারিত হইবে; যেমন বালকের কানে 'রাম'-'লাম' হইয়া গেল। এইরূপেই 'রামের' লামও হইতে, 'শিত্ত' শব্দের 'কাহারব', 'হুইত্ব'র 'উটারত্ব' এবং ভাষার পার্থক্য সংস্থাপিত হয়। কি নিয়ম প্রণালীতে এই বিভেদ ঘটে তাহা বাক্যবিজ্ঞান অঙ্গগত কথা। যে দেশের লোকের জিহ্বা বেশী ঘোটা, তালু স্থলভর, তাহাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা পৃথক হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? ততাত

এই বৈষম্যের মধ্যে একটু ভাবের, একটু উচ্চারণ প্রণালীর সামান্য
 বেধা: মাত্র। দুই জাতির মধ্যে যত পার্থক্য সামান্য ভাষাদের মধ্যে পার্থক্য,
 ব্যাক্তিক ও ব্যবহারিক ঐক্য বা আত্মীয়তা ততখানি থাকিবে। মূলে সকলেই
 এক হইলেও তৈজস্কী প্রকৃতির জন্য এক বৈষম্য ঘটে। যেমন জলপ্রপাত
 হইতে জল পড়বার সময়ে সকল জলই সমান; কিন্তু ভূমি সংস্পর্শে উহা
 বিক্লিষ্ট হইয়া নানা বিশেষণে প্রধাবিত হয়, এবং ভূমি গুণে নানা ভাবে সরল,
 বক্র হইয়া, মধুর বা ক্ষারস্বাদযুক্ত হইয়া ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন নদী হইয়া
 প্রবাহিত হয়, পরে সকলই মহাসমুদ্রে একভাবে পতিত হইয়া মিলিয়া যায়,
 তেমনি মানবও বধন ওক্ত, ক্রিমি এবং রক্তাণু সংযুক্ত হইয়া মানবী প্রকৃতি
 অবলম্বন করে তখন সকল মানুষই এক। কিন্তু মাতৃগর্ভাশ্রয়ী, ভ্রমণ গুণে
 সাদা, কালো বা ডান্ন রঙ্গের হইয়া, শান্ত, দুই বা উক্কত হইয়া, অথবা
 মাতৃভূমির গুণে তেজস্বী, অধ্যবসায়শীল বা হুসন্তা হইয়া, নানা জাতি হইয়া,
 নানা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম লীলাখেলায় প্রবৃত্ত থাকিয়া, পরে সকলেই সেই
 এক মহাকালসমুদ্রে নিজের অস্তিত্ব জুঝাইয়া দেয়। জলবিশ্ব জলে উঠিল,
 দিনকর-করঞ্জিত হইয়া, কত ভদ্রে, কত রঙ্গে, তেলিয়া হুগিয়া, মাচিয়া
 নাচিয়া মন জুলাইয়া শেষে সেই মহাসমুদ্রে আবার গলিয়া গেল।

আমরা একরকম করিয়া দেখাইলাম কেন ভাষার পার্থক্য হয়। এখন আর
 একটি কথা আলোচনা করিতে থাকি রহিল। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া
 পণ্ডিতগণ বলেন যে আর্যগণ পূর্বে মধ্য আসিয়ায় বাস করিতেন—সেইটাই
 তাঁহাদের আদিম জন্মভূমি। তথায় ভাষারা যে ভাষার কথাবার্তা কহিতেন,
 সেই মৌলিকভাষার ছেলেপুলে আধুনিক ইংরাজী, বাঙ্গালা, কুক, পৌরা-
 নিক, সংস্কৃত, লাতিন, গ্রীক ইত্যাদি। আমরা ভাষা-পার্থক্যের যে কারণ দেখা-
 ইলাম তাহাতে মানুষকে যে একস্থানে কহিতে হইবে এমন কিছু বাধ্য বাধ-
 কতা নাই। ভাষা ভাবের ব্যাক্তিক সমুদ্ভাবন। যে দেশের লোকের বাক্যস্ত্রের
 গঠনপ্রণালী যেমন হইবে তথাকার ভাষা তেমনি হইবে। ইংরাজ ইংলণ্ডে
 থাকে, তাই তাহার ইংরাজী ভাষা। ইংরাজী ভাষায় ইংলণ্ডীয় প্রকৃতি
 গাঁথা আছে। তবে এটা মান্য বটে যে, বৈদেশিক সংস্রবে ভাষা অনেক
 বিকৃত হয়—যেমন আমাদের বাঙ্গালা ভাষা আজকাল দাঁড়াইয়াছে। বেশম-

কীট যেমন ভারতে অণু ছিন্ন করিয়া সুন্দর প্রজাপতি হয়, চীন দেশেও তাই হইবে। যেখানকার জলবায়ু তাহার প্রকৃতির পরিপোষক, সেইখানেই মনোহর প্রজাপতিতে পরিণত হইবে। মানুষ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মানুযায়ী, ভারতেও যেমন পশুত্ব ত্যাগ করিয়া মানবীপ্রকৃতি অবলম্বন করে, আমেরিকায়ও তাই, আফ্রিকায়ও ডেমনি। যেখানে যেখানে তাহার জন্মগ্রহণ-উপযোগী জলবায়ু, তথায়ই তাহার বিকাশ। অধ্যাপক ডারউইন মহাশয় বেশ সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে কেমন সামান্য জড় শক্তি বিকশিত হইতে হইতে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব অবলম্বন করে, এবং পরে আনুশ্রবিকাল হয়। ক্রমোন্নতি প্রণালী বুকিলে আমরা বেশ বুঝিব যে "There is no cradle-bed of human existence"—মাছুষের একটি সাধারণ জন্মস্থান নাই। মাছুষ প্রকৃতির দাস—একটি ফুটন্ত ফুল। যেখানে অকুম হইবে, সেই খানেই ডেমনি ভাবে ফুটিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছি যে, মনুষ্য শরীর যে ভাবে ও যে উপায়ে গঠিত তাহাতে শীত-প্রধান দেশ তাহার জন্মভূমি কখনই হইতে পারে না। শীতোক আবর্ত (Temperate zone)ই তাহার বিকাশভূমি। বাস্তবিক সাধারণ বুদ্ধিতে দেখিতে গেলে ইহাই প্রকৃত বনিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যগণ যে কি দেখিয়া বলিলেন যে মাছুষ একস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আবার সোণার সংসারের কত স্বর্গোপম স্থান গেল, মধ্য আসিয়াই (আধুনিক মতে বাস্টিক উপকূল) তাঁহাদের আদি মাতা। কথাটায় আমরা যেন একটু বাই-বেলী পড় পাই। প্রেভেনা-বীর স্ববেলেক যখন মধ্য আসিয়া অন্বেষণ করিতে আইসেন, তখন তাঁহার সমভিব্যাহারী কতিপয় ইজিপ্তিয়ান কাম্পিয়ান উপকূল হইতে তাহার বেশ পর্য্যন্ত অগ্রীপ করেন। তাঁহারা বলেন, যে মধ্য আসিয়া বড়ই আধুনিক। কিছু পূর্বে সমুদ্রপর্বে নিহিত ছিল। ভূতত্ত্ব (geology) ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যেখানকার ভৌতিক প্রকৃতি এখনও পরিপুষ্ট হয় নাট, যেখানকার ভূমি এখনও লবণাক্ত; মনুষ্য সেখানে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা বুঝি, মাছুষ একেবারে মাছুষ হইয়া টিপ করিয়া সংসারে পড়ে নাই। ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী, ফুলের মতন

একটু একটু হুটিতে হুটিতে যেন কত সম্ভরণে, যেন কত সাবধানে, যেন কত ভয়ে ভয়ে মানুষের অস্তিত্ব সংসারে প্রতিষ্ঠানিত হইয়াছে । সমগ্র সৃষ্ট সংসারে ভিল ভিল করিয়া, গরিয়া বাড়িয়া, সকল শক্তির সকল জৈবীভাব সমষ্টি করিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছে । অতএব যেমানকার ভৌতিক, স্বাভাবিক, আকৃতি, প্রকৃতি পরিপুষ্ট এবং সন্ধ্যাবসম্পন্ন তথ্যই মানুষের প্রথম আবাস স্থান । ভূমিতে হাসি পায়, যে, মকশ্রবশ মধা আশিয়া অথবা তুবারাত্ত (Tuberoles) হুইডেন ও বান্টিক উপকূল মানুষের প্রথম জন্মভূমি । মিটার পেছা ও লেখান এই বিত্তীয় মত্তের সমর্থক । অনাবশ্যক বোধে উক্ত ব্যক্তিবর্গের সকল কথার সমালোচনা করিব না । তবে মোটা কথা এই বলিতে চাই যে, বাহ্য এক মধ্যস্তর (geological age) পূর্বে তুবার নদীতে অগ্নুত ছিল, এখন যেখানে তুবার-রূপা ভূমি স্পর্শ করিতেছে, সেইটুকি মানুষের আবাসভূমি হইতে পারে ? মানুষ সকল স্থানেই নিম্ন বুদ্ধির সাহায্যে থাকিতে পারে, তবে তাহার আদি ও প্রাকৃতিক উপরি শীতোষ্ণ প্রদেশে — যতাবের লীলা ভূমিতে হইয়াছে ।

তাহার পর জাতি-নির্ণয় । পাক্কাভাগন, মানুষকে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে—আর্য্য, তুরানী, সেনিতি ও হাবসি । সার্কভৌম সমাট মেগোলিওন যেমন একদিন যুরোপ যত্নকে বিলাইয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া ছেদে বেলা করিয়াছিলেন, আজকাল আমাদের শিক্ষক মহোদয়গণ বিজ্ঞানের ষাতিরে, মানব মণ্ডলীকে ভাঙিতেছেন গড়িতেছেন—জাতি নিষ্কাশন করিতেছেন । ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গণের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যের ভারতম্য দেখিয়া তাঁহারা এই চারিটি থাক করিয়াছেন । সমগ্র যুরোপবাসী (কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ভিন্ন), হিন্দু, পারসী, কাবুলী সকলেই আর্য্য । পূর্বেই বলিয়াছি মৌলিকতায় মানুষ এক ; তবে চৈতন্যী প্রকৃতির জন্য যত বৈষম্য ঘটে অত্যন্তিক ব্যবহারে ও বাণিজ্যে ভিন্ন জাতিগণের মধ্যে সাদৃশ্যটা বজায় থাকে । অতঃপর জাতির মধ্যে এক অধিক সাদৃশ্য থাকার কারণ আছে । মাননীয় রবার্টসন সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন যে “India, south of the Ganges, is peculiarly deficient in this respect; and the chief reason is that the greater part of this region has been chiefly in the

condition of dry land from very early times." মোটামুটি কথা এই যে, আর্ধ্যবর্ত্ত অন্যান্য দেশের বহুপূর্বে সমুদ্র গর্ভে-
থিত চইয়া জীবের আবাসভূমি হইয়াছে যে সব স্থল জীব
নিবাসভূমি ছিল, অধুনা কালের বিচিত্র গতিতে সে সব প্রদেশ পথোদি-
গতে নিহিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন দেশ নিচয়ের সমনাম-
য়িক আর্ধ্যবর্ত্ত এখনও মানব নিবাসস্থল থাকিয়া কলকরাত্মক বিদ্যাপুষ্কর,
বল সমৃদ্ধির ভূষণ অঙ্গে রাখিয়া এখনও সংসার-শীর্ষে ঠাঁইয়া রহিয়াছেন।
ভারত সংসারকে অঙ্গপূর্ণার ন্যায় জ্ঞান বস্তুনি করিয়াছেন আজিও সে
সদাশ্রিত, সে অগ্রচ্ছত্রের ধুম কমে না। ভারতের জ্যোতিব, ভারতের
রসায়ণ, ভারতের শিল্প, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, ভারতের মণিভূজা হীরা চুনি
সমগ্র পৃথিবীকে শোভিত, ধনা, মান্য, গণ্য, জ্ঞানী করিয়াছে। ঐকগণ
আমাদের খাইয়া মাত্ম, গোমীয় আনাদের ধনে ঐবর্ধ্যালী, আবার সেই
ঐক ও রোমের ষোলো বর্ত্তমান যুরোপ নির্মিত। পারস্যের জেলাবেস্তা
ভারতের আচার ব্যবহার ও ধর্মের আভাস লইয়া প্রণীত। সেই পূর্বতন
অগ্নিহোত্রী পারস্যগণের রক্তে বর্ত্তমান পারস্য গঠিত। তাই এই সকল
জাতিগণের মধ্যে এত বেশী সাদৃশ্য। আবার পুরাণ পাঠে আমরা জানিতে
পারি যে, কত ক্ষত্রিয় শবরত, যবনত, বা মেক্ষত প্রাপ্ত হইয়া কত স্থান
নিবসিত করিয়াছিলেন। এততেও যদি সাম্য না থাকিবে তবে কিসে
থাকিবে?

বিচিত্র বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রাজ্যে সব যেন ছড়াইয়া পড়ে। এই
বিচিত্রতা কেমনে সংসাদিত হয় সাম্যাত্মক যে দিন ইহা জানিতে
পারিবেন, সেই দিনই আর্ধ্যকবিগণের বাক্যবিজ্ঞানের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে
পারিবেন। বুঝিবেন, কি রকম সামাজিক, কি রকম ভৌতিক ক্রিয়া হইলে
সাদা চামড়া কালো হয়, কি খাইলে কি করিলে ধ্বননগন্ধন নয়ন কটা হয়,
কতদিন কি ভাবে বিলাতে থাকিলে বাঙ্গালী পুরা সাহেব হইবে। তখন
বুঝিবেন, আহাৰ ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি কতখানি পরিবর্ত্তিত
হয়। তখন বুঝিবেন, সামান্য শাক সবজী খাটিলেও ধীরে ধীরে প্রকৃতির গতি
কত উল্টাইয়া যায়। তখন বুঝিবেন, নবমীতে নাগিকেল খাটিলে অথবা

জগদিশীতে বার্তাহু ধাইলেও কি অনিষ্ট সংঘটিত হয়—যে সব শাস্ত্রীয় অনুশাসন বাক্য লইয়া আশ্রয় এই অধম বাস্তবতার ছোট বড় প্রায় সব রকমের লেখকগণই হিন্দুশাস্ত্রকে বিক্রম করিয়া থাকেন। সামান্য কথা, সামান্য সংস্পর্শেও একজাতির হৈতুকী প্রকৃতি বিকৃত হয়। যেমন তড়িত গতি একটু বাধা পাইলে অমনি বাকিয়া চুরিয়া, নাচিয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়, প্রকৃতিও এমনি চপল, এমনি নরম যে ভিন্ন প্রকৃতির একটু সংস্পর্শে ভিন্ন দেশীয় একটু বাত্যাঘাতে যেন টলিয়া যায়--বাকিয়া যায়—সমুচিত হইয়া যায়। তাই শাস্ত্রকারগণের এত অনুশাসন—এত সাবধানতা !

তবে কি আমরা বিদেশী নহি ? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই আমাদের আদি নিবাসভূমি ? ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলাভূমি, যতপ্রকারের বিচিত্রতা থাকিতে পারে, যতবিধ বৈষম্য সম্ভবে, ভারতে তাহা সবটাই বর্তমান। মানবী প্রকৃতি যে এখানে বহুপূর্বে বিকশিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? চাইতে পারে সোণার ভারত দহ্যর আকাজিত পদার্থ হইয়া লুপ্ত ও অপলত হইয়াছে। বিদেশী বর্ণোপম স্থান দেখিয়া বাস করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের আর্ধ্য ভারতেরই। ভারতের ব্রাহ্মণের, ভারতের বৈশ্যের, ভারতের ক্ষত্রিয়ের পূর্বপুরুষ কোন বিদেশী লুঠেরা নহে। ভারতের শূদ্র রাক্ষস-বংশাবতঃ নহে। আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ভারতীয় প্রকৃতি মিশিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্দৃষ্টি হইয়াছে, তাই পাশ্চাত্য-মণ্ডিত এই হলহল পান করিতে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য আমাদের শাস্ত্র মণ্ডিত করিয়া বলিল, ঋষিগণ গোখাদক ছিলেন, আমরা অমনি মস্তকাবনমন করিয়া তাহাই স্বীকার করিলাম। অমনি জাতিভেদ উড়িয়া গেল, শাস্ত্র ডুবিল, মনুষ্যত্ব কণ্ঠ্যনাশায় ভাসিল। না জানি, আরও কি কপালে আছে !

শ্রীপাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শিল্প রসায়ন ।

আমাদের মত পরম্ব্যাপেক্ষী জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। সভ্য বলিয়া আমাদের বড়ই অভিমান। ঘর দার, বাগান বাগিচা, ষড়ি জুড়ি, রঙ তামাসা আমাদের সবই আছে। সন্দের অবধি নাই—সব বিকেই কেতাছরস্ত, কিটফাট। কিছ কি করিলে এই সখ প্রকৃতরূপে বজায় থাকে তাহা আমরা জানি না। আমাদের আছে সব, কিছ কিছুই নাই। একটি সূচ বা দিয়াশাণাইয়ের জন্য সাত সহস্র তের নদী পারের পথে হা করিয়া থাকিতে হয়। আজকাল অনেকে এ পরপ্রেক্ষিতার লাগুনা বুদ্ধিতেছেন, কিছ কিসে ইহার সম্যক দূরীকরণ হয়, কিসে এ অভাব পূরণ হয়, দেশের টাকা দেশে থাকে, দেশের সখ দেশে মেটে, দেশের টাকায় দেশীয় লোকের শূন্য উদর পূরণ হয়, সে বিষয়ে সকলেই সেই সমান উদাসীন, সমান নিশ্চেষ্ট, সমান নিক্টিয়। বড় বড় বিষয়ের কথা এখন থাক। যে সব সামান্য সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে বিলাত আমাদের এত কষ্টের ধন প্রতিদিন রাশি রাশি পরিমাণে লইয়া গিয়া আপনার ভাণ্ডার বোকাই করিতেছে,—আমরা যথাসাধ্য কখনায় নিয়মিতরূপে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অভাব যে উপায়ে দূর করিতে পারা যায় এই প্রবন্ধে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুস্তক কিনা কাগজের পাখে' স্বর্ণের

গিলটি করণ প্রণালী ।

প্রথমে দণ্ডরিদিগের প্রেসে পুস্তক কাৎ ভাবে রাখিয়া দৃঢ়রূপে প্যাচ আঁটবে। পরে, আরমেনিয়ান বোঁল নামক দ্রব্য এবং মিস্ত্রি (মিছুরি) এই উভয় দ্রব্য সমভাগে কিঞ্চিৎ জল দ্বারা পেষণ করিয়া চট্‌চটে আটার ন্যায় করিবে। তৎপরে ডিম্বের অভাস্তরস্থ শুক্লাংশ সংযোগ করতঃ তুলি আখবা ক্রস দ্বারা পুস্তক বা দিত্তা বাঁধা কাগজের পাখে' মাখাইবে। পুস্তক পাখে' উক্ত মাধান দ্রব্য শুকগ্রায় হইলে, রসানকাটি (রসায়নকার বা বাণিসকারেরা এক প্রকার প্রস্তর ব্যবহার করিয়া থাকে) দ্বারা পুস্তক পাখ'

বর্ণন করিয়া অমি সমান করিবে, এবং একখণ্ড স্পষ্ট পরিষ্কৃত ঘলে তুবাটরা, নিংড়াটরা ঐ অমিকরা স্থান ভিজাইবে। তখনন্তর বর্ণপত্র (ডবক) মাপ করিয়া কাটিয়া ভিত্তান স্থানে বসাইবে এবং রসানকাটি দ্বারা সকল দিক সমান করিয়া রসান করিবে। একরূপ সাবধান হইয়া রসান করা উচিত, যেন কোন স্থানের কাগজ কাটিয়া না যায়। একখণ্ড বেশমের বস্ত্র খণ্ডের উপর স্থাপন করিয়া রসান করিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর, সেণী বসাইবার সময় তুলা দ্বারা বর্ণপত্র তুলিলে ছিঁড়িবে না। কাগজট একটু সাবধানে করা আবশ্যিক।

অয়েলপেন্‌টিং চিত্রপট ধূম কিস্টা ধুলা লাগিয়া মলিন হইলে পরিকার করণোপায়।

প্রথমতঃ অথ বা গোকর পুরা নন মুক্তে কিকিং পরিমাণে লবণ তালিয়া তাভাতে পশমের বস্ত্র ভিতাইয়া তদ্বারা চিত্রপট সকল মুছিবে। যখন বেশিবে পটগুলি পরিষ্করে হইয়াছে তখন এক খণ্ড স্পষ্ট নিঃশল ঘবে ভিজাইয়া উক্ত চিত্রপট ধৌত করিবে এবং শুক হইলে পরিকার বস্ত্র দ্বারা বর্ণন করিয়া রাখিবে।

(গ্লাস) কাচের উপর ছবি বা অক্ষরাদি অঙ্কিত করিবার উপায়।

কোন কাচ পাত্রে ছবি বা অক্ষর খোদিত করিতে হইলে প্রথমে মোম এবং আল্‌কাত্ৰা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতাপে দ্রব করিবে। তৎপরে খোদাই করিবার পাত্রে একপার্শ্বে উক্ত দ্রবিত পদার্থ মাখাইয়া শুক হইলে বুলি বা নকুন দ্বারা যেৰূপ চচ্ছা, লতা পাতা, মণবা পলী বা যে কোন মূর্তি খোদিত করিয়া তাইডোক্সোট্রিক স্পিড তালিয়া দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। তৎপরে তার্পিন তৈল দ্বারা উক্ত মোম, আল্‌কাত্ৰা উঠাইয়া ফেলিবে। কাচের উপর অতি সুন্দররূপে চিত্রসকল অঙ্কিত হইবে।

জুতার কালি প্রস্তুত করণ প্রণালী।

আইভারি রাফ্‌ বেড্‌ ছটাক, কোড্রা ওড্‌ এক ছটাক, অর্ড্‌ আউল্‌ তিনিয়ার (ছিক্‌), সুইট্‌ অয়েল্‌ অর্ড্‌ ছটাক, টুতে অর্ড্‌ছটাক্‌ এই সমস্ত

প্রত্যেক পৃথক পৃথক রাধিয়া দিবে। পরে সুইট অয়েল, কোডরা ওড ও আইজরি ব্রাক এই এটা প্রত্যেক একত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। কাইয়ের মত হইলে, তুতিয়া, তিনিগার এবং জল ক্রমে ক্রমে তাহাতে সংযোগ করিয়া সন্ধান করিবে। কিস্তিকালের মধ্যেই তাহা হইতে উৎকৃষ্ট জুতার কালি প্রস্তুত হইবে। আমরা সচরাচর ঘেরূপ বিলাতী জুতার কালি ব্যবহার করি, ইহা তদপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট হইবে না। উপায় সহজ, ব্যয় বৎসামান্য মাত্র।

অদৃশ্য কালি ।

ডাইলিউট সলফিউরিক এসিডে নূতন কলম দ্বারা পত্র লিখিয়া অধিতাপ দিলে কাল বর্ণের লেখা বাহির হয়। আজ কাল আমাদের দেশে পোষ্ট-কার্ডের চলন হইয়াছে; যাহারা তাহাতে বহু প্রকৃতিকে, অপরের অজ্ঞাতব্য কোনও বিশেষ সংবাদ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

চিত্তি পড়িলে তাহা বস্ত্রাদিতে

উঠাইবার প্রকরণ ।

বস্ত্রের যে স্থানে চিত্তি পড়িয়াছে সেই স্থানে উত্তমরূপে সাবান ধসিয়া, পরে উত্তম চা খড়ি চাচিয়া, ঐ ওড়া বিয়া উত্তমরূপে বর্ণন করিবে! তখনস্তর, বাসের উপর বিছাইয়া শুক করিবে এবং পুনরায় অল্প ভিজাইয়া দুইবার ঐরূপ করিলে, চিত্তির দাগ উঠিয়া যাইবে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বস্ত্রাদিতে, বিশেষ জামা ও পিরাণে প্রায়ই এইরূপ চিত্তি ধরিয়া থাকে, দেখিতে অতি কদর্য, এমন কি সে জনম নূতন কাপড়ও অব্যবহার্য হইয়া পড়ে, তত্নলোক তাহা আর ব্যবহার করিতে পারেন না। ধোবা সে দাগ তুলিতে পারে না। অথচ ইহা নিবারণের উপায়টি অতি সহজ। সকলের ইহা জানা আবশ্যক।

[ক্রমশঃ

ত্রিরাশচন্দ্র মল্লিক ।

সমালোচনা ।

বিধবা বিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা ।—

সমালোচক শ্রী গণ্ডু স্ব-অল-সকারী সফরঃ । সমালোচক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই । তিনি সবিনয়ে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার মত অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিনয়ই যোগ্য । অনন্ত, অহলম্পর্শ হিন্দু-শাস্ত্র সমুদ্রে সুরণবশীল দুই মৎস্য মধ্যে আপনাকে না ধরিয়া গণ্ডু প্রমাণ জলের সফর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, গণ্ডু প্রমাণ জলে সত্তরপকারী সফর যেমন অণুকাল মধ্যে প্রাণ হারায়, তিনিও বিধবা বিবাহ-সমর্থনকারী পণ্ডিত-গণের তর্কে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন । কিন্তু আমরা তাঁহাকে অভয়-দান করিতেছি । তাঁহার সুক্লিষ্টপণী আমরা বতদূর বুকিয়াছি, তাহাতে তিনি যে ভয়ী হইয়াছেন, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস । তিনি যে প্রণালীতে বিধবাবিবাহ-বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বিধবাবিবাহ পক্ষীয়গণের বিষম চিন্তার বিষয় হইবে সন্দেহ নাই ।

সমালোচক অনেক প্রমাণ দ্বারা নুকাইয়াছেন, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তক শাস্ত্র অতি অল্প, নিবেদক শাস্ত্রই প্রায় সমস্ত । এবং যাহারা ঐ অল্প কয়স্থলে নিধি দিয়াছেন, তাহারা সহস্র স্থানে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । কেবল তাহাই নহে, বর্তমান ক্রমোন্নতি সুক্তিবাদ (Evolution theory) ধরিয়া বিচার করিলে যেমন সত্যযুগের (হিন্দুসমাজের আদিম সভ্যাবস্থা) প্রথমভাগে প্রচলিত ব্রাহ্মস পৈশাচাদি প্রভৃতি নিকট বিবাহ-প্রণালী, এবং কানীন, সহোঢ়, গৃহোৎপন্ন প্রভৃতি সন্তান ক্রমে লোপ পাইয়াছে, বিধবাবিবাহ সেইরূপে এককালে কোন কোন স্থানে প্রচলিত থাকিলেও সমাজের উন্নত অবস্থায় তাহা হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

তার পর তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে পরাশর সংহিতা বিধবাবিবাহ-সমর্থনকারীদের ব্রাহ্ম, তাহা অন্যান্য মুনিভবির, বিশেষতঃ মনু অর্থাৎ স্মৃতিসংহিতার, নানা বচন কোন স্থলে অবিকল ও কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত বচনাবলী ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

৩য়তঃ । ‘ভাই ফেলতে ভাতা কুলো’ “নষ্টে মতে” ইত্যাদি যে বচনটির উপর বিধবাবিবাহ পক্ষ হইতে বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক-অটালিকা নির্মিত হইয়াছে, তাহা পরাশরমুনি নিম্নোক্ত ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ ধর্মের ভারতম্ভা দেখাইবার জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কলিযুগে আচরণীয় বলিয়া উদ্ধৃত করেন নাই। ব্রহ্মচর্য ও সহমরণ এই দুইটি তাহার নিজের বিধান—ইহাই কলিযুগে আচরণীয় এষ্ট সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য। গ্রন্থকার ক্রমে ক্রমে দ্বাদশটি হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহের অমূলক বলিয়া যে সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সমালোচন ও খণ্ডন করিয়াছেন।

৪র্থতঃ । পরাশর-মতে বিধবাবিবাহ বিধিসিদ্ধ ভাবিয়া লইয়া পরাশরের অনেক মত যেমন অপ্রচলিত রহিয়াছে, নৌকিক যুক্তি অমুসারেও ইহা প্রচলিত হওয়া উচিত নহে, এ কথাও প্রমাণ করিয়াছেন।

সমালোচকের যুক্তি প্রণালীর সম্যক বিচার করিতে গেলে একখানি দৃষ্ট পুস্তক হইয়া পড়ে; সুতরাং আমরা হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ অতিষ্ঠ, নিরপেক্ষ হৃদয়দর্শী পণ্ডিতগণের প্রতি সে ভার অর্পণ করিয়া অবসর লইলাম।

কিন্তু আমাদের একটি বক্তব্য আছে। সমালোচক বলেন, “মনুষ্যায়ত্ব হইলে বালিকা বিধবার সংখ্যার যাহাতে হ্রাস হয়, তাহা সর্বতোভাবে কর্তব্য ও সেই জন্য বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেওয়া উচিত।” এই বলিয়া তিনি লিখিতেছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-নিবারণ প্রস্তাব সর্বাংশে শাস্ত্রীয়। বহুবিবাহ এখন দ্বিগিত হইয়া পড়িয়াছে ও দিন দিন উঠিয়া বাইতেছে। আমাদের বিবেচনার প্রথম কারণ—শাস্ত্রীয় যুক্তিই এ প্রথা উৎপত্তির প্রধান হেতু; সকল প্রথাই শাস্ত্রাঙ্গারী পরিবর্তিত ও সংশোধিত হওয়া উচিত। তিনি যে লোকের দ্বারা কথা বলিয়াছেন, সেই “লোক” শব্দটা বড়ই গোল বাধাইয়াছে। সমালোচককে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে এমন কয়জন লোক বর্তমান, যাহাদের মতামত— কোন প্রকার প্রতি অমুরাগ বা বিরাগ-সমগ্ৰ হিন্দুসমাজ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারে? বহুবিবাহ যে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে তাহা শাস্ত্রীয় বলিয়াই উঠিয়া গিয়াছে। বহুবিবাহ-প্রথা মনুষ্যত্বের যথেষ্ট হানি করিতেছিল।

হিন্দুজাতির যে একমাত্র অবশিষ্ট গৌরব—নারীজাতির সতীত্ব তাহার মূল নিখিল করিতেছিল। নিষ্ঠুরতা, দারিদ্র্য প্রভৃতি শত শত ভীষণ পাপ ও অত্যাচার-স্রোত ভয়ঙ্কর প্রবল করিতেছিল। সেই পশুভাব সকল আমাদিগকে এই অত্যাচার দমনে উত্তেজিত করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারদের যে মূল উদ্দেশ্য—সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের যে গূঢ় তাৎপর্য, মনুষ্যকে বাবতীর পশুভাব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা, মনুষ্যকে পূর্ণ মনুষ্য করা, মনুষ্যজাতি বঁাহার অংশমাত্র, তাঁহার অংশ বলিয়া পরিচিত হইবার প্রকৃত উপযোগী করা, সেই মহান উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা বহুবিবাহরূপ অপকৃত্ত প্রথা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের দূতবিবাস, হিন্দুজাতির প্রাচীন জাতির ভাবের—বাহার মূল মন্ত্র, প্রাণ দিয়া মান রক্ষা করা, শরীরের হুখ—কণ্ঠহারী হুখ, বাহ্য হুখ সম্পন্ন অপেক্ষা মনের প্রকৃত হুখ, স্বামী, অনন্ত হুখ, বাবতীর সংস্কারের সম্যক অনুশীলন দ্বারা চিরন্তন প্রসাদ, মনের পূর্ণ শান্তি, জন্মের পূর্বনিশ্চয়কে সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা—আজিও সেইভাবের হিন্দুমাত্র অবশিষ্ট আছে বলিয়া, হিন্দু বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, বিধবাবিবাহের বিরোধী, জাতিভেদের পক্ষপাতী, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী, একাম্বর্তী প্রথার পক্ষপাতী ইত্যাদি। প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দু এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিক নব্য হিন্দুর মধ্যে প্রভেদের মূল ও গূহ্য কারণই এই। শুভরায় সমালোচক যে আক্ষেপ করিয়াছেন “অনেকে বাল্যবিবাহকে দ্বন্দ্ব করে, কিন্তু শাস্ত্রীয় জ্ঞানে এখনও অধিকাংশ লোক ঐ ঘৃণিত ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না,” তাঁহার এ আক্ষেপ রহিয়া যাইবে। বাল্যবিবাহ যদি বাস্তবিকই অনিষ্টের কারণ হইত, তবে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ইহার সপক্ষে বিদ্যি থাকিত না। বাল্যবিবাহের কারণ বাল্যবিবাহ নহে। নিয়তিই যে ইহার প্রধান কারণ, চিহ্নাশীল ব্যক্তিমানই তাহা অবগত আছেন। অবশ্য আমরা গর্ভে অবস্থানকালে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা এবং ৩।৫ বৎসরের বালিকার বিবাহের বিরোধী। যে যে স্থানে এরূপ বিবাহ প্রচলিত, সে দেশের লোকেরা শাস্ত্রভ্রষ্টা। হিন্দুজাতি হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত। দীর্ঘায়ু বা অমায়ু হওয়া যদি অনেক পরিমাণে শারীরিক নিয়ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষার প্রতি নির্ভর করে, তবে অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ার দ্বারা

কে ? যে পুরুষ ৮ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়া বালিকার ২ বৎসর বয়সে মরিয়া গেলেন, তিনি ১৫ বৎসরের যুবতীকে বিবাহ করিলে কি শওখান্দ হই-
তেন ? বাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিবার স্থান এ নয় ।
এখানে পাঠকগণ স্মরণে রাখিবেন, সমালোচক বালাবিবাহের বিরোধী একটাও
শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে না পারিয়া, তৎপক্ষীয় বচন হইতে নিজ মত
সমর্থন করিতে গিয়া সত্যের অপলাপ চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র । যিনি
অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রের এতদূর পক্ষপাতী, শাস্ত্রের ভিত্তির উপরেই যিনি
বিধবাবিবাহ পুস্তক গঠিত করিয়াছেন, তাঁহার মত স্মরণার্থী ব্যক্তির পক্ষে
এ কাজ নিতান্ত পবিত্র হইয়াছে । বালবৈবধ্য নিবারণ পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে
যথেষ্ট উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ, অস্ত
র্ধনী ব্যাকরণ তত্ত্বজ্ঞ, প্রচার ও পালনের চেষ্টা করিলেই ও ভাল হয় ।

ভারত-কুসুম । কবিতাহার এবং ভারতকুসুম রচয়িত্রী এতদিন
আজ্ঞ নাম প্রকাশ করেন নাই । অধুনা, তিনি ভারতী এবং কখনায় নাম
দ্বারা করিয়া কবিতা লিখিতেছেন । তাঁহার আধুনিক কবিতাগুলি,—
“আম্য-ছবি”, “ছাই” প্রভৃতি, তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত পরিচয় দিতেছে ।
কবিতাহার এবং ভারতকুসুম, তাঁহার অল্প বয়সের লেখা, অপরিপক্বতাবস্থার
ফল । কিন্তু বালিকার ক্রীড়াক্রান্তাবস্থায়ও ভবিষ্য রূপ-মাহাত্মীর আভাস
পাওয়া যায় ।

সাহিত্যের দোষ তৎ বিচারকালে, আমরা নারীজাতির প্রতি পক্ষ-
পাতিত্বের ধার রাখি না । গিরীন্দ্রমোহিনীর সম্মুখে ঘণোপব বিস্তারিত
রহিয়াছে, একইমাত্র উদ্ভাসের অপেক্ষা ।

পারিবারিক চিকিৎসা বিধান । প্রথম ভাগ । ডাক্তার শ্রীনন্দ-
লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য একটাকা চারি আনা । আমরা এই পুস্তক
খানি পাঠ করিয়া যতদূর সুক্লিষ্টাছি, তাহাতে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে
পারি যে, গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সফল
হইয়াছে । সাধারণ রোগ সমূহের চিকিৎসা করিতে হইলে বাহা কিছু
জানা আবশ্যক, গ্রন্থকার অতি সরল ভাষায় তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত

করিয়াছেন তাঁহার আর এক বিশেষ ক্ষমতা এই, তিনি যে প্রাণীতে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা সচক্ষেই সাধারণ লোকের বোধগম্য হইবে। পরিবারের মধ্যে যোগ হইলেই সে ডাক্তার না ডাকিয়া নিজে তাহার চিকিৎসা ভার গ্রহণ করিবে, আমরা এ মতের পোষকতা করি না, কারণ, তাহাতে অনেক সময় তিতে বিপরীত ফল দর্শে, তবে ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইলেও যদি গৃহস্থের চিকিৎসা বিদ্যা কিছু কিছু জানা থাকে, তবে তাহাতে অনেক সময় যে বিশেষ উপকার হয়, তাহা গৃহস্থ মাত্রেই স্বীকার করিতে হইবে। আর এক কথা, এখন পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিন যেতদূর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একজন পুস্তকে অনেকটা উপকার হইতে পারে ; কারণ, সামান্য জ্বর, সন্ধি, পেটের পীড়া প্রভৃতি সাধারণ রোগে প্রতিবার ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাইতে সামান্য অবস্থার গৃহস্থ লোকে সক্ষম হইতে পারে না। বিলাতে এমন গৃহস্থ বিরল। যাহার গৃহে সাধারণ রোগ সমূহের ঔষধ বা চিকিৎসা-পুস্তক নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই। এ দেশের অধিকাংশ লোকেই অশিক্ষিত। তবে, আমার কথা—আজ কাল অনেকেই লেখা পড়া শিখিতেছেন, অনেকেই এ প্রকার পুস্তকের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। চিকিৎসাপাশ্রয় যে মোটামুটি রকম সকলেরই জানা উচিত তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ, যাহাদিগকে ছেলেপুতে লইয়া ঘর করিতে হয়, তাহাদের নিত্য প্রয়োজন। আগে প্রাণীনারা গাছ বাড়ড়া দিয়া অরুচি আরাম করিতেন, তখন গৃহিণী মাত্রেই আর কিছু না কিছু ঔষধ পালা জামিতেন। এখন সে দিন কাল নাই। গৃহে গৃহে ইংরাজি চিকিৎসা প্রবেশ করিয়াছে। রোগও দমাই লাগিয়া আছে। এ সময়ে সকলেরই প্রকর্য-মত কিছু কিছু চিকিৎসা জানা আবশ্যিক। সেজন্য, পুস্তকও আজ কাল অনেক বাহির হইতেছে। আমরা তাহার বস্তুগুলি দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এখানি প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পুস্তক পাঠে কেবল গৃহস্থ কেন অনেক পল্লীগ্রামের ডাক্তারেরও উপকার হইতে পারিবে।

কমলা দেবী। [ঐতিহাসিক উপন্যাস।] শ্রীহরিশোহন যুগো-পাঠ্যের কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মূল্য দশ আনা। কমলা দেবী অসম্বিত্য

আকবর বাবশাহের জন্মদেবী। আকবর তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া আপন জন্মস্বরাজ্যের সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কমলা ভারত সম্রাটের একাধিববী চইয়াও পরিতৃপ্তা নহে, বুদ্ধ আকবরের সহবাসে তাহার প্রণয়-পিপাসা মিটিল না। এই সময় বাবশাহের প্রধান সেনা-নায়েক অশিক্ষিত বীর মানসিংহ কমলার মনন পথের শনিক হইল, কমলা সমস্ত বিমুগ্ধ হইয়া আপনার জীবন, দৌবন, মন, প্রাণ সমস্তই মানসিংহকে অর্পণ করিল। মানসিংহ কমলার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে মুগ্ধতা তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহার জন্ম-দর্পণে আর এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সর্বদাই বেধিতে পাওয়া বাইত,—সে প্রতিবিম্ব হেমলতা। হেমলতা মানসিংহের পরিনীতা ভার্য্যা। বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহের প্রণয়ে উন্মত্তা হইয়া সে হেমলতা সর্বভাগিনী। কিন্তু মানসিংহ কমলাকে বাস্তবিক বিশেষ ভালবাসা জানাইত, তাহার কারণ কমলা দ্বারা আপনার অভীষ্ট সাধনের সম্ভাবনা ছিল, সে অভীষ্ট অন্য কিছুই নয়—যোগল রাজ্যের ধ্বংস করিয়া হিন্দুস্বাধীন সংস্থাপন। কিন্তু বীরশ্রেষ্ঠ সিংহের বিধাসম্বাতকতায় সে অভিপ্রায় পূর্ণ হয় নাই।

হরিমোহন বাবু সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। কিন্তু, বলিতে কি, এ উপন্যাসখানি তাঁহার ন্যূনতম লিখিলেই ভাল হইত। ইহাতে ঘটনার পুঙ্খলা নাই, চরিত্র গঠনের পারিপাট্য নাই, বর্ণনার তেমন লিপিতাত্ত্ব্য নাই। আজ কাল দেশীয় মুদ্রাবদ্ধ সকল পুস্তকের বে প্রকার অপর্য্য উপন্যাস উল্লীখন করিতেছে, ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর ন্যূনতম হইলেও আমরা ইহাতে প্রশংসা করিবার কিছু বেবলান না। লেখক ভারতবর্ষ মানসিংহের চিত্রে যেরূপে আঁকিয়াছেন তাহা বেবিধা বাস্তবিক আমরা হৃৎখিত হইয়াছি তাঁহার মানসিংহকে আমরা যেখানে দেখিয়াছি সেখানেই তাহার প্রতি আমরা ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আপনার প্রভু সম্রাটের বিপক্ষে ওপ্ত বড়দত্ত, নীলজ্ঞানোচিত বিদ্যাসম্বাতকতা এবং প্রভু-পতীর প্রতি আসক্তি—তাঁহাও আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্য—মানসিংহের নায় উন্নত বীরের চরিত্রে এ সমস্ত আমরা অহুমোদন করিতে পারি না।

রাজ চিকিৎসক । - ঐরামচন্দ্র ময়িক কল্ক সম্পাদিত । ইহা একখানি চিকিৎসা সংস্কীর্ণ মাসিক পত্র । বাঙ্গালার এ ধরণের মাসিক পত্র বোধ হয় আমরা এই প্রথম দেখিলাম । মধ্যে, হোমিওপেথী মতে কয়েক খানি পত্র দেখা দিয়াছিল কিন্তু তাহার বিষয় স্বতন্ত্র, সে সকল অধিক দিন স্থায়ী হইতেও পারে নাট । কেন স্থায়ী হইতে পারে নাই, তাহার বিশেষ কারণ আমরা তত জানি না । কিন্তু স্থায়ী হওয়া উচিত ছিল । এ পত্র-খাধির স্বাগিৎ আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি । রামবাবু চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক জন কৃতকর্ণা ও উদ্যমশীল লোক, তাহার "ডুপিটস্ হ্যাণ্ড বুক" ও "পাল্চাতা চিকিৎসা বিজ্ঞান" অনেকেরই আদরের সামগ্রী । আমরা তাহার নিকট অনেক আশা করি । এই অরাজক রোগপ্রসূ বাঙ্গালার 'রাজ চিকিৎসকের' প্রকৃত আদর হওয়া নিতান্ত উচিত । বার্ষিক মূল্য ডাক মাণ্ডল সমেত এক টাকা মাত্র । ২২ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, চন্দ্রকিশোর সেনের আব্দুর্সেদ ঔষধালয়ে পাওয়া যায় ।

নিবোধই ইংরেজ লাইব্রেরী, } আমরা এই দুই লাইব্রেরী দুইতে দুই
অয়নগর পুস্তকালয় । }
খানি রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি । পাঠ করিয়া খুশী হইলাম । আজ সাত বৎসর হইল, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই সাবিত্রী লাইব্রেরী স্থাপন করি, এত দিনে সেই উদ্দেশ্য লাভিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি । আজ কাল নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠদুহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সকলেই দেশীর সাহিত্যের উন্নতি করিতে যত্নপর হইতেছেন, ইহা বড়ই সুখের সংবাদ । "সাবিত্রী" আদীর্ঘ্যাদ করিতেছে, তাহার ছোট ছোট ভদ্রমৌগুলি দীর্ঘায় লাভ করিয়া এই মহৎ ব্রত সুচাফরুপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হউন । ইহর তাঁহাদিগের উন্নতির পথে অবশ্যই সহায় হইবেন ।

শিরোমিতি বিদ্যা ।

শারীরিক অবস্থা ।

১। মস্তিষ্ক ও শরীর ।

পূর্বে প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে মানসিক ক্রিয়া সকলের প্রকাশ ও ক্ষুণ্ণি অধিকাংশ যদিও মস্তিষ্কের আয়তনের উপর নির্ভর করে, তথাপি শারীরিক অবস্থার ইতর-বিশেষেও তাহার কতকটা প্রভাব পড়িয়া থাকে। যে সকল শিক্ষার্থী শিরোমিতি বিদ্যার নিয়মানুসারে লোকের চরিত্র নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা যেন শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

মস্তিষ্ক ও শরীরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যে সকল অসংখ্য ব্যক্তি শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিবাপ্ত তৎসমস্ত মস্তিষ্কে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শরীর দুর্বল, পরিচ্ছন্ন বা রোগাক্রান্ত হইলে মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সেই পরিমাণে মৃদুতর হইয়া পড়ে, এবং শরীর বদীয়ান ও উত্তেজিত হইলে মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও ক্ষুণ্ণতর হয়। পক্ষান্তরে মনেরও প্রভাব শরীরের উপর প্রকটিত হয়। আশা ও আনন্দের প্রভাবে রক্তচালনা ক্ষুণ্ণ হয়, শ্বাস-সমূহ সবল হয়, এবং মাংসপেশী সকল দৃঢ় হয়। আহার, হুঃধ, নিরাশার প্রভাবে সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, পরিপাক ক্রিয়া ও রসনিঃসারণ ক্রিয়া মন্দীভূত হয়।

২। শরীর প্রকৃতি ।

শারীরিক প্রকৃতি চার প্রকার *। তাহাদিগের নাম—শ্বেদা-প্রকৃতি ; শোণিত-প্রকৃতি ; পিত্ত-প্রকৃতি এবং বায়ু-প্রকৃতি ।

* আমাদের শাশ্ত্রে তিন প্রকার। যথা, শ্বেদা, পিত্ত ও বায়ু ; রক্ত-প্রকৃতি আমাদের শাশ্ত্রে নাই।

১। উদয়ের প্রাবল্যের উপর স্বেচ্ছা-প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। বাহ্যদের স্বেচ্ছা-প্রকৃতি, তাহাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিঞ্চিৎ গোলাকার, তাহাদের মাংস নরম, নাড়ী ক্ষীণ এবং তাহাদের সমস্ত শরীরে কেমন এক রকম “এলিয়ে পড়া” ভাব থাকে।

২। ধমনী সমূহের প্রাবল্যের উপর শোণিত-প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। বাহ্যদের শোণিত-প্রকৃতি, তাহাদের শরীর কিয়ৎ পরিমাণে স্থূল; তাহাদের মাংসপেশী কণ্ঠিৎ মৃদু—নাড়ি সবল; এবং মুখভাব উৎসাহোজ্জ্বল। তাহারা আগ্রহাধিক, ক্ষুধিবিশিষ্ট, আন্ত তাবগ্রহণশীল। এবং স্বেচ্ছা-প্রকৃতির লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর কর্মতৎপর ও উদ্যমবিশিষ্ট।

৩। পিত্ত-প্রকৃতি যত্নতের প্রাবল্যের উপর নির্ভর করে। পিত্ত-প্রকৃতি লোকদিগের চুল খুব কাণ—চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ—মাংসপেশী হৃদু—অস্থি বড় বড়—শরীরের আকার-প্রকার কর্ণকতা-বাহক। ইহাতে অতিমাত্র কণ্ঠিষ্ঠতা, উদ্যমশীলতা ও বল প্রকাশ পায়।

৪। স্নায়ুতন্ত্রের অতিমাত্র প্রাবল্যে বায়ু-প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বায়ু-প্রকৃতি লোকদিগের চুল পাতলা, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্ম, মাথা বড়, শরীর একটুতেই অস্থস্থ হইয়া পড়ে—রোগা; তাহাদিগের মানসিক ক্রিয়া ক্ষুদ্র এবং ইন্দ্রিয়-বোধ অত্যন্ত তীব্র। তীব্রচেতনা ও মানসিক ক্রিয়াশীলতা এই প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ।

উপরে যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল তাহা পুরাতন তত্ত্বানুযায়ী। আধুনিক তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে দেখয়া বাইতেছে।

মুখ্য শরীরে তিন প্রকার তত্ত্বের বস্তু-সকল দেখা যায়। ঐ প্রত্যেক তত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া। যথা—পতি-প্রধান কিন্না যান্ত্রিক তত্ত্ব; প্রাণ-প্রধান কিন্না পুষ্টিতত্ত্ব; এবং মন-প্রধান কিন্না স্নায়বীয় তত্ত্ব। এই প্রাকৃতিক তত্ত্বের উপর শরীর-প্রকৃতির অতিনব শ্রেণী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত।

যথা :—

১। পতি-প্রধান প্রকৃতি।

২। প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি।

৩। মন-প্রধান প্রকৃতি।

অস্থি ও মাংসপেশী, যাহাতে শরীরের গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহারই প্রবল প্রভাবে গতি-প্রধান প্রকৃতি উৎপন্ন হয় ।

প্রাণন-ক্রিয়ার বস্তু সমূহ বাহ্য বস্তু ও উৎসরের মধ্যে অবস্থিত তাহারই প্রাবল্যে প্রাণ-প্রধান প্রকৃতির উৎপত্তি । এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহের প্রভাবে মন-প্রধান প্রকৃতির উৎপত্তি হয় ।

গতি-প্রধান প্রকৃতি ।

যাহার শারীরিক প্রকৃতি গতি-প্রধান, তাহার অস্থি-সকল অপেক্ষাকৃত বড়-বড়, চোড়া অপেক্ষা লম্বায় বেশি, এবং সমস্ত আকৃতি কোণ-প্রবণ । মাংসপেশী পরিমাণে খুব বেশি নহে, কিন্তু খুব ঘন, দৃঢ়, ও বলশালী । শরীর প্রায় লম্বাকৃতি, যুগ দীর্ঘ; গণ্ড-অস্থি চোড়া, সামনের দাঁত বড়-বড়; ষাড় কিছু দীর্ঘ; স্বক্বেশ চোড়া এবং বুক মাঝামাঝি প্রশস্ত, চুল কালো, শক্ত, এবং প্রচুর । শ্বাসবায়ু সকল খুব বহিঃপ্রস্থ এবং যুগভাব কঠোরতাব্যঞ্জক । সমস্ত শরীর-তন্ত্র শক্ত, বলশালী ও লম্বসহ । এই প্রকৃতি যাহাদের শরীরে বলবৎ তাহাদের উদ্যম, বল ও কাণ্ড করিবার শক্তি খুব বেশি । তাহাদের চরিত্রে খুব একটা বিশেষত্ব আছে, এবং জনসমাজে তাহারাই সর্বজন-স্বীকৃত নেতা হইয়া থাকে । মন্ত্রণা-গৃহ অপেক্ষা বুদ্ধ ক্ষেত্র তাহাদের উপযুক্ত বিচরণ-ভূমি । তাহারাই প্রায় রাজ্যের সৈন্য-বিভাগে ও পুষ্ঠ-বিভাগে প্রাধান্য লাভ করে । তাহাধিগের চিন্তাশীলতা অপেক্ষা বর্ণনশীলতা অধিক । তাহার দৃঢ়, আত্ম-নির্ভরপ্রিয়, প্রেম ও বন্ধুত্বতে অটল, কার্য-নির্বাহক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং অধ্যবসায়শীল । তাহার প্রভুত্ব করিতে ভাল বাসে এবং এই উদ্দেশ্যে আপনার ও অন্যের শারীরিক যুগ বিসর্জনে কুণ্ঠিত হয় না । যে সকল বস্তু এই প্রকৃতির লোক তাহার খুব হোরাণ কথা প্রয়োগ করে—অনেক কথা সৌক দিয়া বলে, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে না—যতটুকু



বলা আবশ্যিক ততটুকু বলে। “কামারের ঠুংঠাঙ্ক শ্যাহুর এক ঘা” এই কথাই সার্বক্য তাহারা সম্রমাণ করে।

এই প্রকৃতি বাহাদেবের অতিমাত্র প্রবল তাহারা পাশব বলের অবতার বিশেষ। তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের উচ্চ-দেশ সন্নিবিষ্ট ও তলদেশ প্রশস্ত। ঘাড় খাটো ও স্থূল; স্বক্ক প্রশস্ত; নাক চোঁড়া, মাংসপেশী খুব স্থূল, দৃঢ়, ও পাকানো। গতি প্রকৃতির এইরূপ অতিমাত্র বিকাশ যে বাণিজ্যে দেখা যায়, পাশব বল ছাড়া আর তাহার কিছুই থাকে না। তবে থাকিবার মধ্যে এক নির্বুদ্ধিতা। মাংসপেশী থাকা মন্দ নহে, কিন্তু সমস্ত মস্তকের বিনিময়ে মাংস-পেশী অর্জন করা বাহুনীয় নহে।

দৃঢ়তা, সুসুংসা, জিবাংসা গতি-প্রকৃতি লোকদিগের প্রধান লক্ষণ। হিন্দুস্থানী ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়।

প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি।

প্রাণ-ক্রিয়ার প্রধান বস্তুগুলি বক্ষ ও উদরের গম্বুজের অধিকার করিয়া থাকে। এই অন্য বাহাদিগের প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি তাহাদের শরীর বস্তুটা প্রশস্ত ততটা দীর্ঘ নহে। এবং কিকিৎ বর্তূলাকার। বুক ভরা ভরা; উদর-প্রদেশ বেশ পরিপুষ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল স্থূল ও ক্রম-সন্নিবিষ্ট; হস্তপদ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ঘাড় খাটো ও স্থূল, স্বক্ক প্রশস্ত ও কোণালু নহে। মস্তক ও মুখ গোলাকার-প্রায়। মুখ-ভাব প্রীতিজনক ও হাস্যময়।

বাণাদিগের এই প্রকৃতি প্রবল তাহারা কি শারীরিক কি মানসিক উভয়-পক্ষেই ক্রিয়ারশীল। তাহারা মুগ্ধবায়ু সেবনে ও শারীরিক পরিশ্রমে অমুরাগী; তাহারা আবেগে, কথাবার্তায় ও উৎসাহজনক তর্ক বিতর্কে যোগ দিতেও তাহাদের ভাল লাগে। কিন্তু গতি-প্রকৃতির লোকদিগের ন্যায় তাহারা ততটা কঠিন পরিশ্রম করিতে কিংবা কোন গভীর আলোচনায় মন সম্বন্ধান করিতে সমর্থ নহে। তাহারা আত্মহাসিত, আবেগচালিত, নানা বিব-য়িতীযুক্তিসম্পন্ন এবং কখন কখন চপল; তাহারা ভ্রমসহিষ্ণু কিন্তু কোন বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহারা খুব চটকু লাগাইতে পারে

কিছু বুদ্ধির ততটুকু গভীরতা নাই। তাহারা খুব রাগী, কিছু তাহাদের ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী নহে। যেমন অম্মেতেই তাহারা উত্তেজিত হয় তেমনি অম্মেতেই আবার শান্ত হয়। সাধারণতঃ তাহারা প্রবৃত্ত, সৌম্য ও মিত্তক। তাহারা আধুনে লোকের সঙ্গ ভাল বাসে এবং আহার বিহারে খুব অহরঃণী। মাদক দ্রব্য সেবন ও অতিভোজন দোষে লিপ্ত হইবার তাহাঙ্গিণের বিলক্ষণ প্রবণতা আছে।



যাহাঙ্গিণের প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি তাহাঙ্গিণের সাধারণতঃ পাশব বৃত্তি সকল প্রবল—বিশেষতঃ তাহাদের মিত্ব-লালসা, বুদ্ধি, এবং অর্জুনস্বা বলবতী। দয়া, আশা, ও আমোদপ্রিয়তাও তাহাদের বেশ পরিপূর্ণ।

এই প্রাণ-প্রধান প্রকৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথাঃ—
রক্ত-প্রধান* ও রস-প্রধান†। যাহাদের বুক খুব গম্ভীর এবং শরীর নিত্যস্থূল নহে তাহারা রক্ত-প্রধান প্রকৃতির লোক। এবং যাহাদের বুক সে রূপ গম্ভীর নহে, কিন্তু লম্বোদর ও স্থূলশরীর, তাহারা রস-প্রধান প্রকৃতির লোক।

বঙ্গালীদিগের মধ্যে এই রস-প্রধান প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিবার জন্য আর এক ভাবে এই প্রকৃতিগুলির ত্রৈণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

মন-প্রধান প্রকৃতি	সাহিত্যিক প্রকৃতি।
পতি-প্রধান	রাশনিক প্রকৃতি।
রক্ত-প্রধান	তামসিক প্রকৃতি।
রস-প্রধান	

মন-প্রধান প্রকৃতি।

মন-প্রধান প্রকৃতি, মস্তিষ্ক ও ব্রাহ্ম-ভক্তের আধিক্য চাইতে উৎপন্ন হয়। যাহাদের এইরূপ প্রকৃতি তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং

* Sanguine temperament.

† Sympathetic temperament.

মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ; মুখের গঠন ভিন্মাকৃতি ; উচ্চ কপাল, কপালের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত ; মুখাবয়ব-সকল স্বচাকুরূপে খোদিত ; সমস্ত মুখ ভাব-ব্যঙ্গক ; হৃদয় কোমল কেশ ; কোমল চর্মে এবং কণ্ঠের উচ্চ-গ্রাম্পস্বর্ষী ও নমন-শীল । সমস্ত শরীরের গঠন সুন্দর ও পরিপাটি । কিন্তু অসাধারণ ও অমকালো নহে । হৃদয়মণ্ডিতা, মার্জিত-ভাবুকতা, হৃদয়-মৌন্দর্য্যানুরাগ প্রভৃতি ভাব সকল এই প্রকৃতির মানসিক অভিব্যক্তি । চিন্তা সকল ক্ষুদ্র, ইন্দ্রিয়-বোধ তীব্র, কল্পনা ক্ষুদ্রিময়ী এবং ধর্ম্যভাব সকল সাধারণতঃ সক্রিয় এবং প্রভাবশালী । মন-প্রধান প্রকৃতিতে, কপালের উৎকৃষ্ট অংশ সকল এবং মস্তকের চূড়া-প্রবেশ বিশিষ্ট রূপে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ।



হেতুবর্শিতা, তুলনা-জ্ঞান, ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা, এবং ভক্তির প্রাধান্য হয় এবং যে রক্তি-স্থান তলি মস্তকের পশ্চাৎ ও তলদেশে অবস্থিত তাহার। তেমন সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না । এই প্রকৃতি অস্বাস্থ্যকর নীমায় উপনীত হইলে বায়ু-প্রকৃতিতে পরিণত হয় । এই প্রকৃতির আতিশয্যে, মাংসপেশীর ক্ষীণতা, শারীরিক দুর্বলতা, অমৃতব-তীব্রতা এবং আশুযুগ্মতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । মস্তিকের অকালপক্কতা ও সামঞ্জস্য-হীন অতিবৃদ্ধি এই অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থার পশ্চন-ভূমি । এবং আলসাকর অভ্যাসে, চা, কফি, তামাক প্রভৃতির অপরিস্রিত ব্যবহারে, এবং অন্যান্য হানি-জনক বস্তুর

দেবনে হহার মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠে। সাহিত্যাহ্নীলক পণ্ডিতগণের মধ্যে এই প্রকৃতির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতি-সামঞ্জস্য ।

উপরোক্ত কোন প্রকৃতির আভিপ্রাণ্য হইলে, কি মন, কি শরীর উভয়েরই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব নষ্ট হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে শরীর ও মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে একের পরিবর্তনে অপরটিরও পরিবর্তন হয়। যথোপযুক্তরূপে প্রকৃতিপন্থের সামঞ্জস্য হইলে শারীরিক অবস্থার পূর্ণতা উপন্ন হয়। অতএব বাহ্যতে এই সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, কিম্বা কোন প্রকৃতির আভিপ্রাণ্য বর্জিত না হয় তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।



এই যে প্রতিকৃতিটি বেওয়া গেল, ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে প্রকৃতিত্রয়ের সামঞ্জস্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ব সামঞ্জস্য প্রায় কোথাও দেখা যায় না। পূর্ব তার নিকটবর্তী হওয়াই প্রার্থনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে এই তিন প্রকৃতির কিছু না কিছু অংশ নানাবিক পরিমাণে আছে—এই নোনা-

বিক্যের পরিমাণ ও সংমিশ্রণ স্থির করাই সুকঠিন। বহুধর্মনে ও বহুপন্থীকার পর এই প্রকৃতিনির্ণয়-জ্ঞান জন্মে।

[ক্রমশঃ।

ঐতিহাসিকনাথ ঠাকুর।

যাই,—যাও ।

১
যাই, তবে যাই ।

আকুল ঝটিকা সদা ছোটে যে সমুদ্র-মুখে,
জগত কি পারে দিতে সুকে তারে ঠাই ?

যাই, তবে যাই ।

কাটে কি তাহার বেলা ল'য়ে লতা-পাতা-পেলা,
ল'য়ে তটিনীর উর্ষি, নারীর কুন্তল ?—

প্রাণে যার সদা কোলাহল !

২
যাই, তবে যাই ।

ধূধূ সাগর-ধারে, অনন্ত বাসুর পাড়ে—
ধূধূ মধ্যাহ্ন রৌদ্রে লুটাই—উড়াই !

যাই, তবে যাই ।

শত শত রাজ্য-কথা, শত ভগ্ন হৃগ্ন-গাথা,
ওতপ্রোত করিতেছে ছন্দস্ব বাহার ;—

সদা ছলু ছলু পায়ে পড়িবে তোমার গায়ে,
এ তার অসাধা কৰ্ম্ম—আনুহত্যা তার ।

৩
দাও, ছেড়ে দাও ।

কেন নিমেষের ধরে মার্মধানে এসে পড়ে
চূর্ণ হ'য়ে যাও ?
যাও, যাও, যাও ।

৪
যাও, যাও, যাও ।

আমি জগতের দূরে, তুমি জগতের পুরে,
তোমার আমায় হবে কেমনে মিলন ?

আমার অন্তিহ—খেলা । যা কিছু ভাবিয়া ফেলা ।—
তোমার—আমারে চেয়ে কেবল ক্রন্দন ।

তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন ?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ।

কি কি সংস্কার করিতে হইবে ।

কিছু সংস্কার আবশ্যক তাহা আশোচনা করিবার পূর্বে কি কি সংস্কার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা আবশ্যক কারণ, আগে রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা ঠিকিতে পারে না । এই প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য কেবল রোগগুলি নির্দেশ করিব ; সে সকলের কারণ এবং তদপন্থনের উপায় নির্ধারণ করিব না । রোগের কারণ নির্দেশ এবং ঔষধের ব্যবস্থা একত্র হইয়াই বুদ্ধিসঙ্গত এবং মঙ্গলকর ।

“ সংস্কার ” প্রবন্ধে আমরা ব্রাহ্মইদ্রাহি, সংস্কার করিতে হইলে গৃহে তাহার আরম্ভ । গৃহ-সংস্কারের ফলই সমাজ সংস্কার, সমাজোন্নতি । এক্ষণে দেখাইতে হইবে, সেই গৃহের কি কি সংস্কার কর্তব্য । গৃহ-সংস্কার বলিতে গেলে—বিশেষতঃ হিন্দুগৃহ সংস্কার বলিতে গেলে—হিন্দুপরিবার প্রথার সংস্কারের কথা প্রথমেই উঠে । কাবণ, হিন্দুপরিবার লইয়াই হিন্দুগৃহ । হিন্দু-জীবন হিন্দুর গৃহেই গঠিত হয় ।

হিন্দুপরিবার প্রথার কোষগুলি আশোচনা করিবার পর দেখিতে হইবে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাবের অভাবে আমাদের জীবন কিরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আমাদের গৃহ কি প্রকারে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে । অপর পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বটে, বঙ্গমহিলা-গণের প্রভাবেই বাঙ্গালীর গৃহে আজিও ধর্ম্মস্থান—পূজার্ত্তনা, ব্রত-নিয়ম, দানধ্যান, অতিথিলেবা প্রভৃতি অনেক পুণ্যকর্ম্ম অহুত হইতেছে । কিন্তু চক্ষুলাভ্য তাপ করিয়া সরলাস্তঃকরণে সকলে বলুন দেখি, আজ কাল কয়জন মহিলা ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য লক্ষ্যরূপে করিয়া, ধর্ম্ম বুঝিয়া, সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করেন ? ধর্ম্মের মন্ত্রপ্রদান কমলা দূরের কথা, তাঁহারা প্রত্যহ হরহরি প্রভৃতি ইষ্টদেবতার অর্চনার্থ যে সকল যত্নোচ্চারণ করেন, সেই সকল যত্নের অর্থ কয়জন জানেন ? তাঁহারা যে

তিথিবিধিগণে পুরোহিত কর্তৃক চণ্ডী " পড়তির পাঠ শ্রবণ করেন, তাহার করণ বর্ণ ভাঙার বৃক্ষিতে পারেন ? সত্য বটে, ধর্ম্মে প্রগতি আনয় থাকিলে পাপকার্য্যে স্বপ্ন এবং পুণ্যকর্মে শ্রদ্ধা জন্মে, সংস্কার সমূহের অনুশীলন হয়, এবং জীবনে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধ ভক্তির দ্বারা কতকদূর আগসর হওয়া যায় বটে, এবং সেই কারণে বঙ্গনারীকুল পুরুষগণের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত, ধন্যপরাদেশ এবং মজুমদারের অধিকারিণী বটে; কিন্তু তাহা হইলেই হইল না। পরিণামে টেহার যে বিষময় ফল, তাহা দলিবেই দলিবে। জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির উৎকর্ষ ও প্রাতিভা জন্মে। কেবল অকবিশ্বাসে পরিণামে কার্য্যের অপব্যবহার ঘটে। আমাদের নারীগণের তাহাই ঘটিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অপরিমিত ভাগ প্রবেশ করিয়াছে; অনেক ধর্ম্মাশ্রয়ী বাত্বিক হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই সকল ধর্ম্মাশ্রয়ীদের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, অন্তর বিশোধিত করা, মন পবিত্র করা, সংস্কারনিচয়ের পূর্ণ স্বর্জ্জিসাধন করা, তাহা বড় বেশী ঘটিতেছে না। বহুদলিলাগণ এক দিকে অনেক পুণ্যাস্রয়ী করিতেছেন; অন্য দিকে ঈর্ষ্যা, ঘেব, হিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিরুপস্থিত বৃত্তি সকলের অপরিমিত অনুশীলন করিতেছেন। তাহাদের কোণসৃষ্টিতে পড়িয়া বঙ্গগৃহ এখন জলিয়া পুড়িয়া জ্বলি হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদিও টেহা হিন্দু-পরিবার প্রকার একটি অঙ্গ, আমরা যথাসময়ে স্বতন্ত্রভাবে এই বিষম সঙ্কটের উৎপত্তির কারণ এবং তৎকালের উপাশোধন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

একদা হিন্দুপরিবার প্রথার কোন কোন স্থানে বিরূপ যুগ ধরিয়াছে প্রথমে তাহার আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য, সকল দোষের উল্লেখ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। চিত্তাশীল, বহুদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিষয়ের যত আলোচনা করিবেন, ততই নূতন নূতন দোষের আবিষ্কার হইবে। আমাদের সামান্য ক্ষমতায় যতটুকু পারিচ্ছি এ প্রবন্ধে তাহাই প্রকটিত করিলুম। নির্দেশ অগসরে দোষগুলির বিচার যেটুকু হয় করা গেল। বিস্তারিত চিচার, কারণনির্দেশ এবং তদপনয়নের উপায়-উদ্ভাবন কালে করিতে মনস্থ করিয়াছি।

১ম। স্বার্থপরতা বা প্রকৃত স্বার্থসাধনে বিরতি। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী কথায় কেহ কেহ হাগিয়া উঠিবেন যোধ হয়। কিন্তু একটু তলা-টরা দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে ভুল্ল বিসময়ের লোভ, ক্ষমতা লাভে আকাঙ্ক্ষা, ভোগসুখে দিশম অহুগগকে আগরা প্রকৃত স্বার্থসাধনে বিরতি বলি। যে ধনের লোভে প্রাণগম মহোদর, জাতুপুত্র প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিতে হয়; বাহার অন্য তাম্ব্রাকীট অহরহ জন্ম করিয়া বাইতে থাকে; যে অর্থ আজ আছে কাল নাই; বাহাত কথিক আমোদ পাওয়া যায় মাত্র সেই অর্থলোভে যে লালায়িত তাহাকেই আমরা প্রকৃত স্বার্থসাধনে বিনত বলি। একদম লোকেরা এক দিকে অর্থ দন শস্য করে, অন্য দিকে তাহা অচিরে ধ্বংস হইয়া যায়! তাহারা লোভে পড়িয়া অর্থ, মান, সম্মান হারায়; নিজ পুত্র পৌত্রানিকে দাক্ষ্য ভূষণে নিপতিত করে; এবং বাবজীবন এক নিমেষের জন্য জন্মে শাস্তি, চিরজমান ভোগ কহিতে পার না। তাহারা এই যোভে পড়িয়া—হীরক ফেলিয়া কাচে লোভ করিতে গিয়া—বিশম মর্কনাল বটাইয়া বসিতেছে। সাম্প্রতিক তাহারা বড় নির্দোষ। কিন্তু তাহারা মাগের দিকে দৃষ্টি করিয়া সমস্ত আত্মীয় পরিজনকে সমভাবে প্রতিপালন করিয়া, আপ-নার উচ্চপক্ষে আপনি অগিষ্ঠিক পারিষা, জীবনমাত্রা নির্বাহ করেন, চিরের পরম ভূক্তি—জীবনে পরম সুখ লাভ করেন, তাহারাষ্ট প্রকৃত স্বার্থ চিনেন। তাহারাষ্ট পবিত্রানন্দমণী, বুদ্ধিমান। আমরা সকলে স্বার্থপর নহি বলিয়াই পদে পদে এত ভ্রম বধনা, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি। বর্তমান একাদশবর্তী পরিবারের কর্তা ঈদানীং এই স্বার্থ ভুলিয়া সংসার ভাবিয়া চূর্ণিয়া একাকার করিতেছেন। কর্তার সতিত গৃহিণীর যোগ-ভোগে তাহাদের দেখাওনি ক্রম পরিবাহক সকলেরই নিজ নিজ ভোগ-সুখে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই স্ব স্ব পদান হস্তা উঠিতেছেন। পরিবার-প্রথা মনুলে নির্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২য়। এই স্বার্থপরতাই অবিস্বাসের প্রসূতি। এই স্বার্থপরতা বা প্রকৃত স্বার্থে বিরতি আত্মদিককে পাতারণায় সুপটু করিয়াছে। এখন পিতৃবা জাতুপুত্রে, মহোদর মহোদরে অধিক কি পিতাপুত্রে পরস্পর পরস্পরকে অবিস্বাস করেন। কেহ কাহারও নিকট নিজ সম্পত্তি রাখিয়া নিশ্চিন্ত

নহেন। প্রতিপক্ষেই সন্দেহ, বাকবিত্তা, মামলা-মোকদ্দমা। সংসার এখন ঘোর অশান্তি ও বিষম বস্ত্রপার স্থল হইয়া উঠিয়াছে।

৩য়। যখন দেখা গেল, খুড়া বা জ্যেষ্ঠা ভাইপোর, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদরের, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের স্বখস্বাদু কামনা করেন না, নিজের জীপুত্রাদির সকল অভাব দূর করিতে মনোযোগী এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সুখী করিবার জন্য বকনার মানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তখন সেই সব আচরণ মৰ্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া জন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে বিচলিত করিয়া দেয়। ক্রমে ভাগবাসার মূল শিথিল হইয়া যায়। সন্দেহ জন্মাইয়া, বিশ্বাস নষ্ট করিয়া পরস্পরের প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা, স্নেহ মমতা, প্রীতি, সহানুভূতি ক্রমে সম্বৃদ্ধি করিয়া ফেলে। এখন হিন্দু-পরিবারে এই মহা অনর্থ ঘটয়াছে। আমাদের জন্ম হইতে দিন দিন এই সকল নৈমিত্তিক, স্মরণ, পবিত্র বৃত্তি শুকাইয়া বাইতেছে। সুতরাং জীবনের শক্তি, জন্মের তৃপ্তি, মনের প্রকৃত সুখ ক্রমেই দূরে পলায়ন করিতেছে।

৪র্থ। এই প্রেম-সঙ্গীতের ফল—ঈর্ষ্যা, ঘেব ও হিংসা। যখন একের দুঃখে অন্যের প্রাণ কঁাদিত, একের সুখে অন্যের জন্ম উৎসব হইয়া উঠিত, তখন এ সকল পশুবৃত্তি দ্বিসীমায় আনিতে পারিত না, তখন এ সকলের অস্তিত্ব-বোধই ছিল না। কিন্তু এখন আর সে মহান ভাব নাই। এখন খুড়া, ভাইপো প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনদের স্বখ-সমৃদ্ধি মান-সম্মানে চোখ টাটায়, সে সব বড়ই মৰ্ম্মান্তিক ও অসহ্য। ঈর্ষ্যা মন পুড়িতে থাকে। নিজে তরুণ ঈর্ষ্যা ও সম্মানলাভে অসমর্থ বলিয়া তাঁতাদের প্রতি বোর ঘেব জন্মায়। সে পতঃ পরতঃ তাহাদের শত্রুতা করিতে থাকে। ক্রমে তাণ্ডা কার্যে পরিণত হয়। বিবাদ বিদ্রোহ, মামলা মোকদ্দমা হিংসা-বৃদ্ধির পূর্ণাঙ্গতি। অবশেষে সর্বস্বান্ত হইয়া ঈর্ষ্যা ঘেব হিংসার সহিত ভয়সাৎ চণ্ডারাই ইহার পরিণাম।

হিন্দুপরিবারের এক দিকের চিত্র অঙ্কিত হইল। ইহার আর এক দিক আছে। সকলেই জানেন, হিন্দুপরিবার-প্রথার বর্তমান অবস্থা অতি হীন হইলেও এখনও ইহার বখেট প্রভাব আছে। অনেকের জন্মে

ইহার মাহাত্ম্য অদ্যাপিও আগরিত রহিয়াছে। যাহাদের গৃহে এখনও এই প্রথা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তাঁহাদের কি কি দোষ জন্মিয়াছে,—কি কিং আলোচনা করা যাউক।

১। দরিদ্রতার উৎপত্তি। এক পক্ষে এ কথা সত্য বটে, যে দশ জনের অর্থ একত্র থাকিলে সমস্ত পরিবারের সর্বপ্রকারে যেমন সুবিধা হয়, সকলে বেক্রম স্বর্থ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন পৃথক্ হইলে তাহার শতাংশও লাভ করা যায় না; বরং তাহাতে এক তপের স্থানে চারি খণ্ড ব্যয় হয়, এবং আরও অনেক বিষয়ে নানাপ্রকারে কষ্ট ও যত্ন-তোলা করিতে হয়। কিন্তু এ কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, হিন্দুপরিবারে এক জন উপার্জনক্ষম হইলে আর পাঁচ জন সব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার অর্থে নিঃস্বার্থ এবং পুত্রকলত্রাদির ভরণ-পোষণ করেন। কোথায় তাঁহার স্বয়ং উপার্জন করিয়া সমস্ত পরিবারের সুখবৃদ্ধি করিবেন, এক জনের অতিরিক্ত পরিশ্রম লাঘব করিবেন, ভবিষ্যতের জন্য ধনসঞ্চয় করিবেন তাহা না হইয়া তাঁহার “ঘোড়া দেখিয়া ঘোড়া” হইয়া বসেন। সেই এক জন বহু দিন জীবিত থাকেন শুভ দিন একরকম করিয়া সংসার চলিয়া যায়। তার পর, তাঁহার নিয়োগে সে সংসারের কি হৃদিশা হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহার ভুক্তভোগী। আর যাহাদের পিতা বা অন্য কেহ বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বক্তব্য থাকিলেও আপাততঃ বিরত রহিলাম। কেবল রাজার শোষণে আমাদের দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে না, আমাদের নির্মুক্ততার আমরা গৃহে গৃহে এই দারিদ্র্য-বীজ বপন করিতেছি; প্রতি বৎসরে যে হৃদয় হইতেছে গৃহে তাহার প্রথম উৎপত্তি। Political economy প্রভৃতির কথা তুলিতে হইলে গৃহেই তাহার আরম্ভ করা উচিত।

২। এই ‘ঘোড়া দেখে ঘোড়া হওয়া’ রোগ হইতেই আলস্য ও অকর্ম্ম-ব্যতা জন্মিয়াছে। জগৎভ্রম লোক জানে, বাঙ্গালীর মত অলস, দীর্ঘস্থীতি, নিরক্ষর, অকর্ম্মণ্য জাতি আর নাই। পুরাতন হইতে আমরা একের অর্থে উত্তর পূর্ণ করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এমন অপ-দার্থ হইয়া পড়িয়াছি, যে আমাদের দ্বারা আর কোনও কাজ হইতে পারে

না। বহুকালের অভ্যাশে আলস্য আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহা আমাদের এতদূর প্রকৃতিগত হইয়াছে, যে কোনও কাজে আমাদের আর উৎসাহ হয় না; কোনও কাজ আরম্ভ করিয়া আমরা তাহা শেষ করিতে পারি না। আলস্যের নিকট অধাবসায় কি এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে?

৩২। এই আলস্য ও কার্যাত্যাব হইতে আর এক নিষময় ফল যে উৎপন্ন হয়, তাহা নিতান্তই সাংঘাতিক। প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্যের লোপ হওয়া এবং আলস্য ও অন্য কর্ম্মভাব তাহার হানাদিকার করা অবধি ভোগ-বিলাসে আমাদের আত্যাত্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। আগ্রা দিন দিন ঘোর বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেছে। হিন্দু গৃহশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বড়ই শিথিল হইয়া যাইতেছে।

৩৩। এই আলস্য ও ইন্দ্রিয়বশাত্তর ফলে আমাদের ধর্ম্মভাব ক্রমে সন্নিহিত হইয়া পড়িতেছে। জন্মে যতই তামসিক ভাব প্রবল হয়, সাত্বিক ভাব ততই কমিতে থাকে। সে ভাব ধারণা করিতে হইলে বহু পরিশ্রম করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে হয় আলস্যের প্রভাবে তাহা ঘটিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের ধারণাশক্তি, চিন্তার একাগ্রতা, মনের বিস্তৃক্ত ভাব ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

আমরা হিন্দুগৃহের প্রধান কয়টি সংস্করণীয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। প্রধান কয়টি দোষ পরিচয় করিতে হইলে তদন্তগত অনেকগুলি দোষের কঠোর হস্ত হইতে পরিচয় পাওয়া আবশ্যিক। আমরা একে একে প্রত্যেক দোষের বিস্তৃত আলোচনা করিব। দেখাইব, হিন্দুগৃহের গঠন সম্পূর্ণ হইলে হিন্দু-সমাজের পূর্ণতা সাধিত হইবে। হিন্দুগৃহ, হিন্দুসমাজ একই বস্তু। একটির উন্নতি বা অবনতিতে অপরটির উন্নতি বা অবনতি বরাবর হইয়া আসিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। ব্রাহ্মনৈতিক সংস্কার সমাজ সংস্কারের অন্তর্গত। তথাপি সাধারণ এ কার্যে ব্রতী তাঁহাদিগকে আমরা এই বলি যে, যে সহানুভূতি, একতা, সাহস, উদ্যম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সকলই সমূহের অভাবে তাঁহারা ব্রাহ্মনৈতিক জীবন গঠিত করিতে পারিতেছেন না, সভ্য জগতে বাঙ্গালী একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না, গৃহে তাহা শিক্ষা

করিতে হইবে। শিশুকাল হইতে মাতা-পিতার নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার কথা। গৃহ-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার—সকল সংস্কারই এক গ্রন্থে গ্রহিত। তাই আশাদের সাধনায় নিবেদন, সকলে বুদ্ধি, ক্ষমতা, এবং কার্যের পরিসর কমাইতে থাকুন। অল্প হইতে কার্য আশ্রয় করুন। আগে হেলে ধরুন, তার পর কেউটে ধরবেন। কিছুকালের জন্য ভারতভূমি, বিশ্বপ্রেম, সার্বভৌমিকতা, বিশ্বজনীন উদারতা প্রভৃতি লম্বা চৌড়া দিগ্গজ কথাওলা ছুনিয়া যান।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ।

আত্মময় কবিতা বা গীতিকবিতা ।

জাগতিক সকল জিনিসেরই এক একটা সময় আছে—ফল আছে। ফল এক দিনে প্রস্ফুটিত হয় না। এবং কোন পদার্থের একোভাবও চির কাল থাকে না। জগৎ গতিশীল, জীবন্ত, বিচিত্র। জগতের গতি সেই পূর্ণতার অন্তর্ভূতিকে। সেই জন্য জগৎ কখন এক রকম অবস্থায় থাকিতে পারে না। ফল একবারেই হয় না। প্রথমে বীজ, ফল পরে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। দেখিতেছি, এইরূপে—ক্রমে ক্রমে—এক অবস্থার পর আর এক অবস্থার পড়িয়া প্রকৃতি—প্রকৃতির সকল বস্তুই—অসীম পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইবার জন্য ফুটিতেছে—ঝরিতেছে—ঝরিতেছে—ফুটিতেছে। পরিবর্তনই জগৎ। পরিবর্তনই উন্নতি। এই অনন্ত পরিবর্তনই জগৎ-শরীর আজ বিশ্লেষণ করিয়া। তাহার মিশ্রিত অংশগুলির স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম আলাদা করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। আজ আমরা জগতের প্রত্যেক উপাদান এবং তাহার প্রতি ধাতুর গুণ ও কাজ বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি, এই প্রকাণ্ড জগৎ-দলের মধ্যে কোন্ বাক্তি, কে। তাহার বিকাশ কখন।

পূর্বে, একজনের বোঝাতে হাজার লোকে বৃদ্ধি। হাজার লোক এক জনের অহু করণ করিত। সেই একজন দলপতি ভিন্ন তাহাদের কোন কাজ

সম্পন্ন হইত না। সেই একজনের কথার প্রতিধ্বনি, হাজার লোকের প্রাণে উঠিত। সেই দলপতির কথাই, হাজার প্রাণের কথার দর্পণ। নবজাতি তরুতে প্রথমে একটি ফল ধরে। ইহা সামগ্রিক গুণ।

তখন কোন কথা না বুদ্ধিগাও বুদ্ধিত, না বুদ্ধিগাও তাহাতে সম্মতি দিত। এখন না বুদ্ধিগা বোকে না, না বুদ্ধিগা সম্মতি আর দেয় না। তখন একজন গাহিত, হাজার লোক শুনিত। এখন হাজার মধুবা-শাখায় গান, অদৃশ্য পরিনর্ভন-বারি পাইয়া, ফুটিয়া উঠিতেছে। তখন ফুটিবার সময় হয় নাই। আজ সময় পাইয়া—কাহার উপদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি ফুটিয়াছে। সময়ের স্বতঃ উচ্ছ্বাসিত এই ভয় প্রকটন—গানকেই আমি আত্মময়কবিতা বা নীতিকবিতা বলিলাম।*

জান যত বাড়িতেছে, কবিতার ধ্যানময় রাজ্য তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার কবিতার দৃষ্টি অতি হৃদয়, অতমুখী, সর্বব্যাপিনী। জীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, অতি মূঢ় অজ্ঞাত হাসি, অতি মূঢ় স্মৃতি-ভাগান সমীকরণ, কি সেই অনির্ভরচনীয় দৃষ্টি, অথবা প্রাণস্পর্শী অতি মধুর সেই নীরব সঙ্গীতময় চলনটি পর্য্যন্ত কবিতার চক্ষু এড়াইয়া বাইতে পারে না। এখনকার কবিতা, জীবন-লাইব্রেরীর তালিকা। জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। হৃদয়-হৃৎস্বরের মানচিত্র।

আগে কবিতা, মধুবোর সাধারণ ভাব ও সাধারণ বিষয় লইয়া লেখা হইত। সাধারণ ঘটনা বা পৌরাণিক গল্প কবিতার বিষয় ছিল। তখন কবিতা, মধুবা-জীবনের মিশ্রপদার্থের গূঢ় রহস্য বাহির করিতে পারে নাই। কি হুত্রে হাসি কান্না—শ্রেয়-বিরহ—আলোক-অন্ধকার ফুটে—জীবনের বিভিন্ন পরস্পর স্বতন্ত্র হ্রস্ব কেন বাজে তাহার হৃদয় কারণ কেহ জানিত না। অত বুদ্ধিবাহ্য কল্পনা শক্তি তখন কাহার ছিল না। সে সর্বরহস্যভেদী ভীষণ দৃষ্টি, প্রাচীন কোন কবিতার মধ্যে দেখিতে পাই না। তখন কবিতার গতি, প্রকৃতি বহিমুখী ছিল। এখন অতমুখী।

* The prevailing characteristic of modern literature is the predominance of individuality and scepticism. Man now stands face to face with his Creator, and sings to him his lay. Hence it is that modern literature commences with spiritual songs. Later on, as it becomes secular, the interest of self-consciousness—the feeling of personality—predominates: poetry is no longer epic; it is subjective, and lyrical and reflective.

একটা মাছব কি সাধারণ ব্যাপার ! তাই দেখি একবার মাছব কি । একটা জীবনে কত হাসি, কত কান্না, কত সুখ, কত দুঃখ, কত মেহ, কত বিরাগ, কত মায়া, কত মমতা, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত আশা, কত যন্ত্রণা, কত পথ এবং আরও যে কত কি রহস্য আছে, একবার তাহা তাই দেখি ! মনুষ্য-জীবন রহস্যময় !—সুপ্তময় ! মনুষ্য-জীবন অনন্ত সুখ-দুঃখ-আকাজ্জক রান্ধি—জীবন্তগুণি ! তাহার কয়টা দুঃখ, কয়টা সুখ, কয়টা ভরস্কের রহস্য তুমি জান ? বুঝিতে পার ? কেবল সময়ের প্রস্ফুটিত ফুল চির-জ্ঞানী আত্মময় কবির অসামান্য মনোপিতা এবং সর্বতত্ত্বদর্শী হৃদয়দৃষ্টির কাছে, সে সুখ-দুঃখ-আকাজ্জক অদৃশ্য মূল লুকাইয়া থাকিতে পারে না । মনুষ্য-জীবন-নদীতে “বহে নানা তরঙ্গ ।” কিন্তু কোন্ দিক হইতে বাতাস আসিয়া যে তরঙ্গ তুলে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না । বাতাস জানা বড় কঠিন । বাতাস সকলে ঠিক করিতে পারে না । কবি—আত্মময় কবিই কেবল সে বাতাস দেখিতে পায়—ঠিক করিতে পারে । আত্মময় কবির কাজ, এই রহস্যময় জীবন-নদীর সেই বাত্যাখেলিত সহস্র সহস্র তরঙ্গগুলির সুন্দর উজ্জ্বল প্রাণেশ্বর্শী ছবি আঁকিয়া জগতের চোকের সমুখে ধরা । জীবনটা কি, এবং তাহার সমস্ত লক্ষণ কখন কিরূপ ধারণ করে—জানিবার চেষ্টা, আজকাল বড়ই পড়িয়া গিয়াছে । আত্মময় কবি তাহাই দেখাইয়া দেয় । আমার হাসি তুমি দেখিতে পাও না বলিয়া কি তাহা হাসি নহে ? তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি তাহার কোন অর্থ নাই ? তোমাকে দেখাইয়া এ জীবনের কোন্ কার্যটি হইতেছে ? কই, তোমার মীমাংসা, তোমার আজ্ঞার জন্য ত আমার জীবন অপেক্ষা কমিয়া থাকে না ! তোমার কথার ত সে তাহার প্রাভাবিক গতি অতিক্রম করিয়া এক সেকেণ্ডও ক্ষত চলে না ? জীবন আপনার ভাবে সমান চলে । ও তলি মনুষ্যের ভ্রম ।

গীতি-কবিতা, মনুষ্য-জীবনের এক একটা ভাবের—সুখ-দুঃখের—দর্পণ । জীবনের এক একটা সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বি । জীবনের সাময়িক প্রতিফলিত । কবিতাকারে প্রকৃতি । আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের “নিশীথকণক” এবং অক্ষয়কুমারের “আজি নিশা জ্যোৎস্নাময়ী” নামক কবিতা দুইটি বুঝাইয়া, কথটা আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া দিতেছি । শুনিতে পাই, এ কবিতা

দুটি নাকি অমেকগুলি পাঠক এবং দু'এক জন বুদ্ধিমান সমালোচকেরও
 বুদ্ধিতে গোল ঠেকে। গোল ত ইহাদের কোথাও দেখিতে পাই না।
 কবি রবি, তাঁহার স্বল্প কবিতাসমূহক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, জগতের
 একটা দিক, জীবনের এক ভাগ, নিশীথ। সে দিকটা আমরা দেখিতে
 পাই না, তাহার কিছুই জানি না বুঝি না। দেখিতে পাই না বলিয়াই
 তাহা নিশীথ। কিন্তু তাহা সত্য—জীবন্ত সত্য। সেই দিকটা না জানাও
 দক্ষণ, জগতের কত লোক নিশি দিন আত্মহার। হইয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া
 বেড়াইতেছে। তাহাদের গোথে ধূলা উড়িয়া পড়িতেছে—চরণে বাধা
 লাগিতেছে—পাখাণ বজ্রসম মাঝায় দাঙ্গিতেছে। কত সরল শিশু, গহন
 জগৎ-বনের মাঝে মা'র হাত ধরে চলিতে চলিতে, অকস্মাৎ কি একটি
 ঘটনা-নিশীথের জালে জড়িয়া একেবারে পিছাইয়া গিয়াছে। শিশু পথ
 চিনে না, মাকে কত কাদিয়া কাদিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল—মা,
 সেই কাতর “মা মা” শ্রুতি শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে চারি দিকে চাচিতে লাগিল,
 কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না। এইরূপে জীবন-গ্রামী জগৎ-
 অন্ধকারের মধ্যে কত অশ্রুশ্রাব্য প্রাণী অহরহ কাদিয়া কাদিয়া নীরবে
 প্রাণত্যাগ করিতেছে! কত হিংসা, কত বিস্ময়, কত মিথ্যাচরণ, কত
 বিশৃঙ্খলা, কত অনর্থক যন্ত্রণা, কত হত্যা, কত ভীত দীর্ঘনিশ্বাস, কত
 সাধের খেলা, কত স্বপ্ন প্রভৃতির অবিবাহ বিচিত্র অভিনয় হইতেছে!
 সে অন্ধকারের গর্ভে পড়িয়া কত ভক্তি, স্নেহ, প্রেম ও কত অসম্পূর্ণ সাধের
 খেলা, চিরদিনের মত মাস্ত হইয়াছে! আজ সেই স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও
 খেলার গৃহে নিশীথের চির-ব্রাহ্মণ। কেহ কাহাকে আর চিনে না।
 কাহারও কথা, কাহারও হাসি, কাহারও কান্না এবং কাহারও জ্বরও
 কেহ বুদ্ধিতে পারে না। এইরূপে অন্ধকারে প্রতিদিন কত লোক মরি-
 তেছে। এইরূপে অন্ধকারে পড়িয়া কত হুল পিট হইতেছে! কত
 সংসার ছারখার হইয়া বাইতেছে! ইহাই রবীন্দ্রনাথের “নিশীথ জগৎ।”
 এই ভাবী-সত্যের উজ্জ্বল ছবি, কবি, জগতের পটে আঁকিয়া মানুষকে
 সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এ গীতিকবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অক্ষরকীর্তি।
 এটি তাঁহার *chef d'oeuvre*।

তার পর অক্ষয়কুমারের “আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী ।” ইহা কত সুন্দর । কি মহান ভাব ! কবি বলিতেছেন যে, আজ আমি এই সমুদ্র প্রাণ-উদ্ভাসিনী জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে তুল-সৌরভাকুণিত ধীর সমীরণে এবং স্রোতধিনীর সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ ঢল ঢল নারীগম্ভ ভাবে বিস্তার হইয়া যেন—কোণাকার কোন সুদূর চইতে অপ্সরার অলস সপ্নময় গান শুনিতে পাইতেছি—যেন সেই অপূর্ণ গান শুনিতে শুনিতে দেখিতেছি যে, সেই হৃৎকের সুদূর নন্দনে—মন্দার-কুঞ্জে, মন্দাকিনী-তীরে আমার প্রাণের স্মৃতিময়ী অতীত অদৃষ্ট-ছায়া বসিয়া । আমার অতীতের সেই আদর্শ অনন্ত প্রেম-ছায়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ পূর্ণ আশো করিয়া বিরাজিত । সে যে অভেদ-আত্মা ! মরিয়াও আবার তাহাকে পাইব । সে অ-দৃষ্ট-ছায়া আমার পূর্ণতার—অনন্ত-প্রাপ্তির—আকাজক্ষা—অপ্সরা-গান । সে ছায়া অনন্ত সৌন্দর্য্য—অমর । সে ছায়ার অর্থ অশ্রু-মিলন । “আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী” অর্থ এই । ইহাই গীতিকবিতা । কবির প্রাণের একটি ভাবের ইহা দর্পণ । জীবনের কবিতা-ভাষণ । ইহা কবির জীবন-সত্য-সমবায়ের একটি সত্যের প্রতিকৃতি । আত্মমগ্ন কবির জন্ম-অকুরের বিকাশ এইরূপ নানা কবিতা-পন্থে, নানা কবিতা-কূলে, নানা কবিতা-কলে । তাহা বিচিত্র প্রকারে বিকশিত । তাহা কখন মেঘে, কখন বিদ্যুতে, কখন বৃষ্টিতে, কখন হাগিতে কখন কান্নাতে, কখন আশোতে, কখন অন্ধকারে, কখন বজ্রাঘাতে, কখন চারায়, কখন মিলনে, কখন পীড়নে, কখন সপ্নে, কখন কটাক্ষে, কখন হাসিনুনা গৃহে, কখন হৃৎকের স্মৃতিতে, কখন পূর্ণিমা নিশীথে, কখন প্রেমে, কখন বিরহে, কখন বিদ্রোহে, কখন বিপিনে । সমুদ্র জগৎ-বাড়ীটা একেবারে দেখান, আত্মমগ্ন কবির কাজ নয় । আত্মমগ্ন কবির কাজ, জগৎ-বাড়ীর অংশ—গৃহগুলি দেখান । সকলের এক সঙ্গে গাওয়ায় কীত বলে না । তাহা যাত্রা । হরিবোল ।

জগতের শৈশব কালে অনেক কবি, অনন্ত জীবন এবং সমুদ্র জগৎ-বাড়ীর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের এককে “জাতীয়” এবং “জাগতিক” প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয় । কিন্তু—সত্য কথা বলিতে গেলে—সে সব এক বা মহাকাব্য ভাল বৃত্তিতে পারা যায় না ।

তাহা বড় অক্ষুট। তাহার ভিতরকার অনেক কথাই কোন অর্থ পাওয়া যায় না। সেগুলি নিতান্ত গোঁজা মিলন। অথবা কেবল কতকগুলি শব্দের বোজন। পুস্তক নামধারী মাত্র। অলংকার পুস্তক পাঠের ফল। Intellect। তাহা জীবন নহে। সত্য নহে, সত্যের অক্ষুট ছায়াও নহে। যে নিয়মে ফুলের বিকাশ হয়, সে নিয়মে তাহার জন্মায় নাই।

ত্রিপুরেশ্বরনাথ বসু।

হিন্দু আচার ব্যবহার।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর।)

৪। শিষ্টাচার।

এইটী বড় মনস্তাপ, আগাদের নব্যতন্ত্র স্থপিত্ত হইয়া কোথায় সমাজের সুখোচ্ছল করিবেন, না, কথায় কথায় তাহার মুখ পোড়াইতে বসিয়াছেন! যদি কোন বিষয়ের অভাব থাকে তাহারা তাহার পরিপূরণ করুন, আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইব। যদি কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহারা তাহার সংশোধন করুন, আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব। যদি কোন অত্যাচার থাকে, (বেশন সতীদাহ, সন্তান ভাসান এবং কন্যা হত্যা পূর্বে ছিল; এবং কোন কোন স্থলে শেবেরটি এখনও আছে) তাহারা তাহা নিবারণ করুন, আমরা কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু সে সব করিবার সময় আগে আদ্যতন্ত্র সমুদয় অবস্থা ও তাহার বৈধাট্যবধতা বধাবিহিতরূপে বিচারান্তে করিতে হইবে। বিশেষতঃ নবপ্রচার প্রবর্তন বড় কঠিন কাজ, হয় ত ইষ্ট আশে অনিষ্ট ঘটতে পারে, এই ভয়টী মনে রাখিরা, অত্র পৃষ্ঠাৎ বেবিয়া সতর্ক হইয়া তাহা করা উচিত। নতুবা সহসা অভাব বোধ, সহসা দোষ দর্শন, সহসা অত্যাচারের অভিযোগ করিয়া উদ্ভ্রম হওয়া বিধের নয়।

এই পরিচ্ছেদে আমাদের এ কথা বলিবার বিশেষ হেতু আছে। সমস্ত সভ্য বা অর্ধসভ্য সমাজেই তদ্রূপ, লৌকিকতা, ও শিষ্টাচারের বিভিন্ন

বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। কোন জাতীয় লোকেই স্বকীয় শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়া পরকীয় রীতি অবলম্বন করে না। কেনই বা করিবে? কোন ভক্তলোক কি আপনার থাকিতে পরের জবে লুপ্ত করিয়া থাকে? কি গত্যায় আক্ষেপের বিষয়, আমাদের নবশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় তাহাও করিতেছেন! শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন পদার্থটি হিন্দু সমাজের ভাণ্ডারে এত অশেষবিধ এবং এত অপূর্ণ্যাপ্ত, যে, যত প্রকারের যত চাহিবে ততই প্রাপ্ত হইবে। পাস্চাত্য ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা যখন কোন বেনী সৌজন্য, বেনী শিষ্টাচার ও বেনী স্তরের কথা উল্লেখ করেন, তখনই এই বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, “এ যেন পূর্বাঞ্চলের সৌজন্য!” অথবা, “এ যেন পূর্বাঞ্চলের আভ্যন্তর!” ইউরোপীয় কোন পত্রে, কোন দরখাস্তে, কোন কাগজাদিতে পাঠাপাঠ ঘোটে নাই। আমাদের দেশের পত্রাদিতে কালের কথা যদি একটি থাকে, পাঠের শব্দ দৃশ্য পাইবে! অভাবনা, আগত সম্ভাবণ, নমস্কার, প্রণাম, আলিঙ্গন, পাদ্যর্ঘ্য, আসনাদি প্রদান, ভক্ষ্য ভোজ্যের বিধান, এ সব পূর্বকালে বাহ্য ছিল এবং বাহ্য আছে, তেমন কি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়? কাহাকে কিরূপে, কি অজ্ঞতকোণে, কি বলিয়া নতি, প্রণতি, আপোর্বাদ করিতে হয়—কাহাকে নমস্কার বলে, কাহাকে প্রণাম বলে, কাহাকে সম্ভাবণ বলে, কাহার প্রতি কিরূপ শিষ্টাচার বিধেয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, কুটুম্ব, পথিক, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, শূত্র, তপস্বী, গৃহী, রাজা, প্রজা, কনিষ্ঠ, ঘোষ্ঠ ইত্যাদি শত শত সম্প্রদায় ব্যক্তির প্রতি পরম্পরের কি কর্তব্য এত কথা হিন্দুশাস্ত্র তিন আর কোন দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কি ব্যবস্থাপিত আছে? তদাভাব দিবার জন্য এ স্থানে অন্ততঃ কতিপয় মন্তব্যচন উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভিবাধ্যং পরং বিপ্রো জ্যায়াং সমভিধায়ন ।

অসৌ নামাহমস্মীতি যং নাম পরিকীর্তয়েৎ ॥ মনু ২য় অ। ১২২।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন বৃদ্ধকে অভিবাচন করিবে, তখন “আমি অধিককে অভিবাচন করিতেছি বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে।

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাধ্যং ন জানতে ।

তান্ ঋতিজ্ঞোহহমিতি ক্রিয়াং ত্রিঃ সর্বান্তধৈবচ ॥ ঐ। ১২৩।

বাহাকে অভিবাচন করিবে, তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে

অভিবাধ্যকে অভিবাদনানন্তর “আমি অভিবাদন করি” এই শ্রাব্য বলিবে ; এবং শ্রীলোকধিপকেও এইরূপ অভিবাদন করিবে ।

আত্মস্থান তব সৌম্যোতি বাচ্যো বিপ্রোহভিবাধনে ।

অকার-চাস্য নায়েহন্তে বাচ্যঃ পূৰ্ণকরঃ প্লুতঃ ॥ ঐ । ১২৫ ।

অভিবাধনানন্তর অভিবাধ্য ব্যক্তি অভিবাদক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ অভিবাদককে, “হে প্রিয়দর্শন শুভশ্রী তুমি দীর্ঘজীবী হও” ইহা বলিবে ; ক্ষত্রিয় অভিবাদককে “আত্মস্থান তব সৌম্য বল বর্ধন” এবং বৈজ্ঞ অভিবাদককে “আত্মস্থান তব সৌম্য বশ্বভূতে” এই কথা বলিবে । কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিবাদকের নামের অন্তে অথবা অস্ত্রাবর্ণের পূর্বে যে অকারাদি স্বর তাহা প্লুতে অর্থাৎ ত্রিমাত্রে উচ্চারিত হইবে ; ক্ষত্রিয় ও বৈজ্ঞের নামের অন্ত্রা স্বর অথবা অন্ত্রাধরের পূর্বস্বর বিকসে প্লুত হইবে । শূত্রের এবং শ্রীলোকের নামে প্লুত উচ্চারণ নাই ।

পরপত্নী তু বা শ্রী স্যাধসম্বন্ধা চবোনিতঃ ।

তাঃ জগ্নান্তবতীত্যেবং সূত্রে ভগিনীতিচ ॥ মহ ২২ । ১২২ ।

পরত্নী ও বে নারী পিতৃবংশীয় নহেন, তাঁহাদিগকে ভবতি বা সূত্রেণ অথবা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে । ভগিনী প্রত্যুতিকে ও পরের অন্ত্রা কঙ্কাকে আত্মস্থতি ইত্যাদি পদে সম্বোধন করিবে ।

মাতৃবসা মাতুলানী বক্ররথ পিতৃবসা ।

সংপূষ্যা শুক্লপত্নীবৎ সমাপ্তা শুক্লভার্যয়া ॥ ঐ । ১৩১ ।

মাতৃ-ভগিনী, পিতৃ-ভগিনী, মাতুল-পত্নী ও বক্র ইঁ হারা মাতার ন্যায় পূজনীয়, যেহেতু ইঁ হারা শুক্লপত্নীর সমান অর্থাৎ মাতার সমান, অতএব ইঁ হারা আগত হইলে পাদগ্রহণ পূর্ণক অভিবাদন করিবে ।

এরূপ কত বিধান আছে, তাহা অঙ্কভবেই বুঝিা লইবেন । অত্না এত সূত্র শিষ্টাচার বহিত হইয়াছে, ওথাপি অভিবাদন, আলিঙ্গন, আশীর্ষচন, প্রিয় সম্ভাবণের কত প্রকার সুপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানেন ? আপনাদের এত থাকিতে,—কোন অভাব না থাকিতেও, তবু আমাদের কেমন কুর-বৃত্তি অথবা পরের পদ-লেহন প্রবৃত্তির অভ্যাস হইয়াছে, যে, এ সব ভ্রান্ত্য অজ্ঞান বধনে ত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জরূপে ইচ্ছাপূর্ণক পরকীয়

শিষ্টাচার ও দেশাচারের ধাম হইয়া উঠিতেছি ! যে ব্যক্তি ইংরাজী স্পর্শমাত্র করিয়াছে, সে ব্যক্তিও আপাণী দেখিবা মাত্র মহা ব্যগ্রভাবে সাহেবী ধরণের মুখখানা বন্ধ করিয়া—

“হ্যালো ! হা-ডু-ডু ?”

—বলিয়া হাত ধানি বাড়াইয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বসে ! কিন্তু ইটী ভাবে না, যে, সাহেবদের যেতাননের ডক্‌সিটী কক্ষ বদনে নিত্যই বিকৃতি দেখায় ? আর যে জোরে সাহেবরা সেক্‌হ্যাণ্ড করে, কালো হাতে সে জোর নাই— সে জোর দিতে গেলেও হাত ভাঙ্গিয়া যায় ! আমি প্রায় এক দিন এক বলবান্ বাবুর সেক্‌হ্যাণ্ডের পাল্লার পড়িয়া বাড়ী গিয়া চূণ-হলুদ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ।

ভাল, অনর্থক এ ধার করা কেন ? ইহার আর তো কোনো তাৎপর্য দেখি না, কেবল জানানো আর স্পর্শ করা, যে, আমি ইংরাজী খুব জানি ; যে হের বাঙ্গালার চেয়ে আমি বড় বিদ্যা শিখি ; যে আমি সাহেবদের সঙ্গে সহবাস করিয়া থাকি ; যে নমস্কার, প্রণাম টুণাম সেকেলে ঘুণিত আচার—নিত্যই অসভ্যের কার্য—হি ।

যাহারা এখনকার বাবুদের ধরণ ধারণ ভালরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন, যে, তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়া অথবা হঠাৎ তাহাদের দেখা পাইয়া যে হুঁতগা তাঁহাদিগকে নমস্কার কি প্রণাম করে, কিম্বা যে হুঁতগা ইংরাজীতে কথা না কহ, অন্ততঃ বাঙ্গালার মাঝে মাঝে বড় বড় ইংরাজী কথা না বসায়, তাহার প্রতি বাবুদের অবজ্ঞা হয়, তাহাকে সামান্য লোক ভাবেন, তাহার সহিত যৎসামান্য আলাপ করেন ! তাহাকে সেইরূপ নিয়-শ্রেণীর জ্ঞান করেন, যেজন সাহেবেরা তাঁহাদিগকে জ্ঞান করিয়া থাকেন । আবার যে ব্যক্তি সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে জানে, আঃ ! ওঃ ! হাঃ ! হোঃ ! হরো ! ওড়্ পড়্‌সো ! ইত্যাদি বলিতে জানে, মধ্যে মধ্যে টেবিলখাতের ন্যায় হাত ফেলিতে জানে, মধ্যে মধ্যে বিনামার ওল্‌ফাখাতে পদতলে শব্দ করিতে পারে, তার যদি তাহার বসন ভূষণ কিছু বিলাতি ধরণের হয়, তবে সম্মানের সীমা কি ? তাহার সহিত বাবুরা মনপ্রাণ খুলিয়া আলাপ করেন, তাহাকে সভ্যনিষ্ঠ “ম্যান অব্‌ অনার”

বলিয়া ভাবেন, তাহার কাজে অগ্রে মনোভিনিবেশ না করিয়া থাকিতে পারেন না !

শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপ প্রথার আনুষ্ঠানিক বিস্তার কথা আছে, কিন্তু যথেষ্ট হইয়াছে, একটীর আভাষেই সকলটী বোধগম্য হইবেক। এক্ষণে একবার গুরুজনের অবস্থাটা দেখা যাউক।

পুরাকালে হিন্দুসমাজে পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরু-সম্পর্কীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত এবং বয়োধিকের কি প্রকার মান্য ছিল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্ব্বে যে কয়টি বচন সংগৃহীত আছে, তাহাতেও এ বিষয়ের কিয়দংশ আভাবিত আছে। আর কথেকটী এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

শয্যাসনেহধ্যাচরিতে শ্রেয়সান সমাবিশেৎ ।

শয্যাসনমুচৈনেনং প্রত্যাখ্যানাভিবাদয়েৎ ॥ মন্ত্র ২য় অ। ১১২।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শয্যা বা আসন আপন নিষ্কিষ্টরূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যা-হীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনো তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। আর ঐরূপ গুরুলোক সমাগত হইলে শেযোক্ত ব্যক্তি যদি শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিবে।

উর্দ্ধং প্রাণা হ্যংক্রামন্তি যুঃ সূর্যির আয়তি ।

প্রত্যাখ্যানাভিবাদিত্যাং পুনস্তানু প্রতিপদ্যতে ॥ মন্ত্র ২য় অ। ১২০।

বয়োবিদ্যাগি ষায়া জ্যেষ্ঠ আগমন করিলে অঙ্গবস্ত্র সুবার প্রাণ যেন দেহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করে, অতএব আগতক বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক অভিবাদন করিলে ঐ প্রাণ সূক্ষ্ম হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আগত বিদ্যাবয়োজ্যেষ্ঠকে অবশ্য অভিবাদন করিবেক।

মাতুলান্চ পিতৃবান্চ শস্ত্রানুদ্বিনো গুরুন ।

অসাবহমিতি ত্রয়াং প্রত্যাখ্যায় ঘবীরসঃ ॥ ঐ ১৩০ ॥

মাতুল পিতৃব্য শস্ত্র পুরোহিত অথবা গুরু ইহারা বয়সে কনিষ্ঠ হইলে তাঁহাদিগের আগমনে গাত্ৰোখ্যান করিয়া আমি অসুখ এই কথা বলিবেক কিন্তু পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবেক না।

পিতৃভগিন্যাং মাতৃশ্চ জায়দ্যাকং হসদ্যপি ।

মাতৃবদ্ভক্তিমাভিষ্ঠেৎ মাতা ভাত্যো নগীরসী ॥ ঐ ১৩৩ ॥

পিতা ও মাতার ভগিনীর প্রতি এবং ভোষ্ঠা সহোদরার প্রতি মাতার
ন্যায় ব্যবহার করিবেক কিন্তু কন্যী তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা গুরুতর।
জানিবেক, যেহেতু মাতৃ আজ্ঞার ও মাতৃবদ্ভ আজ্ঞার পরস্পরের বিরোধ
হইলে মাতৃআজ্ঞাই প্রবল হইবেক ।

য আয়ুৰ্ভোত্যাবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণানুভৌ ।

স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তত্ত্ব ক্রহোৎ কদাচন ॥ যশু ১৪৪ ॥

যিনি স্বার্থে বৈদ শব্দ দ্বারা উভয় কর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া দেন তিনি মুহোপ-
কারক বলিয়া মাতা ও পিতৃপদে বাচ্য হইবে, গৃহীতবৈদ হইলেও কেহ
তাঁহার প্রতি কখন অত্যাচার করিবেক না ।

ন হায়নৈ ন পলিতৈ ন বিসেন ন বদ্ধভিঃ ।

জয়শ্চক্রিরে ধর্ম্যং যৌচনুচানঃ স নো মহান্ ॥ ১৫৪ ঐ ॥

ব্যয়োধিক হইলেই, কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি পক্ষ হইলেই, বিপুল ধনশালী
হইলেই, পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ থাকিলেই যে মহৎ হয় তাহা নহে, যিনি সান্নো-
পাক বেদের অধ্যাপক তিনিই আমাদের মধ্যে মহৎ শব্দের প্রতিপাদ্য ।

যং মাতাপিতরৌ ক্রেশং সহেতে সত্তবে নৃণাং ।

ন তস্য নিকৃতিং শক্যা কর্তুং বর্ষণৈতরপি ॥ ঐ ২২৭ ॥

মাতা বালককে গর্ভে ধারণ, প্রসব বেদনা ক্রেশ, ও জন্মাবধি রক্ষণ
বর্জন কষ্ট সহ্য করেন, এবং পিতা বাল্যাবধি রক্ষণ বর্জন ক্রেশ ও উপনয়নাদি-
পূর্বক বেদাধ্যাপনাদি কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, ফলতঃ অপত্যজ্ঞনেন
পিতা মাতা যে ক্রেশ সহ্য করেন, পুত্র শত শত বৎসরে শত শত জন্মেও
তাঁহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না ।

তয়োনিভ্যং প্রিয়ং কুর্ধ্যাদাচার্যাস্য চ সর্বদা ।

তেষেব ত্রিষু ভূষ্টেষু তপঃ সর্বং সমাপ্যতে ॥ ঐ ২২৮ ॥

অতএব প্রতিদিন পিতামাতার ও আচার্যের সর্বদা হিত সাধন দ্বারা
প্রীতি উৎপাদন করিবেক, যেহেতু ইহারা তিনি জন সন্তুষ্ট থাকিলে সকল
তপস্যার ফল পাওয়া যায় ।

হীনাম্বহস্তবেশঃ স্যাৎ সৰ্ঙ্গদা শুক্লসমিধৌ ।

উদিতৈঃ প্রথমকাস্য চরমকৈব সমিশ্রিতং ॥ মনু ১২৭ ॥

শুরু ধেরূপ অন্ন ও বসন ভূষণাদি ব্যবহার করেন। শিষ্য তাঁহার নিকট তাহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট ভোজন ও নিকট বসন ভূষণ সৰ্ঙ্গদা পরিধান করিবেন, শুক্ল রাত্রিশেষে শয়ন হইতে উদিত হইবার আগে তিনি উদিত হইবেন এবং প্রথম রাত্রিতে শুরু শয়ন করিলে পশ্চাৎ শয়ন করিবেন ।

আমীনস্য স্থিতঃ কুৰ্য্যাদভিগচ্ছন্ত তিষ্ঠতঃ ।

প্রহৃদ্পদ্য ভাত্রজতঃ পশ্চাকাব্যস্ত ধাবতঃ ॥ মনু ১২৮ ।

শুরু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আত্মা করিলে শিষ্য আসন হইতে উদিত হইয়া, শুরু দণ্ডায়মান হইয়া আত্মা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কএক পদ গমন করিয়া, শুরু আগমন করিতে করিতে অমুমতি করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে বাইয়া, শুরু বেগে গমন করিতে করিতে অমুমতি করিলে শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আত্মা গ্রহণ ও তাঁহাকে সত্যাগণ করিবেন ।

নোদাহরেন্দস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং ।

নচৈবাস্যামুকুর্ভীত গতিভাষিতচেষ্টিতং ॥ ঐ ১২৯ ।

শিষ্য পরোক্ষও উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদশূন্য করিয়া শুরুর নাম উচ্চারণ করিবেন না এবং উপহাস-সূক্ষ্মিতে শুরুর গমন ও কথনাবির অস্বকরণ করিবেন না ।

আবার জানীর দৌরব জবণ করুন,—

অধ্যাপয়ামাস পিতৃন্ শিশুরাক্রিয়সঃ কবিঃ ।

পুত্রকা ইতিহোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ তান্ ॥ ঐ ১৩১ ॥

পূর্বকালে অত্রিরার পুত্র বালক অর্থাৎ বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও জ্ঞানবলে অধিকবয়স্ক পিতৃব্য ও তৎপুত্রদিগকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রক বলিয়া আজ্ঞান করিতেন ।

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবানাগতমন্য বঃ ।

দেবশ্চৈততান্ সমেভ্যোহু ন্যারং বঃ শিশুরক্তবান্ ॥ মনু ১৩২ ।

পুত্রক শব্দে আহৃত সেই পিতৃভ্রাতৃ পিতৃব্যাদি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগের

নিকট পুত্রক শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, দেবগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, শিশু যে তোমাদিগকে পুত্রক বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ন্যায্য হইয়াছে ।

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রমঃ ।

অজ্ঞং হি বালমিত্যাহঃ পিতৃতোঃ তু মন্ত্রমঃ ॥ ঐ ১৫৩ ।

অনবয়স্ক হইলেই যে বালক হয় এমন নহে, যে ব্যক্তি মূর্খ সে বয়োবিক হইলেও তাহাকে বালক বলা যায় । যিনি মন্ত্ৰের বা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করান তিনিই পিতা হইবেন, পণ্ডিতেরা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বালক ও মন্ত্রদাতাকে পিতা বলেন

আর কত বলিব ? হিন্দুর শিষ্টাচারের ভাণ্ডার অনন্ত । এ সামান্য পত্রিকায় ভাষার স্থান কোথায় ? ছায়, কেন লোকে ইহা বুঝে না ? নিজের ভাণ্ডারনিহিত—নিভাস্ত-অব্যবহার-মলিন—এই সমস্ত রত্নের প্রতি কেন তাকাইয়া দেখে না ? আপনার ধনে হেলা করিয়া কেন পরের ধন ভিক্ষা করিতে যায় ? আমি বুড়া হিন্দু, কিছুই বুঝি না—বুঝিতে পারি না । দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হই, মর্মে ব্যথা লাগে । ব্যথা লাগে বলিয়াই এ বয়সে আবার এত আবেল তাবেল বকিতে বসিয়াছি । আমার এ কথা কেহ শুনিবেন না জানি ; জানি, কেহ কেহ এ প্রসঙ্গ দেখিয়াই ক্রকুটী করিবেন, কেহ বা কখনো এ পাতা কয়টা উল্টাইবেন কি না সন্দেহ ; তথাপি যে এত কথা লিখিয়া মরিতেছি কেন তাহা কি বলিব ? বাস্তবিক, বুড়াওলা সমাজের বড়ই অন্ধকার, এ ওলার কবে গম্ভাযাত্রা হইবে ? [প্রমথঃ
ঐমনোমোহন বহু ।

প্রেমদাসের জীবন-নাটকের এক অঙ্ক ।

আমি আমার জীবনী লিখিব । বিলাতের দিয়ানিলাই-ওয়াল্ডা যখন আত্ম-জীবনী লেখে, তখন, আমি—এত বড় একটা Reformer, আমার

জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হইবে না ! যদিও জীবন-বৃত্তান্ত লেখাপ্রথাটা বিলাতী কৃষাণ্ড, তবু দেশী কৃষাণ্ড ত আছে । আমার এমন একজনের সহিত আধঘণ্টা মাত্রও পূর্ণাঙ্গ আলাপ হয় নাট, যিনি সেই আধ-ঘণ্টার মধ্যে আপনার গুণের, কাণ্ডের, ওস্তাদীর তালিকাটা আওড়াইবার চেষ্টাটাও করেন নাই । সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন-বৃত্তান্ত লেখাটা বিলাতী, আওড়ানটা দেশী । বিলাতী ধরণ দেশীয় ভাবে প্রচারিত না হইলে বাঙ্গালার উন্নতি কোথায় ? আবার আমি আশা আপনাদিগের নিকট জীবনের এমনটুকু আওড়াইব, যাহা আমার মৃত্যুর পর অন্যের দ্বারা লিখিত হইলে, নিকটস্থ আর এক রকম হইয়া যাইতে পারে ।

ভালবাসাটা আমাদের বাড়ীর পাশের কুলগাছ । প্রত্যেক উপন্যাস-লেখক, নাটক-লেখক, প্রবন্ধ-লেখক, সকলেই ইহাকে একবার না একবার নাড়া দিয়াছেন । ছেলেবেলা হইতে আমি কিছু ছুট, কাজেই কুল-তলা আমার এক-চেটে !

বলা বাহুল্য, ভালবাসাটা আমার জন্মকাল হইতেই আছে । শুভার্ণব বশভঃ জাতি-স্মরণ নই, গুণ জন্মের কথা বলিতে পারিলাম না । ইচ্ছাটা বলি—অম্বিষা মাত্র স্তনদুগ্ধের প্রতি আমার বিশেষ ভালবাসা জন্মিয়াছিল । স্তন মুখে দিলেই কন্দন থামিত, নহিলে প্রতিবাসীরা—পথের পথিকেরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিত, একটা কান্দেব বাড়ীর ছেলে কাঁদিতেছে বটে ।

হুই বৎসর পর্য্যন্ত ভাল খাবার, ভাল খেলনা আমার এক-চেটে ছিল । কিক, ইংরেজ রাজত্বে কিছুই একচেটে করিবার ঘো নাই । আমার একটা ভগ্নী জন্মিল । এত দিন আমি গৃহের একমাত্র রাজা ছিলাম । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটা প্রতি-নারক জুটিল । সুতরাং মনো মনো ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যাইত । অর্জুনের সম্মুখে কর্ণ-নেচারার রথচক্র প্রায়ই কর্দমে বসিয়া যাইত । তাহার উপর বিধাতার অভিশাপ ছিল । বেচারী এ পর্য্যন্ত কখনও ওসমানের মত স্বয়ং যুদ্ধ দেখি বলে নাই !

মাপ্তিনী বাড়ীর জীলোকদের নথ কাটিয়া দিত, আলতা পরাইয়া দিত, কিছু আমার হাঃধিনী বামী দানীর কেহ দিত না । উপর বেলা, নকশের পরিবর্তে খাৎরা কাটি, স্বামীর পরিবর্তে ইট, এবং অল বাটি প্রভৃতি

সরঞ্জাম লইয়া বামীর নথ কাটিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম । “নেহি পদপদব-
মুদারম্” আমি চাই বৎসরের সময় বলিয়াছি ।

চারি বৎসর চারি মাস চারিদিনের দিন আমার হাতে খড়ি হয় । শুক-
ক্রীড়ার বৈল-মঙ্গল শিখা-শোভিত মস্তক বেশিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম ।
প্রথম যে দিন ক-এর উপর দাগা বুলাই, সেই দিন হইতেই আমার তর্কশক্তি
জন্মিয়াছিল । অদৃষ্টে এতটা আছে কি না ! ক দেখিয়া প্রজ্ঞানদের মত
আজ্ঞাদে কঁপি নাই । শুক মগ্ধায় এ দিক হইতে খড়ি টানিয়া পুঁটুলির
কাছে শেষ করিতে বলিতেন । বাধাবাদি আমার ভাল লাগিত না
তাবিতাম, কেন ওদিক হইতে টানিয়া এদিকে না শেষ করি । বা, আমার
ইচ্ছামত ক-এর পেটটা না কাটিয়া দেই । যাহা হউক, ঘরে পড়াই ভাল
পড়া, আমি বাড়ীর দেয়ালে মেতেয় সিঁড়িতে খড়ি লইয়া ইচ্ছামত ক লিখিয়া
ভরিয়া দিতাম ।

ছয় বৎসরের সময় বাঙ্গালা স্কুলে ভর্তি হইলাম । প্রতি ক্লাসে দুই
বৎসর রহিয়া, বিদ্যাব গোড়ার গাঁথনি মজবুত করিয়া, বারো বৎসর বয়সে
চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম । পুর্বেই বনিয়াছি, ঘরে পড়াই ভাল । স্কুলতঃ
স্কুলের কোনও বই-ই পড়িতাম না । * জলধাবারের পরমায় পথে
“আমোদিনী উপন্যাস” “ছোট বয়ের গল্প” “পোলের পাঁচালী” ইত্যাদি
কিনিতাম । বাড়ীতে—সুপার, স্কুলে—পাঠ্য পুস্তকের নীচে রাখিয়া, সেইগুলি
পড়িতাম । জানি না, কেন বাড়ীর সকলে এবং স্কুলের সকল মাষ্টারই
আমার উপর চটিতেন । তখন হইতেই আমি বুদ্ধিমান ছিলাম যে, আমি
রুগতের সহিত ঘৃণ করিতে আসিয়াছি ।

* পশ্চিমে—পশ্চিমে কি কোথায় তাহা আমি মনে রাখি নাই—একবার
বিদ্যালয়গত হইতে যান । একটা মুদি আসিয়া বলিয়াছিল,—“মহাশয়
আপনার নিকট আমার দশ আনা পাওনা আছে ।” বিদ্যালয়গত বলেন,
“বাপু, তোমাকে আমি কখন দেখিই নাই । তোমার আমি ধারি কিরূপে ?”
সে বলে—“মহাশয়, আপনার ১২ খানা ‘বর্ণপরিচয়’ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু
আমার যে ১টা অঙ্কর পরিচয়ও হয় নাই !”

কিন্তু আমি লগ্ন করিয়া বলিতে পারি, কখন কোন স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক
প্রণেতাকে এরূপ আলাতন করি নাই ।

আমি বাণ্যকালেট কেমন diligent ছিলাম তাগার একটি মাত্র উদাহরণ দিব। আমার একটি সহপাঠী একদিন খুলে “ভূর্গেশ-নন্দিনী, কণ্যাসুখলা ও মৃণালিনী” এট তিনখানি পুস্তক আনে। আমি তাহার মিকট বট তিন খামি পড়িতে চাই। সে বলে, আন আমি সেবে কিনিত্তেছি। আগার পড়া হইলে তোমায় দিব। আমি তাহাকে কাণ্ডিতি মিনতি, এবং কতকটা বল দেখায়া বহুগুলি লইয়া আসিলাম। করার—আজ বৈকালে চারিটার সময় লইয়া বাইরেছি, কাল বেলা দশটার সময় ফিরাইয়া দিব। কখনও ঠিক বসটার সময় বট তিনখানি ফেরৎ দিই। বাড়ীর মাষ্টারকে ক'কি দিয়া, বাড়ীর সবাইকে ফাঁকি দিয়া, বই গুলি এত অল্প সময়ের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। অপর রাত্রি আটটার সময় যেমন শুই, তেমনি শুইয়া-ছিলাম। তবে, সাতসংগ্রহকারীর মতন—বাক্সালি সমালোচকের মতন—যেখানে যেখানে কথা আছে সেই সেই খানটা পড়িয়াছিলাম। লম্বা Para, যেখানে লেখকের বর্ণনা গা বহুনি, সেখান গুলো পড়ি নাই। আপনারা বুঝিলেন, বালাকালেও আমি পরব-গ্রাহী ছিলাম না। উপন্যাস ভালবাসি নাই, মাটকড ভালবাসিয়াছি।

আমাদের পাণের বাড়ীতে ৩২ বৎসর বয়সী মোহিনী নামী একটি প্রত্নিবেশিনী ছিল। আমাদের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি তাহাকে “মোহিনী দিদি” বলিয়া ডাকিতাম। আমি বহুগুলি “পোলের পাঁচালী” প্রভৃতি কিনিতাম, সকল গুণিই মোহিনীকে পড়িতে দিতাম। আমার ১২ বৎসর বয়সের সময় দীনাদুর্গা ‘শোণাবতী’ কিনি। তাহা হইতে “প্রিয়সুখ” “প্রাণেশ্বরী” “সুদয়েশ্বরী” প্রভৃতি কতকগুলি জনপ্রিয় কবিত্তিকর কথা শিবি। একদিন কেমন আক্সাদে মোহিনীর প্রতি একটা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তররূপ একটা প্রচণ্ড গর্জন ও একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত লাভ করিয়াছিলাম।

চপেটাঘাত খাইয়া বাজালা তাহার উপর, বাজালীর প্রেমের উপর, বাজালী রমণীর উপর মনটা কেমন চটিয়া গেল। বাজালা খুল ভাড়িয়া দিলাম। বাড়ীতে বলিলাম বাজালা শিবিলে কিছুই হইবে না। ইংরেজি খুলে ভর্ত্তি হইলাম। ইংরেজি খুলে ভর্ত্তি হইবা মাত্র মনটা ইংরেজি রকম

হইয়া গেল। কিট ফাট, টেরি, পমেটম, গংই জুটল। আপনাকে একটা knight বিবেচনা হইতে লাগিল। পাড়ায় হরি নারী ২৭ বৎসরের একটা গরিব যুবতী-বালিকা থাকিত। হরিকে পাড়ার সকলে বয়সী বিবেচনা করিত। এমন কি সেও আপনাকে কাণীবাসী হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিত। আমার বোধ হয় সে হুটামি করিয়া, nun হইবার-যোগাড়ে ছিল। বহা হউক আমি তাহাকে বাঙ্গালীর চক্ষে না দেখিয়া, ইংরেজি ধর্মের মধ্যে দিয়া দেখিতাম। আমি তাহার bloom of youth দেখিতে পাইতাম।

তাহার চালা খানি পড়ার শেবে। চালায় চারি দারে কতগুলি গাছ ছিল, কতকটা বনের মতন দেখাইত। আমি সেইখানে একটা chivalry দেখাইবার যোগাড়ে রহিতাম। সর্বদাই ভাবিতাম, হরি যখন বাইবে, তাহার পশ্চাতে একটা খেক্ষেরালি তাড়া করে। সে যখন মুর্ছাপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে পড়ে, এমন সময়ে আমি “ভয় নাই ভয় নাই” রবে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব। সে খলিত-বচনে অর্ধ-মুহুরিত-নেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকে হাসিয়া বলিব, “শুদরি, আমি আমার কর্তব্যই করিয়াছি।”

দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন একটা সুযোগ নীচ আসিল না। বহুই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই আমার মন উত্তপ্ত হইতে লাগিল। এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, আমি দিন রাত্রি লাঠি বা বেত হাতে করিয়া থাকিতাম। সময়ে সময়ে লাঠিহাতে খেক্ষেরালীকে কি রকম তাড়া করিব, তাহার rehearsal-এর মত ছোট ভাইয়ের পশ্চাতে তাড়া করিতাম।

“চিরদিন সমান না যায়” এ কথাটা বড় ঠিক। একদিন দেখিলাম, হরি বাহার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পশ্চাতে পশ্চাতে একটা কুকুর আসিতেছে। আর পার কে! কোণ হইতে ককি ভাঙ্গিয়া সবিক্রমে কুকুরটার পশ্চাতে তাড়া করিলাম। কুকুরটা প্রথমে আমার দেখিয়া পলায় নাই, কিন্তু প্রথম আঘাত খাইয়া উর্ধ্ব-বাসে হা হতোম্বি! হা দ্যোম্বি! রবে লাম্বুল উত্তোলন পূর্বক পলায়ন করিল। হা অগুট! কই, হরি ত আমার প্রতি কৃতজ্ঞ নেত্রে চাহিল না।—জ্বরে বল বাধিয়া হরিকে বলিলাম, “কুকুর তোমার কামড়াইতে আসিতেছিল।” হরি হাসিয়া

বলিল “কেলো!” কেলো বোধ হয় কুকুরটার নাম। জিহ্বা শুকপ্রায়
হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। কি, হরি আমার knight ভাবিল না!
বাড়ীতে গায় রোজনোম্ম হইয়া কিরিয়া আসিলাম। পরে, তাহার বাড়ী
হু তিন দিন গিয়া কুকুরটার গল্প করিয়া আমার প্রশংসাতুষ্ক তাহার হৃৎ হইতে
বারিহ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কুকুরের গল্পটা শুনি-
লেই হাসিত। পাড়ার লোকের কাছে হাসিয়া আমার বীরত্ব-কাহিনী কহিত।
এমন কি শেষে আমাকে দেখিলেই হাসিত।

তার পর, অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, অর্জুনের মত লক্ষ্যভেদ করিয়া
বিবাহ করা বাঙ্গালীর সম্ভবে না। এখন আর রানকনা নাই।
বীর্ঘের আদরও নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজসংস্কারক হইলাম।
আমার প্রথম কোঁক পড়িল বিধবা বিবাহের উপর। আমি—মহাপুরুষ,
বক্তৃতা চাই না—কার্য্য করিয়া স্থখ্যাতি চাই। অর্থাৎ নিজে বিধবা
বিবাহ করিয়া example দেখাইতে চাই। কিন্তু পাণ্ডী পাঠ না। আমার
পরিচিত বক্তৃৎসি বিধবা আছে, সকল হতভাগিনীই বিবাহের দিকে
মন না দিয়া ধর্ম্মক্ষেত্রের দিকে মন দিয়াছিল। হুই একজনকে প্রথম প্রথম
মিঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার পুনর্বার পতি পরিত্যক্ত করিতে ইচ্ছুক কি না?
দেখিলাম কেহ বিরক্ত হয়, কেহ বা রহস্য কহিয়া বলে “কি দাগা, তুমি
তোমার ঠাকুর দাগা হইবে না কি!” ঠেকিয়া শিখিলাম, বাল বিধবার বিবাহ
হওয়াই উচিত। কিন্তু, কি করি!

আমাদের একটা প্রতিবেশিনী ছিল—নাম কুম্মদ। বয়স ১২।১৩,
কিন্তু তাহার স্বামী বর্ত্তমান। তাহার স্বামী কলিকাতার চাকুরি করে।
কুম্মদের স্বামী-কুলে কেহ অভিভাবক না থাকায়, স্ত্রীর মাতার নিকটেই
থাকিত। আমার মাতৃকুলে তাহার একধাত্র মাতা ছিল। মনে মনে
ভাবিতাম, কলিকাতার সম্রাটে ১৫-১২০০ লোক মরে, সেই ১৫-১২০০ মধ্যে
একদিনও কুম্মদের স্বামীটা পড়ে না! হুর্ভিক্ষে মাহুত্ব করে, যুদ্ধে মাহুত্ব করে,
কিন্তু ছায় চাকুরীতে মাহুত্ব করে না! রোগে মাহুত্ব করে, শোকে মাহুত্ব করে,
কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের জন্য কেহই মরে না! বাঙ্গালী সমাজের এই জন্য
উন্নতি নাই, বাঙ্গালীর এই জন্যই অধোগতি। বাঙ্গালী স্বার্থ ত্যাগ জানে না।

কুসুমের পানী ছয় মাস বাড়ী আসে নাট, ছই মাস সে কোন পত্রাদি পাঠায় নাট। কলি করিয়া সুযোগ-ক্রমে একদিন কুসুমের সহিত দেখা করিলাম। বলিলাম, “কুসুম তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।” কুসুম আমার দিকে ককণ-নেত্রে চাহিল। আমি বলিলাম “এই একমনের মুখে শুনিলাম।” কুসুমের ভাসা ভাসা চক্ষু ক্রমে টল টল চল চল কথিতে লাগিল। প্রথমে নিম্নু বিন্দু, ক্রমে অশ্রুর স্রোত উছলিতে লাগিল। প্রথমে দীর্ঘ শ্বাস, ক্রমে তা-তভাবে পাড়া সরগরম করিবার উদ্যোগ করিল। বেগতিক দেখিয়া আমি বলিলাম, “কুসুম কাঁদিও না, কাঁদিলে ত আর মরা ম্যারুৎ সেরে না। তুমি পুনরায় বিবাহ কর।” কথাগুলো বোম হইয়া তার কানেই উঠিল না। তাহার incoherent চিংকারে তাহার মা-মুতুর পাড়ার লোক আসিয়া উৎসিহ্ত আমি বেগতিক দেখিয়া সেখান হঠতে আগে ভাগেই প্রস্থান করিলাম।

সেই দিনই কুসুমের মাতা, আমার পিতাকে কুসুমের স্বামীর কাছে telegraph করিতে বলিলেন। পিতা গ্রহাই করিলেন। কুসুমের হতভাগা জীবন্ত স্বামী উত্তর পাঠাইল “I am well”। এই আর কি! আমার উপর চারি দিক হইতে প্রহরণ বর্ষন হইতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করে “কর নিকট হইতে অনিরাছিলে?” কেহ জিজ্ঞাসা করে “কোথায় অনিরাছিলে?” ইত্যাদি। কেহ বা সেই নির্ণাম পুরুষকে গালি দিতে লাগিল। আমার প্রভূতঃপন্নমতিটা নাকি খুণ। আমি কাঁদ কাঁদ মুখে বলিলাম, “ক্রাসের একটা ছেলে তার দাদার মুখে শুনিয়াছে।” মা বলিলেন, “বোকা! বা তা অনিরা আর বা তা বনিও না।” সব দোষ মুছিয়া গেল। কিন্তু কুসুম আমার ঘেঁষিলেই ঠোঁট ভারি করিয়া চলিয়া যাইত।

সমাজ সংস্কারকের বড় মন বতই বাধা পায়, ততই উত্তরিয়া উঠে। এখন আমি ভাবিলাম, বিধবা-বিবাহ—কুসুম সমাজের একটা ক্ষুদ্রতম সংস্কার। ভাবিলাম, হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া যাওয়া চাই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক করিবার একমাত্র বাধন গড়ি—হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ। কিন্তু আমাদের গ্রামে একটা করণীর গৃহস্থ মুসলমান দেখিলাম না। বা দুই চার ঘর আছে। তাও পাতি—চাঁস বাস করে খায়। সবই বাঙ্গালীর মত। কেবল জল না বলিয়া “পানী” বলে। ভাবিলাম, যখন কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় যাইব,

সেইখানে একজন ভাল কাগুজি মুসলমানের মেহেরকে বিবাহ করিব। আর আশ্বক্ষম না হইয়া বিবাহ করা ভাল নয়, ইত্যাদি।

যখন ভাবত-একীকরণ-রূপ হৃদয় আকাশে মন-রূপ বাজ পক্ষী উড়িতেছিল, পিতা-ব্যাধ সোঁপ দিয়া বোধ হয় আমাকে ঘরিয়া রাখিবার কল্পনা করিতে-
 ডিনেন। একদিন মা বলিলেন, “আস্চে মাসে তোমার বিবাহ।” বিবাহ! বিবাহ কথাটা দেখিতে দেখিতে মনের মধ্যে ঘূর্ণির মত ঘুরিতে ঘুরিতে কোথার তলাইয়া লটকা গেল। বোধ হইল, যেন একটা chaos-এর ধারে আনিয়া পৌছিয়াছি। -চুল সব খাড়া হটয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিকে ভানিয়া উঠিলাম—একটা ডাব আচণকা বিছাতের মত লুপয়ের মধ্যে ছুটিয়া গেল। বিবাহ! এওহ একটা সংস্কার করিবার বস্তু। মাকৈ বলিলাম, আগে Love—পরে বিবাহ। মর্খ মা—যে মা Cod-Liver Oil-কে কডলে বেড়াল বলে, সেই হৃদয় মর্খ মা—অপোগণ্ড বাবাকে বলিল, “ছেলে বলেছে, আগে লাভ পবে বিয়ে।” বাবা হাসিয়া বলিলেন, “লাভ না হলে কি এর মধ্যেই বিবাহ দিতেছি।”

গেমদাস।

কৃষি-কথা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কৃষির হৃদয়শার কথা যদি পাড়িতেই হইল, তবে তাহা আরও একটু ভাল করিয়া বলিতে হইতেছে। বলিতেছিলাম, হৃর্ভিক্ষের কথা। সে বড় ভয়ানক—রোমহর্ষণ। সে বিত্তীষিকার ভৈরব নৃত্যের কথা মনে হইলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; লোকে পেটের আঁলার গাছের পাতা চিবাইয়া খাইতেছে; হিন্দু যবনের ছাতের প্রাস কাড়িয়া লটতেছে; মাতা প্রাণের অধিক বুকের ঘন পুত্রকে

বিক্রয় করিতেছে ; পুত্র বৃদ্ধ মৃগী পিতার করণ চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে কেলিয়া পলাইতেছে ; ধনীর গৃহপাশে যেখানে ফেন কেলে, ভূকাননেষ নিকিপ্ত করে, শূণ্যল কুকুরের ন্যায় সেইখানে ক্ষুধাকাতর দুই একজন হতভাগা ব্রিহ্মা বেড়াইতেছে ; ঘরে ঘরে রাশি রাশি লোক মরিতেছে ; গৃহের দ্বারে দ্বারে শকুনি উড়িতেছে ; বাহারা ধন-কুবের তাহারাও অল্প দিন মধ্যে টাকার রাশি মাথায় দিয়া ঘরের ভিতর মরিয়া পচিয়া রহিতেছে । কে দেখে ? কে সে দৃশ্য ফিরাইতে চেষ্টা করে ? টাকায় পেট ভরে না । দেশে আহারীয় কিছুই নাই । দূরত্ব দেশের জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আনিতে যে সময় লাগিবে, তত দিনে দেশ খাশানভূমে পরিণত হইবে। ভারতভূমি স্বর্ণ-প্রসবিনী, সেই ভারতের এই দশা—ইহা তাবিতে হুঃখ হয়, চক্ষে জল আইসে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ।

এ ঘোর দুর্দিন নিবারণের উপায় কি ? একরূপ দুর্ভিক্ষ বহুদিন হইতে আছে, ও থাকিবে । রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই । কিন্তু, তখন রাজ্যের জন্য, প্রজার জন্য রাজা স্রোণপণ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতেন । এখন সে দিন নাই, সে রাজা নাই । বেশ কিসে শাসাশালী হইতে পারে, কিসে দেশের প্রজা দেশের উৎপন্ন সামগ্রী বাটরা জীবন ধারণ করিতে পারে, সে দিকে রাজার দৃষ্টি নাই । ১৮৭০ খ্রষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো (Mayo) নিম্ন মুখেই বলিয়াছিলেন “It cannot be denied that Indian agriculture is in a primitive and backward condition, and the Government has not done for its improvement all it might have done.” অথচ ইংরাজ কৃষির বিলম্বন মর্যাদা বৃদ্ধি ; দেশের ধন-রত্ন যে তাহার জমির ভিতরই লুপ্তায়িত থাকে, তাগে জানে । জানে, ভারতের ন্যায় উর্বরা ভূমি আর কোথাও নাই ;—তাহাতে ওত পাট করিতে হয় না। অথচ বাহাই বৃনা যায় তাহাই কলে ; ভারতের ক্ষয় এমনই অকটিন যে ইহার চাষীদিগের সেই সামান্য বস্তুদিগের পরশেই তাহা খুলিয়া দিয়া আপনাত গর্ভভাগার বিলাইয়া থাকে । ইংরাজ এ সব বুঝে—সব জানে । জানিয়া তনিয়া, লোভ সামলাইতে না পারিয়া অমনি উড়িয়া আসিয়া

চা ও নীলের চাপ আরম্ভ করিল। নিতান্ত বিদেশীর ভিনিস হটলেও তাহাই বিনা ওজরে কলিতে লাগিল। এত দেখিয়াও ইংরাজ গভর্ণমেন্ট কেন যে এই ভারতের দুর্দশাপন্ন কৃষির পতি এত উদাসীন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, এক দিন লর্ড লিটনের গভর্ণমেন্ট কৃষি ও রেলপথ নিষ্কার হুঁত্বিক নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মনে হয়, যেন এই কথা উল্লেখ করিয়াই সে সময়ে লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব এখন অতীতের কাহিনী হইয়া গিয়াছে! সার জন ষ্ট্রাচি ও লর্ড লিটন আপনাদের ধর্মপ্রতিজ্ঞা তদ্রূপ করিয়া গরিব প্রজার সেই বুকের রক্তশোষা টাকার কি ব্যবহার করিয়াছিলেন সে সব কথা উল্লেখ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

ফলতঃ গভর্ণমেন্ট যে ভারতকৃষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ও সঙ্কুচিত-দৃষ্টি, তাহা স্থির। অথচ বাহ্যে কিছু করার তানিকা আছে, তাহা রীতিমত বিনা ওজরে আদায় হইয়া থাকে। রাজা প্রজার উৎপন্ন সামগ্রীর “ষষ্ঠাংশ ভাগী”—এ কথা এখন আর কেহ শুনে না। ডোমার উৎপন্ন হটক ভাল, না হটক ভাল, অজন্মা নাই, দুর্জন্মের নাই, রাজকর কড়ার গণ্ডায় বুকাইয়া দিতে চাইবে। ভারতীয় কৃষকদিগের সহিত রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। তাহাদের হৃৎকের কান্না কে শোনে? জমিদারের পাইক পিয়াদার তাড়নার ধরহরিকম্প। শেষ হতভাগ্য মহাজনের দ্বারে আছড়াইয়া পড়ে। মহাজনেরও ‘বাড়ির’ কথা আছে। তিনি দেড়ী স্ত্রণে খত লিখাইয়া লইয়া নিঃশব্দে তাহার কনিজার উপর শাপিত ছুরিকা চালাইয়া লরেন। গরিব ছাঁ-পোষা শেষে ধনে প্রাণে মারা পড়ে। হতভাগ্য কৃষকদিগের এ দুর্দিন কবে পোহাইবে? রাজাই প্রজার মা বাপ, সেই রাজাই যদি প্রজার মুখ না ডাকাইল, তবে আর কে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিবে?

গভর্ণমেন্ট নাকি বলিয়া থাকেন, কেন, বাহ্যে মূলধন সেই জমি আমরা প্রজাদিগকে দিই, তাহার সেই মূলধন খাটাইয়া, জমিতে ফসল করিয়া, আমাদিগকে দিবে, তাহাও যদি না পারে সে দোষ কাহার? কথাটা সঙ্গত হটক, অসঙ্গত হটক, ঠিক রাজার মত নহে। প্রজা যদি মূলধন খাটাইতেও না জানে, যদি স্বাধীনতা চাপ আদায় করিতে না পারে, তবে সে বিষয়ে

তাহাকে শিক্ষা দেওয়া রাকার কর্তব্য। প্রকার মঙ্গলই রাজার মঙ্গল। এক জন অনভিজ্ঞ অধিবাসীগীর হাতে মূলধন দিয়া নিশ্চিন্ত থাকো যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের উচিত নহে। এ জন্যই বোধ হয়, লর্ড মেওর উল্লিখিত ডেসপ্যাচের উত্তরে তৎকালীন Secretary of State for India বলিয়াছিলেন 'It is certain that, the Government has a direct and immediate interest in the improvement of Agriculture.' হৃদয়ের বিষয়, কথাটা কথাই রহিয়া গিয়াছে; আশ্রয় কার্যে পরিণত হয় নাই। কখনও হইবে কি না তাহাও জানি না।

অনেকে বলিবেন, দুর্ভিক্ষ লইয়া এত কথা কেন? বলিয়াচ তো, ও চিরকাল আছে ও থাকিবে। অতিদ্রুতি, অনাবৃষ্টি, মরিক, খলত প্রভৃতি ইতি-ভয় বাইবার নহে। কিন্তু সে তো মথো মথো কচিং দেখা দিবে মাত্র। আর, এই যে প্রতিনিরন্তর রপ্তানি-বাণিজ্যে দেশ অহঃশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপায় কি? ভারতে কি শস্য অম্মায় না? কিন্তু কন্ডিলে হইবে কি? দেশের ভিন্ন কি দেশে থাকিতে পার? বৎসরে যে কতলটা ফলে, তাহার করটা দানা ভারতের ভাগ্যে থাকিতে পার? রাজা বহু পানেন, আপনি শোষেন, তারপর কাতাল বোকাই করিয়া তাহার সন্দেহীয়েবা বিলাতে লইয়া যায়—তবে দেশে আর থাকিবে কি? ভূমি ও হুনি থাইয়া মাছের বাঁচে না। রপ্তানি বাণিজ্য যে দেশ ছায়েথারে দিতেছে, তাহার উপায় আগে কর, দেখি। কথাটা উড়ইয়া দিবার নহে। উৎপন্ন সাম-গ্রীতে আপনাদের কুলাইয়া যদি উদ্ধৃত থাকে, তবে সেই উদ্ধৃত্তাংশ অন্যের সহিত বিনিময় করাকেই বাণিজ্য বলে। আপনি অনাহারে থাকিয়া, গ্রী-পুত্রকে পেটে মারিয়া, নিজের সামগ্রী অপরকে দেওয়ার নাম বাণিজ্য নহে। বাহাতে দেশের লোকেরই কুলাটয়া উঠে না, ভাল দেশ হইতে বাহিরে যাওয়া নীতিসঙ্গত নহে। ভারতের অগাধ রপ্তানি-বাণিজ্য যে তাহাকে আরও নিরন্ন করিয়া কেলিতেছে, ইহা সত্য বটে।

কিন্তু ইহাও সত্য যে, যে ভারত দর্পপ্রসূ বনিয়া অগতে বিখ্যাত, বাহার মাটা আঁচড়াইয়া এক মাগগার ছুট; দানা কেলিয়া ফিলেই সচ্ছন্দ শস্য উৎপন্ন হয়, চিরকালটা সকল দেশের লোক বাহার খাইয়া পরিয়া মাছের,

দেই ভারত আর ইংরাজকে চ-বুঠা চাউল দিয়া বে একেবারে অন্নের
কাজল হইয়া পড়িবে, তাহা বড় দুঃখের কথা। হউক না কেন রপ্তানি-
বাণিজ্য, ভারত যদি শ্রীতিমত শস্য জন্মাটতে পারে তবে তাহাতে তাহার
লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে দুশা ঠিক বদ-
লাইয়া যাইতে পারে। এখন রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত বেরূপ জড়মর্কণ
হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্তরূপ শস্য জন্মাইতে পারিলে তখন সে ইহাতে
আপনার অবস্থা উন্নত করিতে পারিবে। ভারতের শস্যের বিলাতের
বাজারে আদর বড় বেশী। অন্যান্য যে সব দেশ হইতে তাহা আইসে,
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা কখনও ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি।

মনে কর, গমের চাস। তুমি যদি তোমার ক্ষেতে এমন গম জন্মাইতেই
না পার, যে তাহাতে তোমার ও তোমার পরিবারেরই কুলায় না, তাহা
হইলে, সে সত্ত্ব কথা। কিন্তু যদি উপযুক্তরূপ ফলাইতে পার, আপনাকে
রাখিয়া উত্তমভাণ যদি চালান দিতে পার, তাহা হইলে তোমার যে তাহা
হইতে বিলম্ব হ-পরস্যা লাভ হইবেই, ইহা নিশ্চিত। ডাক্তার ওয়াটসন
(Watson) বলেন, ভারতের গম আমেরিকা কি অষ্ট্রেলিয়া সকল স্থানোপেক্ষা
উৎকৃষ্ট,—ইহা যেমন কোমল ও পরিষ্কার, তেমনি শুদ্ধ এবং স্বাদু।
British Trade Journal বলেন, ভারতের ময়দায় অনেক পরিমাণে জল থাকে,
ঠহার কটি বেশ ফুলিয়া উঠে, এবং ইংরাজেরা বড় পছন্দ করেন। বিলাতের
অনেক কলওয়াল মহাত্মন শতকরা ৫০ মণ ভারতের গম, ৪০ মণ আমে-
রিকার গম এবং ১০ মণ ড্যানিউকের গম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং
সকল স্থান অপেক্ষা ভারতের গমের আদর বে বেশী ইহা ঠিক। ভিনিষ
ভাল, অথচ ইহা অন্যান্য দেশোপেক্ষা সস্তাও চইবার কথা। ইউনাইটেড
স্টেটসে বত জারগা গমের চাস করিতে ৬ টাকা, ৬০ টাকা পড়িবে,
ভারতে তাহা ৩ টাকা ৩০ টাকায় হইবে। এরূপ কম খরচা পড়িবার
কারণ আছে। ভারতের মাটি বেরূপ সহজ-উর্বর, আমেরিকার মাটি সে
রূপ নহে। ভারতের এক ফুড়া ভূমি চষিতে যে পরিমাণ লাগিবে, আমে-
রিকার সে এক ফুড়া ভূমিতে তাহার চতুর্গুণ পরিমাণের প্রয়োজন। তা

ভাড়া, এখানে এক টাকায় যে পরিমাণ পাওয়া যায়, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তাহা ৩০ টাকার কম হয়ইয়া উঠিবে না। এ দেশে মজুরদিগের বেতন মাসে বড় ছোৱা আট টাকা। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বেতন সপ্তাহে (৫০ ঘণ্টায়) অন্তর ১৫ মিলিং। সুতরাং ভারতের গম যে অপেক্ষাকৃত সস্তা হইতে পারিবে, ইহা একরূপ স্থির কথা। দুই দেশের খুজরা দর দেখিলে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কানপুর, লুধিয়ানা এবং জলপুত্রে বাহা ৭০ টাকা হইতে ১১ টাকার বেশি হয় না, আমেরিকায় তাহার দর ১৬ টাকার কম নহে। তবে, একটা কথা আছে। আহাজ-ভাড়া। আমেরিকা হইতে মাত্র আটলান্টিক পার হইলেই বিলাতে আসিয়া পড়া যায়। কিন্তু ভারত হইতে তেমন সুবিধা নাই। অনেক পথ, অনেক খরচ। নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে লইয়া যাইতে হইলে বাহার ভাড়া ২ টাকা কি ২০ টাকা পড়িবে। ভারতবর্ষ হইতে যে লিনিয় লইয়া যাইতে হইলে ৪ টাকার কম কোনও মতে হইবে না। বেশ কথা। কিন্তু, মোট হিসাব ধর। প্রথম বলিয়াছি, আমেরিকায় বাহার দর ৬ টাকা ৩০ টাকা, এখানে তাহা ৩ টাকা ৩০ টাকা মাত্র; তার পর বলিয়াছি, আমেরিকায় বাহার ভাড়া ২ টাকা ২০ টাকা, এখানে তাহার ভাড়া ৪ টাকা। এখন মোট হিসাব খতাইয়া দেখ। আমেরিকায় যে গম ভাড়া সমেত ৮ টাকা কি ৯ টাকা পড়িবে, ভারতে তাহা ভাড়া সমেত ৭ টাকা কি ৭০ টাকা পড়িবে। তবু ১ টাকা, ১০ টাকার কম বেশি। ভারতের গম ভাল, অথচ ভারতের গম সস্তা, তবে ভারতের গমে লাভ না হইবে কেন? তবে রপ্তানি বাণিজ্যের অকারণ দোষ দিব কিসের জন্য?

তবে, আসল কথা, উপযুক্তরূপে ফসল চাই। তাহা হয় না বলিয়াই ত বড় বিপত্তি। শুনিবে বিস্মিত হইতে হয়, ১৮৮১ অব্দে ইংলণ্ডে সর্ব সম্মত ৫৭০৪২৬৪২ হাকের গম ৩১৬৬৬৮০৪ টাকায় আমদানি হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৩৮২৬৮৫১ টাকার গম গিয়াছিল। * হিসাব করিলে অতি বৎসামান্য মাত্র,—আট ভাগের এক ভাগ। ভূতপূর্ব

* The Influence on English trade and American protection by the development of India.

স্বাস্থ্যসচিব মেজর বেয়ারিং এ সপক্ষে বজ্ঞেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই ভারতের চাষ আবাধের দুর্দশার কথা বুঝিতে পারা যায়। মেজর বেয়ারিং স্থির করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতে মাত্র ২১০০০০০ একর ভূমি গমের চাষ হয়। অথচ অবোধা, মধ্য-ভারত, বোম্বাই, বেয়ার, বেহার এবং বাঙ্গালা সকল প্রদেশেই ইহার চাষ হইয়া থাকে। যে সব ভূমিতে চাষ হয়, তাহাও রীতিমত, যেমন হওয়া উচিত সেক্রপ, ফসল হয় না। ইহার অধিক আক্ষেপের কথা আর কি আছে ?

ভুজ গম নহে। সকল সময়ই ভারতের উপযুক্ত ঋণ জন্মে না। মুসলিম আকবর সম্রাটের রাজস্ব-সচিব টোডরমল তখনকার উপায় শস্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাহা উনিশ বৎসরের বহু অগ্রগতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আইন আকবরীতে সেই তালিকা আক্ষণ্ড-অক্ষুণ্ণ-রূপে একটি রহিয়াছে। তাহা মতে দেখিতে পাই, তখন, প্রতি একর ভূমিতে—

চাউল	১৩০৮ পৌণ্ড।
গম	১১৫৫
ভুলা	১১৩
পরিমাণে অস্থিত। আর, আজ কাল দেখিতে পাই, সেই প্রতি একর ভূমিতে,	
চাউল	৮০০ হইতে ৯০০ পৌণ্ড
গম	৬৬০
ভুলা	৫২

মাত্র অস্থিতেছে। এ কি এ! সে স্বপ্নপ্রস্থ ভারতের উর্বর-ক্ষেত্র কোথায় গেল? সে লক্ষ্মীর প্রিয় লীলাভূমির কেন এ দশা হইল? ভারতের সারধন তাহার ভূমির সেই উর্বরতা শক্তি কে হরণা লইল? Mr. Rivett-Carnac, আমেরিকাধর্মের ভুলার চার্লসের শেষ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন “Ah! I am at a loss to account for the continuous yearly decrease of this staple.” দুই শত বৎসরের মধ্যে বাহার এই অবস্থা ঘটয়াছে, আর দুই শত বৎসরের পর তাহার কি ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হইবে তাহা কে বলিবে? সে কথা মনে তাবিতোও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভারত স্বর্ণ-প্রসবিনী, সেই ভারতের এই পরিণাম।

ভরে ভরে ।

ভয়ে ভয়ে কেন, বাঁচা, গান্ ফিরে ফিরে ?
কচি কচি রৌঁট ছুটি কেন কাপে ঘরে ?
দিশাপ-গম্বীর যুব,
দেখে কি কাপিছে নুক ?
ঢল ঢল অঁথি-সুগ ছল ছল নীরে ।
আসিতে সাহস নাই,
হুয়ারে দাঁড়িয়ে চাই ?
ডাকিলেই এস দাই, 'আজ কেন চেয়ে রে !
আমার বেহের লতা,
ভূমি কি বুঝেছ ব্যথা ?
কাপিছে অধর-পাঙা, অভিমानी মেয়ে রে !
মুছেছি, মা, অঁথি-ঘলে ;
ভর কি, মা, আয় কোলে !
ডাক দেখি 'মা. মা,' ব'লে, আয় নুকে, রাগি রে !
—আয় নুকে অবশিষ্ট হৃথ-হাসি-খানি রে !
ঐমতী গিরীশ্রমোহিনী দামী ।

যুগ-ধর্ম ।

পৃথিবীতে অধুনা লোক সকল ধর্ম ধর্ম করিয়া চীৎকার করিতেছেন ।
তন্মধ্যে ধর্ম পদার্থ যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত অনেকে স্থির করিয়া উঠিতে
পারেন নাই । অনেকে বলেন, বদ্বারা অগৎ রক্ষা হইতেছে তাহারি নাম

ধর্ম। আর কেহ কেহ বলেন, মনুষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে বিধিনিষেধ আছে তাহাই প্রতিপালনে ধর্ম। আবার কেহ কেহ বলেন, বাইবেলোক্ত বিধিনিষেধ পালনেই ধর্ম। কেহ কেহ বলেন কোরাণোক্ত বিধিনিষেধ পালনেই ধর্ম। ধর্ম সম্বন্ধে আর অনেক প্রকার নূতন নূতন মত আছে। বৌদ্ধ মত, জৈন মত, দিগম্বর সিদ্ধান্তী মত, কাপালিক মত, অবোহি মত, নানকপন্থী মত, গোরক্ষী মত, মহাপ্রস্তর মত, কর্তাভজা মত, ব্রাহ্ম সমাজের মত, কৃতবিদ্যা নব্য বঙ্গালির মত।

এত মতামতিতেও আজি পর্যন্ত চকুলপ্রকৃতি মানবের ধর্মই স্থির হইতে পারিতেছে না। লোক সকল যতই হেতুবাদী হইতেছেন ততই পুরাতন ধর্মে হীনপ্রকৃ হইতেছেন। বাহ্য ধর্মে হেতুবাদ চলে অপ-রোক্ষ ধর্মে হেতুবাধ চলিতে পারে না। পরোক্ষ আর অপরোক্ষ ভেদে ধর্ম দুই প্রকার। কৃত্রিম ধর্মকে পরোক্ষ, স্বাভাবিক ধর্মকে অপরোক্ষ ধর্ম বলা যায়। সর্ব দেশীয় সর্বজাতীয় শাস্ত্রে উক্ত উত্তরদিধ ধর্ম পালন ও অপালনের বিধিনিষেধ আছে। যাহারা তাহা গ্রাহ্য করেন না, তাহা-দিগকেই নাস্তিক পেছাচারী বলা যায়। অপরোক্ষ ধর্মকে যোগীগণ আধ্যাত্মিক ধর্ম, আর পরোক্ষ ধর্মকে পরিবর্তনশীল বাহ্য জগতীয় ধর্ম বলেন। এ ধর্ম প্রতি যুগে পরিবর্তন হয়। যেমন যুগ পরিবর্ত হয়, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও পরিবর্ত হইতেছে। ইহারি নাম যুগ-ধর্ম।

শাস্ত্র আবার দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নানা প্রকার। ভারবর্ষের জল বায়ু ও নৃত্তিকার আর বৌদ্ধের ওপে ভাবতবর্ষবাদী লোকের যেমন আকৃতি প্রকৃতি ভারতীয় সিদ্ধযোগী আর অভ্রাত্ত ত্রিকালজ্ঞ হস্তমর্শী পণ্ডিতগণ তত্-পন্থ শাস্ত্র সকল প্রস্তুত করায় লোক সকল তদনুসারে চলিয়া সুখী হইতেছেন।

অপরূপ দেশেও এই রূপ চলিতেছে। তাহাতেই সে সকল দেশের লোক সন্তুষ্ট হইবে। যে সকল শাস্ত্র আপ্ত বাক্যে সংরচিত সে সকল শাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাণাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। উদ্ভিন্ন আর আর শাস্ত্র সকল দোষবহুল হেতু লোকের নিতান্তই অনিষ্টকর। সিদ্ধযোগী আর তপস্বিগ

তত্ত্বজ্ঞানীরাই অত্রায় ত্রিকালজ্ঞ ও নাক্ষত্রিক। ভারতীয় পুরাতন মুনি ঋষিরাই আপ্ত নাক্যের অধীশ্বর ছিলেন। সেই জন্যই এ প্রবন্ধে বৃন্দাবনদাস কথিয়া হিন্দুর হিতার্থ যুগ-ধর্ম নামক প্রবন্ধ লিখিতেছি। এত দিন এক প্রবন্ধ যদি কোন দেশহিতৈষী মহাত্মা লিখিয়া সকলকে জানাইতেন তাহা হইলে দেশের অনেকটা উপকার হইতে পারিত। নোপ হয় এখন সময় হইয়াছে বলিয়া এক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। সকলই কালে হয়, আগর কালে লয় পায়। হিন্দু শাখের পুরাতন কালের বিষয় যেমন প্রকাশ আছে, এমন আর কোন দেশীয় কোন জাতির শাখা আছে কি না তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রায় ৫০০০ হাজার বৎসর হইল কলিযুগ প্রবর্ত্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২১০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত মহারাজা সুধর্মির দেশের কিনা অর্জুনের বংশাবলিতে ভারত শাসন কিংবা সমগ্র পৃথিবী শাসন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এক প্রকার প্রাচীন শাখার পাওয়া যায়। তখন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা ও মুনিঋষি দ্বারা পৃথিবী শাসন হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পুরাণ, আর তত্ত্বশাস্ত্র। যখন চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় হিন্দুরাজা দ্বারা পৃথিবী শাসিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুধর্ম বৈ আর কোন ধর্ম যে পৃথিবীতে ছিল, তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চীন হিন্দু ছিল, মুসলমান হিন্দু ছিল, রষ্ট্রান হিন্দু ছিল (কে না হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিল?) সকলি হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিল। সূর্য্যবংশীয় সগন রাজা হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃন্দাবন প্রাণ হয় তাহারাই বৈদিক ধর্ম-কর্ম হইতে পরিচ্ছিন্ন হইল, যাগযজ্ঞ সংস্কার বিহীন হইল। কিছু তত্ত্বজ্ঞ জিয়ার অধিকারী হওয়ায় ঐ সকল লোক কেবল তত্ত্বমতে দৈব পৈতা ও সংস্কার জিয়ার করিতে লাগিলেন। ইহারা বৈদিক ভাষা ও বৈদিক অক্ষর পর্য্যন্ত পরিচয়ক হওয়ায় স্ব স্ব দেশোপগৃহ ভাষা ও অক্ষর ক্ষতি করিয়া শুদ্ধা সকল কর্ম নির্দোহ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চিন্দু-ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বলবীৰ্য্য অব্যাহতই ছিল বলিয়া, ঐ সকল অনাধ্যাপন হিন্দু রাজাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহারা এইরূপে চীন, পারস্য, মুসলমান, রষ্ট্রান, মগ, পাহাড়িয়া প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের বিতর্ক হওয়ায় নানা জাতিতে বিতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারাও ক্রমশঃ ধর্ম পরিবর্ত্ত করিয়া আসিতেছেন। ঐরানেরা এখন যে ধর্মাবলম্বী, ১৯ শত বৎ-

সর পূর্বে অনা ধর্মাবলম্বী ছিলেন । এইরূপ ৬ মলমানেরা ১০ শত বৎসর পূর্বে যে ধর্ম দীক্ষিত ছিলেন অধুনা সে ধর্ম তাহাদিগের নাই । চীনেরাও ২২ শত বর্ষ পূর্বে যে ধর্ম পালন করিতেন, এইক্ষণে সে ধর্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অনা ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন । এইরূপ পৃথিবীর তাবৎ জাতির পক্ষে ঘটিয়াছে । বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম যত পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে এত আর কোন জাতির হয় নাই । হিন্দুশাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, হিন্দুরা মত্যা নুপে কেবল বেদ মতে, ত্রেতাতে কেবল শ্রুতিমুতি মতে, দ্বাপরে কেবল পুরাণ মতে, কলিতে শুদ্ধ তত্ত্ব মতে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিবেন । ইহার প্রমাণ এই—

“নৃণামো বেদমার্গেন ত্রেতায়াং শ্রুতিসম্মতং

দ্বাপরেচ পুরাণেন কল্যাবাগমসম্মতম্ ॥” তত্ত্ব তারাপ্রদীপ ।

বিশেষতঃ কলিযুগের ধর্ম কথ্য সাধনা পক্ষে তত্বই যে এক মাত্র শাস্ত্র তাহার কতিপয় প্রমাণ এই স্থলে দেখান যাইতেছে ।

যথা—

আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ তজ্জং হৃদীঃ ।

নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কল্যাবান্ বিধানতঃ ।

কলৌতন্ত্রোদিতাঃ মন্ত্রাঃ দিক্শাস্ত্রাণি কলপ্রদাঃ ।

শস্ত্রাঃ কথ্যহু সর্কেণু তপ যজ্ঞ ক্রিয়াদিহু ॥

নাস্ত্রঃ পদা মৃতিহেতুরিচ্ছাদিতহৃদাশ্রয়ে ।

তথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায়চ হৃদায়চ ॥

দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরুষচরণ তর্পণং ।

ব্রতোদাহো পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ॥

জাতকর্ম তথানাম চূড়াকরণমেবচ ।

মৃতক্রিয়াঃ পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য়াদাগমসম্মতং ॥

তীর্থভ্রাজ্জং বুবেৎসর্গং শারদোৎসবমেবচ ।

মাত্রাং গৃহ এবেশক নব বস্ত্রাদিনারণং ॥

বাণীকৃপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্মচ ।

গৃহারভ্যং প্রতিষ্ঠাক দেবানাং দ্বাপনং তথা ॥

দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পরীকৃত্যং তটৈবচ ।
 স্তুত্বাস বর্ধকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকক যৎ ॥
 কর্তব্যং যদকর্তব্যং ত্যজ্যং গ্রাহ্যকষদ্ববেৎ ।
 মধোক্তেন বিধানেন তৎসর্লঃ সাধয়েন্নরঃ ॥
 ন কৃত্যং যদি মোহেন চূর্ণত্যাশ্রকথাপি বা ।
 বিনষ্টঃ সর্লঃ কশ্চেভ্যো নিষ্ঠায়াং জায়তে কনিঃ ॥
 যদি মমত্বমুৎপজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ ।
 যদাযং ক্রিয়তে কর্ম বিপরীতায় তদ্ববেৎ ॥
 কলিকালে প্রবুদ্ধেভু জ্ঞান্য যজ্ঞান্নমসিকৈ ।
 যোহন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কৃত্যং স মহাপাতকী ভবেৎ ॥
 অতোপাতো প্রকুর্যোগো যোহন্য মার্গেণ পান্নতি ।
 স যাতি নরকং যোরং যাবচ্চন্দ্রিবাকরৌ ॥

মহানির্দোষ তত্ত্ব ।

এবল কলিতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশে যে সকল সম্ভ্রান জন্মিলে তাহারা শুদ্ধ কাল-মাহাত্ম্যে অপবিত্রতা-হেতু সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়াবহিত হওয়ায় শূদ্রবৎ হইবে । তজ্জন্য তাহারা বেদাদি শাস্ত্রে অনধিকারী হইবে । কেবল তত্ত্ব অধিকার থাকিবে । ইহাই মহানির্দোষ তত্ত্বের মূল মর্ম্ম । তত্ত্ব ভিন্ন এ সময়ে অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র নাই । তত্ত্ব মতে ক্রিয়া করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য যে হইতে পারিবেন ইহারও প্রমাণ এই—

অন্তকাঃ শূদ্রকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ ।

তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন জ্যোতিবদ্ধনা ॥ তত্ত্বযামল ।

এতদ্বিত্ত এই কলি যুগের ব্রাহ্মণেরা বৈদিক সন্ধ্যা ব্যতীত আর কোনরূপ বৈদিক ক্রিয়ায় যে অনধিকারী তাহাও প্রমাণ গায়ত্রী তত্ত্বে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে । যথা—

গায়ত্রীচ তথা সন্ধ্যা বেদধ্যানং তথা মমুং ।

কলিকালে মহারাজ ব্রাহ্মণেষু প্রশাসতে ॥

অন্যংসর্লং বেদমতং কলৌ বিবর্জয়েদ্বিজঃ ।

বেদপাঠে ব্রাহ্মণস্য নাধিকারঃ কলৌযুগে ॥

হে মহারাজ, বেদমাতা গায়ত্রী, বৈদিক সন্ধ্যা, বেদের ধ্যান আর বেদ চতুষ্টয়ের মত চতুষ্টয় এই চারিটি বৈদিক কার্য কলিকালে ত্রাঙ্কণের পক্ষে প্রশস্ত । তদ্বিন্ন অন্য প্রকার বৈদিক ব্যাপার পরিত্যজ্য । বিশেষতঃ কলিতে ত্রাঙ্কণের বেদ পাঠে অধিকার নাই । প্রবল কলিতে বেদ, ত্রুটি, স্মৃতি, পুরাণের যেরূপ অবস্থা তাহা সম্ভবমাত্র লেখা যাইতেছে । মহা নির্দোষ তত্ত্বে আছে—

নির্দোষাঃ শ্রোতিজাহীরাঃ বিবহীনোরপাইব ।

পাকলিকাঃ যথাভিত্তৌ সর্কেন্দ্রিয়সমধিতাঃ ।

সত্যাদৌশফলা আসন্ কলৌতে নৃতকাইব ।

অনুরমতাঃ কার্থ্যে তথানো মন্তরাশয়ঃ ॥

অনামষ্ট্রঃ কৃতং কার্থ্য বক্ত্যাত্মীসঙ্গমং যথা ।

ন তৎকলসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছ্রম এবহিক্বেবলং ॥

এই প্রবল কলিতে ত্রুটি, স্মৃতি, পুরাণ ও বেদ ইহারা বীৰ্য্যহীন চইয়া রহিয়াছেন । যেমন বিবহীন সর্প তাহারি মত হইয়া রহিয়াছেন । নির্বিষ প্রাণিতে সংশন করিলে প্রাণিগণের কেবল ক্ষত মাত্র হয় । তেমনি বেদ, ত্রুটি, স্মৃতি, পুরাণ মতে ক্রিয়া করিলে কেবল অনর্থক অর্থব্যয় আর পরিত্রম হইয়া থাকে ।

অপরূপ, চিত্তিত বিচিত্র পট দিঘালে লট্কাইয়া রাখিলে সেই সর্কেন্দ্রিয়-সম্পন্ন প্রতিবৃতি যেমন কোন কার্য্য করিতে পারে না, কেবল দেখিতে মনোহর, তেমনি বেদ, ত্রুটি, স্মৃতি, পুরাণের বাক্যগুলি একালে শুনিতে বা পড়িতে অতি সুমিষ্ট ও মনোহর হয় ; কিন্তু দৈব পৈতৃ্যাদি কার্য্যে কোন ফল দান করিতে পারে না । ঐ সকল শাস্ত্র সত্য ত্রোতা দ্বাপর যুগে একত্বকল দান করিতে পারিত । একালে ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বাক্যে কোন ফল হয় না, তাহা নৃতবাক্য হইয়াছে ।

আবার—এই প্রবল কলিকালে তদ্রোক্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য বেদ, ত্রুটি, স্মৃতি, পুরাণোক্ত মন্ত্র দ্বারা ক্রিয়া করিয়া ফলকামনা করা, আর বক্ত্যাঙ্গীর গর্ভে সন্তান লাভ করিতে আশা করা উভয়ই সমান । সে কেবল বিভ্রম্না মাত্র ।

ভারতবাসী হিন্দু কতি এই প্রবল কনিকালেও অর্থব্যয় ও পরিভ্রম করিয়াও নৈব পৈতৃ্যাদি যে কিছু ক্রিয়া করিতেছেন, তাহাতে কোন ফল যে পাইতেছেন না, তাহার প্রকৃত কারণ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করা । অশাস্ত্রীয় কার্য্য তাহাকে বলি, যে কালের অন্য যে শাস্ত্র প্রচার বা বৃষ্টি হইয়াছে, সেট শাস্ত্রানুযায়িনী ক্রিয়া না করা ; কিন্তু শিবাজী অবহেলন পূর্ব্বক খেচ্ছাচার মত কার্য্য করা ।

যেমন বৈদ্য আর ঔষধ সঙ্গর হইলে রোগ প্রতীকার হয় না, তেমন বহুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে নৈব পৈতৃ্যাদি কার্য্য করিলে, সে কর্ম্মের ফল পাওয়া হুঁরাশী । তদ্বারা কেবল অতিচারই বটিয়া থাকে ।

এইক্ষণকার প্রায় তাবৎ ক্রিয়ায় বেদ, ঋতি, শ্রুতি, পুরাণ, তন্ত্র মিশ্রিত । কেবল শ্রাদ্ধ, আর অগ্নিক্রীড়া ও অন্নপূর্ণা পূজা শুদ্ধ তন্ত্র মতে হইতে দেখা যায় । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার উপযুক্ত পুরোহিত বা সাধক দেখা যায় না । যেখানে তাহা মিলে সেখানকার কার্য্যের ফল হাতে হাতে লাভ হয় ।

ভক্তমুখী ও ঐতিশ্যে হেতু এ বিদ্যা অতি কঠিন । ইহার সচরাচর সঙ্কটস্থ পাওয়া স্কটন । অন্যান্য শাস্ত্রের টীকা টিপ্পনী আছে । তন্ত্র শাস্ত্রের তাগ নাই । তন্ত্র শাস্ত্রকে মঙ্গলযোগ সাধনার শাস্ত্র বলে । ইহার সহিত হঠ যোগ, রাজ যোগ, লঘু যোগের বনিষ্ঠ সঙ্গন্ধ আছে । কিন্তু বিজ্ঞানের সহিত সে সকল কথা উপস্থিত মত লেখা যাইবে ; এখন বর্ত্তমান সময়ে প্রবল কলি বলা বাইতে পারে কি না, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বাইতেছে ।

এতদিন কলি প্রবল হয় নাই । প্রবল কলির প্রধান চিহ্ন এই, হিন্দু ধর্মানভিক্ত অত্যন্ত ধনলোভী স্নেহহীনতা ভারতের সম্রাট হইবেন । ১ ।

ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিয়া পরধর্ম্মাবলম্বন করিবেন । ২

গন্ধাধেবী ছিন্ন ভিন্ন ও অসুস্থিতা হইবেন । ৩

বেদ, ঋতি, শ্রুতি, পুরাণের ভেদজ্ঞান হইবে । ৪ ।

পৃথিবীস্থ তাবৎস্তর আকৃতি ধর্ম্ম ও স্বাদ অন্ন হইবে । ৫ ।

গোব্য জব্য দুশ্লীল্য হইবে । ৬ ।

জীলোক সকল দাবীনা ও দুঃখী এবং দুর্লভ হইবে । ৭ ।

অন্ন আর সভাস্ত সর্বত্র বিক্রয় হইবে । ৮ ।

অপচর্য তত থাকিবে না । ৯ ।

হিন্দু মাঝেই বামাচারী হইবে । ১০ ।

—ইত্যাদি । এগুলি ঘটনাছে বলিয়া ইহাকেই সাধারণে প্রবল কলি বলে । ইহাও ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন হইয়া শেষে খোর কলি হইবে । তৎপর যুগান্তর উপস্থিত হইবে । জনদুঃস্থ শত্রু কলিযুগের প্রথম ভাগের মানবনু নিস্তারার্থ অনেক তত্ত্ব মন্ত্র প্রচার করিয়া শেষে বিবেচনা করিলেন, প্রবল আর বোর কলির লোক সকল এমন দুর্লভ ও নিবীৰ্য্য আর সাহসহীন হইবে যে, যে সকল তত্ত্বাদি প্রকাশ করিলাম তার নিয়ম সকল প্রতিপালনে তাহারা নিতান্তই অক্ষম হইবে । তবে তাহাদিগের উপায়ের নিমিত্ত মহা নির্দোষ তত্ত্ব প্রকাশ করা বাউক । তজ্জন্য, আর জনশ্রুতি ভগবতীর অনুগোষে মহানির্দোষ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ তত্ত্ব খানি কেবল প্রবল আর বোর কলির শাস্ত্র । সেই কলির রাজত্ব এখন পড়িয়াছে কি না, এবং সেই তত্ত্বোক্ত বিধিনিষেধ পালন করিয়া ধর্মচর্যা কর এখন উচিত হইয়াছে কি না, তাহারই মীমাংসা করা এই প্রবন্ধে লক্ষ্যে করিবার প্রধান উদ্দেশ্য । এক্ষণে, যোগী আর প্রকৃত শাস্ত্রী মহাশয়দিগের নিকট এই কার্যনা যে, এই প্রবন্ধটির মত কার্য হইলে প্রকৃত হিন্দু সমাজের উপকার হইবে কি অপকার হইবে; আর লিখিত বিষয়টি হিন্দুশাস্ত্রমণ্ডল কি অশাস্ত্রীয়, ইহা সপ্রমাণ হানাইলে আমাদিগের মনেহ দ্বন্দ্ব হইবেই হইবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বর্তমান হিন্দু সমাজের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইতে পারিবে ।

[ক্রমশঃ—

শ্রীকালীকমল সার্বভৌম ।

ভারতে ইংরেজাধিকার* ।

ভারতে ইংরেজাধিকার প্রবন্ধে আমি প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথম, ভারতে ইংরেজাধিকার একটি অসাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত নহে। দ্বিতীয়, ভারতে ইংরেজাধিকার কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৃতীয়, ভারতের পূর্নতন সম্রাটেরা যে নীতির বলে আপনাদের সাম্রাজ্য হৃদয় ও হৃদয়িত রান্ধিয়াছিলেন,— শেষে যে নীতিতে ওদাসীনা দেখাইয়া সাম্রাজ্যের বনক্ষয় করিয়াছিলেন, ভারতে ইংরেজাধিকারে কিয়ৎংশে সেই নীতির অনমাননা হইতেছে। যে সকল ইংরেজ-লোক বর্ম্মান সময়ে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক সিলী প্রধান। অধ্যাপক সিলীও নির্দেশ করিয়াছেন যে, কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতে ইংরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-অঙ্গকে ইংরেজ কোন অলৌকিক শক্তিরও পরিচয় দেন নাই। আমি উপস্থিত প্রবন্ধে এই মতের আলোচনা করিব।

অনেকে বলেন, ইংরেজ আপনাদের অনন্ত মহিমায় ক্ষমতায় ও অপূর্ণ যাহুবিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক, শিবজী বা রণজিৎসিংহ যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, ইংরেজ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। চাণক্যের কূট-যন্ত্রণায় বাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইংরেজের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। বণিক ইংরেজ বণিক-বৈশে ভারতবর্ষে আসিয়া অল্প দিনে সিদ্ধ ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে আপনাদের, অল্পপতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন। অল্প দিনেই তাহাদের স্বদেশের বণিক-সমিতির এক জন অমুগত কর্ত্তব্যকারী ক্ষমতা, সমগ্র ভারতে সেকেন্দরশাহ বা শার্লোম্যানের, পিতর বা

* দরজীপাড়া তাতীয় পাঠক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ানের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমতিয়ার স্পর্শ করিয়াছে। ইহা ইংরেজের অপরোক্ষ দেবশক্তির ফল—অগণ্য, অচিন্ত্য মহিমার পরিচয়। ইংরেজ এই দেবশক্তির বলে—এই অচিন্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুন্দর কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দ্রতর প্রঙ্গ পর্য্যন্ত, বহনিস্তৃত, বহু সমুদ্র ও বহু জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে অলোক-সামান্য পুস্তক ও রাজাধিরাজ চক্রচর্চা বলিয়া পুঞ্জিত হইতেছেন।

গাহারা অক্ষত্বদর্শী নহেন, তাহারা যে, ইংরেজের সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু নিচিত্র নহে। ইতালীর সহিত ভারত-বর্ষের অনেক দিবসে সাদৃশ্য আছে। এদিককার মানচিত্রে যেমন ভারত-ভূমি; ইউরোপের মানচিত্রে তেমনি ইতালি। উভয়েই উত্তর মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ; উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ হইয়াছে; উভয়ের শীর্ষদেশেই স্টল অচলবর বিরাট-পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির অল্পপম শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে; উভয়ের অন্তর্দেশে প্রসঙ্গমলিনা জ্যোতস্বতী তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিরা বাইতেছে; উভয়েই প্রকৃতি রাজ্যের রমণীয় স্থান; শ্যামল তরুলতায় লসাপূর্ণ প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়েই চিরশোভিত, অপরিসীম মৌল্যের গরিমায়, অনাগাস-লভ্য ফলসম্পত্তির মহিমায় উভয়েই বিভূষিত। পঞ্চাশত্বে, ভারতের ন্যায় ইতালীও অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। বহুশতাব্দী ধরিয়া উভয় জনপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নির্জীত, নিপীড়িত ও আত্মসাদীনতায় বঞ্চিত। ইতালী পূর্বে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় ইতালীর দৈনাবল ছিল না, ইতালীর অধিবাসীরাও অষ্ট্রিয়ার অধিবাসীদের ন্যায় সাহসসম্পন্ন বা রণ-নিপুণ ছিল না। সীজর বা আটলীর সমরের বীরত্বকীর্ত্তি এ সময়ে ইতালী হৃদয়ে অন্তর্ধান করিয়াছিল। যে অসাধারণ পরাক্রম, যে বিপুল বৈভবে অগতের লক্ষ্যী মৌল্যমাণিনি গোমনগরী তিব্বের তীরে দাঁড়াইয়া আপনার গৌরবে আপনি হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম ও সে বৈভব ধীরে ধীরে অনন্ত অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে অষ্ট্রিয়া ইতালীর নিকটবর্তী ছিল, সুতরাং অল্প সময়ে, অল্প আঘাতে

আক্রান্ত জনপদের আপনাদের পাশবশক্তির পরিচয় দিত। ইতালী এরূপ স্ফটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়াও আপনাকে অস্তিত্বের অধীনতাশাশ হঠতে বিমুক্ত করিয়াছে। এই অধীনতাশাশ উচ্ছেদের একমাত্র কারণ—ইতালীর অপূর্ণ জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালী অনেকবার পরাজয় প্রাপ্ত করিয়াছে, কিন্তু কখনও আপনার জাতীয়ভাব হঠতে অধুগাত্য বিচলিত হয় নাই। ইতালীর সাহসী গৈরনাগণ পবিত্র সময়ে অন্য নিঃশ্রয় অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহার অধিবাসিগণ বিদেশীর অত্যাচারের হৃৎকের সম্পদের, শান্তির আশায় অনেকবার অলপ্তানি দিয়াছে; ইতালীর বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুপ্তিত ও দেশান্তরে নীত হইয়াছে; কিন্তু ইতালী জাতীয়-জীবনের গোপবশূনা হয় নাই। জাতীয়ভাবে সম্বন্ধ ও জাতীয়-জীবনে অধুগাত্য হওয়াতে সমগ্র ইতালীতে অভূতপূর্ণ শক্তির সঞ্চার হয়, অন্যান্য দুঃখও ইতালীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করে, বিদেশী আক্রমণকারী অবশেষে ইতালীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

পঞ্চাত্তরে, ভারতের দিকে—এই যৌর দুর্জশাময় পতিত ভূমির দিকে চাহিয়া দেখ। ইতালী যেমন অস্তিত্বের নিকট রহিয়াছে, ভারতভূমি তেমন ইংলণ্ডের নিকটবর্তী নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বহুদূরে—সাগর-হৃদয়-পরিবৃত্ত বিপুল পৃথিবীর একভাগে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বহির্ভাগকে বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া অনেক কষ্টে—অনেক দিনে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল। তখন অন্তরীক্ষের তড়িৎ ভূতলে আসিয়া ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের নিকটবর্তী করে নাই; বাষ্প-প্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক অবনত করিয়া ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে সাহায্য করে নাই; মন্থর লেন্সপেনের বুদ্ধি বিস্তৃত সৈকত ভূমে জনস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অধিকতর সুগম করিয়া দেয় নাই। অধিকন্তু ইংলণ্ড যে সময়ে বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল না, ইংলণ্ডের অধিপতি সেকন্দর বা হানিবলের ন্যায় দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন না, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের আট গুণ পরিমিত ছিল, তথাপি ভারতবর্ষ সহজে ইংলণ্ডের বশীভূত হয়। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ ইতালীর ন্যায় কখনও আত্মস্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ হয় নাই, সমগ্র ভারতভূমি ইতালীর

নাথ জাতীয় ভাবে সমৃদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডকে “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া কখনও আহ্বান করে নাই। অঙ্গীরাণকে ইতালীর জন্য যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় নাই। সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় যন্ত্রের স্বপ্নে ইংরেজ বণিকের পদানত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণে আগার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা কি বিশ্বয়কর ঘটনা নহে? ইহাতে কি ইংরেজের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইংরেজের অচিন্তনীয় মহিমায় কি ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই?

ঘটনা বিচিত্র বটে, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের সহিত কোনরূপ অলৌকিক শক্তির সংযোগ নাই। কোনরূপ অচিন্ত্য মহিমার সংশ্রব নাই। উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমতঃ ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, ইতালীর নাথ সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল; দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের পরাক্রমে এই সার্বজনীন শক্তি পূর্ণদস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ইংরেজ সমগ্র ভারতস্থ সমান আচার, সমান ধর্ম ও সমান ভাষার একটি বিশাল জাতিকে আপনার ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই দুয়ের একটি কথাও প্রকৃত নহে, একটিও বস্তুতঃ ঘটনার উপর স্থাপিত হইয়া ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তির সমর্থন করিতে পারে না। ইংরেজের পদার্পণ সময়ে বা তৎপূর্বে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না; ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক উদ্দেশ্য নাশনের জন্য পরস্পরে ভাড়াভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই।

জাতীয় ভাবের উৎপত্তির প্রথম কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাষা। সমস্ত ইংলণ্ডের লোক এক ইংরেজীতেই আলাপ করিয়া থাকে। কিন্তু এ প্রযোগ ভারতবর্ষে নাই। সমগ্র এশিয়ার লোক এক ভাষায় কথাবার্তা করে, ইহা বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, আর সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক ভাষায় আলাপ করে, ইহা বলিলেও সত্যের সেইরূপ অনাথাচরণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক জনপদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে বুদ্ধিতে পারে না; এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর করিয়া পড়ে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীর চিন্তা, ধারণা, সম-

বেদনা প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে । ইহাতে জাতীয় ভাব নিকাশের সম্ভাবনা কোথায় ? ইতালী ভারতবর্ষের ন্যায় স্বাধীনতা বিতর্ক থাকিলেও এক ভাষায় আবদ্ধ ছিল । সমগ্র ইতালীর লোক পরস্পর এক ভাষায় কথোপকথন করিয়া পরস্পরের নিকট মনোভাব জানাইতে পারিত । এই সাধারণ ভাষা হইতে একটা সাধারণ সাহিত্যের উৎপত্তি হয় । স্বদেশবৎসল কবির সমস্রী কবিতার—স্বদেশ-হিতৈষী বক্তার তেজস্বিনী বক্তব্য এই নাহিত্য অগম্য হইতে পারে । কবিতার দ্বারা এক সময়ে অপূর্ণ দেশ-ভক্তিতে বিভোর হইয়া যে গান গাইয়াছিলেন, রায়েন্সি সেই গান গাইয়াই স্বদেশীয়গণের মুহ্যমান জগদে তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করেন । সমস্ত ভারতভূমিতে এ দৃশ্যের আদির্ভাব দেখা যায় নাই, স্মরণ্য কোন সময়ে সমস্ত ভারতভূমি একত্র জাতীয় ভাবে সম্বন্ধ হইতে পারে নাই ।

একবিধ ধর্ম, একবিধ স্মার্ত্ত ও একবিধ আচার ব্যবহার প্রভৃতিতেও জাতীয় ভাব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের অধরে ইহাও ঘটে নাই । ইহা ব্যতীত দুারোহ পর্বত, গর্গম অরণ্য, হস্তর তরঙ্গিনী প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের জনপদ সকল পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্থিত । এই প্রাকৃতিক অন্তরায়ও কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই । জাতীয় ভাবের উদ্বোধ দেখা যায় নাই । স্মরণ্য এসিয়া, ইউরোপের ন্যায় ভারত বর্ষও একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র । ইহার সহিত সার্বজনীন রাজনৈতিক ভাবের কোন সংশ্লিষ্ট নাই । নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তিতে ভারতবর্ষের অঙ্গ সকল বহুকাল হইতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে । ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক অঙ্গ বেদনা অনুভব করে না ; এক অঙ্গে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলে আর এক অঙ্গের স্পন্দনক্রিয়া লক্ষিত হয় না । এই বিচ্ছেদে—এই অনৈক্যে ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে বলশালী হয় নাই । যখন শাহবদ্দিন গোরিকে দেশ চাইতে নিকাশিত করিবার জন্য পৃথীরাজ দুষধতী-ভীরে সমাগত হন, তখন অগচ্ছ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন নাই । ভারতে মোগল রাজ্যের স্থাপনকর্তা বাবরশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, শেষে আফগানিস্থান তাঁহার হস্তগত হয় । বাবরশাহ যখন দ্বিতীয় সিংহাসন

এহণে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাদৃশ সহায়সম্মুখ ছিলেন না—বিশেষ রূপনিপুণ যোদ্ধারাও তাঁহার সহযোগী হয় নাই, তথাপি বাগরশাহ ভারতবর্ষে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্বত্বপাত করেন, শেষে ইহারই বংশধরের উদ্দেশে ভারতের হিন্দুগণ “দিল্লীররো বা অগদীররো বা” শ্লোকে সকলকে মাতাইয়া তুলেন ।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে সমগ্ৰ ছিল না, ইংরেজ কোনরূপ জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন নাই । নানা কারণে ভারতবর্ষ পূর্বেই বহু-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল । ইংরেজ এ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত অবস্থায় আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন । সুতরাং ইহাতে ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তি বা অচিন্ত্য মহিমাও পরিচয় পাওয়া যায় না । যদি ভারতের হিন্দুগণ দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের স্বদেশীয়, স্বজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিত, এই রাজকীয় শক্তির সহিত তাঁহাদের জাতীয় বল বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে বলিতে পারা যাইত যে, ইংরেজ এই রাজশক্তির উপর আপনার রাজত্ব স্থাপন করিয়া অগতের সমক্ষে অসাধারণ কমতা দেখাইয়াছেন ; আর যদি ভারতের সমস্ত হিন্দু অর্থাৎ পরম্পর সমবেদনার অধিকারী হইয়া একনিধ চিন্তায়, একবিধ ধারণায় একটি মহাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, তাহা হইলেও বলিতে পারা যাইত, ইংরেজ এই চিরঞ্জয় মহাজাতিকে পরুদ্ধস্ত করিয়া দেবশক্তির পরিচয় দিয়াছেন । কিং উতিহাসে এই দুয়ের একটিরও চিহ্ন পাওয়া যায় না । ইংরেজের পর্যাপ্ত সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি লোকের আবাস ছিল যে, তাহাদের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, রাজনৈতিক একতা ছিল না, একের ধারণা অন্যে সন্মত হয় নাই, একের চিন্তায় অপরে চিন্তাশীল হইত না, একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিশিয়া যাইত না, একের অভাবে অপরের অভাব বোধ হইত না । ইংরেজ পরের সাহায্যে এই বিচ্ছিন্ন, বিগুণ লোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন ; ভারতে ইংরেজ রাজত্ব লোকাতীত দেবশক্তির বলে স্থাপিত হয় নাই । উতিহাসের চক্ষে ইহা অসাধারণ নিশ্চয়কর ঘটনাও নহে ।

আবার, অনেকের বিশ্বাস ইংরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কেবল ইংরাজের পরাক্রমে, ইংরাজের ক্ষমতায়, ইংরাজের বুদ্ধি-কৌশলে ভারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরধীনতার দুর্দশ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজ বিজ্ঞতা, ভারতবাসী বিজিত। ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনকর্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাজিত। নানা দৃশ্য-সমাকীর্ণ নানা-রক্ত-শোভিত ঐক্যের এই রমণীয় রাজ্য দিগ্বিদিক দ্বারা ইংরেজের বিজয়লক্ষ সম্পত্তি। পলাশীর আত্ম কাননে, আসাইর প্রথম ক্ষেত্রে, পঞ্চনদের পবিত্র-ভূমিতে, সর্বত্রই ইংরেজের বাহুবলে ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অনেক ইংরেজ ইতিহাসলেখক অগ্নানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা পরিকল্পিত করিয়াছেন। লর্ড মেকলে 'লড ক্রাইব' শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক স্থলে "কেহই সাগরের ক্ষমতামূলী সন্তানগণকে, অর্থাৎ ক্রাইব ও তাঁহার ইংলওবাসীদিগকে, প্রতি-রোধ করিতে পারে নাই" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "সাগরের ক্ষমতামূলী সন্তানগণের" ক্ষমতাবলেই যেন ভারত সাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। ক্রাইব তাঁহার ইংলওবাসীদিগের পরাক্রমেই যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা আপনায় পদানত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা বিপর্যস্ত করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, আমি তাঁহাদিগকে শতহস্ত দূর হইতে অভিমানন করি। ভারতবর্ষ এখন ইংরেজের পদানত হইয়াছে, ইংরেজ এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইংরেজের বীরবে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ভারতের দেশের পর বেশ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরাজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। হিমালয়ের অত্যাচ্চ শিখর হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত ইংরাজের প্রভাব ছাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরাজের বিজয়লক্ষ সম্পত্তি নহে। অদূরদর্শী ইংরেজ যতই গর্ভিত হউন না কেন, জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব বিস্তার করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত বিজ্ঞতা।

বলিয়া সম্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রকৃত বিজেতা নহেন, কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই, বিজয়-লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ষে অধিপত্য করিতে ইংরেজের কোন অধিকার নাই। ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতবাসী আপনাবাই আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়া তুলিয়াছে।

কেই এক দেশ হইতে আসিয়া দেশান্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিলেই উহাকে সাধারণতঃ দেশজয় বলা গিয়া থাকে। দুই রাজ্যে সংগাম উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেই রাজ্যের রাজত্বীয় শাসন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের অধিপত্যকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত রাজ্যাদিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকট প্রকারান্তরে আপনাব্য অধীনতা স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধি অধীন হওয়াতে তাহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। ইহাই প্রকৃত দেশজয়। যখন মাসিদনের মহানীর সেকন্দরসাহ পারস্যস্থান জয় করেন, তখন মাসিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যাদিগের যোঁরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যগণ সেকন্দর সাহের সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। পারস্যে মাসিদনের বিজয়পতাকা উডডীন হয়। যখন পঞ্চাবদেশের রণজিৎ সিংহ সিদ্ধান্ত আক্রমণ করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফগানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটয়াছিল। এই যুদ্ধে শেষে আফগানদিগের পরাজয় হয়। আর্গানবর্তের হিন্দু নরপতি আফগানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন। যখন নির্দেশ করা যায় যে, ইংলও ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তখন সহজেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যেও এইরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস স্মৃতি দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ইংলণ্ডের অধিপতি বিভিন্ন যোগল সম্রাট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের রাজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইংলণ্ডের সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত

হয় নাই, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করে নাই। ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কেন্দ্র ইংলণ্ডের কয়েক জন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদবৈ ব্যবসায় করিতে আসিয়া, মোগল সাম্রাজ্যের ভয়ানক ভাবেতনয়ে অরাজকতা দেখিতে পান। এই অরাজকতা তাঁহাদিগকে আবিপত্য স্থাপনে প্ররম্বিত করে। তাঁহারা ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছলে বলে ও কৌশলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইণ্ড প্রকৃত দেশভয় নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের বল বলিয়া নির্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত।

এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময় যদি ইংলণ্ডের বলিকগণ কেবল তাঁহাদের "সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের" বাহবলে ভারতের জনপদ সকল অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বলিতে পারা যাইত যে, ইংলণ্ডের পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে এইরূপ চিত্র ত পাঠকের নেত্র পথবস্তী হয় না। ভারতবর্ষের দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৬৫০০ হাজার মাত্র ইংরেজ। এই রূপ সংখ্যা কেবল সিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। সিপাহি যুদ্ধের সময় ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২৩৫ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। ১৮০৮ অব্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পূর্বে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন মাত্ৰাণের এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন্য ছিল। ইহার পূর্বে কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারা আপনাদের সামরিক কার্য্য নির্বাহ করিতেন। অকল্প-কল্পতার পর লর্ড ক্লাইব যখন কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাত্রাণ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ১৫০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও ২০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশির যুদ্ধে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানীর পদানত হয়, তাহাতে ২৮৮০ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; পলাশির, ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে ইংরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধলিপ্ত হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান

যুদ্ধে তাঁহাদের বিজয়-গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, তৎসমুদয়ই একপক্ষমাংশ মাত্র ইংরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারি ভাগের সমস্তই ভারতবর্ষীয় সৈন্য। সুতরাং ইংরেজ জাতি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির পরাক্রমে ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশী কর্তৃক নিজিত হয় নাই; সমগ্র ভারতবর্ষে কখনও বিজাতি ও বিদেশীর পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বহুমূল হয় নাই। ভারতবর্ষ আপনাকে আপনিই জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অনেক দোষে ভারতবর্ষের অপঃপতন হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অমুঠানে ভারতবাসী পূর্নতন ওপগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর ইংরেজেরাও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও হরক্ষিত করিয়াছেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীরজনীকান্ত ওপ্ত ।

শিরোমিতি বিদ্যা ।

মস্তিষ্ক উপাদানের উৎকৃষ্টতা ।

“মস্তিষ্কের আয়তনই মনের শক্তি-মাত্রার পরিমাপক” ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে সকল কারণে এই নিয়মের ভারতম্য ঘটয়া থাকে তাহাও শারীরিক প্রকৃতির ইতর-বিশেষ একটি প্রধান কারণ। শারীরিক প্রকৃতির বিষয় পূর্ন প্রবন্ধে বর্ণনা করা দিয়াছে, এক্ষণে অপর কারণগুলির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—

মস্তিষ্ক উপাদানের উৎকৃষ্টতা ।

এক খণ্ড পেটাই লোণ আয়তনে-সমান এক খণ্ড ঢালাই লোহা অপেক্ষা

বেশি শক্ত।—যনতার আধিক্য হেতু বেশি ভারি ও দৃঢ়। পাণ্ডুরোগী
ন্যায় ছিজানু ও বিরল-পরমাণু দব্য-সকল লঘু ও ভঙ্গুর হইয়া থাকে।
সিংহ বলবান কেননা তাহার মাংসপেশী, মাংসবন্ধনী এবং অস্থিসকল
অত্যন্ত ঘন ও শক্ত। কি মনুষ্যো, কি পশুতে, কি মস্তিষ্কে, কি মাংস-
পেশীতে এই একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত মহত্ব কোথায় দেখিতে
পাওয়া যায়, না যেখানে গুরুভার ও দৃঢ় মস্তিষ্ক, যুগ্ম শ্রাণু সমন্বিত
বলবান শরীরের সহিত সম্মিলিত হয়। বাহাদিগের মাথা ছোট, তাহার
খুব চটকদার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চতুর এবং কোন কোন দিশে বলবান হইতে
পারে, কিন্তু তাহার কখনই চৌকোষ, গভীরবুদ্ধি কিম্বা নেড়-গণাক্রান্ত
হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, বাহাদিগের মাথা বড়, অথচ বাহাদিগের
মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক উপাদান তেমন উৎকৃষ্ট নহে, কিম্বা রোগাক্রান্ত,
তাহারা বৃহৎমস্তক হইয়াও স্থূলবুদ্ধি কিম্বা নিপুণ হইতে পারে। কি
শরীর কি মন উভয়েরই উচ্চতম শক্তি প্রকাশের জন্য দুইটি বিষয় সমান
প্রয়োজনীয়। প্রথম, উপাদানের উৎকৃষ্টতা—দ্বিতীয়, আয়তনের বৃহত্ত্ব।
এই উপাদান-যুক্ত উৎকৃষ্টতা অনেক সময়ে চক্ষু, কেশ ও মুখাবয়ব প্রভৃতির
স্থূলবৃদ্ধিতে দেখিয়া নির্ণীত হয়।

জাস্তা।

কোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যের অনুসন্ধান
করা আবশ্যিক। কারণ, অসুস্থ হইলে কি মন কি শরীর উভয়ই অক-
র্মণ্য হইয়া পড়ে। “সুস্থ শরীরে সুস্থ মন” ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

স্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া।

স্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া শারীরিক জীবনের একটি প্রধান ব্যাপার। নিঃস্বাস
আর জীবন প্রায় একই কথা।

বুকের আগতন ও ফুগুসের অবস্থার উপর স্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি নির্ভর
করে। বুকের আগতন মাটিয়া দেখিলেই নির্ণয় হইতে পারে।

স্বাসপ্রশ্বাস শক্তি উত্তম হইলে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যথা :—

• দৈনিক বিভাগের নিয়মাহুযায়ী প্রত্যেক মৈনিকের বুকের বেড় তাহার
শরীরের দীর্ঘতা মাপের অর্ধেক হওয়া চাই।

হৃৎবেশ লাল, হাত পা গরম, এবং সমস্ত শরীরের ক্রিয়া সবল। বাহার প্রাসপ্রবাসের তেজন বল নাই। তাহার বর্ণ সাধারণতঃ পাণ্ডুর্বর্ণ—এত পা ঠাণ্ডা, নীল শিবার আদিক্য এবং অল্পেতেই তাহাদের মর্দি কাশি হয়।

প্রাসপ্রবাস ক্রিয়া বাহার যত সবল তাহার সেই পরিমাণে জীবনী শক্তি, অতএব বৃককে প্রেবস্ত করা এবং প্রাসপ্রবাস ক্রিয়াকে বলবতী রাখা সকলেরই নিত্য আবশ্যক। প্রাণায়াম ইহার একটি প্রধান সাধন। এই অন্য প্রাণায়াম সাধন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

রক্ত চালনা।

প্রাসপ্রবাস ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এই উভয়ের মধ্যে একটি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জীবনী শক্তি উৎপাদনে উভয়েরই সহযোগিতা আছে। নিঃপ্রাসপ্রবাসে বৃক যে ওঠে নাবে এবং নাড়ীতে যে স্পন্দন হয় এই উভয়ের মধ্যেই একটা যোগ আছে।

বিস্তৃত খাদ্য বোধোপকৃত রূপে শরীরান্তরে সমীকৃত হইলে এবং বিস্তৃত বায়ু প্রাসপ্রবাস দ্বারা অন্তর্নীত হইয়া ঐ খাদ্যকে অক্সিজেন-গোধিত করিলে যে রক্ত উৎপন্ন হয় উহা বিস্তৃত রক্ত। সমস্ত শরীর-ভয়ে এই রক্ত প্রবাহিত করাই লম্বিণ্ডের কার্য। এবং এই রক্ত হইতেই মাংস-পেশী, আয়ু ও মস্তিষ্ক উৎপন্ন হয়। রক্ত বিস্তৃত হইলেই এই সকল পদার্থ সবল ও সুস্থ ও কার্যক্ষম হইয়া থাকে।

তাল রক্ত চালনের লক্ষণ—হৃৎবেশ হৃৎ বর্ণ—হাত পা গরম এবং নাড়ী দীর্ঘ, সবল ও সমবেগস্পন্দন।

পরিপাক ক্রিয়া।

পাকশয়ের অবস্থার উপর পরিপাক শক্তি প্রদানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু রক্ত চালনা ও প্রাসপ্রবাস ক্রিয়ার মাত্রা-ভেদেও উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি রক্তচালনা-শক্তি কম হয় তাহা হইলে পরিপাকের সময় হয়তো যথাপরিমাণ রক্ত পাকস্থলীতে নীত হয় না। আর যদি প্রাসপ্রবাস শক্তি কম হয়, তাহা হইলে যে রক্ত পাকশয়ে নীত হইয়াছে তাহার বল ও তেজ বোধোপকৃতরূপে থাকে না। বেশি পরিমাণে প্রাসপ্রবাস ক্রিয়া হইলে পরিপাকের সাহায্য হয় এবং পরিপাক-বস্তু ও ক্ষুদ্র

সবল হয়। দুঢ় নিরেট মাংস, হৃদ বর্ণ, ইহা হৃদ পরিপাক যন্ত্রের ও উত্তম পরিপাক শক্তির লক্ষণ। ক্ষৌণ্ডতা, পাতুবর্ণ - রূপময় চর্খ — নৈরাশ্র-বৃত্ত খিটখিটে মনের অবস্থা,—এই সকল অসম্পূর্ণ পরিপাক ক্রিয়ার নিদর্শন।

ক্রিয়াশীলতা ।

ক্রিয়াশীলতা প্রধানতঃ শরীর-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেস্থলে গতি-প্রধান প্রকৃতি এবং মন-প্রধান প্রকৃতি উভয়েই সমানরূপে বলবতী সেই স্থলে এই ক্রিয়াশীলতার বিকাশ সর্বাধিক। সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দীর্ঘতা ও মাংসপেশীর অনতিপরিপুষ্টি ইহার লক্ষণ। হরিণ, ঘে গৌ ও কুঙ্গুর এবং ঘোড়-গোড়ের ঘোড়া এই অন্য এত ক্ষুদ্রগামী। দীর্ঘতা, অস্থূলতা ও হৃদমার গঠনের সহিত সহজসাধ্য গতি কেমন সংলগ্ন তাহা উপন্যাস পুস্তকের দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ হয়।

উত্তেজনীয়তা ।

ইহাও শরীর প্রকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। যেস্থলে প্রাণ প্রধান প্রকৃতি ও মন-প্রধান প্রকৃতি উভয়েই অত্যন্ত বলবতী, সেই স্থলে এই উত্তেজনীয়তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। অতিমাত্র মদ্য, তামাক, চা-কাফি প্রভৃতি সেবনে তাহাদের স্বাধুত্ব বিকলিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উত্তেজনীয়তা দৃঢ়বাহিত্ব অপ্রাভাবিক মাত্রায় প্রকাশ পায়।* রস-প্রধান প্রকৃতির লোকেতে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। সকল বিষ-য়েতেই তাহাদের উদাস্য ও অনুসাহ—কি বর্তমান কি অতীত কোন ঘটনাতেই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে না।

অবস্থা সমূহের সামঞ্জস্য ।

চরিত্রের পূর্ববিকাশের অন্য ইহা নিত্য আবশ্যক, যে শরীর ও মস্তিষ্ক এবং তত্ত্বয়ের শরীরতাত্ত্বিক অবস্থা সমূহের মধ্যে মিলক্ষণ সামঞ্জস্য।

* পূর্ব প্রবন্ধে হৃদযন্ত্রীদিগের প্রমাণ বশতঃ রস-প্রধান প্রকৃতির ইংরাজী Sympathetic temperament লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরিবর্তে হইবে Lymphatic temperament.

থাকে--কোথাও কিছু অতিরিক্ত না হয়, ন্যূনত্বও না থাকে। স্থলবিশেষে মনের উপর শরীরের কতটা প্রভাব প্রকটিত তাহা যদি আমাদের নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে শুধু যে শরীর ও মনের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তির ও অবস্থার বিশাখ দেখিতে হইবে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের আপেক্ষিক ফিগারালতা ও শক্তিমাত্রাও নির্ণয় করিতে হইবে। যে স্থলে সকলে মিলিয়া জুলিয়া কাজ করে, সেই স্থলে প্রত্যেকের কার্যকারিতা ও বল বৃদ্ধি পায়; পক্ষান্তরে এইরূপ সামঞ্জস্য ও সম্মিলনের অভাব হইলে, সকলেই কার্যে ব্যাঘাত হয়। [ক্রমশঃ]

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা ।

(বেদের অনিত্যতা—সাহেবদিগের মত)।

পূর্বোক্ত ইতিবৃত্তদ্বারা একপ কল্পনা করাও অধৌক্তিক নয় যে, কোন একধাণি প্রচলিত প্রসিদ্ধ পুস্তকের উক্তরূপ বিভাগ-বটনা তাহার প্রচারক-দিগের মধ্যে যোরতর বিশাব ব্যতীত কখনই সম্ভব হইত না। অবশ্যই উহার মধ্যে এক দলেরা প্রাচীনগিহতা বশতঃ প্রচলিত পুস্তককে যথাবস্থ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অপর দলেরা যথোচিত পরিবর্তন করাকে মুক্ধিগুণ বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্নবান হইয়াছিল। এইমাত্র কারণ বশতঃ প্রথমে কত বাহুবিতণ্ডা, কত গালাগাল মন্দ, পরে কত হাতাহাতি, এমন কি, কত রক্তারক্তির পর এক যজুর্কেন্দ্র দুই দত্তত্ব বণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। নতুন ভাগ বা শুক্লযজুর্কেন্দ্রের উদ্ভবের স্বরূপ ভালরূপে জানিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন বা কৃষ্ণ যজুর্কেন্দ্রের বিষয় সম্যকরূপে জানা আবশ্যিক।

ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, যেন সকল দুই ভাগে বিভক্ত (১) মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ, (২) ব্রাহ্মণ ভাগ। সংহিতাভাগে বিশেষ করিয়া বৈদিক মন্ত্র ও শুদ্ধ বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগে যে যে বৈদিক কৃত্যের অনুষ্ঠানে যে যে মন্ত্রের প্রয়োগ হয় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিভাগ অতি শুদ্ধতার সহিত কৃত হইয়াছে। ইহাদিগের মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ ভাগ সম্পূর্ণ পৃথকভাবেই রহিয়াছে। পরস্পরের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট নাই। প্রত্যেকই আপন আপন আলোচ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃক যজুর্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের কিছুমাত্র শৃঙ্খলা নাই, অর্থাৎ উভাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ পরস্পর জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কৃক যজুর্বেদ সংহিতায় মন্ত্র ও তৎপ্রয়োগার্থ কৃত্য সকলের উল্লেখ এক স্থানেই করা হইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে হইলে, কৃকযজুর্বেদ সংহিতাকে অক্ষর্যু নামক পুরোহিতের স্বকর্তৃপদ্ধতি বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে; যেহেতু, হোতা এবং উদ্যাতাদিগের অধ্যতব্য হুখানি স্বতন্ত্র বিশেষ পুস্তক আছে।

কেহ কেহ কখনা করেন—প্রাচীন যজুর্বেদ সংহিতার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের পার্থক্য না থাকায়, অর্থাৎ উভয়ের সমিশ্রণভাবে অবস্থিতি করায় ইহার নাম কৃক বা অক্ষর্যময় হইয়া থাকিবে। তবে ইহার তৈত্তিরীয় সংহিতা নামের প্রতি এইরূপ কারণ হইতে পারে যে, ইহার অক্ষর্যমীপন তিত্তীর পক্ষীর মত লড়াই করিয়া অপরের পরিত্যক্ত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই নিমিত্ত ইহার নাম তৈত্তিরীয় হইয়া থাকিবে। বোধ হয় শুক্র-যজুর্বেদে ঐরূপ মিশ্রণ ভাব দ্রুত হইয়াছে। ইহার সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ পরিচয় হওয়ায়ই ইহার নাম শুক্র হইয়া থাকিবে।

যজুর্বেদের পূর্বোক্ত ঋগ্বেদে একই বিষয়ের উল্লেখ আছে। তবে ঐ সকল বিষয় প্রত্যেকে বিভিন্ন রীতিতে সম্মিলিত হইয়াছে এবং একই বিষয় হয়ত এক স্থানে সংক্ষেপে এবং অপর স্থানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও এক কারণে বেদ সকলের ভিন্নকালিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদে অশ্বমেধ-যজ্ঞ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এমন কি,

হু চার কথায় শেষ করা হইয়াছে বলিলে হয়। কিন্তু যজুর্বেদে অসংখ্য অছষ্ঠানের যোগ দ্বিগুণ ও ত্রুহ পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে অঙ্ক এবং যজুর্বেদ কখনই এক সময়ে রচিত হয় নাই।

রচনার যাপ্যজ্ঞানি বৈদিক কণ্ঠের অমুঠান পরতিহে অনেক ঘোঁট-মঙ্গল আদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নয়, যজুর্বেদে একপ যন্ত্রের উল্লেখ আছে - অন্য কোন বেদে তাহার আদৌ উল্লেখই নাই, অন্য বেদের সময় উহাদের নাম অবধি হোহ জানিত না বলিলেই চলে। যেমন, পুরুষমেধ-যজ্ঞ। এই যজ্ঞে, পরম্পর ভিন্নবাসায়, ভিন্নস্থানে ও ভিন্নআত্মীয় এক শত পঁচাত্তি জন মনুষ্যকে একাত্মশী যুগ্মকাঠে আবদ্ধ করিয়া নানাবিধ দেনতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত। এইরূপ সর্কমেধ এবং পিতৃমেধ প্রভৃতি আরও কয়েকটি অসাধারণ যন্ত্রের বিধান দৃষ্ট হয়। ইহাও এখানে অবশ্য কথনীয় যে, কথিত সংহিতার সময় চাতুর্কর্ণ বিভাগের কোন রূপ নষ্টে চিহ্ন লক্ষিত হয় না, কিন্তু যজুর্বেদে উহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবং যজুর্বেদে একপ অনেক কথার ব্যবহার দৃষ্ট হয় যাহা পৌরাণিক সময়ে শিবের পর্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সামবেদ এবং যজুর্বেদের মত অর্থর্ববেদ সংহিতাকে যজ্ঞার্থ সংগৃহীত পুস্তক বলিয়া বিবেচনা করা হইতে পারে না। অর্থর্ব বেদের প্রায় যষ্ঠাংশ ভঙ্গোবদ্ধ নয়। উহা বড় এবং ছোট ছোট পদ্যময় বাক্য পরিপূর্ণ, ঐ ভাগের ভাষা ও লেখনীতির স্বাক্ষরের ভাষা ও লেখনীতির সহিত অনেকাংশে ঐক্য দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট বা পদ্য ভাগের যষ্ঠাংশ কথেন্দ-সংহিতার মন্ত্রভাগ হইতে সংগৃহীত; তাহার মধ্যেও আবার দশম মণ্ডলের মন্ত্রই অধিক, অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি অর্থর্ববেদের নিজস্ব। অর্থর্ববেদের নিজস্ব মন্ত্রগুলির রচনিতা যে কে তদ্বিষয়ে কোন প্রামাণিক ইতিবৃত্ত বা উপন্যাস লক্ষিত হয় না। তাহাদের অধিকাংশই কমিত ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অধ্যাপক হইটনি সাহেব বলেন, অর্থর্ববেদের প্রথম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি ঠিক এক নিয়মে রচিত হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ের মন্ত্র-সংখ্যা সমান, এবং সর্বাঙ্গোপেক্ষা ছোট মন্ত্রগুলি অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় বড় মন্ত্রবৃক্ক অধ্যায় সকল সম্বিন্বেশিত হইয়াছে।

অধর্ষবেদ সংহিতার মন্ত্রনিচয়ের গুঢ় ভাষার্থ্য পর্যালোচনা করিয়া এই-
রূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে কথোবদের দশম মণ্ডলের মত উহারও
বৈদিক সময়ের অনেক পরে রচিত এবং পূর্বতন বৈদিক মন্ত্র-সমূহ অপেক্ষা
সম্পূর্ণ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাষ-প্রকাশক । আদিম বৈদিক মন্ত্রনিচয়ে যদিও
দেবতাদিগের উপর কিঞ্চিৎ ভীতি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সে ভয় আত্মরীণ ভীতি
ও সম্মাদর-সম্মিষ্ট । পিতা মাতা ওরুজনকে ঘেরূপ ভয় করা যায়, 'উহাও সেই
জাতীয় ভয় । বাঙ্গালা ভাষায় সত্তম যে অর্থে ব্যবহৃত হয় উহার ও ঠিক সেই
অর্থ । দেবতাদিগের উপর স্বতঃসিদ্ধ ভীতি অচল ভাবে অবস্থিত । এবং দেবতা-
গণ ও যজ্ঞমানের মঙ্গল সাধনে ও অহু্যায় করিতে একান্ত তৎপর । তৎ-
কালের দৈত্য বা ক্রুরাদিগের সাধারণ নাম রাক্ষস । সর্কিত ইহাদের
এই এক মাত্র নামই ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহারা অতি ভীষণ হইলেও
দেবতাদিগের স্বয়ং ও বিজ্ঞেয় ; সুতরাং তাহাদের উপাসনা অনাবশ্যক ।
অন্য দিকে অধর্ষবেদের মন্ত্রনিচয়ে দেবতাদিগের প্রতি যে ভয় দর্শিত হই-
য়াছে সে ভয় অন্যবিধ, সে হৃদয়কম্পনকারী ভয় । লোকে জমীদার, দারগা
বা পুলিশের পদাতিককে ঘেরূপ ভয় করে উহা সেইরূপ ভয় । সে ভয়ের
সঙ্গে ভীতি বা শ্রকার ভাগ অতি অল্প । দেবতারাও সেইরূপ যজ্ঞমানের হিত-
সাধনে স্বতঃ যত্নবান নন । তাঁহাদিগকে সাধ্য সাধনা করিয়া ঐশ্বজ্ঞান
মন্ত্রের মত শুভ পাঠে যুক্ত করিয়া যজ্ঞমানের স্বকার্য সাধন করিতে হয় ।
এবং কোন স্থলে কপটাচার, কোন স্থলে কৌশল আর স্থল-বিশেষে বল
প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগের নিকট হইতে মঙ্গল গ্রহণ করিতে হয় ।
অধর্ষবেদ সংহিতায় সকল প্রকার ভূত, প্রেত আদি সকল প্রকার দুষ্টাচারই
নাম, ত্রৈলী এবং উচ্চ নীচ পদবী অবধি উক্ত হইয়াছে । কেবল তাহা
নহে, উহার পূজার পাত্র হইয়াছে । প্রত্যেকের উপাসনার পদ্ধতি উক্ত
হইয়াছে, এবং তাহাদিগের নিকট বিষয় না করিতে প্রার্থনা করিয়া বলি
প্রদান করিবার বিধি বলা হইয়াছে । ঐ সকল মন্ত্র অসংখ্যবিধ অভিলষিত
বস্ত্রাভের নিমিত্ত প্রয়োজিত হয়, প্রার্থিত বস্তু সমূহের মধ্যে প্রায়ই দীর্ঘ
জীবন, এবং উৎকট উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্যলাভেরই আধিক্য দেখা
যায় । ঐ সকল প্রার্থনা শুনিয়া স্বপ্ৰমান দেব কখন কখন এক ধানি রক্ষা

কবচ দান করেন, এবং অনেক ভলেই অস্বাস্থ্য ও শারীরী উদ্ভিদ-বিশেষের আদেশ করেন যাহা শরীরে উপর ধারণ করিয়া সমুদয় ক্রেশন দৃষ্টিভূত হইয়া অনন্দলাভ হয়। সম্পদ এবং বীৰ্য্যও যাচিত হইতে দেখা যায়। এতদ্বির শত্রুর ক্ষয়, প্রাণ বা ত্রীভায় জয়লাভ, সামান্য ইতি বা উপজনের অপনয়ন ইত্যাদি, এমন কি, টাকে চুল তথাঃ অবধি প্রার্থনা আছে কেবল অলৌকিক ঘটনাকারী মন্ত্ৰেণ্ড অভাৱ নাই। কিন্তু প্রথম বৈদিক সময়ের উত্তরকালীন হিন্দুধর্মের যেরূপ পণ্ডিত্য ঘটনাত্তিল তদনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, অধর্মবদ সংহিতায় অলৌকিক ঘটনা বিষয়ক মন্ত্ৰের সংখ্যা অল্প বলিতে হইবে। ফলতঃ এইরূপ একটা মোটামুটি বোধ হইতেছে যে, অধর্মবদ কেবল এক মান পুরোহিতদিগের প্রযুক্ত স্বষ্ট হয় নাই; তৎকালীন সমুদয় জাতির অবস্থা বিশেষও কতক পরিমাণে উহাকে উৎপন্ন করিয়াছে। বৈদিক সময় হইতে আধুনিক সময়ে অবতরণার্থ অধর্ম একটি মধ্যমতী গোপন। ইহা ব্রাহ্মণদিগের “একমেবাদ্বিতীয়ং” এই মতের যত না বীজ বপন করুক, কিন্তু মূর্খ লোকদিগের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার যে সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মত্ৰ এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়ই আঘাতের নিকট বন্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং মত্ৰভাগের সহিত ডাক্তার পিয়োডর গোল্ড রিকার সাহেবের ব্রাহ্মণ বিষয়ক মতগুলির উপস্থান করা কোনরূপ অপ্রামাণিক হইবে না। বরং আঘাতের প্রস্তাবের সম্পূর্ণতার সাধন হইবে। তিনি এইরূপে ব্রাহ্মণভাগের আরম্ভ করিয়াছেন—

আমরা ইতিপূর্বেই বেদের ব্রাহ্মণভাগের মোটামুটি অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে কেবল তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধানদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও এক আধটু অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই আমরা বৈদিক মত সকলের সংগ্রহ ও অবশিষ্ট বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের কোথায় স্থান হইতে পারে, ইহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইন।

ঋগ্বেদের পুরোহিতগণ বহুচ্চদিগের ব্রাহ্মণকে দুই প্রকারে রক্ষা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ঐহিকের ব্রাহ্মণের আট পঞ্চাশিকা, চরিত্র অধ্যায় এবং দুইশত পঁচাত্তিশও বিতর। সাংখ্যায়ন বা কৌশীওকী ব্রাহ্মণ

জি'শং অধ্যায় সম্পন্ন এবং প্রত্যেক অধ্যায় পূর্ণের মত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । উভয় ভ্রাক্ষণের মোটের উপর একই বিষয় । কিন্তু বিষয়-বিনি-
বেশ ও ব্যবহার রীতি দেখিগা একরূপ অনুমান করা যাঠিতে পারে যে ঐতরেয়
ভ্রাক্ষণের প্রথম ত্রিশ অধ্যায় সাংখ্যায়ন ভ্রাক্ষণের ঐ ভাগ অপেক্ষা পুরাতন ।
আবার ঐতরেয় ভ্রাক্ষণের শেষ দশ অধ্যায় সাংখ্যায়নের শেষ দশ অধ্যায়
অপেক্ষা অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হয় । এই সকল উভয় ভ্রাক্ষণেই
ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রের ক্রম রক্ষিত হয় নাই, কেবল খোদিত যজ্ঞ সমূহে
হোতৃনাগক পুরোহিতের ব্যবহারী নহ্ন সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে । যে সকল
কৃত্য বা যজ্ঞ কৰ্ণের অহুষ্ঠানের নিমিত্ত এই ভ্রাক্ষণদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে উহা-
দের মধ্যে অভিব্যেক নামক কৃত্য একটি বিশেষ জাতন্য ।

ঐতরেয় ভ্রাক্ষণের যে সকল বাক্য ঐন্দ্রজালিক জাতীয় বা জাতিসারিক কৃত্য
প্রবর্তক উহার। ইহার শেষ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়; ঐ অধ্যায়ে অভিষাত বা রাজা-
দিগের শত্রুধ্বংস বিষয়ক একটি যজ্ঞের উদ্দেশ্য আছে । তাহাতে লিখিত আছে,
যে ব্যক্তি এই যজ্ঞের বিষয় অবগত হয়, তাহারিগের সকল প্রকার শত্রু নিপা-
তিত হয় । যাহা আকাশে গমন করে তাহার নান বায়ু । এই বায়ু সাগ্নিধ্যে
বিদ্যুৎ, বর্ষ, চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি এই পাঁচটি দেবতা বিনষ্ট হয় । বিদ্যুৎ
প্রকাশিত হইয়াই বৃষ্টির পূর্বে অন্তর্হিত হয় ; ইহা অন্তর্ধান হয় কিন্তু কোথায়
যায় তাহা কেহই বলিতে পারে না । যখন মনুষ্য পঞ্চভূপ্রাপ্ত হয় তখন সে
আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় এই মাত্র, কিন্তু আত্মা যে কোথায়
গমন করে তাহা কেহই জানে না । অতএব যখন বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হইবে,
তখন এই মায় পাঠ করিবে "আমার শত্রু বিনষ্ট হোক, সে লোকের দৃষ্টিপথ
হইতে অন্তর্হিত হোক এবং তাহার গতি যেন কাহারও বিদিত না হয় ।"
নিচয়ই অতি শীঘ্র তাহার যে কি গতি হইবে তাহা কেহই জানিবে না ।

[ক্রমশঃ

শ্রীহৃদীকেশ শাস্ত্রী ।

হেমচন্দ্র ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

সেই রাতে হেমচন্দ্র বহুমতীর সঙ্গে তাহাদের বাটীতে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুমতীর মাতা এতক্ষণ মেয়ের জন্য বড়ই ভাবিতেছিলেন। পাগল মেয়ে—বলিলে শুনে না, নিবেদন করিলে মানে না; কে জানে কোথায় গেল? বুকার সে দিন একই অস্থখ হইয়াছিল, সে অস্থখ ভুলিয়া গিয়া ঘর বাহির করিতে লাগিল। যাহাকে দেখিল, জিজ্ঞাসা করিল। কেহ ঠিক বলিতে পারিল না। কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিল “ভয় নাই, ভাবিও না, বোধ হয় কার বড় অস্থখ হইয়াছে, তাই সেখানে বসিয়া আছেন, তা মা, আপনি ঘরে যান, আমরা খুঁজিয়া দেখিতেছি।” বৃদ্ধা চলিয়া গেল। আরও এক ঘটী অতীত হইল। মার কাছে সে এক ঘটী এক মুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধা গৃহে ত্রিষ্টিতে পারিল না। বাহিরে আদিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্রকে লইয়া বহুমতী আদিয়া উপস্থিত হইল। মাতার দেখে জ্ঞান আসিল। বলিলেন—“ভালা মেয়ে যা হউক—”মাতা আরও বলিতে যাইতেছিলেন। বালিকা হেমকে দেখাইল, দেখাইয়া সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। মাতা ভৎসনা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষে দুই বিন্দু জল আসিল; হেমচন্দ্রকে বলিলেন—“এস বাবা এস।”

হেম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল; ভাবিল, এমন মা না হইলে কি এমন মেয়ে হয়? ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

তখন, মৃধ হাত ধোয়ার পর, জলযোগের আয়োজন হইল। হেম খাইতে চাহে না। মাতা বিস্তর বলিতে লাগিল। শেষ, হেম কিছু খাইল। মাতার কথামত ইতিপূর্বে বহুমতী শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, জল-যোগান্তে হেম গিয়া শয়ন করিল। সে কি শয্যা?—মেকের উপর এক ধানি

মাত্র কমল । হেম তাহার উপর শয়ন করিলেন । কয়েক দিনের পরিশ্রমে, অনাহারে, চিন্তা ও ক্রোশে শরীর বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অসংখ্য মথোই নিজ্জাকর্ণণ হইল, অসংখ্য মথো হেম ঘেঁষেতেনে ঘুমাইয়া পড়িল ।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে হেম এক স্বপ্ন দেখিল । দেখিল, সেই নিশীথ—জ্যোৎস্নারাত, নীলব, শস্যশূন্য—গম্ভীরতাপূর্ণ । আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল, নীল—নীল আকাশমণ্ডলে সেই যে চন্দ্র—তাহার ভাবের দীপ্তি ক্ষুরিত করিয়া শোভা পাইতেছে—তাহাও গম্ভীরতাপূর্ণ । আর সেই মচন্দ্র-জলদ আকাশের কপূরকন্দমল প্রতিবিম্ব বসে ধরিয়া সেই যে বীচিবিম্বোভালালিনী পূর্ণতোরা ভাগীরথী মুহূর্ত্তে ঘোরবিক্ষেপে উছলিয়া উঠলিগা চলিয়াছে তাহাও গম্ভীরতাপূর্ণ । রজনীর গম্ভীরতা, চন্দ্রালোকের গম্ভীরতা, ভাগীরথীর গম্ভীরতা—সর্বত্রই গম্ভীরতাপূর্ণ । সেই সকল গম্ভীরতার উপর আরও গম্ভীর সেই শ্মশানের প্রাণ-উদাসী করাল দৃষ্ট । হেম দেখিলেন, সেই শ্মশান মথো তিনি তেমনি বসিয়া—নির্জল, নির্দানব, একেলা । দূরে সেই চিতা হেমনি দীকি দীকি জলিতেছে । চিতা-ধূম মণ্ডলাকারে আকাশপথে উঝিত হইতেছে । হেম বাষ্পপরিপূর্ণ নয়নে তাহা চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে সহসা প্রবল ঝটিকাকারে ভীষণ ধূম উঝিত হইল, মুহূর্ত্ত মথো তাহা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল । মুহূর্ত্ত মথো আকাশ, চন্দ্র, ভাগীরথী, শ্মশান, চিতা সমস্ত বোর অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িল—প্রকৃতি অনন্ত ধূমেরে মিশাইয়া গেল—হেমচন্দ্র আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না । সহসা পক্ষাতে কে যেন ধল ধল শব্দে হাসিয়া উঠিল । ভয়ে, আতঙ্কে সর্ব শরীর শীহরিয়া উঠিল । হেম আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না ; দোরে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল । আবার সেই রব—সেই ধল ধল বিকট হাসি । ভয়ানক ভয়ানক ! হেমের দুই চক্ষু মুদ্রিত, তথাপি সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটা জীলোক তাহার প্রতি জাহ্নটী করিয়া এই বিকট হাসি হাসিতেছে । ক্রমে সেই মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর—আরো স্পষ্টতর হইতে লাগিল । এ কি এ ! নিশাচরী নয়, প্রেতিনী নয়,—হেমের বোধ হইল, হেম স্পষ্ট দেখিল, সে মহামায়া । হেম আরও শীহরিল, বক্ষবেশন আরও পরিবর্জিত হইল, ভিত্তা তথাইয়া আসিল । সেই মূর্ত্তি সেইরূপ হাসিতে

হাসিতে ক্রমে তাহার আরও নিকটবর্তী হইল । কাজে আসিয়া তাহার
 দুই হাত ধরিল । তাব পূর্ব, 'আপন'র বস্ত্রসমূহ হইতে একপাতি রজ্জু বাহির
 করিয়া উদ্ধারা তাহার হস্তপদ হুট বন্ধ করিল । বন্ধ হইয়া হেম তথায়
 পড়িয়া রহিল । তখন, সে আবার সেই উৎকট থল থল হাসি হাসিয়া এক
 তীর জলুসী করিয়া তথা হইতে অন্তর্ভুক্ত হইল । বন্ধনে হেমের বড়ই যাতনা
 বোধ হইতে লাগিল । তাম্ গুরু হইয়া গেল, প্রাণ বাহির হইবার উপকম
 হইল, উপায় না দেখিয়া হেম কেবল কানিতে লাগিল । তখন, বোধ হইল,
 কে যেন, ধীরে ধীরে মূঠপদসকলের তাহার নিকটে আসিয়া ঝাঁড়াইল ।
 ধীরে ধীরে তাহার পাদ স্পর্শ করিল । সে স্পর্শে তাহার অসাড় দেহে যেন
 চেতনা কিরিয়া আসিল । যে আসিল, সে যেন তখন ধীরে ধীরে একটী
 একটী করিয়া তাহার বঁধন খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল । কত ভয়—
 একবার পড়াতে চাহে, আর একবার বঁধন খুলিতে চেষ্টা করে । একটী একটী
 করিয়া অনেকগুলি বঁধন খুলিল । হেমচন্দ্র সেই ভীষণ বন্ধন হইতে মুক্ত
 হইলেন । তখন, সেই মুক্তিকারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অল্প মুখ
 উন্মোলন করিয়া দেখিলেন । হেম বিস্মিত হইলেন । দেখিলেন, বালিকা ; সে
 বালিকা বিরাজ্জ । কিন্তু হেম চাহিয়া দেখিবামাত্র বিরাজ্জ যেন কোথায়
 উড়িয়া গেল । সকল বঁধন খোলা হইল না—কে জানে কোথা দিয়া, কেমন
 করিয়া—পলায়ন করিল । কোথায় গেল ? তখনও হেমের দুই চক্ষু হুট
 যন্ত্রিত ছিল ; ভয়ে, বিষয়ে যেন চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন । কিছুই
 লক্ষিত হইল না । সেই ধূম,—ভিত্তিশূন্য—রক্ত ধূম ধূমপটলে দিগন্ত খেটিয়া
 রহিয়াছে—আর কিছুই নাই । হেমের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল ।
 হেম স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, সেই ধূমস্তর কতক্ষণ পরে যেন চারিদিক্ হইতে
 একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া এক স্থানে অমাট বাধিতে লাগিল ।
 দেখিতে পাইলেন, সেই সূচিভেদ্য বিখ্যাতী তিমারাক্ততায়ের বিরূপ ধূমরাশি,
 মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃহৎ স্তম্ভাকার ধারণ করিল । তাহার শিখর-দেশ
 আকাশের প্রান্তে গিয়া সংলগ্ন হইল । সেই অন্তরীক্ষ প্রদেশে ধূমময় স্তম্ভ-
 শিখরে হেম দেখিলেন, মণিময়কতাদিমণ্ডিত বিবিধ কারুখচিত এক সিংহা-
 সন উজ্জ্বল চলকরসম্পর্শে হীককল্পপবন বাক্ বাক্ করিয়া উত্তাসিত হই-

ভেছে। হেমের সঙ্গরে এতক্ষণ নীরবে যে ভয় জীড়া কপিছে তখন তাহা
 দূটিল, হেম বিম্বিত হইল। বিম্বয়দ্বন্দ্বল নেবে সেই বিবেক চাহিয়া
 রহিল। কি অশুভ শোভা! অনন্ত-নক্ষত্রপতিবৎ সেই সিংহাসনোপরি
 কীরটি কুণ্ডল-শোভমান! নানারহণকার-ভূষণ এক ভোয়াতির্ময়ী রাজ-
 রাজেশ্বরী মূর্তি। প্রথমগুণে করুণা উজলিয়া পড়িতেছে, নতনে ঘেহের হাসি
 ক্ষুণ্ণিত হইতেছে। হেম মলিনমে, মানন্দে, ভীতপ্রহরে চিনিম, তাহার সেই
 অচিরনৃত্য প্রাণিনী জননী এই আলোকময়ী মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। হেম
 ডাকিতে গেল—মা, কিছু কথা দূটিল না। হেম শব্দেব চেঁচা করিল, কথা
 দূটিল না। হেম বড়ই কাতর হইল। সেই করুণাময়ী মার দেখা পাঠিয়া
 হেম একবার কাণ ভরিয়া ‘মা’ বলিয়া ডাকিতে পারিল না—তাহার কাণ
 আসিল। হুটী চক্ষু ফলে ভাগিয়া গেল। সেই অশ্রুপূত কাতর মুখ তুলিয়া
 হেম মাতার প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন সেই নৈশ গভীরতা বিদীর্ণ করিয়া
 অঙ্গাধিকারী এবং মহাবীণাব্যঙ্গার-নির্দিত কি এক অগাধিগ্ন শব্দে সেই
 কিরণমালিনী কারুণ্যপ্রসূত কণ্ঠে বলিলেন, “বাছা! কেন কাঁদিতেছ?
 কাঁদিয়া কি কল? সকলই নিয়তির কৰ্ম। নিয়তির আদেশ কেহই লঙ্ঘন
 করিতে পারে না। নিয়তি দুরাইয়াছে, তাই আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি।
 সে জন্য কেন কাঁদ, মাদ্?” এতক্ষণে হেমের কথা দূটিল। বলিল “কাঁদিব
 না? আমি আপনার সন্তান হইয়া আপনার কোন্ কাজটা করিলাম? আনা-
 দেব জন্য কতই দুঃখ সহিলেন, কিন্তু আমরা আপনার একটা দুঃখও বুচাইতে
 পারিলাম না—এ কষ্ট কি তুলিবার?” মাতা আবার বলিতে লাগিলেন,
 “বাছা, কেন আবার আপনা বিম্বিত হও। দুঃখ দুঃখ এ সব বিবিলিপি
 মনুষ্যের সাধ্য কি একজনের দুঃখ আর একজনে খণ্ডন করে? সে জন্য কষ্ট
 পাইও না। আর, দেখিতেছ না, আমার এখন আর কোন দুঃখ নাই, আমি
 অতুল ঐশ্বর্যশালিনী। তোমার বড় ব্যথিত দেখিয়াই, একবার তোমাকে
 আমার এই অবস্থা দেখাইতে আসিয়াছি।” হেম কাতরে বলিল “বদি
 দেখা দিয়াছ, তবে আর কেলিয়া যাও না, আমাকেও ঐ স্থানে তুলিয়া
 লও।” মাতা ঈষৎ হাস্যে বলিলেন “তাও কি হয়? তাহা হইবে না।
 এখন এ স্থান তোমার নয়—তোমার সম্মুখে সংসারের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ,

তাছাই তোমার অবলম্বনীয়। কিন্তু সাবধান, সে অতি কঠিন স্থান,—
 আদি ব্যাধি, বাধা নিম্ন পদে পদে। ইতিমূর্খে যে এক ভীষণ দৃশ্য যথেষ্ট
 প্রত্যক্ষ করিয়াছ তাহা আমিই দেখাইয়াছি, সাবধান—বুঝিয়া চলিও।
 আর থাকিব না, আমি চলিলাম।” এই বলিয়া সে মূর্ত্তি অস্তিত্ব
 হইবার উপক্রম হইল। কাতরে হেম বলিতে লাগিল—“বাইও না—
 বাইও না, সংসার যদি এত ভয়ানক, এখানে একা কেলিয়া থাকিও না—
 একবার ফাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে বাই।” তখন সেই মূর্ত্তি পুনরায়
 একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, “কি করিল, এ স্থান এখন তোমার নয়। আমি
 শত চেষ্টা করিলেও তুমি এখন এখানে আসিতে পারিবে না।” হেম বলিল
 —পারিব না—কেন পারিব না? মাতা তখন ভ্যোতিঃপুঞ্জ অঙ্গুলি নির্দেশ
 দ্বারা বলিলেন—“কেমন করিয়া পারিবে, বাছা? ঐ দেখ, তোমার পশ্চাতে কে
 তোমায় ধরিয়া টানিতেছে।” হেম বিস্মিতলোচনে পশ্চাতে চাছিল। দেখিল
 মনোরমা। মনোরমা কাহার হাত ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিতেছে
 —“দাদা, কোথা যাও—কোথা যাও—এ ছাগিনী অবলাকে একা রাখিয়া
 কোথায় যাও।” সেই কাতরোক্তি শুনিয়া হেমের চক্ষে জল আসিল। হেম
 আবার একবার উর্দ্ধমুখে সেট দৈবী মূর্ত্তির প্রতি চাছিল। তিনি বলি-
 লেন—“কেমন বাছা, বলিয়াছিতো পারিবে না। আমি চলিলাম।” হেম
 দেখিল, তখন, সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অস্তিত্ব হইতেছিল, সে ভ্যোতিঃপুঞ্জী মূর্ত্তি
 ধীরে ধীরে দৃশ্যপটে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে অর্ধমণ্ডল যেমন
 মেঘস্তর মধ্যে ধীরে ধীরে আবৃত হইতে থাকে, সেইরূপ ধীরে ধীরে অন্ধকার
 মধ্যে লুকাইতেছিল। হেম আবার কাতর হইয়া বলিল “একটু অপেক্ষা
 কর—মনোরমাকে শাস্ত করিতেছি, তাহার পামীর হস্তে তাহাকে দিয়া
 নিশ্চিত হইয়া যাইতেছি।” কিন্তু সে মূর্ত্তি আর পূর্ণপ্রকাশিত হইল না।
 সেট অবস্থায় থাকিয়াই। তখন ঈষৎ হাস্য বলিল—“পারিবে না—বাছা,
 পারিবে না—ঐ দেখ আবার কে তোমার পদতলে।” তখন সেই প্রহ্বানো-
 মুখী ভ্যোতিঃপুঞ্জী অঙ্গুলিসংকেত দ্বারা কি দেখাইয়া দিলেন। হেম তৎ-
 সন্কেতানুসারে আপনার পদপ্রান্তে চাহিয়া দেখিল। এ কি প্রহেলিকা!
 অসামান্যরূপসী মন্দনপারিজাতসমপুষ্পময়ী এক নিসর্গহুল্লরী বালিকা

পদশাস্ত্রে লুটাইয়া পড়িয়া রোদন করিতেছে ।—মুখে কথা নাই, অথচ সে কাতরতায়, সে যোবনে, সে চক্ষের জলে কত কথা প্রকাশ করিতেছে । কে এ বালিকা? সে বালিকাকে হেগ কয়েক দণ্ডের জন্য মাত্র দেখিয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্য দেখিলেও তাহাকে ভুলি যায় না—হেম চিনিল—বহুমতী । “বহুমতী !—” আর হেমের কথা বাহির হইল না, হতবাকের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিল । শূন্যময়—ধূমময়—অন্ধকারময় । কোথায় সে স্বস্ত, কোথায় সে সিংহাসন, কোথায় সে ভোতাতিথ্যের স্মৃতি । কেবল শূন্য—অনন্ত শূন্য মণ্ডলে মণ্ডলে ব্যাপিয়া রহিয়াছে—দিপঙ্ক্তমকারী ধূম পটলে পটলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অন্ধকারের পর অন্ধকার স্তরে স্তরে বিচরণ করিতেছে । আর সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বনি—মহামায়ার সেই ভীষণ জুহু—সেই বিকট হাসি ! ভয়ানক—ভয়ানক ! হেম লভয়ে ডাকিয়া উঠিল—“মা ।”

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

তখন, প্রভাত হইয়াছিল । দোয়েল, কাক, শালিক, বুলবুল সকল পাখীট একে একে গান ধরিয়াছিল । গাভে গাছে, শাখায় শাখায় নানা পাখী—নানা-বুনি বলিতেছিল । গৃধ্রকপোত ঘরের চালে উড়িয়া বসিয়া গা ধুটিতেছিল, পাখা কাড়িতেছিল, রব করিতেছিল । সেই পক্ষীকুলনন্দন অতিক্রম করিয়া দূরে আশ্রিত লোকধ্বনি উথিত হইতেছিল । সে শব্দ নানা রকমের, কেহ হাসিতেছিল, কেহ কাঁসিতেছিল, কেহ ডাকিতেছিল, কেহ বকিতেছিল, কেহ ইটদেবের নাম করিতেছিল, কেহ বা মৃদুমন্দ গান ধরিয়াছিল । কোথাও টানোখিত ছকার ছুড়ছুড়বুড়বুড় শব্দ, কোথাও মিমঝমান গাড়ুর বক বক শব্দ, কোথাও মার্জ্জনগিরতা বধুর ভাবিগগবজ্জ্বলে ও বাসনে মৃদু মন্দ ঠন্ ঠন্ শব্দ । কোথাও বাছুর ডাকিতেছে, কোথাও গোব ডাকিতেছে, কোথাও রাখাল গায়িতেছে । সেই সব বিবিধ শব্দ একত্র মিলিত হইয়া অনন্ত শব্দের সমুদ্র সৃষ্ট হইতেছে । সেই শব্দসমুদ্র মধ্যে কোথা দিয়া প্রভাতে নরনারী আপন আপন কাজে ব্যস্ত হইতেছে । রোদ উঠিয়াছে । গাছের

ডাল, ঘরের চাল হঠাৎ সিকিমিকি করিতে করিতে বোদ আঁগিয়া উঠানে পড়িয়াছে। হেমচন্দ্র বেখানে শুইয়াছিলেন তারার পশ্চাৎ দিকে একটী জানালা খোলা ছিল। উদ্ভূত গব্যাকপণ্যবিষ্ট হইয়া স্বর্ধ্যালোক যেকের উপর, মেকের হইতে বিছানার উপর, বিছানা চইতে হেমচন্দ্রের মুখের উপর পড়িয়া থেলা করিতেছিল। নিদ্রাভঙ্গে হেমচন্দ্র সেই আলোকগতি চাহিয়া দেখিলেন। তখনও তাঁতার বৃকের ভিতর ঘুপ ঘুপ করিতেছিল; তখনও ললাটে বেদনিম্ন নির্গত চইতেছিল। হেমচন্দ্র আপনার অবস্থা বৃক্ষিতে পারিলেন না। কোথায় তিনি, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রভাত হইয়াছে, রোদ উঠিয়াছে, লোক আগিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। হই হাতে চক্ষুর মার্জনা করিলেন। পরিষ্কার দৃষ্টিতে আর এক বার চারি দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। গৃহ আলোকময়—এত যথার্থই প্রভাত, আর তিনি সেই কয়লসন্ধ্যার শুইয়া। তাহা ত সত্য, কিন্তু সেই দৃশ্য—সেই কথা—সেই তুলিবীর নচে, তাহা তো এখনো স্পষ্ট বোধ হইতেছে। বড়ই গোল ঠেকিল। হেম ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শিরের কাহার নিশ্বাস অদ্ভুত হইল। সচকিতে হেম মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শিরের ঝাঁড়াটয়া সেই বালিকা বসুমতী।

বসুমতী বলিল—“দুখ ডাঙ্গিয়াছে?”

হেম সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। বালিকাকে দেখিবারাত্র বসুমতী সেই দৃশ্য আরও স্পষ্ট আগিয়া উঠিল। হেমের বৃকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। অবাক হইয়া বালিকার প্রতি দ্বির দ্বিরে চাহিল। বালিকার সেই সরল, নির্দোষ, পরিচয় মুখমণ্ডল প্রভাতসূর্য্যের সূরু করম্পর্শে উজলিতেছিল। বিমূঢ়ের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া শূন্যদৃষ্টে হেম সেই মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কথার উত্তর দিতে পারিল না।

বালিকা বলিল—“অমন করিতেছ কেন?”

হেম কথা কহে না।

বালিকা বলিল—“অন্থ হইয়াছে কি?”

তবু হেম কথা কহে না।

বালিকা তখন বড়ই কাতর হইল । কাতরে জিজ্ঞাসা করিল—“বল না, কেন অমন করিতেছ ? কি হইয়াছে ?”

হেম কথা কহিল । বলিল—“আমার কিছু হয় নাই । তুমি কে ?”

বালিকা বলিল—“চিনিত পারিতেছ না । আমি বঙ্গমতী ।”

“বঙ্গমতী—” হেম আর কিছু বলিতে পারিল না । ধীরে ধীরে ধীরে বঙ্গমতীর নাম উচ্চারণ করিয়া চকু মুদ্রিত করিল ।

বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিল না । তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল । ছুটিয়া গিয়া মাতাকে ডাকিয়া আনিল । মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কি হইয়াছে, বাবা ?”

কি হইয়াছে, তাহার কি উত্তর দিবে ? হেমের চক্ষু ডাকিল, বঙ্কমড করিয়া উঠিয়া বলিল । বলিল—“কিছু নয়, একটা পত্র দেখিয়াছিলাম ।”

মাতা বলিলেন—“কোন অশুভ হয় নাই ত ?”

হেম । না ।

মাতা । কুম হইয়াছিল ?

হেম । হ্যাঁ ।

মাতা । বেলা হইয়াছে, উঠ, হাত মুখ ধোও গিয়া ।

হেম । একেবারে গঙ্গার ঘাটে, সেখানে দোকানে আর আর সকলে আছেন, সকলে একত্রে হাত মুখ ধুইয়া, রওনা হইব । সুমারিয়া পড়িয়াছিলাম, বেলা হইয়া গিয়াছে । আর বিলম্ব করিব না ।

মাতা । সে কি, বাবা, তাও কি হয় ? সে কত পথ, পেটে কিছু নাই, হাঁটিবে কেমন করিয়া ? সকাল সকাল দোগাড় করিতেছি, এখানে হবিষ্য করিয়া পরে বৈকালে যাউক ।

হেম । আমি একা নহি । আমরা অনেকগুলি । রাত্রি হইতে তাঁহাদের হাড়িয়া রবিয়াছি, একবার তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত হইতেছে ।

মাতা । সেতো ভালই, আমি তাঁহাদের জন্য লোক পাঠাইতেছি । সকলে মিলিয়া চারিটা আহার করিয়া তার পর যাউবেন ।

হেমের যে কোনও অশুভ করে নাই, ইহা জানিতে পারিয়া বঙ্গমতীর

সেই ভয়প্রায় ভয়ঙ্কর অনেক আগন্তু চটল চিন্তায় বালিকার কণ্ঠে মুণ খানি শুক হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মাতার সহিত হেমকে কণ্ঠা কহিতে দেখিয়া বালিকা নিশ্চিন্ত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। বাগির হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বালিকা বলিল—

"মা, দোকানী দাদা এসেছে, দাদা সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, এক বার বাহিরে এস।"

মাতা বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। তখন, বৃক্ক দোকানী সকলের বসিবার বিছানা পাতিয়া দিল। সকলে বসিলে, সে গিয়া প্রতিবেশী এক জনের বাটী হইতে হাঁকা কলিকা আনিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। তখন কথাবর্তা রাগিয়া হাঁকা টানার ধুম পড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা-
দিগের মধ্যে কেহ আগন্তুদিগকে বিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল; কেহ তামাকু সাজিতে লাগিল, কেহ তামাকু খাইতে লাগিল, কেহ কেহ তিতরে আসিয়া আহ্বারের উদ্যোগ করিতে লাগিল, কেহ কাঠ কাটিল, কেহ তর-
কারি আনিল, কেহ দুধ আনিল, কেহ জল কেলিতে গেল। তখন, তিতরেও পাড়ার অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া রান্নাবান্নার ষোগাড় করিয়া দিতে আগন্তু করিল। কেহ কুটুনা কুটিল, কেহ বাটনা বাটিল, কেহ চাউল ধুইয়া আনিল, কেহ জল তুলিয়া দিল। বহুমতী, যত তাহার ক্ষমতা, এষ্ট সব কাজে মার সহায়তা করিতে লাগিল। মাতা, তখন, স্থান করিয়া, আগে হেমের হবিষ্যের আয়োজন করিয়া, রন্ধন করিতে বসিলেন।

আহ্বারের হেমের প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু সকলের জেদ, কি করেন, মান করিয়া হবিষ্য চড়াইয়া দিলেন। তখন, আর আর সকলে স্থান করিয়া আসিলেন। যথাসময়ে আহ্বারাদি শেষ হইল।

এখন, অনেকের পক্ষে একরূপ আহ্বার বহু দিন জুটে নাই। অনেকের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বেলাটা কাটিয়া যায় বাড়িক, দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারটা নির্ভাবনার বেগানে একরূপ সঙ্কক্ষে চলে, হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করা সুক্টি সম্ভব নয়। হুই এক জন বড় বড় উল্লসিত তুলিতে তুলিতে বিছানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আহ্বারান্তে একটু বিশ্রাম চলিল।

বেশ একটা বাড়িয়া গেল । পাড়ার প্রৌ-পুরুষ যাহারা আসিয়াছিল, তাই এক জন ছাড়া সকলে আপন আপন বাড়ীতে প্রস্থান করিল । মাতা অপ-
রাপর সকলকে পাওরাইয়া মেয়ের ও আপনার ভাত বাড়িয়া হাঁড়ি তুলি-
লেন । মেয়েকে সকাল সকাল খাইতে নিশ্চর রোধ করিয়াছিলেন । বালিকা
খায় নাই । ভাত বাড়িয়া বালিকাকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময় সে
দৌড়িয়া আসিল । বালিকার সেই ভাসা ভাসা হুটী চক্ষে জল আসিয়া-
ছিল । বহুমতী দেখিয়া আদিয়াছিল, কৈবর্তদের কামিনী খেলা করিতে
করিতে কাঁটায় বাধাইয়া তাহার কাপড় খানি একেবারে ফালা ফালা করিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাই দেখিয়া তাহার মা কাঁদিতেছিল, আর কামি
নীকে মারিতেছিল । তার মা বড় গরিব—আর কেহই নাই । পূজার সময়
এক জন দয়া করিয়া এই কাপড়খানি দিয়াছিল । আবার এখন সে কাহার
কাছে চাহিবে ? কে দিবে ? হতভাগিনী তাই নিজে কাঁদিতেছিল, আর
মেয়েকে মারিতেছিল । আহা সে কচি মেয়ে—কি জানে—সেও চীৎকার
ছাড়িয়া কাঁদিতেছিল । বহুমতী তাহা দেখিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া মার কাছে
দৌড়িয়া আসিল । মা জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি, মা ?”

বালিকা ভয়ে ভয়ে বলিল—“একটা কথা বল্‌বো ?”

মা । কি, বল্‌বে ; তাব ভয় কি, বল মা ।

বহু । ‘মা, আমার সেই ছোট নতুন কাপড়খানি দিবে, মা ?’

মা । এখন সে কাপড় নিয়ে কি করিলে ?

বহু । আমি তাহা কৈবর্তদের কামিনীকে দিব ।

এই বলিয়া বালিকা, যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল তাহা মাতাকে বলিতে
লাগিল । শুনিয়া, মাতা বালিকার মুখ চুসন করিলেন, বলিলেন—“যাও,
মা, দিয়া এস ।”

বালিকা কাপড় লইয়া চলিয়া গেল । পাশের ঘরে হেম শয়ন করিয়া
বিস্রাম করিতেছিলেন, সমস্ত শুনিলেন । আ মরি মরি ! এ মর্ন্ত্যে কোন
দেবকন্যা ! বিশ্বরে হেগের রোমাঞ্চ হইল, নয়ন-কোণে দুই কোটা জল
দেখা দিল । আবার স্বপ্নের সেই কথা মনে পড়িল, জ্ঞায়েতেও তাহা স্পষ্ট
প্রত্যক্ষন বোধ হইতে লাগিল । এ কি রহস্য ? ভগবন্, তুমি লীলাময় ;

তোমার লীলা কে বুঝিয়া উঠিবে, ঠাকুর ? নীঃবে. নির্বাকের শয়ন করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় হেম আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

অৰ্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল । বালিকা কিরিল না । বেধিতে দেখিতে আর আধ ঘণ্টা কাটিল । তখনও মাতা ভাত কোলে করিয়া বসিয়া । বালিকা কিরিল না । মাতা অস্থির হইলেন । ভাতের পাত্র ঢাকা দিয়া বাহিরে আসিলেন । বালিকাকে ডাকিলেন । উত্তর পাঠিলেন না । তখন, মেয়ের উপর একটু রাগ হইল । মাতা আবার ঘরে কিরিয়া আসিলেন । কিন্তু, সে মেয়ের উপর রাগ করিয়া কি থাকি যায় গা ? তার মার প্রাণ—আবার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল ; মাতা আবার বাহিরে আসিলেন । তখন, আর কোথাও না গিয়া একেবারে সেই কৈবর্ত্তরের বাটীতে গমন করিলেন । কৈবর্ত্তরমণী তখন কামিনীর পৃষ্ঠে ঐহুত স্থানে বৈল িতেছিল, আর, কামিনী এক একবার কোঁপাইতেছিল, আর এক একবার সেই নৃতন কাপড়ের রক্তা পাড়টীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল । বহুমতীর মাতাকে হঠাৎ সেখানে দেখিয়া কৈবর্ত্তরমণী মনে করিল, মুক্তি, বহুমতী মাকে না বলিয়া আপনি লুকাইয়া এই কাপড়খানি আনিয়াছিল, মাতা তাই আনিতে পারিয়া লইয়া বাইতে আসিগাছেন—ভাবিয়া সে কিছু থতমত খাইল । কামিনী তখন কাপড়খানি পরিবার জন্য তাহার লাল পাড়টীর উপর হাত দিয়াছিল, তাহার হাত হইতে সেখানি কাড়িয়া লইয়া, সে বলিল—“তা, কি জানি, মা, আমি এত মানা করিলাম, তা, তিনি কিছুতেই শুনিলেন না ।” মাতা কৈবর্ত্তরমণীর মনের ভাব বুঝিলেন । বলিলেন, “আমি সে জন্য আনি নাই ; তুমি কেন অমন করিতেছ, কাপড়খানি উহাকে পরাও না ।” কৈবর্ত্তরমণী শুনিয়া কিছু আশ্চর্য হইল । বলিল, “আহা, মা আমার অম-পূৰ্ব্বা ; কি দয়ার শরীর । দার্ক মেয়েও গর্তে ধরেছিলে, মা ।” মাতা বলিলেন “আর পোড়া মেয়ের কথা বলিও না, মা, আমাকে আলিয়ে খেলে— এখনও তার খাওয়া হয় নাই, তাই ডাকিতে এসেছি ।”

কৈবর্তরমণী বলিল “সে কি, তিনি বাড়ী যান্নি, অনেকক্ষণ তো এখানে থেকে গিয়াছেন ।”

মাতা ভিনিয়া ভাবিতা হইলেন । বলিলেন “কৈ, বাড়ীতে তো যায় নাই ।”

কৈবর্তবধু বলিল—“তবে বা, দামুখোষেদের বাড়ী গিয়াছেন । তার ছেলেটির বাপ্‌সা হয়েছে, ডরিখে ডরিখে উঠছে, সেখানেই বা গেলেন

মাতা বলিলেন—“কে জানে, বাছা ? তা, হুটো ভাত খুবে দিবার কি সম্ভব হয় না ।”

কৈবর্তরমণী দৌড়াইয়া দামুখোষের বাড়ী গেল । অলক্ষ্য মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল “না, সেখানে তো নাই । গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, তার পর অনেকক্ষণ বাড়ী যাই বলে গিয়েছেন । আপনি বাড়ী গিয়ে দেখুন দেখি, বোধ হয় এতক্ষণ গিয়ে থাকবেন ।”

মাতা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন । বস্ত্রমতী আসে নাই । সেখানেই যে জিনিষ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে, বস্ত্রমণী গৃহে নাই । আবার নাম ধরিয়া উঠে ডাকিলেন । সাড়া পাইলেন না । এ্রাপের ভিতর কেমন করিতে লাগিল । আবার বাহিরে আসিলেন । পথে বাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । কেহই বলিতে পারে না । মাতা আপনার পাড়া খুঁজিয়া অন্য পাড়ায় গেলেন । পাড়ায় সকলে মৃদা উৎকর্ষার সহিত সকল স্থানে খুঁজিতে লাগিল । কোথাও বালিকার সাক্ষাৎ মিলিল না । মাতা অস্থির হইলেন । চক্ষে জল আসিল । তাহা দেখিয়া অন্য সকলেও ব্যথিত হইল । আবার সকল জায়গা আতিপাতি করিয়া খুঁজিল । কৈ, বালিকা কোথায় ? মাতা কাদিয়া উঠিলেন ।

একজন বলিল—“আমার বোধ হইতেছে, তাহাকে ঘন একবার ব্রহ্ম-ঠাকুরশের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছি ।”

তখন, আর একজন বলিল “সে কি, ব্রহ্মঠাকুরণ তো সকালে তাহার নাড্‌জামাইয়ের বাড়ী গিয়াছে ।”

আগে যে বলিয়াছিল, সে বলিল, “তা ত জানি, সকালে যখন বায়, তখন আমাদের উঠান দিয়া হইয়া গিয়াছিল । কিন্তু, আহা! তাহা শুধু পর যখন হাত মুখ হুই, তখন ঘন স্পষ্ট দেখিলাম, ব্রহ্মঠাকুরণ আর আমাদের দ্বিদিমনি

হুইজনে কি বসাবলি করিতে করিতে হাতার বাড়ীর দিকে ঘাইতেছেন।” বহুমতীকে গ্রামের অনেকে দিদিমণি বলিত।

প্রতিবাদকারী বলিল, “না, না, সে ঘুমের ঘোরে কি দেখিয়া থাকিবে।”

তখন, বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, মাতা বড়ই রোদন করিতেছিলেন। অন্যান্য সকলে বলিল “তা, সে অন্য বাদামুনায়ে আবশ্যক কি, চল, ব্রহ্মঠাকুরপের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসি।”

সকলে মিলিয়া ব্রহ্মঠাকুরপের বাড়ী গেল। মাতাও কাদিতে কাদিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রহ্মঠাকুরপের বাড়ী একটু দূরে। বাড়ীর সম্মুখে পোটাকত বাগকাড়, তার তলায় এক হাঁটু বাশপাতা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কত পাতা উঠানে পড়িয়া জমা হইয়া রহিয়াছে, উঠান কি বাশতলা তাহা সহজে চেনা যায় না। কেবল মধ্যস্থলে খানিকটা কাঁট গিয়া পরিকর করা। মাঝখানে একটা বড় কাঁঠালগাছ—তাহার পাতা পড়িয়া গিরাজে, ডাল ভাজিয়া পিয়াছে, গায়ের ছাল উঠিয়া গিয়াছে। শুনা যায়, ব্রহ্মঠাকুরপের বিয়ের বড়র একবার এই গাছে পোটাকত কাঁঠাল কলিয়াছিল, তার পর আর কেহ কখন তাহাতে কল ধরিতে দেখে নাই। সেই কাঁঠালতলায় একটা তুলনী গাছ। গাছের তলায় পিঁড়ি, মাঝার ঝরা। বাড়ী খোলা, প্রাচীর ছিল না; কেবল বাশের বেড়া। সেই বেড়া পার হইয়া উঠানে আসিলেন। একখানি মাত্র মেটে ঘর। তাহার হুইখানি ছাওয়া। পালের খানি ঘেরা—তাহাতে রস্না হইত, আর হুইখের খানিতে বস। দাঁড়ান চলিত। বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। কেহ ব্রহ্মঠাকুরপকে ডাকিলেন, কেহ বহুমতীকে ডাকিলেন; কাহারও উত্তর মিলিল না। তখন সকলে দাওয়ার উপর উঠিলেন। ঘরে চাৰি বক। মাতার যে শেখ একটু আশা হইয়াছিল, তাহাও গেল। আবার উল্টে কাঁড়িয়া উঠিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধানাধি করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ইহার কিছুই জানেন না। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার অনেকে জাগিয়াছিল, কিন্তু, তাহাদের সে দিন যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাহারা মনে মনে রাত্তিকার আহারের শুক্ল বিষয়ে কল্পনা করিতেছিল। কেহ কেহ মাছের খুঁটাটার পরিমাণ

লইয়াই মলা বিচারে মগ্ন ছিল। কেহ ছুঁতের ঘনব, কেহ সন্দেশের মিত্র প্রভৃতি মহা মহা কুটী মীমাংসা সকল তত্ত্ব হইয়া ভাবনা করিতেছিল। বিখ্যাত তত্ত্বদর্শী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন, এ জগতে সকলই অনিত্য, এখানে কেবল কল্পনাই স্থখ। নেপোলিয়ন এ মহাবাহী বলিয়া-
ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, কৰ্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া কেবল কল্পনার পাখায় চাপিয়া উড়িয়া বেড়াইলে নেপোলিয়ন নেপোলিয়ন হইতে পারিতেন কি না। সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ।
যাহা হউক, হেমচন্দ্রের সঙ্গীপন যখন এক এক জন এক একটী নেপো-
লিয়ানের ন্যায় মুদিতকন্ম চক্ষে ধ্যানস্থ হইল সেই মহাবাক্যের অনুসরণ করিতে
প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন হঠাৎ একটা ক্রন্দনের রোলে তাঁহাদের ধ্যান ভাঙ্গিয়া
গেল। মাছের মূড়া, ছুঁতের বাটী, জলখাবারের রেকাব সমেত কল্পনাটী
ভাঙ্গিয়া টুটিয়া চুরমার হইয়া গেল। তখনও হেমচন্দ্র নিজা বাইতে-
ছিলেন; ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সেই বালিকা বহুমতীর কথা শ্রবণ দেখিতেছিলেন।
সেই মুখ, সেই হাসি, সেই কথা,—হেমচন্দ্র ভাবিতেছিলেন, এ কোন্ নন্দনের
পারিজাত ভুলিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়া ফুটিয়াছে? সহসা সে ক্রন্দনের
শব্দ হেমের কাণে বাজিল। ক্রান্তে ধড়মড় করিয়া হেম উঠিয়া বসিলেন।
উৎকর্ণ হইয়া শব্দ শ্রবণ করিলেন। এ যে নিকটে—অতি নিকটে—বহি-
বর্তীতে। ব্যস্ত হইয়া হেম বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, লোকে
লোকারণ্য, সকলেই নিঃশব্দে রোদন করিতেছে; আর সেই যৌকণ্যমান
লোকমণ্ডলীর মধ্যে বহুমতীর মাতা আছাড় পাছাড় ধাইয়া উজ্জ্বল
করিতেছেন। হেমের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, নিঃশব্দে চক্ষের অগ্রভাগে
জল গড়াইয়া পড়িল, বুকের ভিতর কে যেন বা মারিতে লাগিল, একটা অন-
হুতবনীর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সহসা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও
সাহস হইল না। নির্দোষ এক পার্শ্বে হেম ঝাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন,
স্থির হইয়া সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া যাহা বুঝিলেন, তাহা অতি ভয়-
নক। “বহুমতী—বহুমতী কোথায়!”—আর হেমের কথা ফুটিল না, কে
যেন জোরে মাথা ঘুরাইয়া দিল। গা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই
হাতে কপাল টিপিয়া হেম সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

বুঝিবে না ?

নীরবে ওঠে যে ঢেউ, বুঝিতে চাহে না কেউ
হৃদির হইয়া !

বার, কত ক্ষুদ্র আশা, ভালবাসা ভাসা ভাসা,
কালসিঁদু-গর্ভে যায় একপে ডুবিয়া !

হৃদয় ভাসেনি বার,— ক্ষুদ্র স্বপ্ন হৃৎকণ্ডার,
ক্ষুদ্র তার কাছে !

যে আছে জ্যোৎস্নার ভূলে, ক্ষুদ্র তারা, ক্ষুদ্র ফুলে,
কি ক'রে বুঝাব তারে—কি জগত আছে !

কে বুঝিবে ?—জ্ঞানে বার দিন রাত অনিবার
বিধিতেছে সৃষ্টি !

নাহি বার দীর্ঘ-দ্বন্দ্ব, অক্ষয়ল, হা-হতাশ,
কে বুঝিবে কথা তার, মন-ভাঙ্গা সৃষ্টি !

বিন্দু বিন্দু বারি-বারি পাবার ভঙ্গিয়া যায়,
এ কথা ত মান' ;
ল'য়ে রূপ তিল তিল, বিশ্বকর্মা নিরখিল
তিলোত্তমা, জান' ।

অণু পরমাণু ল'য়ে ঘুরিছে বিব্রত হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ড মহান্ ।

ল'য়ে পল বিন্দু বিন্দু ছুটে কাল-মহাসিঁদু,
কি ভীম ডুফান !

যুঝিবে না তবে, ধীর, এ হৃদয়-বাহুকীর
প্রাণাত্মক ভার ?

অপু-পরমাণু আশা, মোহ, ভুল, ভালবাসা,
আসারিছে সঙ্কেতিছে—যেথা অনিবার !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল ।

যুগ-ধর্ম ।

অমান্বিনিধনমগ্ভাব কালের অবস্থা-পরিবর্তনকে কল ও মহত্তর বলে । সেট মনস্তরের অবস্থা বিশেষ বিশেষকে যুগ বলে । যুগের অবস্থাও পরিবর্তনশীল । অবস্থারূপারে সেই যুগ চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ার ভাৱের এক ভাগের নাম সত্য, দ্বিতীয় ভাগের নাম ত্রেতা, তৃতীয় ভাগের নাম দ্বাপর, চতুর্থ ভাগের নাম কলি । এই কলি আবার অবস্থাবিশেষ দ্বারা তিন প্রকার নামে প্রাপ্ত হইয়াছে । কলি, প্রবল কলি, আর ঘোর কলি । কলির প্রথম ভাগ অতীত হইয়া এখন দ্বিতীয় ভাগে পতিত হইয়াছে । ইহার তৃতীয় ভাগ হইয়া শেষ হইবে । কলি প্রথম ভাগে ধর্ম্মাধিকারমোক্ষপ্রদাতা ছিল । বর্তমান প্রবল কলিও তাহা প্রদান করিতে সক্ষম নহে । ইহার পর ঘোর কলিতে উক্ত চতুঃবর্ণের নাম মাত্র থাকিবে এতাবস্থায় । সত্য যুগের বৈকুণ্ঠ অবস্থা ছিল তাহাতে লোক সকল সুন্দর, সুশ্রী, অত্যন্ত বলিষ্ঠ, ষটপুষ্ঠ, অরোগী, অশোকী, ধনবান, ধার্মিক, যোগী, জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু, শরোপকারী, জিতেজয়ী, ক্রিয়াবান্ ও কেবল বেদাভ্যাসেই দেবতুল্য ছিল । এ কালে দেবতা ও পিতৃগণ পুণ্যাক্ষা মানবদিগের বাটীতে আগিয়া আবশ্যক মতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন । একালে মহাবাদিগের যোগ ও তপোবল এতই প্রবল ছিল যে দেবাসুর প্রভৃতি সকলেই সত্য-পুত মানবদিগকে ভয় করিতেন । তখন পার্থিব লোক সকল

এই পৃথিবীকে সর্গস্রোত করিয়া স্রব্ধের সহিত স্পর্শ করিত। এ যুগে বৈদিক জিহাই প্রচলিত ছিল। অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে জিহাই হইত না। সত্যযুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তি যুগকে ত্রেতাযুগ বলে। সত্যতে যেমন সত্যার্থ সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ ছিল এমনি তাহার নাম সত্য হইয়াছিল, তেমনি যে কালে ধর্ম দন বন বীর্ষ্য তপস্যা যোগ পরমায়ু ক্ষয় হইয়া ত্রিপাদ ছিল, পার্থিব ধর্ম ও যে সময়ে বিভাগ যাত্রা থাকিল, এই কালের নাম ত্রেতা-যুগ হইল। সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু যেমন ছিল এ যুগে তদপেক্ষা নান হইলেও দশ সহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল। এ কালে লোক সকলের ঐহিক পারিতোষিক কার্য্যাকাব্য ও যোগ যোগ সকলি ঐতিহ্যুষ্টি অনুসারে হইত। বেদের বেজঃ অল্প পরিমাণে কমিল। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের নিরমায়ুসারে শিশু বলিরাছেন য় এতোক যুগের শাস্ত্র সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ১৮০টি যুগে একটি মন্বন্তর। এতৎসংখ্যক যুগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক নিয়ম, পৃথক পৃথক শাস্ত্র। বর্ত্তমান কলিযুগের অন্য যে নিয়ম ও যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, তবিশ্যৎ কলিযুগের নিমিত্ত অন্য প্রকার নিয়ম ও অন্য রকম শাস্ত্র প্রচার হইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ। এ যুগের যেমন পৃথিবীর অবস্থা তেমনি শাস্ত্র সকল প্রচার হইল। এ যুগে পুণ্য শাস্ত্রই প্রবল হইল। লোক সকল পাপতাপে ভুজিত হইল। স্বর্গ সঙ্কল্পতা কমিয়া গেল। ধর্ম বিপন্ন, সত্য ও দ্বিপন্ন থাকিল। পৃথিবী ভাটাক্রান্ত হইয়া গত্য-ঘোবনার ন্যায় প্রজাপাণন করিতে লাগিলেন। কুরু ও পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথমে ও দ্বাপরের শেষে জন্মিয়া নীলা করিয়া গিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে তবিশ্যৎ দ্বাপরের শেষে আর কলির প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ও কুরু পাণ্ডব জন্মিয়া পূর্ব্ববৎ নীলা করিবেন। এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত নহে।

যেমন মন্বন্তর শাস্ত্র যুগে কতই অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমনি কল্পও অসংখ্য হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রকর্ম্মেরা তৎসংখ্যায় স্থির করিতে পারেন না। এতকণ বরাহ কল্প। চতুর্দশ মন্বন্তরে একটি কল্প হয়। কল্প সম্বন্ধে যোগবশিষ্ট রামায়ণে বশিষ্ঠকৃষ্ণও সংবাদে প্রকাশ যে, এতোক কল্পে লগ্নতের অবস্থা নূতন নূতন হয়। কোন কল্পে এই পৃথিবী কেবল সর্গভূমিগার

সমাজে ছিল। কোন কক্ষে কেবল জগন্ময় ছিল। কোন কক্ষে কেবল পাণ্ডুর ছিল। কোন কক্ষে অবগম্য ছিল। কোন কক্ষে চন্দ্র সূর্য্যের বিদ্যমানতা ছিল না, কেবল পূর্নচন্দ্রের সূর্য্যের অর্ধাংশ দ্বারা আলোক পাওয়া যেত। এখন সে দিককে পূর্ন বনিয়া জানা যাইতেছে, কোন কক্ষে তাৎকালিক পশ্চিম দিক বনিয়া জানা যাউত। শাস্ত্র সকলও তদনুরূপ ছিল। এখন জীলোকের উপনয়ন নাই। কিন্তু অন্যান্য কক্ষে জীলোকের উপনয়ন ছিল যথা—“পুরাকল্পেত নারীনাং মৌলীবন্ধনমীদৃশং” ইতি স্মৃতি। তখন তাহারা বেদেও পুরুষের নাম অধিকারিণী ছিল। ইহার শাস্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন কল্প, তদনুরূপ মনস্তর। মনস্তরের অর্থ সৃষ্টির প্রথমে যে মনুষ্য হইতে মানব ক্রান্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে, ১৮৪টি যুগ তাহার নাম অনুসারে প্রচলিত থাকে। যেমন প্রায়স্কব, গার্গি, খালোচিস, বৈবস্বত ইত্যাদি। আবার মনস্তরের অনুযায়ী যুগ প্রবর্ত্ত হয়। যুগানুযায়ী শাস্ত্র সকল প্রচার হইয়াছে। বর্ত্তমান খেতবরাহ কল্পের মধ্যে ১৪টি মনস্তর গত হইয়াছে। এইরূপ সপ্তম মনস্তরের নাম বৈবস্বত মনস্তর। ১৮৪টি যুগ এক এক মনস্তরের ভাগ কাণ। ১৮৪ যুগের মধ্যে ১১১ যুগ গত হইয়া ১১২ যুগ অবর্ত্ত হইয়াছে। এই যুগের নাম কলিযুগ। এষ্ট কলিযুগের প্রথমাবস্থা অতীত হইয়া দ্বিতীয়াবস্থার পড়িয়াছে। তৃতীয়াবস্থার শেষ হইবে। তাহা হইতে বিলম্ব আছে।

দেশের ও কালের অবস্থানসারে মনুষ্যের প্রকৃতি সংগঠিত হয়। শাস্ত্রও মনুষ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী। নচেৎ শাস্ত্রানুযায়িনী মানব-প্রকৃতি হয় না। যখন যেমন মানব প্রকৃতি নির্মিত হয় শাস্ত্রকারেরা তদনুসারে শাস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। সকল কল্পের, সকল মনস্তরের, সকল যুগের জন্য একই প্রকার শাস্ত্র প্রচার করেন নাই, পূণক্, পৃথক্ যে শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ছুরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার উদাহরণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সংগ্রহীত স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা গিয়াছে, যে, শাস্ত্রের একবাক্যতা সংস্থাপনার্থ বিনিয়াজেন “একভেদাদবিকল্পঃ।” অর্থাৎ কোন কক্ষে এইরূপ কোন কক্ষে অন্যরূপ শাস্ত্র ছিল। এতদ্বিরুদ্ধমঙ্গলবিধাতা জ্ঞানচক্ৰ নিব তত্ত্বশাস্ত্রে স্পষ্টাকরে বিনিয়াজেন, যে

“যুগান্তে বেদমাগেণ জেতায়াং ঋতিন্মতং দ্বাপরে চ পুবাণেন কলাবাগম-
সম্বৎসরঃ” সত্যযুগে ধর্মার্থ কাম মোক্ষপাভ করিতে হইলে শুদ্ধ বেদ মতে
ক্রিয়া করিবে। ত্রেতাযুগে কেবল ঋতি মতে, দ্বাপর যুগে কেবল
পুরাণ মতে, কলিযুগে কেবল আগম মতে ক্রিয়া করিলে ক্রিয়া সফল
হয়।

সত্য যুগে বেদ যেমন জীবন্ত ও সর্বাগ্ৰবসম্পন্ন ছিল, আবার এই প্রবল
কলিযুগে উহা নিখীল অকর্ণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বেদ কেন ঋতি-
স্মৃতি, পুরাণেরও ঐ প্রকার অবস্থা ঘটয়াছে। ইহার প্রমাণ—মহানির্ধাণ
শাস্ত্র। তাহা পূর্বে বলিয়াছি। সত্য যুগ হইতে কলির দুই সহস্র বৎসর পর্যন্ত
ভারতে প্রকৃত ক্রিয় সন্মতি আর মুনিঋষি ও যাজ্ঞিক বিদ্বজ্জ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন
বলিয়া বৈদিকাদি ক্রিয়ার ফল অবার্ণ ছিল। তৎপর প্রকৃত ক্রিয় রাতার
আর মুনি ঋষি ব্রাহ্মণের অসত্তাব হইলে ক্রমশঃ কলি প্রবল হইলে বেদাদি
শাস্ত্র সকল ক্রমে ক্রমে নিভেজ হইয়া পড়িল। সুতরাং আগম শাস্ত্র অবলম্ব্য
হইল। এত দিন প্রবল কলি হয় নাই, সেই হেতু অতীত পণ্ডিতেরা ও গুরু
পুরোহিত সকল নিরবচ্ছিন্ন আগম মতে আশ্রমোচিত বর্ধমাংসাদি
ক্রিয়া করেন নাই, এই মাত্র অনুভব হয়। যুগান্তে ক্রিয়া হওয়ার
আর একটি কারণ এই, এইকণকার অধিকাংশ হিন্দু হেতুপরতন্ত্র বলিয়া
নিচাত্তই কুসংস্কারপন্ন, এবং কেবল বিশ্বাসমূলক আধ্যাত্মিক শাস্ত্রকে
শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় করেন না বলিয়া আগম শাস্ত্র বিশেষ আগুত হইতে
পারিতেছে না। আগম শাস্ত্র অহেতুক অথচ প্রত্যক ফলদাতা।
ইহার ইতিবৃত্ত পর্যন্ত জানা নাই। তাহা দুই এক জন বাঁহারা
জ্ঞানেন, তাঁহারা সংসর্গ ও সমাজের ভণে প্রকাশ করেন না। এই
উপলক্ষে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে হিন্দু শাস্ত্র সকলের মধ্যে কতক
গুলি হেতুমূলক, আর কতকগুলি বিশ্বাসমূলক, কতকগুলি ব্যবহার শাস্ত্র,
কতকগুলি কাব্যালঙ্কার নামক, কতকগুলি প্রত্যক ফলপ্রদ যোগ, ও
জ্যোতিষ, আর আরুর্শেদ শাস্ত্র, আর কতকগুলি অহেতুক সিদ্ধান্ত ব্যাক্য
পরিপূর্ণ আগম শাস্ত্র। এই আগম শাস্ত্র বাতীত আর আর শাস্ত্র সকল
বর্তমানে সময়ে কেবল অর্থকরী শাস্ত্র হইয়াছে। আগম শাস্ত্র অতি গূঢ়।

সকলে ইহা জানে না । কিন্তু ভারতে আগম যত দিন প্রবল না হইতেছে তত দিন ভারতে একজন্মদায়ী বীর হইতে পারিতেছে না । একধর্ম্মী হইতে পারিলে একজন্মদায়ী বীর হওয়া যায় । লোক সকলকে একধর্ম্মী ও এক ক্রান্তি করিতে তাত্ত্বিক আশ্ব ধর্ম্মই শুধু ।

এই প্রবল কনিকালে আগমোক্ত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য সৌর প্রভৃতি যাবতীর পথ ভয়ানক অধঃ কটকাকীর্ণ । প্রাচ্য জাতি ধর্ম্মের পথ অতি দুঃসেবা ও ভয়শূন্য । এ পথের যিনি পথিক হন, তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীষ্টান, না চীন, না মগ । কেবল শিবপ্রাতি চন । শিবত্ব জন্মিলে লোক সকল সকল জীবকে আশ্রয় মতোবর বলিয়া জানেন । ইহা-নিগের তিনটি মাত্র নিয়ম পালন করিতে হয় । যথা :—

“মতা বচন, অশীনতা, পরনারী-নৈরাস ।

এচমে ওরু না মিলে জামিন তারা দাস” ।

যত দিন লোক সকল এই নিয়ম ত্রয়ের আশ্রয় না পাইবেন তত দিন তাঁহারা বীরত্ব বা শিবত্ব লাভ করিতে পারিবেন না ।

তাত্ত্বিক নিষ্ঠার জ্ঞোপাসনার কিয়দংশ গোপীবর গৌরকনাথ ঠাকুরের শিষ্য হইতে ফ্রাইট ও শিবচরু নানক প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ লোককে একজন্মদায়ী বীর করিয়া গিয়াছেন । পেগবর মহম্মদও আপন কলি-পত ঈশ্বরারাদনার মত প্রচার করিয়া অনেক লোককে একজন্মদায়ী বীর করিয়া গিয়াছেন বটে । কিন্তু তাঁহার উক্ত মত জমজমাৎ হইতে না পারায় অকারণ নর-হত্যার পাতকে নামাঙ্কিত হইয়া গেলেন ।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কেবল অসঙ্গত প্রেম বিস্তরণ করিয়া দেশের সাধারণ লোকদিগকে ভিক্ষুক করিয়া গিয়াছেন । বাহারা মহাপ্রভুর নবাবি-কৃত পথের পথিক, তাঁহাদিগের জগদ বীরত্ব ও স্বদেশোদ্ধারগ শূন্য । অপচ গৃহস্থ । ইহারা বিমুক্ত প্রেম কাহাকে বলে তাহা জানে না । কেবল মুখে প্রেম গড়িয়া পড়ে এই মাত্র ।

তৎপর রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বেদ প্রতি স্মৃতি পূর্ণাংগতদ্রাঘমত মত প্রচার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম মুখে এক, কার্যে এক । এ সমাজের বর্ত্ত-মান নেতা সকল হিন্দুয়ানি রক্ষার্থ হিন্দুদিগের ন্যায় শ্রদ্ধা বিবাহ উপনয়নাদি

কার্য। কোনে সত্য, কিন্তু তাহা কি হিন্দু শাস্ত্রমত, কি খ্রীষ্টান কি মুসল-
মান শাস্ত্রমত তাহা প্রকাশ নাট। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন ঠিক
হিন্দু শাস্ত্রমত। যাই হউক ইহাদিগের পত্রপুস্তকে ভক্তি যে আছে তাহা অনেক
সত্য; ইহারা যদি মহানির্দোষ তত্ত্বজ্ঞানারে আপন আপন ধর্ম কর্ম সাধনা
করেন তাহা হইলে সর্বাদ্বন্দ্বের হয়, এবং দেশেরও অনেক হিত হয়।

কেতু কেহ বলেন অনেক তত্ত্ব নিতাস্তই বেদবিরুদ্ধ দেখা যায়। ইহাতে
বোধ হয় তত্ত্ব বেদমতের প্রাচীন শাস্ত্র নহে, উহা নূতন শাস্ত্র। সর্বাদ্ব
চলিত শাস্ত্র নহে। এ কথা মিথ্যাই অল্পমণী ও অল্পজ্ঞানী অবিশ্বাস-
কারীরা কথ্য। বেদ ঐতিহ্য, পুরাণ, তত্ত্ব একই বস্তু। তবে বেদের নাম
আর রূপ পরিবর্তন হইয়া ঐতিহ্যাদি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এতাবস্থায়। বেদ
আপ্ত বাক্য তত্ত্ব ও আপ্ত বাক্য। যাহাতে ভ্রমপ্রসাদাদি দোষ নাই তাহাই
আপ্ত বাক্য। এ বাক্য অপৌরুষেয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ। যিনি সমগ্র
অধর্মবেদ ও অদ্বৈতীয় ঐতিহ্য আর সমুদায় তত্ত্ব অধ্যয়ন বা দর্শন করিয়াছেন,
তিনি তত্ত্বকে অতি প্রাচীন, সর্বাদ্ব-প্রচলিত বেদ বলিয়া সম্মান করেন।
বৈদিক যন্ত্রের যোগন পুষ্টি, ছন্দ, লেখতা আর প্রয়োজন আছে; তাত্ত্বিক
অনেক যন্ত্রেও তাহা আছে। ঐক্য বস্তু: সামবেদে যেমন ইন্দ্রাদি দেবতার
আরাধনা আছে, আগমজ্ঞানী অধর্মবেদেও পরমেশ্বর ও বিশ্ব শিব শক্তি
দ্বারা। গণপতি রূপ নির্ণয় ও সত্ত্ব ত্রয়ের মন্ত্রতত্ত্ব আছে। এই সকল
উপাসক ভারতের সমস্ত দেখা ও শুনা যায়। পত্রপুস্তকোপাসক অতি বিরল।

নির্ভয় পরম্পরোপাসনার পদ্ধতি মহানির্দোষত্রে যেমন আছে এমন
আর কোন শাস্ত্রে নাই। মহানির্দোষ তত্ত্ব অতি প্রামাণিক ও সর্বাদ্বময়।
এই তত্ত্বে হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্মের অনেক প্রকার ত্রিধোলাপের পদ্ধতিও আছে।
তাহাই প্রবল কলিযুগের পক্ষে একান্ত হিতকর ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ।

এখন দেখা যাউক, প্রবল কলিযুগের হিন্দুরা বেদ ঐতিহ্য পুরাণের
শাধন অবহেলনপূর্বক মহাজনোচিত পথ পরিত্যাগপূর্বক বেচ্ছাচারের
বশবর্তী হইয়াছে কি না।

দেখা যাইতেছে যে এই প্রবল কলিযুগে হিন্দুধর্মের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ-
গণ স্ব স্ব ধর্ম কর্ম পরিত্যাগপূর্বক শূদ্রবৎ যবন স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব করিয়া

জীবন যাপন করিতেছেন । তার যাহারা ত্যাগ করেন না, তাহারাও প্রাণ-ব্রাহ্মণগণকে অত্যাচারের সহিত কন্যাপুত্র প্রদান ও আনান কার্য্য করিত তাহাদিগের আচার ব্যবহার পালন করিতেছেন । এতদ্বির দান গ্রহণ ও যাকম ক্রিয়াধারা যে অপবিত্র হইতেছেন তাহা কি তাহারা জানেন না ? সংসর্গ দোষ এমন প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা হইতে নির্লোপ ব্যক্তি কলিযুগে নিতান্তই বিরল । কলিযুগের প্রবল প্রভাবে অল্প ও স্ত্রী এবং সম্বন্ধ বিচার নাই । হিংসা ও মিথ্যা কথা ব্যবহার করাকে কেহই পাপ বোধ করেন না । পরমিত্তা স্বাভাবিক ধর্ম হইয়াছে । মদ্য মাংসের অবৈধ পোষা করা সামাজিক ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে । নবীন ব্রাহ্মধর্ম যদি অভ্যাস দোষহীন ধর্ম হইত, তবে ৫০ বৎসর হইল, প্রচার হইয়াছে, উহাতে ২১০ জন লোকও শিক হইতে পারিতেন । এ পর্য্যন্ত একজনও শিক হইতে পারে নাই । যিনি যাহার সাধনা করেন তিনি ক্রটিবিষয়ে শিক হইলে তৎস্বরূপ হইতে পারেন । ব্রাহ্মোপাসনার শিক হইলে ব্রাহ্মত্ব হইয়া পড়েন । ব্রাহ্মত্ব হইলে অনিমাধি অষ্টৈশ্বর্য্য তাঁহার করতলস্থ হয় । এতদ্বির বাক্শিক ও ত্রিকালজ্ঞ হন । কিন্তু ব্রাহ্ম বল, হিন্দু বল, এট যে কোটা কোটা লোক আছে তাহার ত এক জনকেও শিক হইতে দেখা বা শুনা যায় না । কেন ? যুগান্তবাগিনী যথার্থ সাধনা করা হইতেছে না বলিয়া কেহই শিক হইতে পারিতেছেন না । নচেৎ অন্য কোন কারণ নাই । এই প্রবল কলিকালের আঘাত সাক্ষ্যকারের ও একপ্রাণ হওয়ার আর বীজ-প্রাপনের তত্ত্বোক্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই । এ ধর্ম সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম ।

সত্যযুগ হইতে এই প্রবল কলিযুগ পর্য্যন্ত যতট পৃথিবীপাল হইয়া গিয়াছেন ও বর্তমান আছেন তাহারা সকলেই সাধনা বশে বীর হইয়াছেন । তন্মধ্যে কেহ সত্ত্ব কেহ নির্ভর ব্রাহ্মোপাসনার বীর । যিনি নাস্তিক তিনিও প্রকৃতির উপাসক ছিলেন । হিন্দু মতো অনেকে শ্রবণময়ী প্রকৃতি দেবীকে সাকার্য্য করিয়া আরাধনা করেন । কি হিন্দু কি বন কি খ্রিষ্ট ইহারা তাব-তেই ব্রাহ্মোপাসক বীর । এই প্রবল কলিযুগের পক্ষে সত্যই সকলের অব-লম্ব । যিনি যতই মতাপুত হইবেন তাঁহার ভাগ্য-লক্ষী ততই বৃদ্ধি হইবে.

এবং দৈবর প্রকাশ ততই লাভ করিবেন। সত্যই দর্শন, সত্যই তপস্যা, সত্যই
গোপ, সত্যই যজ্ঞ, সত্যই স্মৃতি, সত্যই মোক্ষধর্ম। সত্য্য গাথনায় তানুশ
জ্ঞান বা ধোপের অপেক্ষা নহে না। কেবল মনের দাঁড়া কাব্যক
করে। কুসংস্কার সত্যের প্রবল প্রতিবন্ধক। কুসংস্কারের দ্বারা সত্য মিথ্যা,
মিথ্যা সত্য হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত সাধু লোকের আশ্রয় লওয়া বিশেষ
প্রয়োজন।

যতই কলি প্রবল হইবে ততই সাধু ও সদ্-গুণের অভাব অসত্ত্বের বৃদ্ধি
হইবে। যথা—

“যদা যদা সত্যং হানির্ক্কম মাগাহুঃপরিণতঃ।

তদা তদা কলেক্ক্কিরিষ্যন্ন যদা বিচক্কেণঃ।”

কলি যে এখন অতি প্রবল তৎসম্বন্ধে মহানির্ক্কণ তত্ত্বে বিশেষ প্রমাণ
যাহা আছে তাহা পুঙ্খনই বলা হইয়াছে। তত্ত্ব বলেন, যে সময় এই
আধিপালিত ভারতে নিত্যম ধনলোভী স্বেচ্ছাচারি রাজা হইয়া হিন্দু শাস্ত্র-
বিরুদ্ধ নিয়মাবলি দ্বারা ভারত শাসন করিবেন সেই সময়কে প্রবল কলি
বলিয়া জানিবে। আর নদীযাত্রীরা সমুদ্রগামিনী ভাগীরথী গঙ্গা যে সময়
ছিদ্রা ভিন্না ও মল্লগতি হইবেন সেই সময়কে প্রবল কলি বলিয়া জানিবে
এখন রাজার আর গজার অবস্থা দ্বারা প্রবল কলি বলিয়া কেনা বিশ্বাস করিবে ?
এতদ্ব্যতীত প্রবল কলি সম্বন্ধে মহাত্মন আর যতগুলি কথা বলিয়াছেন সে
সকল গ্রন্থ ঘটিয়াছে। অতএব হিন্দু-ধর্মের এখন ক্রিয়া করিতে হইলে
আগমোক্ত ক্রিয়া করাই শরৎ ও সুকৃতি সম্বন্ধ হইতেছে। ভারতীয় হিন্দু-
জাতি যত দিনে এক ধর্ম্মাছুদারে এক বর্ণ ও এক প্রাণ নঃ হইতে পারিতে-
ছেন, তত দিন তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও স্বদেশাহরণ আর বীরত্ব
কোপায়! এখন হিন্দুজাতির বৈরুপ অবস্থা ও আচার ব্যবহার হইয়াছে
তাড়াতে দেখা যায় যে সে ভারতীয় বাসিন্দারী গৌল বলিয়া বোধ হয়।
এই কৌলত্ব আর বাসিন্দার যদি আগম সম্বন্ধ হইত তাহা হইলে উক্ত
ভাবের ও আচারের প্রকৃত বীরত্ব আর এক প্রাণের মত অদম্যই কলিত।
এতদ্বিম হিন্দুজাতির দৈন্য পৈশ্য। ক্রিয়াকলাপের অকৃত্রিম ক ও ভূরি ভূরি
উৎসাহ হইত। পরিশ্রম এবং অর্থন্যয়ও সার্থক হইত। আর ক্রিয়া

নিম্পাদক মাধু গুরু পুরোহিতেরও অসম্ভব থাকিত না । এ সম্বন্ধে সূত্র
নলেন, “সামগ্রী চেষ্টা ফলবিরহঃ বাঞ্ছিতং রেবেতিত্বম্ ।” সামগ্রী
খানিলে অর্থের উপাদান থাকিলে ফলের অভাব কখন হয় না ইহাট
বাঞ্ছিত । অর্থের স্থির দিক্কাহ্ন । বর্তমান সময়ে ভারতীয় হিন্দুজাতির
একজনমাত্রের ও পদোন্নতির পোতার এবং বীরহের সামগ্রী কেবল বক্তৃতা
বা বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ শিক্ষা করা নহে, এইজন্যকার
সামগ্রী যুগযুগান্তে শাস্ত্রসংগত আচার ব্যবহার ও দৈববল উপার্জন করা ।
কেবল দৈববলে কিম্বা আচার ব্যবহারে কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না ।
যাহারা দৈববলের অনাকাঙ্ক্ষী ও কেবল আচার ব্যবহারের প্রত্যাশী
তাঁহারা অর্দ্ধ সামগ্রীর ফল বৈ সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন না । ইহা
আগমদিগ্গণের মত ।

[ক্রমঃ

ত্রিকালীকমল মার্কভৌম ।

বিবিধ চিন্তা ।

১

বাতায়ন । পৃথের চক্ৰ—জন্মের দ্বার—প্রণয়ের মুখবন্ধ—নারীর স্বাধীনতা—
মৃত্যুর জীবন—জীবনের মৃত্যু—অগ্নির সঙ্গীত—আর আমার সব । এই
চির-অবারিত বহুসাময় পথ বিয়া কোথাকার একটি কল্পনাময় নানাবর্ণের রঞ্জিত
পাখী মধুর গান গাহিতে গাহিতে আসিয়াছিল । আমার এই চির পরিচিত
অন্তহীন ভাস্মা গড়ার পথ কিয়দূর কোথায়—কোন্ দূর মেঘাচ্ছন্ন দেব-
দেশে—উড়িয়া গিয়াছে ! এই বাতায়নই অগতঃ অতীতে পালাবার এক-
মাত্র পথ । হায়, এট চির-দুঃস্বপ্ন পথ দ্বার খুলিয়া কত লোকের কত পাখী
পলাইয়া গিয়াছে ! আজও—এট মূহুর্তে—কত বাইতেছে ! সমস্ত বিশ্ব তিল
তিল অল্পসঞ্জন করিয়া দেখিলেও, আর তাহাদিগকে কোথাও পাইবে না ।
হায় । এ পথ কি রুদ্ধ করা যায় না ? না । ইহা চির-অনবরুদ্ধ ।

২

আজও ত আসিল না। কে ? সে আমার কোথায়—কোন অসীম অন্ধ-
কারের গর্ভে ভগ্ন জগৎ খানি লইয়া কত কাল কাঁদিতে কাঁদিতে—চলিয়া
গিয়াছে ! হায়, কবে আসিবে সে ? আজ কত—কত দিন যে সে আসে
নাই ! এই দীন দীন প্রাণ লইয়া শূন্য জগৎ-বাতায়নে তাহার জন্য কত
দী—র্ঘ—দী—র্ঘ দিন রাত্রি ধরিয়া বসিয়া বসিয়া যে কাঁদিতোছি ! এত কাঁদি-
তেছি তবু আসিল না ! তবে আর বৃষ্টি আসিবে না ! আর আসে না !

৩

আজ আমি যে তাহাকে ঐ দূরগত রহস্যময় organ বাস্তবজ্ঞের সঙ্গীত-
ময় শব্দের স্মৃতিময় বিহাদিত ছবির মধ্যে দেখিতে পাইলাম। যেন কোথা-
কার কোন অদৃশ্য-গানের দেশ হইতে সুর বইয়া সে আমাকে দেখিতে
আসিয়াছে ! আজ সে রাগিনীরূপিণী। বাহাদিগকে আমরা জীবনে ভুলিতে
পারি না, বাহারা না থাকিলে জীবনের কোন অর্থ নাই, বাহারা অন্ধকার-
ময় জীবন-গৃহের এক মাত্র প্রদীপ, বাহারা জীবনের গীতা, অসীম করিগা
দিয়াছে, বাহারা ভাবের অসীম সৌন্দর্য্যে বিব চিরদিনের মতন ডুইয়া
গিয়াছে, তাহারা যখন অনন্ত অদৃশ্য জগৎ-কাব্যের জগৎয়ের মধ্যে একে-
বারে মিলাইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে আমরা বিশাল জগৎ-কাব্যের প্রতি
পত্রে, প্রতি স্কুলে, প্রতি স্কুলে, প্রতি কলে, প্রতি পাখীর স্বরে, প্রতি নদীর
তরঙ্গে, প্রতি ঋতুর অবসানে, প্রতি হৃদয়ের অক্ষরে দেখিতে পাই। সমস্ত
বিশ্ব তখন তাহার আবাসস্থান। মৃত্যু, অগতে নাই। জগৎ, জীবন। জীবনের
পরিবর্তন—উন্নতি—বিস্তৃতি। একেবারে তাহারা এ পৃথিবী হইতে কখন
চলিয়া যাইতে পারে না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আজ
সে না থাকিলে কি তাহারগান ঐ বাস্তবজ্ঞের মধ্যে শুনিতে পাইতাম ?
সে না থাকিলে তাহার কেল্লাতিগ শক্তি থাকিবে কেন ? সে না
থাকিলে কি আজ কখন ফুল ফুটিত ? মলয় বহিত ? অতীতের স্বপ্ন-স্বপ্নের
কত কথা—কত মুখ—মনে জাগাইয়া দিয়া কি চাঁদ হাসিত ? ঐ পথিক কি
এই গভীর বিজন মহা-বিষ্মৃত পুরাতন জগৎ-পথ দিয়া কত কাহিনীতে
জড়ান আশার ঐ মধুর বাসনা পরিপূর্ণ গান আকাশ ছাপাইয়া গাহিতে গাহিতে

চলিয়া যাইত ? তাহা হইলে কি আজ আর তাহাকে আমার মনে পড়িত ? হায়, আমাদের কত আগের প্রাণসম প্রিয়তম ধনদের, আমরা মোহের বশে চির দিনের মতন হারাইয়া ফেলি ! কিন্তু তাহারা হারাইবার নহে । যাহারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের আর হারাইবার স্থান কোথায় ? আজ সে আমার যে, এই বিশ্বরূপে পরিণত । আর সে আমার যে, অহনিশি চোখের উপর বিরাজিত । তখন তাহাকে এক মাত্র স্থূল চক্ষু দিয়া দেখিতাম, আজ আমার অন্তর্বিহিত সূক্ষ্ম চক্ষু সমস্ত শরীররূপে পরিণত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেছি । তখন সে কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ ছিল, আজ সে জ্যেষ্ঠতর অধিক—জ্ঞানাতীত । তখন সে দেহের মিলন-পিপাসী গৃহসঙ্গিনী গৃহিণী ছিল ; আজ সে জীবাত্মা ও পরমাশ্রয় সংযোগকারিণী বিশ্বরূপা যোগিনী । তখন সে কেবল রূপ ছিল ; আজ সে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ—সব । আজ সে আমার দেহের প্রতি পরমাণু জীবনের জীবন । আর তাহাকে কি ভুলিতে পারি ? কি করিয়া ভুলিব ? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তাহার বিচিত্র অপরূপ রূপ দেখিতে পাই । যে জল এই পান করিতেছি, ইহাও তাহারই রস । স্থূল সূক্ষ্ম-তেজে, তাহার গন্ধ পাইতেছি । নিঃশ্বাস লইতেছি, সে আসিতেছে । আহা করিতেছি, সে প্রাণে মিশিতেছে । স্পর্শ করিতেছি, তাহার দেহে হাত পড়িতেছে । শব্দ শুনিতেছি, সে ডাকিতেছে । দিন যাইতেছে, এ জীবন তাহাতেই পরিণত হইতেছে । জগতের মূল কি জানি না । বোধ হয় নিরাকার । জগতের আদ্যাশক্তি নিরাকার—অব্যয়—অনন্ত । জগতের চরম ও সূক্ষ্ম, স্থূল নহে । দেহের পর আত্মা । ভোগের পর প্রেম । সসীমের পর অসীম । উন্নতি—উন্নতি—উন্নতি । ব্রহ্মে বিশ্বস্থাপ্তি । প্রেমের চির-মিলনের পরিচয়—বিকাশ, আশ্রয়-বলিদানে স্থূল দেহ পরিত্যাগে ।

৪

যাহাকে একবার ভাল বাসিয়াছি, আর কি তাহাকে ভোলা যায় ? যখন প্রেম, কদম্ব-সরোবর পরিপূর্ণ করিয়া উথলিয়া উঠিয়া অন্য সরোবরে মুক্তি-কামনায় প্রেমস্রুধা ঢালিতে যাইতেছে, তখন তাহাকে কে ফিরাতে পারে ? ভাল বাসিয়া কদম্বসরোবর অনন্ত প্রেম-অসীমে মিশাইয়া আর কি ফিরান যায়—সসীমে

নাহা যায় ? কে বলে মরিলে সমস্ত জগৎ ? আমি তাহা বিশ্বাস করি না । প্রেম কখন মরে না । দেহ-দ্বার ভাঙিয়া প্রেমের বিকাশ—বিস্তার । এবং প্রেমের অবস্থান জিকাল দৃড়িয়া । অতীত প্রেমের বীজ, বর্তমান তাহার ফল এবং অনন্ত ভবিষ্যত তাহার চিরফল ।

প্রেম, আকর্ষণী শক্তি—সংঘত শক্তির উদ্বেগ । শক্তির গুণ, বর্জন—আকর্ষণ করা । প্রেমও আকর্ষণ করে, নিকীর্ণ হয় । প্রেমের ধর্ম, প্রতিপদে অগ্রসর হওয়া পিছাইয়া পড়া নহে । প্রেমে জগৎ ফুটিয়াছে, বানে জগৎ বাড়িয়াছে । এ জগতের তহবিলে যত জমা তত খরচ । সেখানে রূপবত্তা সঙ্গীর্ণতা নাই । তাই বলি, যদি সম্পূর্ণ মিলিতে চাও, যদি সম্পূর্ণ পাইতে চাও, যদি সম্পূর্ণ উন্নতি কামনা কর, তবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জগতের পদে বিসর্জন কর । অনন্ত হও । যত দিবে তত বাড়িবে ।

বেশ, ফিরিয়া কিছুই আসে না । আবার দিলেও ত কিছুই কমে না ! প্রেমের ধর্মই এইরূপ ।

একবার জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর । জগতের পাঠ অধ্যয়ন কর । জগৎ যে, এই প্রতিদিন তাহার সমস্ত সামগ্রী আমাদের জন্য স্বজন করিয়া আমাদেরকে বিতেছে, তাহার পরিনর্ভে সে কি পাইতেছে ? কি চাহিতেছে সে ? কোন একটা ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতিদানের জন্য কি সে তোমার দ্বারে তিফা করিতে আসে ? সব দিয়াও ত তাগর ভাঁড়ার আঙ্গু ফরাইল না ! জগৎ যে, প্রেমের ভাঁড়ার । প্রেমের ভাঁড়ার কখন ফুরায় না ।

এ জগৎ উন্নতির গৃহ । অগ্রসরের সোপান । যখন জগৎ-সোপানে পা দিয়াছ, তখন আর কিরিতে পার না । যখন প্রেমের ফুল একবার ফুটিয়াছে, তখন আর তাহার মৃত্যু নাই । এ পথ অনন্ত-গামী । যতদিন না তোমার কাজ পূর্ণ হয়, ততদিন তুমি জগতের অনন্ত ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাক । পিছনে যাওয়া যায় না । জগৎ-অগ্রসরের সঙ্গ-পরিবর্তন-সোপানে উঠিতে উঠিতে, শক্তির বিপরীত মুখে পিছাইয়া যাওয়া যায় না । আমরা অগ্রসরের । পিছাইবার নহে । এ জগতের কিছু পিছায় না, বসিয়া থাকে না । তবে তুমি মিথামিথি কেন পিছাইয়া বসিয়া থাক । অগ্রসর হও । সঙ্গীর্ণতা দূর কর ।

৫

প্রবৃত্তি মূলভূত মোহ—ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব—দেহ—অধীনতা।
প্রবৃত্তি আত্মার কারাগার। নিবৃত্তি তাহার বাতায়ন—মুক্তি। প্রবৃত্তির অব-
সানে আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। নিবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিরতি—দিশ্রাম। নিবৃত্তি,
তীর্থস্থান—বেহের উন্নত অবস্থা—পরের আপন—দূরের নিকট। নিবৃত্তির
এই অনন্ত উন্নতি-পথেই জীবাত্মার সহিত জগৎব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডিক বিবাহ।
এবং ইহাই হিন্দুর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতানে লয়—যোগ।

৬

তুমি তুমি একা! তোমার কেহ নাই। তুমি জগতের, কিন্তু জগৎ
তোমার নয়। তুমি মরিলে জগতের কোন কাজ বন্ধ থাকিবে না। ফুল
ঠিক তেমনি ভাবে সকলকে সুগন্ধ বিতরণ করিবে। পানী সমান ভাবে
ডালিবে। চাঁদ চিরদিন ঠিক সেই ভাবে আকাশে হাসিয়া চির-প্রেমিকের
মতন প্রকৃতির দুকের বসন খুলিয়া দিবে। এবং দিন ঠিক একই ভাবে
হাসিতে কঁাদিতে যাইবে। তবে তুমি কখন অত অনিমেষ ঘেহ নয়নে ঐ
একখানি মুখের প্রতি প্রতিদিন চাহিয়া থাক? সমস্ত জীবন অত কাহার
পিছনে দৌড়াইতেছ? কাহার জন্য চিন্তা করিয়া তুমি অস্থির করিতেছ?
যাহাকে তুমি চির-জীবন কখনো প্রেমময় সুখ-সিঁহাসনে বসাইয়া তোমার
সুগন্ধ-কুসুম দিয়া নিশি দিন পূজা করিয়াছ, যে তোমার কি যে, তাহা আজ
পৃথক্ ঠিক করিতে পার নাই, হায়, সে—তোমার সেই চির-আনন্দময়ী -
আদরের আধার ত তোমার চির-সঙ্গিনী হইয়া তোমার অনন্ত অন্ধকারময়
ভবিষ্য জীবন-পথ আনো ধরিয়া যাইবে না। তোমাকে শোকে ভুগাইয়া,
তোমার সেই বড় কাতর মুখের প্রতি একটিবারও না চাহিয়া বিরাট জগৎ-
স্রোতের মধ্যে সে একা ভাসিয়া যাইবে! সব একা। “তোমার” “আমার”
কেবল কথা মায়। ওগুলো জীবনের সীমা—হু দিন।—আত্ম-বিভ্রমণ।
একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর: আপনাকে অধ্যয়ন কর। তুমি যে,
মোহে আবদ্ধ! তাইত তোমার এত গোপমাল; তাইত তুমি পথ চিন নাই।
এখানে পথ দেখাইবার কেহ নাই! আপনার পথ আপনি চিনিয়া লও।

ঐ. নগেন্দ্রনাথ বসু।

ঔষা ।

রাতি হ'লো ভোর, ঔষা আসি ধীনে, সলাক বয়ান থানি
তুলিয়া কহিল, “আর ঘুমা'ওনা, ভাগ জাগ লগপাণী ।”

ধীরে ধীরে হুটী তুলিল বাহ

কনক মুহূট করে

সাদরে আসিয়া পরাধরা দিল অটবীর শিরোপরে ॥

২

আকি ঔষাবালা সোণার বরণে সেজেছে বড়ই সাজ ।

ঔষারে তুষিতে তাই বৃষ্টি ফুল ফুটিছে কানন-মান্ন ।

চুপি চুপি আসি পশন তার

পরিমল ল'য়ে যায়,

পাশনে বৃষ্টি ঔষারে তুষিতে চায় ॥

৩

মাথাটি নাড়িয়া কুহুম স্রবরী ধিক্ ধিক্ বলে তার ।

বলগান বায়ু না মানে বারণ—হেসে ফুলে ফুলে দায় ।

তাহার পীড়নে মধুপাগ

মধুপান আশা ছাড়ি,

অন্য ফুলে মধু যেতেছে পিঁইতে বাতাদের গালি পাড়ি ॥

৪

পানীয়া উঠেছে, ডালেতে বসেছে, ছেড়েছে মধুর তান ।

ভাগ্যি সকলে ;—দেখিয়া জুড়াও বিভুর মহিমা প্রাণ ।

মহান অটবী উর্ধ্বে তুলি মাথা

দেখিতেকে বহু দেশ,

বাহ নাড়ি ঘেন বলিছে “সকলে ছাড়হ ঘুমের বেশ ॥

৫

নদীর উরসে মরাল মরালী শ্রেনীশক হয়ে চলে ।
উষা আসিয়াছে মুক্তাহার নদী পরিয়াছে যেন গলে ।

হৃদয়ে আনন্দ উছলি উঠে

তাই বারি তার ছোটে

হৃদয়ে আনন্দ রাখিতে পারে না তাই অত ঢেউ ওঠে ।

৬

চারি দিকে যেন হাসিছে সবাই কেহই বিরস নাই ।
আহা ! উষা তোর কোমল বয়ান হেরেছে বৃষ্টি বা তাই ।

(তোর) কোমল পরাণ দ্বার হৃদয়

কে না তোরে ভালবাসে !

(তাই) অচেতন জীব সচেতন হয়ে এসেছে তোমার পাশে ।

৭

উঠিল ধরনী সাজিল সুসাজে পরিল ধবল বাস ।
মাথার উপরে কনক কিরীট ধীরে হ'ল পরকাশ ।

হাতেতে পরিল সুবর্ণ বলয়

তটিনী নদীর তরঙ্গ ছলে

শিশিরের বিন্দু, মুক্তার হার সাধরে পরিল গলে ।

৮

উভয়ের পানে উভয়ে তাকারে হাসিল মধুর হাসি ।
কি মধুর প্রেম বহিয়ে গেল রে উখলি আনন্দ রাশি ।

ক্রমে উষাবালা "বাই বাই" বলে

বিদায় লটল অই ;

হাসি মুখে ধরা অমনি কহিল "ভুলনা আমারে সই ।"

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেন ।

“কেন ও কেমন।”

মাহুঘের স্বভাব, সে সকল কথারই একটা ‘কেন’ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না। বাল্যকাল হইতে বার্কীয়া পর্য্যন্ত, মাহুঘ সকল অবস্থায় জিজ্ঞাসা করে ‘কেন’? বাহা জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যময় শক্তিবিকাশ দেখিয়াই হউক, আর, অন্তর-সমুদ্ভূত চিন্তা-ভরজ দেখিয়াই হউক, মাহুঘ স্বভাবতঃ জিজ্ঞাসা করে ‘কেন’? এই ‘কেন’-পরায়ণতা মাহুঘের স্বভাব। আমরা আজ এই ‘কেন’-পরায়ণতা, এই ‘কারণামুসন্ধিৎসা’ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতেরা বলিয়া আসিতেছেন যে এত ‘কেন’ জিজ্ঞাসাবৃত্তিই মাহুঘের বিশেষত্ব। এই বৃত্তিই, মাহুঘকে নিকট পশু-দিগের অপেক্ষা স্লেষ্ঠ পদবী দিয়াছে। এত বৃত্তিট, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলভূত কারণ, এত বৃত্তিই সকল প্রকার উন্নতির মূল। এবং মাহুঘ যে আজ জগতের নিকট শক্তি সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপনায় স্বয়ংসম্বলি সাধন করিতেছে তাহারও মূলে এত বৃত্তি। যেমন এত ভাবটি পণ্ডিতদিগের মধ্যে বরাবর দেখা গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপরীত ভাবেরও আশ্রয় আমরা সর্বদা অহুত্ব করিতেছি। সেই ভাবটি পূর্বোক্ত কেন-পরায়ণতার প্রতি বিদেহ। যেমন একদল পণ্ডিত এত বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া জগতের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ আর এক দল লোক বরাবর এত কারণত্বকার উপর গালি বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। কবিদের মধ্যে অনেকেই শেখোক্ত দলের লোক। ইহঁরা বলেন, ‘ভাঙি হে, কি জন্য মিছে ‘কেন কেন’ করিয়া দাঁড়িয়া মরিতেছ, কেন’র কোন উত্তর নাই। থাকিলেও তাহা জানিয়া দুঃখ বট স্বর্থ বৃদ্ধি হইবে না। দেখ ঐ চন্দ্রকরমাত কুহুম ভলির হাসিতে কুহুম উদ্যান কেমন আলোকিত হইয়াছে; শোন, ঐ প্রভাতবায়ুর স্পর্শে কেমন পাখি গুলি ডাকিতেছে, জিজ্ঞাসা করিও না ‘কেন’। বালক বালিকার মধুর হাসির মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে, সুবহীর ত্রীড়াসম্পৃচিত হাব ভাবের মধ্যে যে মার্ধ্য আছে, তাহা

যদি সন্তোষ করিতে চাও, তবে ভাই, তোমার ‘কেন’ তুলিয়া রাখ। বিবেচন করিবার ইচ্ছা সম্বরণ কর। পৃথিবীর গৌন্দর্যের সার, তার কি-ধেন-কেমনটুকু, যেই তুমি সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ আরম্ভ করিবে সেই তাহার প্রাণ বাহির হইবে।

এইরূপ কথা যে কেবল কবিদের মুখেই শোনা যায়, তাহা নয়। ধর্ম্ম অগতের কল্পাদিগেরও মধ্যে এই কথা স্তম্ভিতে পাওয়া যায়। Mysteryর উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত। অগতের মূল রহস্য ভেদ করিলে, আর কেহ ঈশ্বর মানিবে না। ইহারা বলেন যে অগতের মূলে এক অন্তর্দা রহস্য আছে, সেখানে জ্ঞানের রাজত্ব শেষ হইয়াছে, আর বিশ্বাসের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। সকল কেন’র শেষে এক কেন আছে, যে কেন’র আর কোন উত্তর নাই। মানুষের সকল জ্ঞানের সীমা এই ধানে, এর পরই সব অন্ধকার। মানুষ যতক্ষণ তার কেন’র উত্তর পায়, যতক্ষণ সে বুদ্ধিতে পারে, ততক্ষণ সে ঈশ্বরের কথা না জানিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু শেষ যখন তাহার জ্ঞানের সীমা দেখিতে পায়, যখন তাহার জ্ঞানালোকের চারিদিকে অন্ধকারের বাহু অনন্তবিস্তৃত দেখে, তখনই সে ভগবানকে ডাকে। তিনি এ রাখোও তাঁহার ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রদীপটী লইতে চান, তিনি নাস্তিক। সকল নাস্তিকতার মূল এই ধানে—যাহা জানিবার নয় তাই জানিবার ইচ্ছা।

আরও এক দল লোক আছেন এবং ইহাদের সংখ্যা বৈজ্ঞানিক অগতে মিতার কম নয়, তাহাদের মতে, মানুষ একেবারেই কোন বিষয়েরই ‘কেন’ জানিতে পারে না। আমাদের জানিবার ক্ষেত্র—‘কেমন’। কোন কণার ‘কেন’ আমরা বলিতে পারি না। জানিবার চেষ্টা বিফল। বিজ্ঞানের কার্য্য কেবল কেমন করে তার পর কোন ঘটনা ঘটল, তার সঙ্গে কেনটা থাকে, এই সকলের নির্ণয় করা। কারণ থাকিলেই কার্য্য হয়, আঙুলে হাত দিলে হাত পোড়ে, দেখিয়াছি, তাই জানি। কেন কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, আঙুলে হাত পোড়ে এ সকল প্রস্তের উত্তর নাই। মানুষ অগভাবস্থার(theological and metaphysical stage)এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং তাহার উত্তর প্রাপ্ত করিত। কিন্তু এই positive stage)এ আর এ সকল প্রশ্ন লইয়া লাড়া চাড়া চইবে না। ইহাদের মোট কথা এই যে দেশ

এবং কালগত ঘটনা-শ্রেণীর বেশ এবং কাল গত সম্বন্ধ বাতীত অন্য কোন রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান আমাদের পক্ষে অসম্ভব । কোমৎ এই মতের অট্টা না হইলেও আধুনিক জগতে তিনি এই মতের প্রধান শিকাগুরু । এট কেন-বিরোধী মত আরও এক ভাবে দার্শনিক জগতে প্রচলিত আছে । ইহাদের মতে সকল প্রকার জ্ঞানের মূল্যেট, কতকগুলি মূল সত্য আছে, যেগুলির দ্বারা আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইলেও তাহাদের আর ব্যাখ্যা নাই । এই মূল সত্যগুলির সম্বন্ধে কেন বিজ্ঞানী বিভ্রম । কেন আমরা বিশ্বাস করি বাহ্যজগৎ আছে, কেন বিশ্বাস করি আমি আছি ; এ সকল প্রশ্নের উত্তর নাই । যুক্তিতর্ক এতখিনে শেষ ।

এই যে কয়েকটি মতের কথা বলা গেল, তাহাতে কোন না কোন ভাবে একই কথা বলা হইতেছে যে 'কেন'র উত্তর নাই । যিনি যে ভাবেই বলুন না কেন, সকলেই এক কথা বলিতেছেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি অজ্ঞান । এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে এই 'কেন'-বিজ্ঞান-বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি, এবং যখন বলি যে 'কেন'র উত্তর নাই, তাহা-ই বা শেষ অর্থ কি দাঁড়ায় ।

সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন, যে অর্থশূন্য প্রশ্ন বলিয়া একটা কিছু সংসারে আছে । ক-ক, ইহার কারণ কেহ বিজ্ঞানী করে না । বিজ্ঞানী করিলে আমরা তাহাকে বাতুল মনে করি । এই সম্বন্ধে যদি একটু ভালোইরা বুঝিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি কি অন্য একধানে আর 'কেন' থাকে না । যাহারা বলেন যে অনেক 'কেন' আছে তাহার কোন উত্তর যাহুব দিতে পারে না, অথবা কোন 'কেন'ই উত্তর আমরা দিতে পারি না তাহারাও স্বীকার করেন এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে যে বোধ 'কেন'র কোন উত্তর আমরা দিতে পারি না তাহা , অধিকন্তু সেখানে 'কেন'র কোন মানে নাই । কেন সেখানে অসঙ্গত প্রশ্ন (irrelevant) । তবে এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, কোথায় 'কেন' অসঙ্গত; কোথায় আর আমরা কেন বিজ্ঞানী করি না । আমরা প্রথমে আমাদের উত্তরটি দিব, তারপর সে উত্তরটি ব্যাখ্যা করিব । উত্তর এই যে, যে সকল জ্ঞান গত সম্বন্ধ বোধিতে পাই সেখানে 'কেন'র আর কোন নাই ।

জ্ঞানসত্ত্ব সম্বন্ধ বলিলে কি বুঝি? এট শব্দের উত্তর দিতে হইলে আমাদের একটু দার্শনিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—জ্ঞানের ভিত্তি সম্বন্ধে একটু বিচার করিতে হইবে। আমরা পূর্বে এক বলে বৃত্তান্তে চেষ্টা করিয়াছি যে, জ্ঞানের অর্থ শেষ দাঁড়ায়, সম্বন্ধ। কোন একটা জিনিসকে জানিতে হইলে তাহার সঙ্গিত সম্বন্ধ অপর অনেক জিনিষকে জানা দরকার। এই যে একটা বৃক্ষ আমার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহার জ্ঞানকে যদি বিশ্লেষণ আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে দেখিব তাহা কতকগুলি সম্বন্ধ প্রণী (relation) ব্যাভূত আর কিছু নয়। প্রথমতঃ বৃক্ষটির দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি বুঝিতে হইলে, অপরায়ণ বৃক্ষের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি বোঝা দরকার। বিস্তৃতি অনন্ত। এক হাত বলিয়া একটা প্রাকৃতিক মাপ নাই। যখন বলি একটা গাছ ১০ হাত, তখন এই বুঝায় যে, আর একটা জিনিষ, যাকে আমি ১ হাত বলিতে সম্মত হইয়াছি, এ গাছটি তার ১০ গুন। বৃক্ষটির অপর্য একটা রং আছে, সে রংটির জ্ঞানের পক্ষে, অন্য রঙের জ্ঞানের প্রয়োজন। এইরূপে বৃক্ষটির প্রত্যেক গুণকে জানিবার পক্ষে তাহার সঙ্গিত সম্বন্ধ অপর অনেক জিনিষের জ্ঞান আবশ্যক।

এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের সকল জ্ঞানের মূলে দুই প্রকার সম্বন্ধ আছে। কোন ভাববিশেষের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে, এ ভাবটি আর একটা ভাবের মত, দ্বিতীয়তঃ এটি আর একটা ভাবের বিরুদ্ধ। এট সমীকরণ এবং বিভিন্নীকরণ (identity and difference) জ্ঞানের মূল। এট যে দুই প্রকার দিয়া, ইহাদের সম্বন্ধে ‘কেন’ খাটে না। এখানে ‘কেন’ এবং ‘কেনন’ এক। জ্ঞানের অর্থই এই দুই ক্রিয়া, এবং জ্ঞান নিজের আলোকেই নিজে প্রকাশিত। ইহাদের ‘কেন’ বুঝিতে হইলে ইহাদেরই সাহায্যে বুঝিতে হইবে। সমীকরণের অর্থ বুঝিতে হইলে সমীকরণ এবং বিভিন্নীকরণের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে। সমীকরণ কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে হইলে, সমীকরণ কিসের মত আর কিসের মত নয়, তাহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞানকে বুঝিতে হইলে জ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন। অথবা জ্ঞান নিজেই নিজেকে বুঝায়, তাহার ‘কেন’র উত্তর সে নিজে। এখন দেখা পাউক যে পূর্বোক্ত দুই

একটি ক্রিয়া বাস্তব জ্ঞানের অপর কোন ক্রিয়া আছে কি না। আমরা পূর্বে এক প্রস্তাবে ইহা বর্ণিতছি জ্ঞানের ক্রিয়া অসংখ্য।—মিলপ্রমুখ ইংলণ্ডীয় দার্শনিকগণ যদিও পূর্বোক্ত দুই প্রকার ক্রিয়াতেই জ্ঞানের জীবন দেখেন, তথাপি আমরা সে প্রস্তাবে বর্ণিতছি যে অর্থান দার্শনিকগণকে অগ্রসর করিয়া আমরা দেখিতে পাউ যে জ্ঞানের সম্বন্ধ অসংখ্য। এই অসংখ্য সম্বন্ধগুলির বিষয়েও পূর্বোক্ত মূল সম্বন্ধ দুইটি বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা খাটে। ইহারাও বীর আলোকের প্রকাশিত। ইহাদেরও 'কেন' নাই। ইহাদের বোকা অর্থেও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বোকা ব্যতীত আর কিছু নয়। পূর্বোক্ত মূল দুই সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য কারণ, বিষয় বিষয়ী প্রভৃতি সকল প্রকার সম্বন্ধ গুলিই জ্ঞানের জীবন এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধেই পরস্পরকে বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানের সমগ্র জীবন সম্বন্ধেই একটা খাটে যে, জ্ঞান সম্বন্ধের 'কেন'র উত্তর জ্ঞান। এখানে যে 'কেন'র উত্তর নাই, তা নয়, হবে এখানে আর কেন বিজ্ঞানী করিতে হয় না। কেন বিজ্ঞানী কোন সম্বন্ধ নাই। কোন একটি বিশেষ জ্ঞানক্রিয়াকে বুঝিতে হইলে তাহাকে জ্ঞানের অপরাপর ক্রিয়ার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, এবং সেই পরস্পরের সম্বন্ধ জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না।

পূর্বোক্ত কথাগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষে তত বোধগম্য হইল কি না, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তাই সেই জন্য আমি কথটা আর এক ভাবে দুবাইতে চেষ্টা করিব। কেন-বিরোধীপদের মধ্যে আমি শেষে এক দলের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের মতের সহিত তুলনা করিলে আমাদের কথাটা অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। তাহারা বলেন জ্ঞানের মূল স্বরূপ এমন কতকগুলি সত্য আছে যাহাদের সম্বন্ধে 'কেন' প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাদের 'কেন'র উত্তর নাই। আমরা বলি যে, হাঁ, জ্ঞানের মূল স্বরূপ কতকগুলি সম্বন্ধ ক্রিয়া আছে, যাহারা জ্ঞান হইতে বিভিন্ন নয়, বস্তুতঃ তাহাদের লটয়াই জ্ঞান এবং এই সম্বন্ধ সকলের 'কেন'র উত্তর তাহারা নিজে। 'কেন'-বিরোধী বলেন, জগৎ আছে ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য তাহার কোন কারণ দেওয়া যায় না। আমরা বলি এ বিশ্বাসেরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন; এবং সে ব্যাখ্যার অর্থ জ্ঞানের অন্যান্য ক্রিয়ার সহিত ইহার

সম্বন্ধ প্রদর্শন। যাহা হউক, গোটের উপর আমরা এতক্ষণে দুইতে পারিলাম। জ্ঞান (reason) নিজে নিজের ব্যাখ্যা। সে স্বপ্রকাশ। যখন কোন সম্বন্ধকে আমরা এই জ্ঞানের সম্বন্ধ বলিয়া জানিতে পারি, তখনই আমাদের কারণ ভিজ্ঞানাবৃত্তি সম্ভূত হয়।

এতক্ষণ আমরা কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞানের দিক হইতেই কথা শুলা বলিয়াছি। এখন কিন্তু আর এক দিকে দৃষ্টি করা প্রয়োজন হইতেছে। এ কথা ঠিক যে, অগতঃ কেবল আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে না, তুমি আমি থাকি আর না থাকি, অগতঃ থাকিবে এবং তাহার অন্তর্গত সম্বন্ধ সকলও থাকিবে। সে সকল সম্বন্ধের কথা আমরা এতক্ষণ বুঝিতে ছিলাম, আর এক ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারি, যে সে শুধি কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের সৃষ্টি নয়। সেই সকল সম্বন্ধ জগৎ জগতের মধ্যেও আছে। একটা জিনিষ যে আর একটা জিনিষের মত। এ কেবল আমরা এইরূপ ভাবি বলিয়াই নয়, সে জিনিষ দুইটার মধ্যে বস্তুতই সেইরূপ সম্বন্ধ আছে। অথবা আমরা কেবল জগৎস্থিত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করি মাত্র। অতি প্রাচীন কাল হইতে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে যে, *like can only know the like*—কথাটা নানাবিধ হইতে নানা ভাবে আক্রান্ত হইলেও মূলে সত্য। অগতঃ যে আমরা জানি, যত অল্পই জানি না কেন, এ যে বিদ্যুৎ পরিমাণেও জ্ঞানের সহিত মিলিতে পারে, তাহার অর্থ এই যে জগতের মূলে জ্ঞান আছে। এই জন্য বলা হইয়াছে, ‘*the understanding which conceiveth nature also maketh nature.*’

এইবার আমরা আমাদের সেই গোড়ার প্রশ্ন বুঝিতে পারি। যাহারা বলেন যে ‘কেন’র উত্তর আছে, তাঁহাদের কথার শেষ অর্থ এই দাঁড়ায় যে, জগতের মূলে জ্ঞান বিরাজমান। আর যাহারা বলেন ‘কেন’র উত্তর নাই তাঁহাদের কথার শেষ অর্থ এই যে জগতের মূলে জ্ঞান নাই। যিনি যে পরিমাণে জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে জ্ঞানের কার্য দেখিতে পান, তিনি সেই পরিমাণে জগতকে বোঝেন, সেই পরিমাণে তাঁহার ‘কেন’-ত্বকার পরিভূক্তি হয়।

অবশ্য যাহারা বলেন যে আমাদের সকল 'কেন'র উত্তর আছে, তাঁহারা একথা বলেন না যে সকল কথাই 'কেন' তাঁহারা জানেন। তাঁহারা বলেন উপযুক্ত অবস্থায় সকল কথাই জানা যায়—অগতে একেবারে অজ্ঞেয় (absolutely unknowable) কিছুই নাই। অগতের সকল স্থলে জ্ঞান তত পরিষ্কৃট না হইতে পারে; নানা দানে জ্ঞানের বিকাশের পরিমাণ নানা প্রকার, কিন্তু অগতে এমন কিছুই নাই যাহাতে একবারে জ্ঞান নাই। যেখানে যে পরিমাণে প্রাকৃতিক বিকাশ দেখানে সেই পরিমাণ জ্ঞানজীবন পুরুষের বিকাশ। আমাদের 'কেন' জিজ্ঞাসার শেষ নাই, এই জন্য যে, অগতের বৃদ্ধিত জ্ঞানের সম আমরা একেবারে পুনরাবৃত্তি করিতে পারি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য, আমাদের সকল জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ এক মহাজ্ঞান অগতের আধারস্বরূপ বিরাট করিতেছেন, যাহার জীবনে 'কেন' আর 'কেমনের' বিবাহ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। জ্ঞানের ক্রিয়াই স্বষ্টি ক্রিয়া।

বিপরীতবাদীদিগের কথা সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বাইবে।

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আকনাদি ।

অনান্য—পাঠা, আগুবে, নিম্বকো। লতা বিশেষ। ইহার পাতা গোল, পুষ্প কঠিন, ফল ক্ষুদ্র, ওচ্ছাকৃতি। ইহা তিল, ওল, উক। মৃত্তকর বলকারক, ঈষৎ রেচক। বাত, পিত্তজ্বর, শূল, বমন, কুষ্ঠ, অতিসার, ক্রোধান, দাহ. কণ্ঠ. বিষদোষ, কৃমি, শুণ্ড ও ব্রণাদি রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল বাটিয়া গোমুত্ৰ সহ পান করিলে নরকপ্রকার

নিষপীড়া নিবারণ হয় । চেলোনী জলে পিষিয়া মধুসহ সেবনে, দেহান্তর্গত বিপ্রধি (কোড়া) আগ্রাস হয় । ইহার পাতা ত্রণ শোধে বাধিয়া রাখিলে, যাতনা নিবারণ হইয়া, উহা শীঘ্র পাকিয়া উঠে । -ঋতু ঝানের পর ইহার পাতা, জলের সহিত বাটিয়া খাইলে নারীদিগের গর্ভসংকার হয় না ।

আখরোট ।

অন্যান্য—ফলশেখ, মধুমজ্জা, বৃহচ্ছদ । পর্কণ্ডজাত বৃহৎপত্র বৃক্ষ বিশেষ । ইহার ফলই সচরাচর ব্যবহৃত হয় । ইহা মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধকর, বলকারক, কফবর্ধক, বাতপিত্ত ও রক্তদোষ নাশক ।—অত্যন্ত কামোদ্দীপক ।

আতা ।

অন্য নাম—আতুপা, গণ্ডগাত্র, সরিফা । খনামধ্যাত বৃক্ষ বিশেষ । ইহার সুপক ফল বড়ই তপ্তিজনক, স্নিগ্ধকর, বাত, কৃমি, হৃদয় ; বল ও মাংস বর্ধক, রক্তপিত্ত, প্রদাহ ও বাতনাশক । ইহার পাতা তিক্ত, মধুর ও কফ পিত্তহারী । ইহা বাটিয়া লেপ দিলে বিষদোষ, ছুটত্রণ, বিস্ফোটক, বীৰ্যপ ও কুষ্ঠ রোগের উপশম হয় । ভীষ্মক্ল বা বোল্ডার দংশন করিলে, দষ্ট ঝানে আতার পাতা রগড়াইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয় ।

আতর ।

গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্প এবং চন্দ্রনাথি সুগন্ধ পদার্থ সমূহ হইতে আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে । গাজিপুরের গোলাপী আতর বিশেষ প্রসিদ্ধ । এরূপ মনোরম সুগন্ধ দ্রব্য আর আছে কি না সন্দেহ । শৈত্য বা অগ্নির দৈহিক উপকারিতা ওপে, ইহা ইয়ুরোপীয় সুগন্ধি দ্রব্য সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ । প্রচ্যুত সমস্ত ইয়ুরোপীয় গন্ধ দ্রব্য অপেক্ষা ইহার সৌরভও অধিকক্ষণ স্থায়ী ।

বিলাসী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই আতরের ব্যবহার অধিক । ইহা দ্বারা চূর্ণক নষ্ট হয় । অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট ঋদ্যের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কাণ পাকিলে ইহা অল্প মাত্র তুলার সহিত মাখাইয়া কর্ণরকে প্রবেশিত করিয়া রাখিলে, আশ্চর্য উপকার হয় । চন্দনী আতর ১০ ফোটা, অর্দ্ধ ছোটাক গঁদ তিমান জলের সঙ্গে মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্রের জ্বালা ও মেহ-

জনিত ভরল শাহু-জাব আত নিধারণ হয়। ইহা মূত্রনাশের ঔষ্ণিক ঝিরি
উল্লেখক ও মূত্রকর।

আতিস।

অন্য নাম—আটৈচ, আতইষ শ্যামকলা, তম্বুরা, দিমা। ক্ষুদ্রকল
বিষাক্ত রূপ বিশেষ। শুক্ল, কৃষ্ণ ও অকৃষ্ণ বর্ণ ভেদে ইহা ত্রিবিধ। ইহার
মূল এক বা দেড় ইঞ্চি লম্বা। সহজে ভাঙা যায়। অতিশয় তিক্ত, ঈষৎ
সংকোচক, গন্ধবিহীন। গবল জরস্ব, পর্ণায়নিবারক, পাচক, বলকারক।
কফ-পিত্ত-বিকার, আমাতিসার, কামি, কৃমি, বিষপোষ, ও বমনাদি রোগে
ইহার কার্যকারিতা বারবার পরীক্ষিত হইয়াছে। জরাস্তে দৌর্দল্য
নিবারণার্থে ইহা ব্যসহার করা যায়। পালাজর ও মনিরাম জরের ইহা উৎকৃষ্ট
ঔষধ। জরের মধ্যবস্থায় ইহার চূর্ণ ৬রতি মাত্রায় পাতোক ২।৩ ঘট্টা অন্তর
৩৪ বার সেবন করাইলে জ্বর আসা বন্ধ হয়। আতিসচূর্ণ ৩রতি মধুর
মহিত মিশাইয়া সেবন করিলে কাশজ্বর ও বমি নিধারণ হয়।

আনারস।

ইহা অত্যন্ত স্নিগ্ধকারক, আধেয়। যন্ত্রণের মধ্যে অধিক পরিমাণে রক্ত
সঞ্চিত হইলে, স্থপক আনারস সেবনে মহোপকার হয়। পাকা আনারসের
রস পান করিলে কামল রোগের উপশম হয়। আনারসের পাতার রস ও
চুনের জল প্রত্যেক ১তোলা, একত্রে মিশাইয়া পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়।
আনারসের পাতার রস অথবা পাকা আনারসের রস ১০ একছটাক লইয়া,
তাহাতে অল্প মিষ্টারি ওঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে, প্রবল হিকা ও বমি
নিধারণ হয়।

আম আদা।

পরম কটিকারক, আধেয়, বায়ুনাশক। ইহার গন্ধ আন্তের মত।
অজীর্ণ রোগে অধিক ব্যবহৃত হয়। সচরাচর আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা
কাঁচা পেঁপে ও তেঁতুলাদি অল্প দ্রব্য সহযোগে ইহার উৎকৃষ্ট অমূল প্রস্তুত
করিয়া খাটেন।—ইহার অন্য নাম আত্ম-গছা, আত্ম-হরিজা, কপূর-
হরিজা।

ক্রমশঃ

ঐশ্বরকর রায়, কবিরাজ।

সমালোচনা ।

মিত্র বিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী—৮রাজকুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত । রাঙ্গকুমার বাবু অর্ঘ্যদানে গিয়াছেন ; কিন্তু তিনি মর্ত্যলোক হইতে পিছির হইতে পাবেন নাই । অনেকের সহিত তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছেন । তিনি মরিয়া পর্ণে মর্তে একহস্তে স্থাপন করিয়াছেন । সানিহী লাইব্রেরী সেই হৃদের একটি অংশ । লাইব্রেরী স্থাপনাবধি তিনি ইতার সকল অমুঠানে যোগ দিয়াছিলেন । লাইব্রেরীর প্রত্যেক কার্যে প্রগাঢ় সহায়ত, পরম দৃঢ় প্রকাশ করিয়াছিলেন । আমরা—লাইব্রেরীর সভ্যগণ—তাঁহার স্বর্গ কখনও পরিশোধ করিতে পারিব ? আমরা বাব-জীবন তাঁহাকে অরণ-মন্দিরে পূজা করিয়া তাঁহার অশেষ গুণগান—বাল্যলীল জন্য, বঙ্গাণা সাহিত্যের জন্য, দেশের জন্য তিনি কতদূর করিয়াছেন, তাহাই প্রবর্ণন করিয়া তাঁহার স্বর্গের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব । সেই জন্যই আমরা একে একে তাঁহার পুস্তকগুলির সমালোচনা করিতে মনস্ত করিয়াছি । প্রথমে “মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলীর” সমালোচনা করিলাম ।

রাজকুমার বাবু বিরূপ সরলহৃদয়, বিরূপ অসাময়িক, বিরূপ বেহাশীল লোক ছিলেন, মিত্রবিলাপে তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায় । সংসারে প্রকৃত বন্ধু মিলা বড় কঠিন ; প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা । যে বন্ধুর জন্য তিনি এরূপ বিলাপ করিয়াছেন, সে বন্ধু এক জন ভাগ্যবান লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই ।

তিনি মিত্র সহবাসে যে যে সময় অতিবাহিত করিতেন, যে সব স্থানে ভ্রমণ করিতেন, মিত্রের সহিত যেখানে একত্র অবস্থান করিতেন, সেই সেই সময়, স্থান ও অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি কাদিয়াছেন । এক এক সময়ে যেন হৃদয়ের শোণিত উচ্ছসিত হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়াছে ।

মিত্র বিলাপ বাতীত টহাতে “বৌদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ” “নিশাকালে বিহঙ্গমরব” প্রভৃতি চৌদ্দটি অন্যান্য কবিতা আছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মিত্র-বিলাপের সহিত এ কবিতাগুলির কি সম্বন্ধ? কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে। তাঁহারা দেখিবেন, এই সকল কবিতার একোক্তিতে জন্মের গভীর দুঃখ অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, প্রতি কবিতার বিষাদের কাগিমা-ছায়া পড়িয়াছে। কবিতাগুলি স্নানরূপে মিশ্র হইয়াছে, কবি বেতলা নহেন।

পুস্তকের কবিতাগুলি অনেক প্রকার ছন্দে লিখিত। বর্ণনা অতি সুন্দর ও মনোহর; প্রায় সমস্ত কবিতা ললিত ও প্রাঞ্জল।

আমরা যে সংস্করণ সমালোচনা করিতেছি, তাহা ৪র্থ সংস্করণ, ১২৮১ সালে মুদ্রিত। আশা করি, এই বারো বৎসরে ইহার তিন চারি বার সংস্করণ হইয়াছে। এ পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিলম্ব উপযোগী। ছাত্রগণ ইহাতে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা ও বিশুদ্ধ আশ্রয় লাভ করিবেন। বিবিধ ছন্দে লিখিত একরূপ উত্তম কবিতাপুস্তক তাহাদের কবিতা রচনা শিক্ষাপক্ষে অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমাদের বিশ্বাস, স্কুল-বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়গণ নানাস্থানের বিদ্যালয়ে পাঠার্থে এ পুস্তক মনোনীত করিয়া থাকেন, এবং বণাধার করিবেন। যুবক ও শ্রোতৃগণও এ পুস্তক পাঠে অল্প অমোদ ও শিক্ষা পাইবেন।

উপহার। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। এখানি কবিতা-পুস্তক। সকল গুলিই গীতি-কবিতা। বাঙ্গালার গীতি-কবিতার অন্তর আজ কাল বাড়িয়াছে। আদর বাড়ি উঠিত। কিন্তু অনেকে এ ভেতিলতা খীকার করেন না। Subjective Poetry ও Objective Poetry দুইটা আজ কাল একটা দলাদলির মহা ঘোঁট চলিয়াছে। সেই দলাদলিতে মাতিয়া আপনার মত বঝার করিবার জন্য কোন কোন সমালোচকশ্রেষ্ঠ লেখক ডামনি Shelleyকে Byronএর সেজ বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। অথচ সেলি যে ব্যঙ্গরূপে কত ভিন্ন প্রকৃতির—কত উচ্চদের—প্রাণ সেই দুই কবির বন্দনীয়গণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু, সে সব অনেক কথা।

এ ছন্দ পুস্তকের সমালোচনায় তাহার উল্লেখে কাজ নাই। তাহা অন্য-
বশাক বলিও-ছিন্নান, গীতিকবিতার আদর আর কাল বাড়িয়াছে
লক্ষন্যো, অলক্ষন্যো অনেক কবিই আর কাল বাঙ্গালীর স্বভাবগত
চিন্তায় সেই কিছুটা খাপসজে আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।
বোংগের গীতিকবি বা ভাষাতাত্ত্বিক দীপকের করতল বাঙ্গালীর কণিকণে আসে
না। বুলি চেষ্টা করিলেও ভাল শুনায় না। নগেন্দ্রবাবু একজন অলক্ষন্যো
কবি; ইহার এ “উপহার” গীতি-কবিতায় রচিত। উৎসর্গ পত্রে
বলিতেছেন—

“সংসারের পথে পথে চলিতে চলিতে ভাই,
মাকে মাঝে যে গান শোনেছি,
লগ্নে পোটাকত হার গেঁথে একখানা পাতে,
উপহার তোমাকে দিতেছি।”

গীতি-কবিতা নিমিত্ত নগেন্দ্রবাবু ক্ষমতা আছে। কিন্তু আজও
পারদর্শী হন নাই। পুস্তকের শলাটেই তিনি যে Thomas Wyatt হইতে
কৃত্যিয়াছেন—

“Blame not my Lute ! for he must sound
Of this or that as liketh me.”—

ইত্যাদি—তাঁরা যত্নেও আমবা বলিতে বন্দা, তাঁহার লেখার নিন্দা করি না
বটে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবু অতটা অমুকরণ না করিলে ভাল হইত। তাঁহার একটু
ক্ষমতা আছে, তিনি না করিয়া পারিতেন। অতি ছোট ছোট কপাল বেশ
ছন্দ ছন্দর ভাব বর্ণনা করিতে তিনি সক্ষম।

বিমুক্ত বেণীবন্ধন নাটক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য
আট আনা। ঘোষ কবি পুস্তকখানি সংস্কৃত বেণীবন্ধন নাটক অবলম্বনে
রচিত। বেণীবন্ধন নাটক মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া লিখিত।
যুধিষ্ঠির পঞ্চাশ চাহিয়া দুর্গোদধনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সন্ধি প্রস্তাব
করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন। এই খান হইতে নাটক
আরম্ভ। মহাভারতে লিখিত আছে, বিরাটরাজ্যে থাকিয়া পঞ্চপাত্তব
শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছিলেন, এবং সেই স্থানে তৎপক্ষীয় রাজন্যবর্গের

সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কবির ভট্টনারায়ণ এবং আমাদের আলোচ্য নাট্যকার উভয়েই সেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবর্ত কাজ করিয়াছেন। একজন হস্তিনার আর একজন উজ্জয়িনীর কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যে হর্ষোদ্যনের নিকট পাঁচ খানি গ্রাম ভিক্ষা চাহিয়া সন্ধি প্রস্তাব করিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করা হইয়াছে, প্রস্তাবের ফলাফল জানিবার পূর্বে আপনাদের প্রাণা বিষয় স্থির না হইতেই পাণ্ডবগণ সেই হস্তিনাপুরে হর্ষোদ্যনের রাজধানীতে আসিবেন, ইহা যৎ যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। উজ্জয়িনীর ত কথাই নাই। প্রারম্ভিক পঞ্চখানি গ্রামের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্ত এক খানি। অতরাং পূর্ন হইতে তাহা যুদ্ধটির মত ব্যক্তির লখল করিয়া বসিয়া থাক। কিরূপে সম্ভবে বৃত্তিতে পারিলাম না।

উঃর থিয়েটারে যে “গীতাবলী” নাটক অভিনীত হয়, তাহার নীতাকে যখন রচনা করিতে আসে, তখন সে নীতা প্রথমতঃ সূক্ষ্মিত এবং সূক্ষ্মিতঃ তা রাস! হাঁ লক্ষণ! বলিয়া ক্রন্দন করিলেন না, তিনি রাবণের সহিত এক প্রকার মলমুক্ত আরম্ভ করিলেন। বাস্তবিক প্রঃক এই খানেই হইল। বিমুক্ত বেণীবন্ধন গণেশও দ্রৌপদীকে জানে স্থানে আর কালচার বঙ্গীয় ললন'গণের ন্যায় উচ্ছ্বাস ও প্রগল্ভা করিয়াছেন। মহাভারতে বনপর্বে যে দ্রৌপদী কামাবনের কুটীরে বসিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম দুইটাই চর্চোদ্যনের বিবর্তে উত্তেজিত করিতেছেন এবং কথোপকথনকালে প্রকৃত পক্ষি-অনুগতা ভাষণের মত কত বিনয়ে, কত নম্রতার সহিত সেই সব কথা বলিতেছেন, নগেন্দ্র বাবু সেই দ্রৌপদীর মুখ হইতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেক্রপ ভীত শ্লোহোক্তি সকল উচ্চারণ করাইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, পূর্ন কালের মহাকাব্যগণ যাহা করিয়াছেন অবিকল সেই ভাবেই নিখিতে হইবে। মহাকাব্য ভবচ্ছতি স্থল বৃত্তান্ত মাত্র রাসায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়া নূহন ভাবে উত্তর চরিত্র নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার “ছায়া” সংস্কৃত গীতিভোজ্য এক অপূর্ণ সৃষ্টি। কিন্তু এক্ষণ সৃষ্টি-কৌশল কয় জন বঙ্গীয় কবি দেখাইতে পারিয়াছেন?

নাটকের একটা গুণ, দ্বিগুণ সফলের পূর্বসূরী। কিন্তু এ পুস্তকে স্থানে স্থানে তাহারও অন্যথ্যচরণ দৃষ্ট হয়। কৃত্যবত্ত্বের জন্য মহাক্রম দাবী করিতে নাগরগকে পৃথিবীর স্তব অসামান্যিক হইয়াছে। আমরা স্থানান্তরিত, লেখক কেন উচ্চ। পূর্বক এ দোষ করিয়াছেন। আজ কালকার দ্বিগুণের গুলিতে আশ্চর্য। মনোহর কৃষ্ণাপট দেখাইবার লোভ অতিশয় প্রবল হইয়াছে। সাংবাদিক বা অসাংবাদিক যে কোন উপায়ে ইহা প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থকার সাময়িক কৃতির অন্তর্গত হইয়া বহু পূর্বের ঘটনার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন।

প্রধান ঘটনার মধ্যে কর্ণের মুখ কাণ ও কৃষ্ণালিন বহু। এখানেও এক ঐতিহাসিক ভ্রম করিয়া কেনিয়াছেন। কৃষ্ণালিন কর্ণের পূর্বে ইহা চইয়াছিল, কর্ণের পরে নহে। বেণীসংহার নাটকে মহাভারতের কথাই আছে। এ পুস্তকে সে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ দেখিলাম।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবলম্বিত যে ভাষা ভাষার অঙ্ক-করণ করিয়াছেন, আমরা নাটকের সে ভাষার পক্ষপাতী নহি। সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে ইহা উপযোগী নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এক্ষণ ভাষার লিখিতে গিয়া গিরিশ বাবু যে সকল দোষে পতিত হইয়াছেন, নগেন্দ্রবাবুও সে সব দোষের হাত হইতে একবারে অব্যাহতি পান নাই। তথাপি তিনি স্থানে স্থানে যেরূপ উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করি। দুই একটা ছাড়া, গানগুলি বেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মরত্ন। শ্রীকানী প্রসন্ন ষটক (বিদ্যালঙ্কার) কর্তৃক সঙ্কলিত। হিন্দুধর্ম্ম আগাধ সমুদ্র, সেই সমুদ্রগর্ভে কত যে অমূল্য রত্ন লোকনয়নের অগোচরে অদৃশ্যভাবে মিহিত রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? যিনি বাহিরী বাহিরী সেই রত্নগুলির উদ্ধার করিয়া ডালি লাগাইয়া সাধাবণো উপহার দিতে পারেন তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্থ। ইংরাজি উচ্চশিক্ষার ধাধারণ বাহালী আপনার চক্ষের মাথা খাইয়াছে—এক দিনে, একটা কারণে তাহার এ অধঃপতন ঘটে নাই—এ সময়ে যিনি তাহার আপনার রত্নগুলি তাহাকে চিনাইয়া দিতে পারেন, তিনি অবশ্যই প্রশংসার পাত্র। আমরা

বিদ্যালয়কার মহাশয়ের যাবু উদ্যোগের প্রশংসা করি। নানা শাস্ত্র চর্চাতে তিনি এই গ্রন্থ সংকলন করিতেছেন। প্রথম খণ্ড যাক প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাচার ও বর্ণবিবেচনা—এই দুইটী বিষয় লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। বৈদ্য দুই অতি গুরুতর, অধিকার দিনে ইহার শাস্ত্রোক্ত মূলতত্ত্ব বাখ্যার বড়ই প্রয়োজন। বিদ্যালয়কার মহাশয় প্রথমতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া নিয়ে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছেন। অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আলোচনা ও বাখ্যা প্রাকিলে আরও ভাল হইত। এ যুক্তি ও তর্কের দিনে কেবল অনুবাদে ততটা কাজ না হইতে পারে।

সদবা দিদি। শ্রীহরিমোহন বাবু দ্বারা প্রবীত। এখানি উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসের যে যে গুণ পাকা আনন্দাক, এখানিতে তাহার অনেক অভাব। তবে, সম্মানে মন্দ নহে। উপকথা ও উপমাণ এ দুইয়ের অর্থ আজকাল আমাদের দেশে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর উপন্যাস-লেখক আজকাল অধিকাংশই এই জন্মাক্রান্ত। তাঁহারা লেখেন উপকথা, নাম দেন উপন্যাস। এতদ্বত্বের ভিন্নার্থতা বোকা সকলের উচিত। কিন্তু যখন এটা সাধারণ জন্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন একা হরিমোহন বাবুকে লটয়া পীড়াপীড়ি করা কর্তব্য নহে। হরিমোহন বাবু নিজে পাতিয়ালা কলেজের চেড মাস্টার, তিনি অ্যাকিয়াছেন একজন হেডমাস্টারের চিহ্ন; সুতরাং তাহা যথোপযুক্ত বর্ণকলিত হওয়াই সম্ভব। হইয়াছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার এতদ্বের নায়ক ব্রাহ্ম “মাস্টার বাবু” রবীন্দ্রনাথ, মাস্টার স্কুলের কলঙ্ক। একরূপ ভগ্ন ব্রাহ্ম ও শিক্ষককুলমানির চরিত্রের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি। বাস্তবিক, দেবীনাথ বাবুর ন্যায় যে সকল অদূরদর্শী সরলজন্ম গৃহস্থ আপনাদিগের পরিবার মধ্যে একরূপ অজ্ঞাতকুলশীল শিক্ষকদিগকে আশ্রয় দেন, তাঁহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যিক। হরিমোহন বাবুর গল্পটী বেশ হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে চরিত্রবিন্যাসের পারিপাট্য নাই, ঘটনার শৃঙ্খলা নাই, বর্ণনার অমূল্যঘটি নাই, লেখার কাষনা নাই। নহিলে, পুস্তকখানি এতদিন আনন্দের লাভ করিতে পারিত।

শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা ।*

ইহা এক খানি সংকৃত গ্রন্থ। গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় বলিতেছেন, “ঐমভাগবতের সারগ্রাহী অম্ববাদ করিবার জন্য আমার নিত্য বাসনা ছিল; কিন্তু এবস্থি বিপুল গ্রন্থের অম্ববাদ করণে আমার অবকাশ নাই। তজ্জন্য সম্প্রতি ঐ গ্রন্থের মূল ভাষ্য অম্বলখন পূর্বক প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা গ্রন্থ রূপে সংগ্রহ করিলাম।” অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ সংহিতাকে এক অর্থে সারগ্রাহী বা আধ্যাত্মিক ভাগবত বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্মেরও আনুষ্ঠানিক বিচার করা হইয়াছে। এবং সর্বশেষে কেনার বাস্তু উপক্রমণিকা ও উপসংহারে মধ্যে মধ্যে “প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে দুক্তিভ্রাত বোপ করিয়াছেন।” গ্রন্থের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন “সম্প্রতি অম্বদেবীয়া অনেক বিদেশীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া ভাষ্য অম্বেষণ করেন। * * * যদি (ইহাঙ্গিণের) শাস্ত্রবিচার জনা কোন গ্রন্থ থাকিত, তাহা হইলে আর উপধর্ম, স্থলধর্ম, বৈধর্ম ও ধর্মাত্তরের কমনারূপ বৃহৎনর্থ ভায়তবর্ধে প্রবেশ করিতে পাইত না। উপরোক্ত অভাব পরিপূরণ করাই এই শাস্ত্রের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার) প্রধান উদ্দেশ্য।” যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন আছে, যাহাতে ভাগবতের সার ভাষ্য ব্যাখ্যাত আছে, বাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাসীরা সংপথে আদিবে, সে গ্রন্থ যে অতি উপাদেয় হইবে, ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার ধর্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী, তাহার রচনাও প্রাঞ্জল। তিনি বেক্রপ সহজে কঠিন কঠিন বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। সেখান তিনি লিখিতেছেন,

‘বয়স্ক সংশয়ং ত্যক্তা পশ্যামস্তত্ত্বমুদয়ং ।

ব্রহ্মাবনাস্তরে রমো শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌভগং ॥

* শ্রীকেশবদেব দত্ত প্রণীত ।

নরভাব স্বরূপোহয়ঃ চিত্তবৃত্তপ্রতিপোষকঃ ।

স্বিত্ত্বাশ্রয়ামাত্মকো বর্ণঃ সৰ্ব্বানন্দবিবৰ্জকঃ ॥

ত্রিতত্ত্বভক্তিমাগুজ্ঞো রাজীবনয়নাদিতঃ ।

শিখিপুচ্ছধরঃ ক্রীমান্ বনমালাবিভূষিতঃ ॥

দীপ্তাস্বরঃ শ্বেবাচ্যঃ বংশীনাস্তম্বহৃদ্বানুজঃ ।

যঘূনাপুলিনে রম্যো কদম্বতলমাস্রিতঃ ॥”

হয়ত, সংস্কৃতস্ত পণ্ডিতেরা এইরূপ সংস্কৃতকে সংস্কৃতই বলিবেন না ; তাঁহারা হয়ত ইহাকে বিভক্তিবিশিষ্ট বাঙ্গালা বলিবেন ; কিন্তু অনেক পুরাণের ভাষা এইরূপ সহজ ; এবং যাহারা অল্প সংস্কৃত জ্ঞানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অতি উপদেশ্য । বিশেষতঃ কেদার বাবু দ্বিতীয় লোক হইয়া এবং সৰ্ব্বদা বিষয়কর্মে ব্যাপ্ত থাকিয়াও এইরূপ সংস্কৃত রচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প শ্রায বা গৌরবের বিষয় নহে । আমরা এতের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা করিলাম ; এতের রচনা-কৌশলের প্রশংসা করিলাম ; এতকর্তার বিদ্যাবত্তা, ধর্মামুশীলন, প্রভৃতির প্রশংসা করিলাম । কিন্তু এখনও আমাদের সমালোচনা দুরায় নাই । এই গ্রন্থ প্রচারে ধর্ম জগতের, বিশেষতঃ অস্বদেশীয় ধর্মালোচনার কি পরিমাণে উপকার বা অপকার হইবে, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয়ক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ।

বর্তমান সময়ে বৈকবেরাই প্রধানতঃ ধর্মশাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন । তাঁহাদের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সমন্বয়যোগী । তাঁহারা প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় (পয়ারে) নিজের বক্তব্যটি প্রকাশ করেন, পরে শাস্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐ বক্তব্যের সমর্থন করেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৈতন্য-চরিতামৃতের এক অংশ ধরুন ।

“ককভক্ত নিকায় অতএব শাস্ত ।

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধকামী সকলি অশাস্ত ॥

তথাহি ভাগবতে

‘মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।

মহমভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিবপি মহামুনে ॥”

এই প্রণালীতে পাঠকদিগের বিলম্ব লাভ হয় । কথাটা ভাল করিয়া বুঝা গেল ; এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকিতে কথাটির উপর আস্থা ও বিশ্বাসও জন্মিল । এবং এই শ্রোকের পরেই পুস্তকের মূল্য, উপমা প্রভৃতি দ্বারা কথাটিকে আরও সূচু করা হইয়াছে । বাহ্যিক মূল্য চান, তাহার মূল্য পাইলেন ; বাহ্যিক প্রমাণ চান, তাহার প্রমাণ পাইলেন ; কাহারও মনে কোন সন্দেহ জন্মিত হইল না । কেদার বাবু এই প্রণালী অবলম্বন না করাতে তাহার পুস্তকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । পুস্তকের অতি অল্প স্থলেই প্রমাণ প্রয়োগের কথা আছে । সংস্কৃত শিক্ষাতত্ত্ব লিখিয়া হইয়াছে ; কিন্তু ঐ সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব মধ্যে কোন কোনটী বা গ্রন্থকর্তার ও কোন কোনটী বা পুস্তককর্তার তাহা বুঝিবার উপায় নাই । সুতরাং কেদার বাবুর সংস্কৃত ও অসংস্কৃত উভয়ের উপরেই পাঠকের সম্বন্ধ হয় । এতদ্বিধ সংস্কৃত শ্লোক লিখিতেই কেদার বাবুর সময় কাটিয়া গিয়াছে । তিনি কোন কোন স্থলে মূল্যের অবতারণা মাত্র করিয়াছেন । সময় ও স্থান অভাবে মূল্যগুলি সুন্দররূপে বিকশিত হইতে পারেন নাই । পুস্তক ধানি হইতে যে পরিমাণে উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, প্রণালীর দোষে সে উপকারটা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না ।

উপক্রমণিকায় কেদার বাবু অনেকগুলি ব্রহ্মসংস্কৃত মতের অবতারণা করিয়াছেন । সেই সমস্ত মতের দ্বারা ধর্ম্মজগতের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । আমরা কয়েকটি মতের উল্লেখ করিতেছি ।

ক । তিনি পঞ্চবিধ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে নিশ্চয় হইবেন, এবং অনেকে মর্ম্মপীড়িতও হইবেন । তাহার মতে,

শাক্ত—নিক্কির জড়ের উপাসক ।

মৌর্য—সোম্যাপ অতএব সক্রিয় জড়ের উপাসক ।

পাণ্ডিত্য—পশুচৈতন্য অথবা অধিকতর চৈতন্যময় পশুর উপাসক ।

শৈব—নরচৈতন্য অথবা অধিকতর চৈতন্যময় নরের উপাসক ।

বৈষ্ণব—পূর্ণ চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসক ।

ইংরাজী করিয়া প্রকাশ করিলে কেদার বাবুর অভিপায় আরও স্পষ্ট-

রূপে বুঝা যাইবে । মনুষ্যের ধর্মদৃষ্টান্তীয় উন্নতির অবস্থা পঞ্চপ্রকার ।

মনুষ্যের প্রথম অবস্থার ধর্ম Fetish Worship (শাক্ত)

মনুষ্যের দ্বিতীয় অবস্থার ধর্ম Elemental Worship (মৌর)

মনুষ্যের তৃতীয় অবস্থার ধর্ম Animal Worship (পাণ্ডপত্য)

মনুষ্যের চতুর্থ অবস্থার ধর্ম Human Worship (শৈব)

মনুষ্যের পঞ্চম অবস্থার ধর্ম Divine Worship (বৈষ্ণব)

আমাদের দেশে শাক্ত ও শৈব অনেক আছেন । তাঁহারা হিন্দুধর্মের এই ব্যাখ্যাকে “সারগ্রাহী” ব্যাখ্যা বলিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে । কেদার বাবু যাহাই বলুন, যাহারা শাক্ত, তাঁহারা শক্তিকে চিত্রায়ী ও ত্রিগুণাতীতা বলিয়া নির্দেশ করেন । তাঁহারা যে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ন্যায়, আমাদের দেশের হাড়ি ডোম প্রভৃতির ন্যায় “Sticks, Stones” লোষ্ট্রে কাঠ পূজা করেন, ইহা তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না । যাহারা শৈব, তাঁহারা যে তিস্তবাসী প্রভৃতিদিগের ন্যায় কেবল নরপূজা করেন, ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না । আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয়, যে কেদার বাবু সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের অবমাননা করিয়া ও সমস্ত হিন্দু পদ্ধতির উপর পদাঘাত করিয়া এই অদ্ভুত মতের প্রচার করিয়াছেন । কোথায় দেবাদিদেব মহাদেব, আর কোথায় লামা প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃত মহাব্য ? কোথায় পঞ্চপতি হেরাম্ব, আর কোথায় বর্ষাদেশীয় ষেতহন্তী ? কোথায় ত্রিনয়না জগৎকর্তা অম্বিকা, আর কোথায় ক্রিয়াবিহীন, চৈতন্যবিহীন, হাড়ি ডোম প্রভৃতির আরাধ্য অঙপিণ্ড ? এ সকলে যিনি সমান বলিয়া মনে করেন, তিনি হিন্দুধর্মের সার অংশ কেন, তিনি হিন্দুধর্মের কোন অংশেরই তাৎপর্য গ্রহণে কৃতকার্য হন নাই । ভারতচন্দ্র হরিহরের অভেদত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কেদার বাবু তাহা হইতে সারগ্রাহী অনেক কথা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

“নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার ।

সবরূপতমোক্ত প্রকৃতি তাঁহার ॥

সত্ত্ব রজঃ প্রভাব কণেক বিনা নয় ।

তমোর প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥

তমোওণে প্রচার কৈবল্য পরিণাম ।

বুদ্ধহৃৎগুণে আর নোক কার নাম ॥

রজোওণে কৌমার যৌবন সত্ত্বওণে ।

তমোওণে জরা দেখ এরূ কোটিওণে ॥

রজোওণে বিধি তাঁরী নাকিতটে স্থান ।

সত্ত্বওণে বিষ্ণুর স্বপ্নে অনিষ্ঠান ॥

তমোওণে শিব তাঁর ললাটে আলয় ।

ভাবি দেখ তমোওণ কত উচ্চ হয় ॥”

খ। কেদার বাবু যে শিবের দেবতা হরণ করিয়াই কাজ হইয়াছেন, এতদ্ব্যতীত নহে। তাঁহার মতে শিব অনার্য্যদের একজন রাজা মাত্র। যে শিব বেদেও বারম্বার বর্ণিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রভৃতি কবীগণ ঈশ্বার সাহায্য স্বরণ করিয়া স্তুতিত হইতেন, যিনি রক্ততপির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তিনি সাওতালের রাজা!! এই কি কেদার বাবুর সারপ্রাণিতার ফল? বরং হট্টার সাহেব ভাল ছিল। সে তবু শিবকে অনার্য্যের দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

গ। কেদার বাবু শঙ্করাচার্য্যকেও অপমানিত করিতে জুঁঠিত হন নাই। কেদার বাবু বলেন—“শঙ্করাচার্য্যের কার্য্য আলোচনা করিলে, ইহাকে পরমেশ্বরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্মসম্বন্ধে ইহার অনেক গোলযোগ ছিল। ইনি যেখানে বৌদ্ধদিগকে খদলভূক্ত করিতে না পারিতেন, সেখানে নাগা সম্রাটসমূহ নিমুক্ত করিয়া খড়্গাদির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অবশেষে বেদান্তভাষ্য রচনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র সম্বলিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন।” কেদার বাবু সারপ্রাণী ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি কি করিয়া “বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড” লিখিলেন তাহা বুঝিলাম না। কেন, ব্রাহ্মণদিগের কি জ্ঞানকাণ্ড ছিল না? ফলতঃ আমাদের বোধ হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখামাত্র। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের সর্বাঙ্গীনতা বুঝিত না, তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের দুই একটা

মত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ হইত। পরে যখন শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্মের আমূল
বিসরণ প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্মের ভ্রম প্রতিপাদন করিলেন, তখন সকলেই
নাস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম অবলম্বন করিল। শঙ্করাচার্য্য তর্কযুক্ত
বৌদ্ধধর্মকে পরাজিত করিয়াছিলেন। নিত্যত্ব অকৃতজ্ঞ ও নিত্যত্ব অহিংস
না হইলে ধর্মসংস্থাপক শঙ্করাচার্য্যকে নিন্দা করা যায় না। কেদার বাবু
সারগ্রাহী ভাণবত হইয়াও কিরূপে এই যৌর নারকীর হুকুম করিলেন,
তাহা আমাদের সামান্য দুষ্কির অতীত। জনকতক নাগা সম্রাটের রাজা
রাজাডাকে বাহ্যদৃষ্টে পরাজিত করিয়াছিল, ইহা হিন্দুবিদ্বেষী ভিন্ন আর কেহই
বিস্ময় করিতে পারিবে না।

উপক্রমণিকায় কেদার বাবু যে পরিমাণে আহিন্দুত্ব প্রকাশ করিয়া-
ছেন, তাহার সংহিতায় তিনি ততদূর করেন নাই। তবে ইহাতেও স্পষ্টানি
মত অনেক আছে। স্পষ্টত্ব স্বরূপ আমরা দুই ভিন্নটীর উল্লেখ করিতেছি।

১। অবতারবাদ। কেদার বাবু বলেন—“যখন জীব সংস্কারবাহ্য প্রাপ্ত,
ভগবান্ তখন সংস্কারবতার। • • নরপশু ভাণবত জীবে তিনি নৃসিংহাব-
তার। ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্য-
বস্থায় রামচন্দ্র।” কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সংস্কার কুর্ষ নৃসিংহ পৃথুতি সত্য-
দুগের অবতার। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের অবতার। ইহাতে বরং ইচ্ছাই
প্রমাণিত হয়, যে মনুষ্যের সভ্যাবস্থায় ভগবান্ কুর্ষাদি অবতার গ্রহণ
করিয়া অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থায় রামাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী
Evolution মানিলে মনুষ্যের ক্রমোন্নতি বলিতে পারা যায়। কিন্তু সত্য,
ত্রেতা, দ্বাপর, কলি মানিলে মনুষ্যের ক্রমানবনতিই স্বীকার করিতে হয়।

২। কেদার বাবু বলেন যে, ঈশ্বর প্রেমলালসাবশতঃ জীবে স্বাতন্ত্র্য
দিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্পষ্টানি মত। হিন্দু ঈশ্বর আপ্তকাম, হৃদয়াৎ
উহার লালসা অসম্ভব। তিনি কি উদ্দেশ্যে মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন।
তাহা মনুষ্যদুষ্কির অতীত। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বরং ইচ্ছাই বলা যায় যে,
মনুষ্যের মধ্যে যে ঈশ্বরের অংশ আছে, সেই অংশের বলে ও ঐশ্বর্য্যে মনুষ্য
স্বাধীন।

বাহ্য্য ভগ্নে আমরা এখানেই উপসংহার করিতেছি। আমরা কেদার

ব্যাপ্ত যে সমস্ত দোষের উচ্ছেদ করিলান, তাহা বিবেচনাক্রমে পরতঃ হইয়া
করি নাই। হিন্দুশাস্ত্রের নাম দিয়া হিন্দু চিরনিবাসের প্রতি আশ্রয় করা
নিষিদ্ধ করিত। আমরা সেই জন্যই পুস্তকস্বরূপ দোষাবলীর এত দীর্ঘ উল্লেখ
করিলাম। পুস্তকের যে যে অংশ চৈতন্য-চরিতাবৃত্তের অনুবাহী, তৎসমস্তের
সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

শ্রীশীলকণ্ঠ মহানন্দার ।

ভারতে ইংরেজাধিকার ।

[পূর্ন প্রকাশিতের পর।]

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে আপনাদের অনেক
সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে তাহারা রণনিপুণ
বীরপুরুষ হইয়া উঠিবে, এ চিন্তা বা এ ধারণা প্রথমে ইংরাজের মনে
উদিত হয় নাই। সুতরাং ইংরাজেরা কখনও ইহা বলিয়া গর্ভ করিতে
পারেন না যে, তাহারা ভারতবর্ষে সিপাহি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের
অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপরূপ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।
আপনাদের অভীষ্ট কার্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত।
ফরাসী গবর্নর ডুপ্রে প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ
করিয়া তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শূক-বিদ্যায় পারদর্শী
করিতে প্রবৃত্ত হন। ইংরাজেরা ফরাসীদিগের প্রবর্তিত দৃষ্টান্ত অনুসারে
ভারতবর্ষীয়দিগকে আপনাদের সৈনিকদলে গ্রহণ করেন। এইরূপে ১৭৭৮
অব্দে দক্ষিণপথে ইংরাজদিগের সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়।

ভারতের এই সিপাহিসৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেজদিগের প্রধান
সহায়। ইহাদের রণনিপুণতা, ইহাদের প্রভুত্ব ও ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে
এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন হইতেছে না। এক জন সদাশয়
পুরুষ একদা ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের নিকট ভারতবর্ষীয় সিপাহী-

দিনের সম্বন্ধে নিষিদ্ধাভেদ, “তাহারা (সিপাহিগণ) যে, ক্রীতকাল পর্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহারা ও তাহাদের পূর্ণপুরুষগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিগাছে, তাহারা যের অক্ষকারময় নিপতিপূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্ত বোধ হইয়াছিল—আমাদের পাৰ্শ্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা আমাদের পরাধীন সুসাদ্য বোধ হইলেও বিপক্ষদের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও তরুতর কার্য সাধন করিগাছে। তাহারা আমাদের আবেশে, তাহাদের প্রাচীন ভূপতিদিগের বিরুদ্ধে তাহাদের বদেষের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিগাছে।” বস্তুত, ব্রিটিশ সেনার সহিত ভারতবর্ষীয় সেনার তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানা বিষয়ে উভয়ে উভয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এক জন বিদেশী প্রভুর দেশ, জাতি, বর্ণ ও বর্ণাশ্রমশাসনে সর্বতোভাবে বিদেশীর সূতায় করে, অন্য জন তাহার বদেশী শোকে ও বদেশের কার্য সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে; এক জন অধিকাংশ সময়ে তাহার স্বজাতির, বর্ধের ও বংশগৌরব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; অন্য জন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন বর্ধের ও ভিন্ন বর্ধের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভুত্ব, প্রভুত্ব বেতনে সহঃপন্ন ও প্রভুর সমাচরণে পরিবর্তিত হয়; অন্য জনের প্রভুত্ব আপনায় পরিপূষ্টির সহিত পরিপূর্ণ হয় এবং আপনায় উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্বদা তাহার প্রভুর অহং ও তাহার প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থ ও সমাচারে যে প্রভুত্ব জ্যেষ্ঠ হয়, তাহা অনেক সময় প্রভুর বদেশীয় সৈন্যের কর্তব্যনিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। বহুবিধ কষ্ট বা অস্বস্তিকারী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহি কখন কর্তব্য পালনে পরাধীন হয় না। বাত্‌নিপত্তি না করিয়া সিপাহি সর্বপ্রকার কষ্টতার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাত্‌নিপত্তি না করিয়া সঙ্গীত সাধনে উন্মত্ত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন অনিচ্ছা তাহাকে কর্তব্য-পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন বর্ধের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধি-

নায়েকের অধীনে থাকিয়া, সিপাহি সর্দার প্রকৃত চিত্রে ও উৎসাহ সহ-
কারে আপনার অবলম্বিত ধর্ম পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অগনিক
ভাবে এই এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে,
অকুণ্ঠিত চিত্রে তাহার সহিত দীতিশূন্যে আনন্দ হয় এবং অস্বাভাব্যে
তাহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহার সাধনা
প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সহ্য শূণ্য অবনত হইয়া পড়ে
না। সে নিপত্তি সময়ে নিদাক্ষণ ক্ষুধার্ত হইয়াও আপনার সংসামান্য
খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রিটিশ সেনার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর হয়, ইউরোপীয়ের
মাহিম ও ভেষজবিদ্যা যেখানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সিপাহী সে
খানেও অবাধে ও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপন
করে এবং সে যুদ্ধের সময় আপনার বহু পরিশ্রমলভ্য সংসামান্য বেতনের
অংশ দিয়া ইংরেজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতি-
পত্তে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তির চিহ্ন আঙ্কল্যমান রহি-
য়াছে। তাহার মহত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্তব্যানুষ্টি, তাহার
স্বার্থত্যাগ চিরকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিলে। হিমা-
চলের অনূত শৃঙ্খলাতেও তাহার গৌরবস্বত্ত্ব বিচূর্ণ বা বিকিপ্ত হইবে না,
এবং ভারতের মহাসাগরের সমগ্র ব্যাপ্তিতে তাহার কীর্তিচিহ্ন বিসৃপ্ত বা
বিধৌত হইয়া যাইবে না।

এই প্রভুভক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া-
ছেন। এই প্রভুভক্ত সৈন্য প্রধানতঃ প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইংরেজদিগের
হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী, বিদেশী বিজ্ঞাতিক হস্তে
আপনাদিপিকে সমর্পণ করিতে কেন এত দর করিয়াছে, আত্ম স্বাধীনতার
উদ্যাসীনা দেখাইয়া বিদেশী বিজ্ঞাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন
এরূপ স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা হুঃসাধ্য
নহে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষে স্বাভাব্য-প্রিয়তা ও জাতি-
প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা
সাহসে ও বীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। যখন মহাবীর সেকেন্দর সাহ
ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া

বিশ্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এসিয়ার আরবেরা একটি এসিষ্ট দ্বি-
জ্ঞানী জাতি। স্বপ্নকালে ইহাদের বিষয়-পতাকা মিসর, পারশা, স্পেন, তুরক
ও কাবুলে উড্ডীন হয়। কিন্তু আরবগণ এক শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও
ভারতবর্ষজয়ে সমর্থ হয় নাই। কাসেম সিজুদেশ জয় করেন বটে, কিন্তু
তাঁহার মৃত্যুর পরই উহা আবার স্বাভাব্য অবলম্বন করিয়াছিল। বাহারা
প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহার পাঠান। পাঠানেরা
আরবদিগের ন্যায় প্রতাপশালী বা সমৃদ্ধিশালী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ
তাঁহাদের হস্তগত হয়। পৃথ্বীরাজের পূর্ব আর কোন ভারতীয় বীর তাঁহা-
দিগকে দেশ হইতে নিকশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার
কারণ স্বাভাব্য-প্রিয়তার অনাহা বা জাতীয়-জীবনের অবনতি। ধর্ম-বিপ্লবে
হিন্দুদিগের জন্মে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা পার্থিব
বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চিত্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিত্তা-
শীলতা প্রসূত ক্রমে তাঁহাদের বাহ্যবৃত্তে অনাহা জন্মে। এই অনাহা হই-
তেই নিশ্চেষ্টতা ও উদাসীন্যের সূত্রপাত হয়। রামা বদেশী কি বিনেশী
হউন, তাঁহারা বাত্‌নিম্পত্তি না করিয়া তাঁহার আমুগতা স্বীকার করিতেন।
মুসলমানের রাষ্ট্রত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুতনা ভিন্ন ভারতের আর কোন
ভূখণ্ড আপনাদের স্বাভাব্য-প্রিয়তার গৌরব দেখাইতে পারে নাই।

যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া বিজ্ঞানসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে
কোন ভাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সম্ভ্রাতা
অশ্রুত ও অপমানের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাঁহা
হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই
সেই অদ্বিতীয় জাতি। বৃদ্ধের পর যুঁকে মিবার হতসমর্থ ও হতবীর
হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া
গিয়াছে, বিজ্ঞতার পর বিজ্ঞতা আসিয়া আপনাদের সংহারিণী শক্তির
পরিচয় দিগছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানব
জাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও
বোরাঙ্ক্য সহিয়া বিজ্ঞতার পদানত হয় নাই এবং বিজ্ঞতার সহিত মিশিয়া
আপনাদের জাতীয়-গৌরবে অলাভলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের

পর আদিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটেনেরা বিজেতার সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের (ওক্) সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মৰ্যাদা, তাহাদের পুরোহিত (প্ৰাইড) গণের প্রাধান্য সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুত্রেরা কখনও একরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেকবার আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে স্থলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রান্না পরহস্তগত হইয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কালনাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, মিবার আপনার বর্ষে জলাশয় দের নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিদ্রুতির জন্য আশ্রয়-সন্ধান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখান নাই; মিবারের বীর-রমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই, মিবারের বীর-বালক জঙ্গভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, বাধীনতা প্রজ্ঞাশালি দেন নাই। ব্রিটিশভূমি বাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

এই স্বাভাব্য-গৌরব আজ পর্যন্ত মিবারের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্য স্থানে একরূপ দৃশ্যের আবির্ভাব হয় নাই। স্বাভাব্য অনাহার ন্যায় ভারতবর্ষের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাবের আভির্ভাব ছিল। বীর্ষবত্বে আৰ্য্য পুরুষেরা বধন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায় নাই। তাহারা তখন একতা-সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার পরাক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্য্যেরা আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্য অনার্য্যে মিশিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয় এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। এতি মণ্ডলে ভিন্ন

জাতির, ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির, ভিন্ন ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অধ্বীতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন না। কোন সময়ে সমুদায় ভারত-বর্ষীয় পরম্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হইল না, হুতরাং ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠার গৌরব দেখা গেল না। জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব ও অনৈক্য প্রসূক্ত সাহসে ও বীরত্বে চির-প্রসিক্ত ভারতবর্ষীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আবার মুসলমানেরা যখন সিংহনদ পার হইয়া পূর্বপালের স্রাব দলে দলে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অমুগত বা মুসলমান-ধর্ষ্যাবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতের সৌভাগ্য-ক্রমে এই অনৈক্যের মধ্যেও একবার জাতি-প্রতিষ্ঠার অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণাপথে প্রান্তঃ-স্বরসীর শিবজী আপনার মহামন্ত্র বলে একবার একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মহাজাতির পরাক্রমে বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুর পদানত হইয়াছিল। কিন্তু শিবজীর মৃত্যুর পর এই মহাজাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ড রাজ্যগুলি যখন স্ব স্ব প্রধান হঠতে থাকে, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব পূর্ণ মাঠায় দর্ভমান ছিল। তখন ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠার কোনও চিহ্ন ছিল না। তখন একপ্রাপত্তা ও সমবেদনা সমস্তই অস্বপ্নান করিয়াছিল। দীর্ঘকাল বিদেশীর ও বিজাতির শাসনে থাকায় ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে স্বাভাব্য-বোধ ছিল না। তখন দ্বিগবিজয়ী মারাঠারা ক্রমে নিজে হইয়া পড়িয়াছিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর প্রতাপশালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতরা ক্রমে গৌরবশূন্য হইয়াছিল। বীর্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্য দোষে পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হৃদয়বাদের বিজ্ঞান স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। অযোগ্যের স্বাধার স্বপ্রধান হইয়াছিলেন। উদ্বাসিত মোগল সম্রাট হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তার করিতেছিল। এই অরাজকতার সময় ফরাসীরা

মহারাজ রণজিৎ দ্বিতীয় শিবজী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন দটে, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব যোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতন সময়ে হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আর ভারতবর্ষীয়গণ এক অধীনতা-পাশে হইতে আর এক অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহাদের সহায় হইয়াছিল। হুতরাং কেবল ইংরেজের বাহুবলে বা ইংরেজের কর-দ্রুত অগ্নির ক্ষমতায় ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ইংরেজ যদি সমস্ত ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের প্রতিকূলাচরণে ব্যাপ্ত থাকিত, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ দৃশ্যের বিকাশ দেখা যায় নাই। ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের অমুকূলতা করিয়াই আসিতেছে। ইংরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রধানতঃ এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের সহিষ্ণুতা ও অমুকূলতার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

পলাশীর প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে যখন হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌল্লাহর অধঃপতন হয়, তাহার পর হইতেই বাঙ্গালায় ইংরেজের ক্ষমতা ও আধিপত্য বহুমূল হইয়া উঠে। ইংরেজের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি প্রধান যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিংশতিবর্ষীয় তরুণমতি সিরাজউদ্দৌল্লাহ সর্বপ্রকার পাপের—সর্বপ্রকার পাশব আচারের অদ্বিতীয় আশ্রয়ভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আমি উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে পলাশীর যুদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রধান যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না। এবং হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌল্লাহ প্রকৃত প্রস্তাবে ভূর্ত্তমান পাপ বলিয়া, ইতিহাসে বর্ণিত হইতে পারে না। পলাশীর যুদ্ধে হাজারা বিজেতা বলিয়া সম্বন্ধিত হইয়াছিলেন তাঁহারা আপনাদের লোকাভীত শ্রুত বা অসাধারণ পরাক্রম দেখান নাই। দেওবীরের যুদ্ধে জরী হইয়া, প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ নওশেরার যুদ্ধে কথ্যতী অধিকার করিয়া, সিদ্ধনদের অপর পারে হিন্দুবিজয়ী পাঠানের শোণিতজলে পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের আত্মার তর্পণ করিয়া আফগানের অধিকৃত পেশাবরে আপ-

প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যে আপনাদের প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীয়েরা এইরূপে সাহায্য দানে অসম্মত হয় নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হইতেই বৈদেশীয় শাসনে ছিল, এখন অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইবার আশায় তাহারা অভিনব বিদেশীয় প্রভুর আত্মগত্য স্বীকারে প্ররুত হয়। ঈংরাজেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের এইরূপ বীৰ্য্যপদ্ধতি দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশী আভির আত্মগত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে নুতন ছিল না। তাহারা পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশির শাসনাধীনে ছিল। ইতালী ও জর্মানি সহজে নেপোলিওনের বশীভূত হইয়াছিল, যেহেতু ইতালী তখন সে ইতালী বা জর্মানি সে জর্মানি ছিল না। ইতালীয় ও জর্মানিগণ তখন জাতীয় ভার হইতে অলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল রাজ্যের অধঃপতন সময়েও ভারতবর্ষ পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ বা শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল না। শূত্ররাজ ইংরেজ বণিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতবর্ষীয়েরা চারিদিকে ঘোরতর অভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা দেখিয়া আত্মরক্ষা সহকারে বৃটিশ কোম্পানির সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং কার্যপারদর্শিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়া আপনাদের অভিনব প্রভুর অধিকার বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবাসী ইংরেজের পক্ষ হইয়া আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে শূত্ররাজ তাহারা বদেশজ্যোহী। তাহারা দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া, অবনীলায়, অসম্মোচে, এতদল বিদেশী বণিককে আপনাদের অধিপতি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ছিল না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। কেহ ভারতবর্ষের কোন ভূখণ্ডে একাধিপত্য করিতে সমর্থ ছিলেন না। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পাঁচ ভাতি, চারিপাঁচ ভাষার লোক পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ বা দ্বিতীয় শিবজীর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপান্তর পরিগ্রহ করিত।

তার পারিতোষিক স্বরূপ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজ্যগনে অধিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে লর্ড ক্লাইব যে নীতি অবলম্বন করেন, ভারতের ইংরেজাধিকারের পরবর্তী ইতিহাসে সেই নীতির বিকাশ হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বহুবিধত্ব জনপদের অধিকারী ও বহু সম্পত্তিশালী, সুতরাং তিনি যোর অত্যাচারী; এই অত্যাচারীর অপরাধে তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করাই উচিত। আবার ধন-সম্পত্তির মহিমায় ও দেববাহুনিয় কহিছুরের বিষম বিভাগ পবিত্র পঞ্চনদ ভারতের তুলনা-রহিত, সুতরাং লাহোর দরবার উচ্ছৃঙ্খল ও শাস্তির বিরোধী; এমনও বালক দলীপ সিংহকে রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অযোধ্যা লক্ষ্মীর প্রিয়নিকেতন, সুতরাং অযোধ্যা যোর অত্যাচারে পূর্ণ। অযোধ্যার নবাবকে ঘুচীখোলায় নির্বাসিত করাই কর্তব্য। দাহিরের দুহিতা হুন্দরী না হইলে শিক্কাওয়া কাসিমের শিরচ্ছেদ হইত না। হতভাগ্য ভারতের রাজ্যগুলি ধনশস্যবিশিষ্টে গৌরবান্বিত না হইলে রাজ্যাধিকারিয়া দুর্দশায় পড়িতেন না। এই লোভ-লালায়িত নীতির স্বরূপাত লর্ড ক্লাইব করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী সময়ে লর্ড ডালহৌসী তাহার সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ইংরেজাধিকারের মূলপ্রতিপোনাঃপুনিক দশমিকের ন্যায় ভারতের ইতিহাসে অনেকবার দেখা গিয়াছে। ডালহৌসীর সময়ে ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্জিত হইয়া জিগীষু মোগলের সাম্রাজ্যকে অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংরেজ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অনেক বিষয়ে উহার অনেক আভ্যন্তরীণ উন্নতি লাভন করিয়াছেন। ভারতবাসীবিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া, দেশের অল্প আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে আমরা ইংরেজের মহত্বকার কখনও তুলিতে পারিব না। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, ইংরেজ ভারতশাসনে সম্বর্ধিতা ও উন্নতির সন্ধান রাখিতে পারেন না। ভারতে ইংরেজের রাজনীতি জেণীভেদে, বর্ণভেদে এখনও অতি সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে। মুসলমানেরা প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষমতার ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুরাজগণ, আপনাদের রক্ত, ভূমি অবলীলায় মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠানেরা জরী হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে নির্বিক্রমে রাজত্ব স্থাপন

নার অল্পপতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতের মহাশক্তিরূপিণী কৰ্ম্মদেবী আত্মত্বের নিকটে কোণবন্ধী হইবন্ধে পরাজিত করিয়া, স্বাধীনতার স্বাধীনতা অক্ষত করিয়াছিলেন। বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণাংশের যুদ্ধে মোগল সৈন্যের ক্ষমতা রোধ করিয়া, হিন্দুজাতী মুগলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়—বিজ্ঞানীরা এই সকল যুদ্ধেই আপনাদের বীরত্ব ও ক্ষমতাবলে বিশ্বয়লক্ষী অধিকার করেন। ইতিহাসে এই সকল কথা অগ্নির অগ্নির লেখা রহিয়াছে। কিন্তু যে পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, মিরজাফর ইংরেজের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন, বাবসাঈ ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধি-বিগ্রহ-পটিত রাজকাৰ্য্যে অভিনিবিষ্ট হন, তাহাতে বিজ্ঞানী ইংরেজ আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দেন নাই। “বীরভোগ্যা বহুব্ধরা” এ কথা পলাশীযুদ্ধের সম্বন্ধে প্রয়োগিত হইতে পারে না। অকৃতজ্ঞতায় এই যুদ্ধের উৎপত্তি, বিশ্বাসঘাতকতায় এই যুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের প্রাণনাশের সহিত তাঁহার অতুল ধনসম্পত্তিতে অকৃতজ্ঞ আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ—এই যুদ্ধের পরিণাম। মহারাণ পুরু যদি বীরোচিত তেজস্বিতা ও মনস্বিতা দেখাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেকন্দের সাহের উদারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। সিরাজের অকৃতজ্ঞ কৰ্ম্মচারীপণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না।

সিরাজউদ্দৌলা কোন অংশে বথেষ্টাচারী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি ইংরেজ বণিকদিগের সহিত কখনও কোন দুর্ক ব্যবহার করেন নাই। সে সময়ে বাহারা বাঙ্গালার অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজউদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালা পৃথিবীর মধ্যে সনু, বহুজনাকীর্ণ, স্বকর্ষিত ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক ও বণিকের ধনপৌরবে সমৃদ্ধিত। জনসাধারণ যুদ্ধে ও শান্তিতে কালান্তিপাত করিত। ইংরেজ একদম যুদ্ধ শান্তিপূর্ণ জনপদের অধিপতিতে নানা কলঙ্কের আরোপ করিয়া তাহার সর্পনাশ সাধন করেন, এবং অকৃতজ্ঞ মিরজাফরকে অকৃতজ্ঞ-

করিতে পারেন নাই, তদুপ যশসমানদিগের অনলগ্নিত নীতি সম্বন্ধিতার সম্মান রাখিত। পেরগামউদ্ধীন যদিও হিন্দুদিগকে প্রদান রাজকীয় পদ সমর্পণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার পূর্বে ও পরে হিন্দুদের হস্তে প্রদান প্রদান কার্যের ভার ছিল। প্রথম মোগল সম্রাট বাবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ মানসে পঞ্চাশে উপনীত হন, তখন হিন্দুগণ তাঁহার সাহায্য করেন নাই। কিন্তু এই মোগলের বংশধরদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের অসীম প্রতিপত্তি ও অসীম ক্ষমতা ছিল, মোগলেরা সর্বদায়ে ভারতবর্ষীয় ছিলেন। ভারতবর্ষীয় হইলেও তাঁহারা ভারতবর্ষদিগের পরামর্শ অনুসারে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতেন। রাজা তোড়রমল আকবরের প্রধান রাজসম্বন্ধী এবং রাজা বীরবল ও মানসিংহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজা রত্ননাথ আকবরের নিক্তি এবং জয় সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ সেনাপতি করিতেন। রাজা রতনচাঁদ সম্রাট করারাঙ্ক শেরের প্রধান মন্ত্রীর কাজ চালাইতেন। বিক্রমসিং ও রাজা ভীম, সম্রাট শাহজাহান প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সহায় ছিলেন। ইংরেজের বর্ণিত যোর অত্যাচারী নবাব মিরাজউদ্দৌলার রাজত্বেও আমরা এই সম্বন্ধিতার পরিচয় পাই। তখন বাঙ্গালী সেনাপতি, বাঙ্গালী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এবং বাঙ্গালী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এখন ইংরেজাধিকারে এ সমোহন দৃশ্য অস্তিত্ব হইয়াছে। বীরবল, তোড়রমল প্রভৃতির বিবরণ এখন কেবল ইতিহাসের কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া লোকের পূর্বস্মৃতিতে বিরাজ করিতেছে। আর হতভাগ্য বাঙ্গালী? নবাব মিরাজের সময়ে যাহারা শাসন কার্যের অস্থিমজ্জাবরূপ ছিল, ইংরেজাধিকারে তাহাদের কি দশা ঘটিয়াছে? বাঙ্গালী আজ ইংরেজরাজের সম্বলগৃহে প্রবেশের অনধিকারী। রাজপুরুষের অনুমতি বাহীত এক খানি সামান্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে আজ বাঙ্গালীর কোনও ক্ষমতা নাই। যাহারা পেশপুরুষকে বাঙ্গালায় পর্বসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্মানগণই আর এইরূপ ক্ষমতানূন্য ও অধিকারশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। মোগল সম্রাট আকবরের উদার রাজনীতির মূলে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য বহুদূর ও সম্ভ্রান্তিক্রিত হয়, সাম্রাজ্যের

এই সম্প্রদারণে বিক্লিত হিন্দুগাই পিছেতা মোগলের প্রধান সহায় ছিলেন।
শেষে আরঙ্গজেব এই উদারতা ও সমবশিতার মূলে আঘাত করিয়াই
আপনার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ স্থগ্ন করিয়াছেন। [ক্রমশঃ

ঐরজনীকান্ত ওপ।

শিশু কন্যার স্মৃতি।

বুকের ভিতরে সে ঘেন কোথায়
এখনো লুকায়ে আছে।
শূন্য মন হ'লে ঘীরে গীরে আসি
দাঁড়ায় প্রাণের কাছে ॥
উদাস দেখিয়ে কচি বাহু দুয়ে
জড়াইয়া ধরে প্রাণ।
কত হাসি হাসে, কত স্নহা ভাবে,
করে কত চুম্বো দান ॥
সে মেহ-মাগরে ডুবিতে ডুবিতে
আমি সুমাইয়া পড়ি।
স্বপনের সনে বাই মিশাইয়া
তাহারে জগরে ধরি ॥
স্বপনো কুরায় সে কোথা লুকার
তাহারে না পাই আর।
নয়ন বিধিয়ে সে শূন্য সংসার
হুটে ওঠে চারি ধার ॥
অঁধি ত'রে ডায় পাইনি দেখিতে,
কেবল দেখিব ব'লে।

রাধিতে ছিলাম আঁধি তার পানে
 অমনি সে গেল চ'লে ॥
 প্রাণ ত'রে ভাল বাসিতে নারিছ
 তবে রেখেছি প্রাণ ।
 বহন করিয়ে বাসনা ভরিয়ে
 নারিছ করিতে দান ॥
 সাজাতে তাহার করিছ সকর
 অগতের কত সুখা ।
 বুকের সে সাধ রহিল বুকেতে
 মিটিল না শ্রহ-সুখা ॥
 মাহুঘের বৃকে দেবতার আশা
 আগাইল সে আমার ।
 কোবার মিটার এ আশা আমার
 কোথা দেখা পাব তার ॥

এস ছায়াময়ী স্মৃতি অতীতের
 আইস হৃদয় ময় ।
 হেরিলে তোমারে সে প্রতিমা খামি
 নয়নে জড়িয়ে রয় ॥
 রাধিলে নয়ন জ্বরে তোমার
 হেরি যে সূপের ধরা ।
 সেই অধরের অমিয়া রাপিতে
 হেরি এ অগত ভরা ॥
 তার আধ আধ বাবা সম্বোধনে
 যেন শূন্য ধরাভল ।
 আনন্দে গলিয়া প্রাণের পিপাসা
 করিতেছে শূন্যতল ॥

মনে হয় যেন বুঝিয়া তনয়া
 পিতার অতৃপ্ত কুখা ।
 খুলি নিশ্বাস তুলি বিশ্ব তায়
 মাথাহিছে নিশ্বাস হুদা ॥
 এম শ্মৃতি নুকে হৃদয় ভরিয়া
 কাতরে তোমারে ডাকি ।
 জীবন ভরিয়া তোমারে ধরিয়া
 প্রাণেতে জড়ায়ে রাখি ॥

অঁধার না আলোক ?

“যা নিশা সর্পিভূতানাং তস্যোঃ জাগতি সংযমী ।

যস্যোঃ জাগতি ভূতানি সা নিশা পশ্যন্তো যুনেঃ ॥”

ভগবদ্গীতা । ২।২৬ ।

অন্ধকার । সকলই অন্ধকার । ঘনঘোর অঁধার ! এই অনন্ত চরাচরের
 সকল সামগ্রীই বিব্রাণী অন্ধকারের নিকট অটহাসির ভীষণ তরঙ্গে
 ভাসিতেছে । সকলই সেই নিকট হাসির মহাতরঙ্গে আপন আপন হাসি
 ডুবাইতেছে । সকলই সেই অঁধার-হাসির অঁধার-তরঙ্গে বুদ্ধদের ন্যায়
 উঠিতেছে—ফুটিতেছে—আবার কোপায় কানিয়া, সেই অঁধার-তরঙ্গেই লীন
 হইয়া যাইতেছে ।—অঁধারে অঁধার মিশিয়া এক হইতেছে । অনন্ত অগত-
 সংসার মহাকালের চির-অঁধারময় হাস্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে ।
 এই হাস্য-হাসির ভীষণ যোরাবর্তে পড়িয়া বিশ্ব চরাচর আজন্ম ঘুরিয়া
 মরিতেছে । মহাকালের অনন্ত মহাশরীরের উগর দিয়া অন্ধকারের অনন্ত
 হাস্য-তরঙ্গ লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে । সে মহাতরঙ্গের বিশ্রাম
 নাই—শেষ নাই । অমাদি অনন্ত-কাল হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিতেছে ।

অন্ধকারের সেই ভীষণ অদম্য হাস্য-তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে কত নিব-
ত্রস্তাও নিমিষের মধ্যে ভাসিয়া চূর্ণীকৃত হইয়া আবার সেই মহাতরঙ্গেরই
নিঃশব্দে বিনীন হইতেছে। আবার সেই অলস্ত-আঁধারের অলস্ত হাস্য-
তরঙ্গের কত শত নূতন জগৎ নিমিষের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।

কি হুল্লর অন্ধকার ! সগাধকৃতির বড় চমৎকার—বড় মনোহর—
আঁধারমাখা ছবি। অলস্ত অন্ধকারের প্রদীপ্ত আঁধার-প্রভায় উদ্ভাসিত এই
ভীষ্ম অনন্ত দৃশ্যপটে অনন্ত-আঁধার ঘূর্ণ করিয়া অনিতেছে ! আঁধার-আকা-
শের আঁধার-ছায়ায় নিমগ্ন তারাগুলি অন্ধকারের প্রথর স্ফোতিতে নিম্পূত
হইয়া, সমুদ্রে স্তম্ভিত জলদে মহাক্রকারের প্রতি মিটিমিটি তাকাইয়া আছে।
আঁধার-ঘেরা পৃথিবীর আঁধারে-ডোবা কুলগুলি, বোর-আঁধার মাঝে আঁধার
হাসি হাসিয়া, আপন আপন জুড় জুড়-দার বুলিতেছে ; আর সমুদ্রে
অন্ধকারের মহাভীষ্ম বিঘটমূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া—প্রাণে প্রাণে
নিশাইয়া আঁধারের ছায়ামাধান কেমন এক হুল্লর হাসির তরঙ্গ তুলিতেছে।
এই হাসি-কান্না মিথান অনন্ত মহাস্রোতের লয়-লহরীতেই যেন এই অনন্ত
বিষচরাচর একপ্রাণে বাঁধা রহিয়াছে। অনন্তবাণি অন্ধকারের পশ্চাতে
এই অনন্তভরা বিষস্রোতের মহাতরঙ্গের পশ্চাতে—এক প্রেমভরা শান্তি-
মাধা অনন্তজ্যোতি হাগিতেছে। এই বিষ-স্রোত-তরঙ্গে ডুবিয়া আত্মহারা
হইলে, প্রাণের ভিতর স্বতঃই সেই মহাজ্যোতির আভা দেখা দেয়।
কিন্তু এই অনন্ত অলস্ত-আঁধার ভেদ না করিতে পারিলে, সে জ্যোতি
দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই মহাজ্যোতির আভা—এই অনন্ত প্রদীপ্ত
অন্ধকার-শিখায় অগ্ন্যবধি রহিয়াছে। কিন্তু কীং মানব-চক্ষু বোরাক্রকারের
প্রথর ধাঁধাতেই বলমিত, সে আলো—সে স্বর্গীয় প্রভা দেখিতে পায় না।

আঁধার !—আঁধার !! চারি দিক বোর আঁধারে পরিব্যাপ্ত। বিশ্ব-
সংসার অনন্ত অন্ধকার-ক্রেড়ে অনন্ত নিজায় অভিভূত। ভয় নাই,—এক-
বার নিম্নলিত নয়ন উন্মূলন করিয়া দেখ। দেখিবে,—কেমন আঁধারে
আঁধারে মাথামাধি—মিশামিশি—কোলকুলি।—কেমন প্রাণে প্রাণে আলি-
শন ! কেমন আঁধার প্রাণে আঁধার-প্রাণ মিশিয়া হাগিতেছে ! সেই হাসিতে
কেমন বিহ্বল ক্ষুরিত হইয়া বিশ্ব-সংসার কাঁপাইতেছে।

অন্ধকার ?—যেই আঁধার ?—তল কথা । ব্রাহ্ম যুগ মানব, তুমি অন্ধকার কোথায় দেখিলে ? এত শারদীর বিনোদ পূর্ণিমায় হৃষিকল হৃষিকল হোয়াংরা । তুমি উকল হাসি হাসিয়া বলিবে—পাগল, যোরা ভামসী অমানিশিতে পূর্ণিমার চাঁদের আলো ?—ভীম প্রভঞ্জন-বিহাঙিত প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ-বদ্ধ মহামরুতনে জীবন-দায়িনী অমৃত-নিস্যাকিনী নিখরীণী ?—অগন্ত-রাসিত প্রণব নিদাঘ তপনে বাসন্তী-চন্দ্রমা ?—পুত্তিকাক-পূর্ণ চিত্তাঘ্রাচ্ছন্ন মহাশ্মনানে স্বর্গীয় নন্দন-শোভা ! চরাচরী নরহস্তারক ঘোর পানীর মধ্যে শ্বেমপুষ্ঠলি বালিকার শ্বেমমাখা সরল হাসি ? মহাপ্রলাপ—ঘোর উন্মাদের কথা ।

কিছু তাই কি ? ভান, তোমার সেই স্বপ্নময় অগন্তের ভৌতিক আলোর ছায়া প্রতি একবার চাহিয়া দেখে দেখি, সে আলোর ছায়া-বালি অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নয়ত । সূর্য্যমাখা চাঁদের আলোতে অন্ধকারের কঠোর তীব্রতা, বিকলিত ক্রোধের হৃষমাতেও অন্ধকারের ঘোর ঘোর ছায়া । পবিত্র-জন্ম হৃদয় শিশুর আধ হাসিতে অন্ধকারের ভীষণ ক্রীড়া ভাসিতেছে, সুটন্ত-যৌবন রমণীর প্রেম-বিকারিত মুখমণ্ডলেও অন্ধকারের বিত্তীষিকাময় প্রেতমূর্ত্তি প্রতিফলিত । আলো কোথায় ? সবই যে আঁধার । আঁধার—আঁধার—আঁধার ।

আলো বলিয়া তব কি কিছু নাই ? উহা কি কেবল একটা কথার কথা ? উপন্যাস ?—মিথ্যা কথা । যে বলে, সেই ঘোর প্রলাপী । আলো কি তা চিনিলে না—বুঝিলে না, অথচ আলো আলো করিয়া ছুটছুটি করিয়া মরিলে কি হইবে ? আলোর জন্য প্রাণ লালারিত—মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়াই মন আলোর জন্য ধাবিত হয় । কিন্তু অগ্নি মন সমুদ্রের ভৌতিক আলোর যুদ্ধকরী প্রথম দাঁড়াতেই পড়িয়া যায় ! প্রথমে সেই আলোতে মন বড় বড় হয়—মোহে জ্ঞানলোপ হইয়া যায় । কিন্তু কৈ, প্রাণের পিপাসাত গিটে না ! ক্রমে সেই আলোতে আত্মা অগ্নিয়া জন্মের স্তরে স্তরে পোড়াইতে থাকে । শেষে সেই আলো-আওনেই তুচ্ছ মানব-ক্রীড়নের অস্ত্রোপক্ৰিয়া সম্পাদিত হয় । অগ্নিয়াই যে অস্ত্রকৃত আলোর জন্য এত কাদিয়া উঠে, তাহা বাহ্যজগতের সামগ্রী নহে,—তাহার জন্য

মুদ্র অবেশণ করিতে হয় না। অথর্জগৎ অনুসন্ধান কর, সেই আলো দেখিতে পাইন। বাহ্য আলোকের ভৌতিক আলোক-ধাঁধায় না পড়িয়া সেই অন্তর্ভূত আলোর জন্য আত্মনির্গমণ কর—আপনার মত্তা ভূমিগা বাও—জগৎ স্বতঃই সেই আলো উল্লাসিত হইবে।

মহাভ্রমণ বাহ্য আলোর জন্য জ্ঞান চারাইয়া ক্রিপের নাগ চারি দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু হায়, জগৎমেও কেহ এক দিন ভাবেন না যে, সেই আলোই তাহার মূহা—মূর্ত্তিমান কালের শিখাময় জলন্ত নিবাস। এই আঁধার-সংসার আলোর জন্য লানাদিত—মলোর জন্য অহুতপ উঠেবরে চীংকার করিতেছে;—কিন্তু পাপল, আলো কোথায় ? অন্ধরাকাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন। জাহ্ন, তোমার ভৌতিক আলো এ ঘোর আঁধারে কি আলো জালিতে পারে ? তোমার আলোক কয়লাকে পুড়াইয়া চাই করে,—কিন্তু তাহাকে হীরকে পরিণত করিতে পারে না। প্রকৃত আলো চিনিতে না পারিয়া তোমার আলোর কুহকময় দীপ্তিতে পুড়িয়া এই দগ্ধ-সংসার প্রমত্ত-চিত্তাপূর্ণ ভীষণ শ্মশান হইয়া বাইতেছে।

ঘোরজাহ্ন অবেশ মানব জন্মিয়া মরণান্ত পর্য্যন্ত প্রকৃত আলো জন্মে ভৌতিক আলোকে পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে। শৈশব—পতনের নাগ মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া প্রদীপ দীপ-শিখাকে আলোজ্ঞানে ছুটিয়া ধরিতে বাইতেছে।—সেই আলোকে আলো না পাইয়া, তাহার লব্ধ উত্তাপে কলদিয়া, শেষে উত্তরবে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। ঘোবনে—আলো ভাবিয়া, রমণীর হাসিতরা চক্ষু মুগ্ধ মোহাগতের বক্ষে ধরিয়া চুষন করিতেছে।—কিন্তু হায়, মূধা কোথায় ?—সে চুষনে যে হলানল উঠিতেছে, তাহার অসহ্য আলাতেই অর্জরীভূত হইয়া আজীবন ছট্‌ফট করিয়া মরিতেছে ! ধৌড়ে—আলোভমে প্রিয়দর্শন পুত্রকে সম্মেহে আলিঙ্গন করিতেছে।—হুদিন পরে সেই আলোই আবার বস্ত্রাঘাতে পরিণত হইয়া সর্পশরীর দগ্ধ করিতেছে !—কখন বা সেই আলো সংসার-ছায়াবাণির ঐশ্বর্যালিক ধাঁধাতে মুগ্ধ করিয়া—সেই স্বতঃউদ্ভূত প্রাণের পিপাসা ভূলাইয়া অকারণে জদ-কমরে জলন্ত আঁধার রানি ঢালিয়া দিতেছে। মহাজাহ্ন মানব আলো ভাবিয়া ঐশ্বর্যের অতি ভীত অথচ নেত্রমুগ্ধকর—আঁধারমরকর আলোক

ধরিতে উর্কখানে ছুটতেছে,—কতবার পড়িতেছে, পা ভাসিতেছে, বাস
কর হইতেছে, হৃদে রক উঠিতেছে,—তাহাতে দৃকপাতও নাই। হৃদই
জান হারাইয়া ছুটতেছে, মনিকাননের সেই ঐন্দ্রজালিক আলো মরীচিকার
ন্যায় ততই নর্জিত হইয়া সংযমে আগে আগে সরিয়া যাইতেছে, আলোর সাধ
নিটাইনার প্রলোভনে মগ্ন করিয়া এক লক্ষণ অতি ভয়ঙ্কর অলস আলোক-
প্রাচুর্যে ডাড়িয়া দিতেছে। শেষে কৃত্রিম হরিণের ন্যায় প্রলোভিত হইয়া
অনন্ত সংসার-মরুভূমে ভীষণ ভালো-মরীচিকায় পড়িয়া,—সেই আলোতে
আঁধার দেখিয়া,—পড়িয়া সরিতেছে! বার্কো—ভৌতিক আলোতে দগ্ন
হইয়া, হতাশ অস্থিরে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। অন্ধকারময়-অতীতে
অন্ধকারময়-মৃত্যির ভীষণ দংশনে আর্জিনাদ করিতেছে,—শেষে, পরিণাম ত
আঁধার ভিন্ন কিছুই নয়! সেই আঁধারেই ত—অলস আঁধারের সাক্ষাৎ-
মূর্তিরূপে মনুষ্যালোকের মহাসমাধি গঠিত হইতেছে!

তাই বলি মহাজ্ঞান, তোমার আলো আলোই নহে। তোমার আলোর
পরিণাম ত অন্ধকার! তোমার আলোই ত অন্ধকারের মূল। তোমার
আলোই সমগ্র মহাব্যাক্তিকে অন্ধতমসাজ্বর ভীষণ অন্ধরূপে ফেলিয়া দেয়।
আঁধার হৃদয়ে অলস অন্ধকার ঢালিয়া দেয়। তোমার আলোতে প্রথমেই
গন্ধ ঝলসিয়া যায়—পরে যে অস্তর পুড়িয়া ছাই হয়। কিন্তু কৈ, অতর্জাত
প্রাণের মহাপিপাসা—সেই স্বতঃ উদ্ভূত আলোর জন্য দারুণ তৃষা একটুও ত
মিটে না! আত্ম, দুশ্চাকারনয় তম্বাচ্ছাদিত জগদে প্রকৃত আলোর সম্ভব
কোথায়? অন্ধর অন্ধকারে তরা।—জীবন অন্ধকারে পূর্ণ। এ যৌর অন্ধকার
ভেদ করিয়া আলোর ছায়া এ বদ্ধ হৃদয়ে আসিতে পারে না।

অনন্ত অন্ধকারের অনন্ত প্রবাহে অনন্তকাল ভাসিয়াই বেড়াইতেছি,—
কখন কূল পাইলাম না! তবে আলো কোথায় পাইব? অনন্ত অন্ধকারে
ভাসিলাম—আবার ভাসিতে ভাসিতে ঘোরাক্ষকারের ভিতর দিয়া আঁধারময়
জননীঅঁঠরে প্রবেশ করিলাম। যেন এক মহাসমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে,
প্রবলতরঙ্গ-প্রবাহে এক অসীম ক্ষুদ্র সরসীমধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তার
পর যখন বাতর্গত হইতে এ সংসারে আসিয়া পড়িলাম, তখন এ বদ্ধ
সংসারের অন্ধকার আরও অলস—আরও ভীষণতম বোধ হইল। যে

অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই আসিলাম। এতদিন অন্ধকারে ভাগিতে-ছিলাম—সে দিন যেন অন্ধকারের ঘোর তিমিরগর্ভে নিমগ্ন হইলাম। এবারও অশ্রিগা কৈ আলো পাইলাম না দেখিরা, আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিলাম। ক্রমে সেই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইতেছে। বয়স যত বাড়িতেছে, অস্তরের অন্ধকার ততই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। ক্ষুদ্র জগৎ ঘোর অন্ধকারের ভীষণ পেশণে পেশিত হইতেছে।—সূচীভেদ্য অন্ধকারের তীক্ষ্ণধার সর্পাঙ্গে আমূল বিদ্ধ হইতেছে। অস্তরে—বাহিরে অন্ধকার! এই অনন্ত অগৎ সংসার অন্ধকারে পূর্ণ—অন্ধকারে মাধামাধি।

অতীত—বর্তমান—ভবিষ্যৎ অন্ধকারের ভীষণ ছায়াতে ঘোর বিভীষিকা দেখাইতেছে। অতীত—অন্ধকারের জলন্তগর্ভে নিহিত ছিলাম, সে দিকে আর দৃষ্টি করিবার শক্তি নাই—ভাবিতেও জগতের অন্ধকার যেন ভীষণ-আলায় চলিয়া উঠে। বর্তমানে—অন্ধকার বন্ধে সাতারাইয়া বেড়াইতেছি—কত জলন্ত-আঁধারময় প্রবল তরঙ্গাঘাতে হাবুডুদু ধাইয়া, সমস্ত বিশ্ব-সংসারেই অন্ধকারের জলন্ত জীবন্ত-মূর্ত্তি দেখিরা সন্মানে কাঁদিয়া উঠিতেছি। ভবিষ্যতে—অন্ধকার—আরও অন্ধকার; আরও তদানিক।—অন্ধকারের ভীষণ জলন্ত-কুণ্ড সেই দিকে আত্মদান করিতেছে। প্রেতাত্মার লীলাভূমি ঐ মহাশয়ান অন্ধকারের জলন্ত-আঁধার-চিতাতেই সংকার সাধিত হইবে। ঐ ভীষণ আঁধার-প্রবাহেই ঐক্কেবৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। তাই, আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—একই।—সেই একই অন্ধকারের একই জলন্ত আঁধারময় রূপে নিহিত।

অন্ধকারে ছিলাম—অন্ধকারে আছি—আবার অন্ধকারেই ঘাইব। আমি আঁধারে উদ্ভিত—আঁধারে বর্জিত—আবার আঁধারেই বিলুপ্ত হইব। হায়! আমি আলো কোথায় পাইব? শক্তি-উপাসক মহাশক্তির সেই ঘোর-মনীষণী কাল-কয়াল-কাদম্বিনী কালিকামূর্ত্তিতে বিশ্ব-ভুবন-প্রকাশিনী অগৎ-সংসার-হাসিনী অনন্ত দিবা-আলোক দেখিতে পায়। সাধক বৈকব মহা-পুরুষের সেই সূচিকণ নবজলধর-শ্যাম কৃকমূর্ত্তিতে বর্ণের অনন্ত ঘোষাতি—মহাপ্রেমের বিশ্বজনীন ভাব দেখিতে পায়। ঐহাদের মন অনিত্য সংসার-পথ-জালে অড়ীভূত নয়—ঐহাদের জগৎ অনন্ত-ভৌতিক-আলোর ছায়া-

বাগিতে নিমোহিত নগ, সেই ধ্যাননিরত মহাযোগীগণও অন্ধকারের অতি ভীষণ বিকট-মূর্তিতে পূর্ণপুরুষের পূর্ণ-জ্যোতির্শ্রয় মূর্তির পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পান—এই অনন্ত-ধোর-আঁধারেই অনন্ত-পুরুষের শান্তিময় অনন্তব্যাপ্ত মহা জ্যোতি দেখিতে পান। যেন প্রতি অন্ধকার-কণিকাতে সেই অনন্ত-পুরুষের নীলিমায় জ্যোতিস্থান্ অনন্তদেহ ভাসিতেছে ! কিচ্ছ হার, মহাজ্ঞান বোর তামসিক আঘাঘের কি পূণ্য আছে যে, সে আঁধারের আলোক—অসারের সার—অসত্তের সং স্রব্দের অলভ্য মণিকে দেখিতে পাইব !

সে অলভ্য অন্ধকারেই চতুর্দশ ভুবন বিভাসিত। সেই অন্ধকারই চাঁদের আলো;—ফুলের প্রাণহরা সুবাস;—শিশুর তথ্যমাধ্যম অর্জুন্ট কথা,—রমণীর প্রেমতরা দৃষ্টি;—কোশিলের প্রাণপোরা পঞ্চময়র,—নির্ঝরিণীর ত্রুতি-মধুর বর্গীর সঙ্গীত,—কৌশলীমাধান নৈশ-সমীরে বাসভীবনরীর ঈশ-দোলনী। অন্ধকারই হৃৎ। অন্ধকারই প্রাণ। অন্ধকারই জীবনের আলো। অন্ধকারই সর্বস্ব। অন্ধকারেই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি—অবস্থান—লয়। সে অন্ধকারই আলো।—সে অন্ধকারকে জগতের সহিত ভালবাসি।—তাই এ আঁধারময় জগরে অলভ্য অন্ধকার এত ভাল লাগে। কিন্তু সে রহস্যময় অন্ধকার তোমার আমার নিকট অন্ধকার হইলেও, তাহাই প্রকৃত আলোক। প্রকৃত বোণী না হইলে, সে আঁধার-রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত আলোক—বাহার পিপাসা জন্ম হইতেই অন্তরে স্রবঃ উদ্ভূত হয়—সে আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্বপ্নময় আলোই বোর আঁধার !—অলভ্য অন্ধকার ! হার ! কবে আঁধারে আলো, ও আলোতে আঁধার দেখিতে পাইব ?

জিম্বেলেনাথ মিত্র ।

সুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা ।

বেদের অনিত্যতা—সাহেবদিগের মত ।

বুষ্টি পতিত হইয়াই বাষ্পাকারে পরিণত হয় অথবা চন্দ্রাদিতে অন্তর্হিত হয় অতএব বুষ্টি নিরুত্ত হইলে ঐ পূর্ণোক্ষ মন্ত্র পাঠ করিবে। চন্দ্র পর্ষ

দ্বিবেশে সূর্য্যের অভ্যন্তরে নীল হয়, চন্দ্র সূর্য্যের অভ্যন্তরে সেইরূপ নীল হইয়া অদৃশ্য হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। সূর্য্য অন্তঃগত হইয়া অগ্নিতে নীল হন, অতএব সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রার্ননামন্ত্র পাঠ করিবে। অগ্নি আকাশে অন্তর্হিত হন, অতএব অগ্নি নির্বাণ হইবার সময় সেই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। আমরা পূর্ব্বোক্ত শব্দ দেবতার নয় স্থান বলিয়া বাহাদিগকে নির্দিষ্ট করিলাম, তাহাদিগকে উহাদের উৎপত্তি-স্থান বলিয়াও জানিবে। অগ্নি আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং নিবাস প্রবাস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, অতএব অগ্নিকে পুনর্বার বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—“অগ্নি পুনর্বার প্রত্যাভ্যবিত হৌক্ ; কিন্তু আমার শত্রু যেন পুনর্বার উৎপন্ন না হয়, সে একেবারেই বিনষ্ট হৌক্।” এইরূপ সূর্য্যকে অগ্নি হইতে পুনর্বার উৎপন্ন হইতে দেখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—“সূর্য্য পুনর্বার উদ্ভিত হৌন ; কিন্তু আমার শত্রু যেন আর উৎপন্ন না হয়” ইত্যাদি। এই অভিচার বা শত্রু-ধ্বংসন যজ্ঞের অমুষ্ঠাতার কর্তব্য—“শত্রুর বনিবার পূর্ব্বে তিনি বসিতে পারিবেন না, অন্যদিকে যতক্ষণ শত্রুকে দণ্ডায়মান বিবেচনা করিবেন ততক্ষণ শয়নও দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। শত্রুর শয়ন করিবার পূর্ব্বে শয়ন করিবেন না, কিন্তু শত্রু যতক্ষণ বসিয়া থাকিবেন ততক্ষণ বসিয়া থাকিবেন। এইরূপ শত্রু যতক্ষণ নিদ্রা না যাইবে তাহার মধ্যে তিনি নিদ্রা যাইবেন না, কিন্তু শত্রুকে যতক্ষণ আগ্রিত বিবেচনা করিবেন ততক্ষণ আগিয়া থাকিবেন। এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিলে শত্রুর মস্তক প্রস্তরনির্ম্মিত হইলেও তাহা ধ্বংস হইয়া যাইবে, শত্রু বিনষ্ট হইবে।

এই ঐতরেয় বা অন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থনিচয়ে যে সকল উপকথা বা গল্প লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা যজ্ঞ বিশেষের (বাহাদিগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) মূল এবং ফল কেবল স্পষ্ট করিয়া দৃষ্টান হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল উপকথা বা গল্প বৃষ্ট হয়, তাহাদিগের একটি অতি অপূর্ব্ব এবং অনেকাংশে সমালোচ্য ঐ কথা, হোতা নামক আচার্য্য সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র আগনে উপবিষ্ট হইয়া অতিষিক্ত রাজার নিকট বসিবে, এবং আর এক জন পুরোহিত উক্ত রূপ মহার্ঘ আগনে উপবিষ্ট হইয়া হোতার বাক্য সকলের পুনরাবৃত্তি করিবে। বিদ্যাগাংমী নরপতি যখন স্বহস্তে যজ্ঞকার্য্যের অঙ্ক-

ঠান না করিলেও এ গল্প শ্রবণ করিতে পারেন। এবং সম্ভবতঃ পুত্র মনুষ্য বধি নিয়মপূর্ণক ঐ কথা শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহার পুত্র লাভ হয়। ঐ গল্পের নাম শুনাশেষের গল্প—উহা এইরূপে রচিত।

কোন সময় ইক্ষাকু বংশোদ্ভব বেধার পুত্র হরিশ্চন্দ্র নামক রাজা হইয়া ছিলেন। তাঁহার শত স্ত্রী মধ্যেও কোনটি দ্বারা পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সম্ভানলিপ্সা ক্রমশঃ পূর্ণাপেক্ষা বলবতী হইয়াছিল। এমন সময় একদিন পক্ষত এবং নারদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর নারদ নারদ তাঁহার সম্ভানলিপ্সির উপদেশ করিলেন।

নারদের উপদেশানুসারে মহারাজা হরিশ্চন্দ্র জলাধিপতি বরুণের স্তব করিয়া বলিলেন, যদি তাঁহার প্রসাদে পুত্র লাভ হয়, তবে তাঁহার নিকট ঐ পুত্রকে বলিদান করিবেন। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তখন বরুণ সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বলি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন, “পশু দশ দিন অতীত না হইলে বলিদানের উপযুক্ত হয় না, অতএব আমার পুত্রের দশ দিন অতীত হৌক্, আমি বলিদান করিব।” বরুণ বলিলেন, তথাস্ত। তাহার পর দশ দিন গেল, বরুণ আবার আসিয়া প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পশুদিগের দন্ত না উঠিলে বলি দিবার যোগ্য হয় না, অতএব আমার পুত্রের দন্ত উঠুক, তবে বলিদান করিব। বরুণ আবার বলিলেন তথাস্ত। ক্রমে রোহিতের দাঁত উঠিল, বরুণ সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পশুদিগের হৃদে দাঁত যখন খসিয়া যায় তখন তাহারা বলি দিবার যোগ্য, আমার পুত্রেরও হৃদে দাঁত খসিয়া যাউক, বলিদান করিব। বরুণ পুনর্বার তথাস্ত বলিলেন। ক্রমে রোহিতের হৃদে দাঁত ভাঙ্গিল। বরুণ আসিয়া উপস্থিত। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন পশুদিগের যখন হৃদে দাঁত ভাঙ্গিয়া আবার উন্মিত হয়, তখন তাহারা বলিদানের যোগ্য হয়, আমার পুত্রের দাঁত আবার উঠিলে বলিদান করিব। বরুণ সে কথাও মানিলেন। রোহিতের আবার দাঁত উঠিল। বরুণও নাছাড়-বাঁদ। দাঁত উঠার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যোদ্ধা এবং বীরপুরুষও বলির উপযুক্ত, সাত্র আমার পুত্র অস্ত্র ধরিতে শিখুক বলি দিব। বরুণ অপরূপ তাহাও স্বীকার করিলেন। রোহিত ক্রমে অস্ত্রে

পারদর্শী হইলেন। রোহিতকে অস্ত্রে পারদর্শী দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র আমি তোমাকে বরুণের প্রদানে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমি তোমাকে বরুণের নিকট বলিদান করিব। তাহাতে রোহিত অশীকার করিল। তাঁহার নিষেধ ধনুকখানি হস্তে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। এক বৎসর সেই বনের মধ্যে বাস করিল। ঐদিকে বরুণ আদিয়া হরিশ্চন্দ্রকে মেঘরোগ প্রস্তুত করিলেন। অগত্যা হরিশ্চন্দ্র কিছুকালের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। রোহিত এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রের নিকট যাইয়া সমুদয় আদেশ-পালন বর্ণন করিল। ইন্দ্র তাহাকে নিরুশায় দেখিয়া ছয় বৎসর অবধি সেই নিবৃত্ত অরণ্যে বাস করিতে বলিলেন।

অনন্তর রোহিত বরুণের নিকট পিতৃ অঙ্গীকৃত সময়ের অবসান দেখিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অরণ্যে অজিগর্ত ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অতি দরিদ্রাবস্থায় দেখিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। একটির নাম শুনম্পুচ্ছ, দ্বিতীয়ের নাম শুনঃশেফ, তৃতীয়ের নাম শুনোলাজুল।

রোহিত তাঁহাকে বলিলেন, যদি সেই ঋষি রোহিতের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিদানার্থ একটি পুত্র অর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একশত গাভী দিবেন। অজিগর্ত তাহাতে সন্মত হইয়া আপনার মোষ্ঠ পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার দ্বী ছোট পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, উভয়েই শুনঃশেফকে বলিদানার্থ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। রোহিত তাঁহাকে আপনার পিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং হরিশ্চন্দ্র ও বরুণও উভয়েই এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। কারণ, ব্রাহ্মণের শরীর ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে বলিদানার্থ পুত্র প্রতিনিধি শুনঃশেফকে কখনা করিলেন। ঐ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতৃর কার্য করিয়াছিলেন, জমদগ্নি অধ্বর্যুর কার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কার্য করিয়াছিলেন। এইরূপে মূল কার্য সম্পূর্ণ হইলে বলিদানের অবসর হইল। কিন্তু শুনঃশেফকে গ্রন্থকাষ্ঠে বন্ধন করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। ঐ সময় অজিগর্ত ঋষি বলিলেন, তাঁহাকে আর এক শত গাভী দিলে তিনি ঐ কার্য সমাধা করিবেন। তাঁহারা সকলে সে প্রস্তাবে সন্মত হইলেন।

অনন্তর স্তনঃশেক পপিভা কর্তৃক মৃণকাঠে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইল না। আবার অঙ্গিগর্তে বয়ঃ অগ্রসর হইলেন, তিনি আবার পূর্বের মত বলিলেন যে আর এক শত গাভী দান করিলে তিনি বহুস্তে স্তনঃশেককে বলিদান করিবেন। তাঁহার সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে অঙ্গিগর্তে অগ্নি শাণিত করিয়া তাঁহার পুত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতা বয়ঃ শাণিত বড়গা লইয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে পুত্র আর কাহার শরণ লইবে? তখন স্তনঃশেক ছল ছল কাতর চক্ষে উর্দ্ধ-মুখ করিয়া আপনার মুক্তির নিমিত্ত দেবতাদিগের শরণাপন্ন হইল। সে প্রথমে কণ্ঠের একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজ্ঞাপতির স্তব করিল। প্রজ্ঞাপতি বলিলেন, তুমি অগ্নিকে স্তব কর, তাহা হইলে কৃতকার্য হইবে। স্তনঃশেক আর একটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করত অগ্নির শরণাপন্ন হইল। অগ্নি বলিলেন তুমি সান্বিত্রীকে শরণ লও। সান্বিত্রী ঐরূপ আহূত হইলে তিনি বলিলেন বরুণকে শরণ লও, বরুণ আবার তাঁহাকে অগ্নির নিকট প্রেরণ করিলেন। বালক স্তনঃশেক অতি কাতরভাবে আবার অগ্নিকে আত্মান করিল। অগ্নি বলিলেন, তুমি একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সন্ধ্যা বেগগণকে স্তব কর, স্তনঃশেক তাহাই করিল। তখন তাহার বকন ঘোচন হইল। হরিত্ত্র ও পীড়া হইতে মুক্ত হইলেন। বকন মুক্ত হইয়া যখন স্তনঃশেক বিবামিজের নিকট তংপিভা কর্তৃক নীত হইলেন, তখন বিবামিত্র বলিলেন, “না, ইহাকে আর তুমি পাইতেছ না, দেবতারা ইহাকে আগায় অর্পণ করিয়াছেন।” সেই সময় হইতে তাঁহার নাম স্তনঃশেকের পরিবর্তে দেবয়াত হইল, এবং বিবামিজের পুত্র বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি হইল।

উপরে বাহা বলা হইল তাহাতেই বোধ হয় পাঠকগণ মুক্তি পাবেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সাধারণত ভাবটা কিরূপ। ইহা পর কেবল প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলেই হইবে। তাহাদের পরস্পরের সার্থক্য বুঝিতে হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সমালোচিত বৈদিক কৃত্য সকলের বিষয় সমালোচনা করা আবশ্যিক, এবং সেই প্রাচীন সময়ের উপন্যাসগুলির অবস্থাও ভালরূপে আলোচিত করিতে হয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীমদ্বৈকেশ শাস্ত্রী।

হেমচন্দ্র ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

দেখ, সম্মুখে ঐ নীলনীরদধবং অনন্তবিস্তৃত অশ্রাহবাহিনী ভাগীরথী কল কল করে ছড়রের কি এক স্বপ্নময় গান গাহিতে গাহিতে দীর-তরঙ্গ-বিক্ষেপে কে জানে কোথায় বহিয়া চলিয়াছে । সেই গানে মজিয়া উর্ধ্বের পর উর্ধ্ব ঝড়ঝড়ি করিতে করিতে তালে তালে নাচিতেছে । দুই পার্শ্বে কত পল্লী, কত গ্রাম, কত নগর নেই গান শুনিবার জন্য অন্য অন্য গ্রামাদি পিছে রাখিয়া আগে হইতে সেই তীরে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে,—জন্মেপ নাই, ভাগীরথী আপন মনেই গাহিয়া চলিয়াছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ अपना আপনাই নাচিয়া বাইতেছে । তীরের বড় বড় গাছগুলো অবাধ হইয়া তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে । আশে পাশে অগণা শোভা ভাগিতেছে । দূর হইতে আরও নৌকা আসিতেছে—দেখিতে দেখিতে আবার চলিয়া বাইতেছে । বৃক্ষগুলো দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাও দেখিতেছে, কখনও কোন ক্ষুণ্ণগামী নৌকার পক্ষাৎ পক্ষাৎ ছুটিতেছে, ধরিতে পারিতেছে না, জাঁ জাঁ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে, তখন ভ্রান্তির ঘন নিবাস ফেলিয়া যে যাহার স্থানে ধমকিয়া দাঁড়াইতেছে । নৌকার পর নৌকা কত এল, কত গেল, একখানিও ধরিতে পারিল না । দূরে বেলা বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল । সেই সময়ে একখানি ভাউলে সন্ সন্ করিতে করিতে অতি তীব্রবেগে বহিয়া বাইতেছিল ; দুই ধারের গাছগুলো বড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বড়ই দোঁড়াবোঁড়ি আরম্ভ করিল । পারিল না । পলকের মধ্যে নৌকা তাহাদের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া বাইতে লাগিল । সে নৌকা-রোহীর মধ্যে একমাত্র শ্যামস্বন্দর বাবু বসিয়া বসিয়া কেবল বারবার শুড়ি খুলিয়া দেখিতেছেন, আর মাঝিকে শীঘ্র বাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন । মাঝি কিন্তু মাঝিগিরির চাল ছাড়ে না । সে হালে হাত দিয়া চূপ করিয়া বসিয়া আছে, আর তিনটা দাঁড়ীর দাঁড় টানিয়া গ্রাণ বাহির হইয়া বাইতেছে ।

বাড়িরে বাবুর এক ভূতা বসিয়াছিল। তাহার কিছুকিনি গোছের একটি নিজা আসিয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া নিশাইতেছিল। নৌকার অন্য লোক ছিল না।

দেখিতে দেখিতে নৌকা কলিকাতা বড়বাজারের ঘাটে আসিয়া লাগিল। বাবুর মুখমণ্ডল দীর্ঘ হর্ষপ্রস্থ হইল। এতবার চারিদিকে চাহিলেন। কি অপূর্ণ শোভা! জাহ্নবীর জল অবিরল উছলিয়া উছলিয়া চলিয়াছে; জলের উপর অগণ্য পোত। স্থানে স্থানে জল পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। কোথাও পান্থী বা ভাউলে করিয়া অসংখ্য আরোহী গতায়াত করিতেছে; কোথাও ডিকি করিয়া জেলেরা মাছ ধরিতেছে; কোথাও বড় বড় ভড়, বগরা ও মহাজনি নৌকা সকল বিপুল শরীর ভাসাইয়া মত্তরগতিতে চলিয়াছে; কোথাও শীমার বায়ুবেগে জল কাটিয়া চলিয়া বাইতেছে—উপরে ধুম উঠিতেছে, ঢাকা অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, কলে কেবল ‘তফাত তফাত’ শব্দ হাঁকিতেছে; ক্ষুদ্র নৌকাগুলি ভয়ে বিল হাত তফাতে গিয়া খেরা দিতেছে। বড় বড় জাহাজ সকল এ সব দেখিয়া নীরবে একস্থানে দাঁড়াইয়া এ উচীর পানে কটাক্ষে চাহিতেছে, আর মাস্তুলের বস্ত্র সকলনে আপনাদিগের বিপুল দেহ-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরাণ্ডা অগ্নীবনিমজ্জিত হইয়া মস্তকোত্তোলন পূর্বক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতেছে, আর ঢেউ আসিয়া তাহার চোখে যুখে জল ছিটাইয়া দিতেছে। দূরে শব্দক ভুবিতেছে, উঠিতেছে, উঠিয়া আবার ভুবিতেছে। ঘাটে অসংখ্য লোক—বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী—কেহ স্থান করিতেছে, কেহ কাহাকে স্থান করাইতেছে, স্থানান্ত্রে কেহ পূজা করিতেছে, কেহ কোটা কাটিতেছে, কেহ পা রগড়াইতেছে, কেহ ডুব দিতেছে, কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ অপরের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেছে—অপূর্ণ শোভা—তীরের উপর ততোধিক আরও অপূর্ণ শোভা। অমরাবতীর সৌন্দর্য্যকে অধঃকৃত করিয়া ইংরেজের রাজধানী কলিকাতা নগরী শোভা পাইতেছে। নানা বর্ণের নানা প্রকার বাড়ী কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া, তাহার পদপ্রান্তে হৃৎপ্রস্তু রাজপথ, সেই রাজপথে জলশ্রোতের ন্যায় জনশ্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কোলাহলে দিক্ পুরিয়া উঠিতেছে। সে সব কি দুই চক্ষে দেখিবার? মাহুষের সব

কয়টা ইন্ডিয়ান যদি চন্দ্র হইয়া যায় তবু সে শোভা দেখিয়া জ্বাটরা উঠে না । কিন্তু এ সকল দেখিবার সময় তাহার নাই । ঠাৎ করিয়া একটার ঘড়িতে বা পড়িল । ব্যস্ত হইয়া বাবু উপরে উঠিলেন । নৌকা যখন তীরলগ্ন অসংখ্য নৌকাজেলী ভেদ করিয়া ঘাটে আসিয়া লাগে, তখন সম্মুখস্থ একখানি নৌকার মাঝি আপতনোন্মুখ নৌকাখানি একগাছি লগি দিয়া ঠেলিয়া দেয় । ঠেলিতে গিয়া লগি সেই নৌকার উপরস্থ ভূত পরমানন্দের গায়ে লাগিল । পরমানন্দ তখনও বসিয়া বসিয়া কিম্বাইতেছিল, আর বাবুর বাড়ীর বামা দাসীর সেই বাউড়ীপরা গোলগাল হাতখানির কথা ভাবিতেছিল । বামা দাসীর হস্তের সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশের সংস্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে এ স্পর্শটা তাহার বড় ভাল লাগিল না । অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি করিয়া একবার পিঠের উপর হাত দিল । দুম তাড়িয়া গেল । জাগিয়া সে বাহা দেখিল তাহাতে বিস্মিত হইল । বাবু তখন উপরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া ক্যাল ক্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল । কিন্তু তার পরই দেখিল, বাবু একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিতেছেন এবং তাহার প্রতি কতকগুলি সাধুশস্য প্রয়োগ করিতেছেন । সুতরাং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বশে পরমানন্দ তথায় বিলম্ব করা অকর্তব্য বিবেচনা করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া ধীরে ধীরে গাড়ীর উপরে গিয়া আরোহণ করিল । ঘর্ষণ চক্রে গাড়ি ছুটিয়া চলিল । বামাদাসীর হাতটা আচম্বিতে কেমন করিয়া একরূপ অকোমল ও তিক্তস্পর্শ হইল পরমানন্দ কোচবান্ধে বসিয়া এক মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল ।

অন্নকণ মধ্যেই গাড়ী আসিয়া লালদিঘির উত্তর পশ্চিম কোণে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড কটকে লাগিল । সেই বাড়ীতে গলপ্তন পামর কোম্পানির আফিস । হৌস্ বড় ভারি । প্রবাদ এত বড় সন্ধানর এদেশে আর কখন আসে নাই । সাহেব যেমন কারবারি, তেমনই অমায়িক । বিশেষ গুণ, তিনি বড়ই বাঙ্গালি-ঘেসা । কারবারও খুব ফেলাও । সদা-গরির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকের কাজও চলিত । সাহেবের হৃদের হার বেণী, সুতরাং অনেকে বেঙ্গল ব্যাকে টাকা না রাখিয়া সেই সাহেবের আশিষেই টাকা রাখিত । প্রকাণ্ড বাড়ী, অগণ্য কেরানী - হৌস্ সর্বদাই লোকে

গিস্গিস্ করিত। টাকার কন্কনানি, লোকের কলকলানি, দালাল মুৎসুদ্দি, ক্রেতা বিক্রেতার হনুহনানিতে পার্শ্ববর্তী স্থান পর্য্যন্ত গম্ভগম্ভ করিত। কিন্তু এ কি! আশ সে প্রকাণ্ড পুরী শূন্য কেন? গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে গেলেন। ঘর ভুজ্জ। অনমানবের সাড়া নগ্ন নাই। সেই প্রাসাদ-সদৃশ অট্টালিকা নির্জনতার ভীষণভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ কি এ? তাঁহার বুকের ভিতর হুপ্ হুপ্ করিতে লাগিল। প্রত্যেক দরজায় করাঘাত করিতে লাগিলেন, সকল দরই ভুজ্জ। তখন দরবানের গৃহে গেলেন। গৃহ অনশূন্য। হতাশ হইয়া বাহিরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভদ্রলোকটি তাঁহাকে তববাহু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয় কাহাকে খুঁজিতেছেন?”

এতক্ষণে বাবুর বেহে যেন অর্ধেক প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তিনি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন “এই সাহেবকে খুঁজিতেছি, হৌগ্ কি আর কোন আরপায় উঠিয়া গিয়াছে?”

ভদ্রলোকটি কিছু আশ্চর্য হইল। বলিল, “সে কি, আপনি শোনেন নি, সাহেব বে ফেল হইয়াছে। কোট তাঁহাকে ইসল্ভেণ্টে দিয়াছে।”

অকস্মাৎ বাবুর মস্তকে কে যেন লগড়াঘাত করিল; কিম্বৎকালের জন্য তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হরিয়া গেল। কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহা দেখিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন “আপনি কি কলিকাতায় থাকেন না, কোথা হইতে আসিতেছেন?”

“আসিতেছি—আসিতেছি অনেক দূর হইতে—তা, সাহেব সত্যই ইসল্ভেণ্টে হইয়াছে—কবে হইয়াছে, মহাশয়?”

“সত্যই হইয়াছে—কাল পাঁচটার সময় হুকুম হইয়া গিয়াছে।”

সে ভদ্রলোকটি আর ধাঁড়াইলেন না। শ্যামসুন্দর বাবুকে এক্রপ আকুল দেখিয়া আরও গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দূরে তাঁহার প্রভুর গাড়ি টিকিনের পর ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সতয়ে সশব্দে একদিক্ দিয়া সরিয়া পড়িলেন। দ্বির হইয়া শ্যামসুন্দর সেইখানে দাঁড়াইলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। স্বরিতপদে বাহিরে আসিলেন। পপে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। পার্কদ্রীটে সাহেবের বাসা - গাড়ি সেইখানে দাঁড়িতে বলিলেন। গাড়ি অর্ধ ঘণ্টা মধ্যে একটি নির্জন বাটার ফটকে গিয়া পৌঁছিল। গাড়ি হইতে নামিয়াই বাবু সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে গেলেন। বাহিরে বেহারা বসিয়াছিল, সে রুপিল। বাড়ীনিম্নস্তি না করিয়া তাহার হাতে একটি টাকা ফেলিয়া দিলেন। সে আর বিশেষ কোন আপত্তি করিল না। বাবু একেবারে উপরে উঠিয়া পড়িলেন। বারান্দায় সাহেব পাশ্চাত্য করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বারান্দার বাহিরের দিকে চিহ্ন ফেলা ছিল। বাবুকে উপরে দেখিয়াই সাহেব একটু বিস্মিত হইল - একটু খতমত ধাইল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া দ্রবংহাস্তে—“গ্যালো! বাবু, শুভমর্শিং” বলিয়া করমর্দন করিলেন। সাহেবটী খাস বিলাতী; আদম কাশ্মীর বড় পটু। মুখে হাসিটুকু সগাই লাগিয়া রহিয়াছে। সাহেব হাসিমুখে সেই অমলধবল হস্তে যখন বাবুর হাতখানি ধরিলেন, তখন যুদ্ধের অস্ত্র বাবু আপনার প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন তাহা বুঝিয়া পাইলেন না। তখন, বেহারা হুঁটখানি চৌকি দিয়া গেল। দুই মনে দুই খানিতে বসিলেন। “হাডু ডু” বলিয়া সাহেব প্রথমেই কথা আরম্ভ করিল। সে কেবল এ ও তা আপপাশ কথাই কহিতে লাগিল। আসল কথা পাড়ে না। কি বলিয়া আসল কথা উদ্ভাষন করিবেন বাবুও তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; তাহার ইচ্ছা সাহেবই আগে সে কথা পাড়ে। কিন্তু সে বৃত্ত সে দিকে যায় না। অন্য কথা কর, আসল কথা পাড়ে না। তখন, বাবু নিজেই তাহা পাড়িবেন মনে মনে স্থির করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সাহেব বড় চতুর, সে তাহা বুঝিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। বাবু যেন কিছুই জানেন না, কিছুই শোনে নাই, এমন করিয়া তখন কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন “বেলা গেল, আমি আপনার কাছে টাকার জন্য আনিয়াছিলাম, আপনি গিয়াছিলাম, আপনি বন্ধ দেখিয়া এখানে আসিয়াছি।

সাহেব হাসিয়া বলিল “উত্তম করিয়াছেন। আমার দোভাগ্য, আপনাকে আমার দরিদ্র কুটীরে আত্ম পাইয়াছি।”

শ্যামসুন্দর মনে মনে ভাবিলেন “সাহেব কি বিনয়ী।” সাহেব ভাবিলেন “মুখ বাঙ্গালীকে যদি কথায় ভুলাইতে না পারিব, তবে বৃথায় সাতসমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলাম।” প্রকাশ্যে বলিলেন “এতদিনে জানিলাম, আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু, যে হেতু এই বিপদের সময় দয়া করিয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন।”

বিপদ! বাবু একটু স্তব্ধ পাইলেন। বলিলেন “কি বিপদ হইয়াছে আপনার?”

সাহেব সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন—“কিছু বড় হুঃখ যে আপনারদের নারী অসুস্থ বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই বাইতে হইবে।”

শ্যামসুন্দর আত্মবে জিজ্ঞাসিলেন “আপনি কি অন্য কোথাও বাইবেন স্থির করিয়াছেন?”

স।। বোধ হয়, আজ না আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইত না।

শ্য।। হঠাৎ এরূপ কি বিপদ হইল যে একেবারে এখানে ছাড়িয়া বাইতে হইল?

স।। আমার জ্বর বড় কঠিন পীড়া, কিছুতেই আরাম হইল না। ডাক্তার বলিয়াছেন, ইংলিষ চ্যানেলের বায়ু সেবন না করিলে এ রোগ আরাম হইবে না।

শ্য।। তবে কি বিশ্রান্ত যাওয়াই স্থির হইয়াছে?

স।। কি করি, এতদিন এখানে থাকিয়া দেখিলাম, কিছুইতো উপকার হইল না।

শ্য।। এ অধীনদিগকে একেবারে ভুলিবেন না।

স।। হি হি! বলেন কি, আপনারা কি ভুলিবার? কফিনের ভিতর এ দেহ পচিয়া বাইবে, তথাপি আপনাদের স্মৃতি এ বুক হইতে মিলাইবে না।

শ্য।। এক্ষণে, আমাদের টাকা কড়ির হিসাবটা—

পাশের কামরা হইতে ক্ষীণকণ্ঠে কিসের শব্দ হইল। সাহেব জন্তে উঠিয়া বলিলেন, “মাপ করিবেন, আমার একবার গৃহের ভিতর বাইতে হইবে। বুকি মেগের অস্থখ বাড়িয়াছে।

সাহেব উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শ্যামসুন্দর একাকী তথায় বসিয়া

রহিলেন। হতবুদ্ধি, লুপ্তজ্ঞান, হতচৈতন্য। গৃহে আর কেহই নাই কেবল ভিত্তিগাত্রে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি টিক্‌টিক্‌ করিয়া অবিরাম শব্দ করিতেছে ; আর বুকের ভিতর তদধিক অবিরাম টিক্‌টিক্‌ শব্দ হইতেছে। উপায়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামসুন্দর বলিলেন, উপায়! নির্জনগৃহে সে শব্দের প্রতিধ্বনি হইল, কেহই তাঁহার উত্তর দিল না। দেয়ালের ঘড়িটা যেন তাঁহাকে দেখিয়া আরও তাহার আশ্রয় বাড়াইল। শ্যামসুন্দর অন্তর হইয়া পড়িলেন। উঠিয়া কয়েক পা বেড়াইলেন। আবার বসিলেন। আবার উঠিলেন। এমন সময়ে সাহেব সে গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিয়া শ্যামসুন্দরের তথ্য জ্ঞানে কতক ভরসা হইল।

সাহেব বলিলেন, “বাবু, আপনি একা রহিয়াছেন, সে জন্য আমি অসীম দুঃখিত। বাহিরে আসিবার আমার এখন সময় নহে, কিন্তু আপনাকে ফেলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আশ্বিত হইল”—এই বলিয়াই সাহেব “বেহারী বেহারী” বলিয়া ডাকিলেন। বেহারী আসিয়া সেলাম করিল। “যাও—ডাক্তার সাহেবকে বোলায় লে আও।” বলিয়া সাহেব চেয়ারে বসিলেন। বেহারী “যো হুকুম” বলিয়া দৌড়াইল। সাহেব চিন্তামান মুখে চুপ করিয়া রসিয়া রহিলেন। শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “মেম সাহেবের কি অসুখ বড় বাড়িয়াছে?”

না। অত্যন্ত। অদ্যই তাহাকে হারাইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

শ্য। আমায় তবে বিদায় দিন।

সা। আহ্ন।

সাহেব একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন “আমার হিসাব—টাকা কড়ি—”

সাহেব অপ্রসন্ন হইলেন। বলিলেন—“এরূপ অসুস্থ মনে কি করিয়া হিসাব হইতে পারে?”

শ্য। আপনি বিলাত চলিয়া যাইবেন, হয়ত আজ না আসিলে আর দেখা পর্যন্ত হইত না।

সা। তা কি করিব, আপনার হিসাব অপেক্ষা আমার মেম আমার বেশি প্রিয়।

শ্যামা। তাহা বলিতেছি না। কিন্তু অত শুভা টাকা—তাহার তো একটা কিনারা চাই।

সাহেব রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন “আমি আপনার কণের কথা জানাইয়াছি, আপনি কোর্ট হইতে আপনার পাওনা বুঝিয়া লইবেন।

শ্যামা। সাহেব, টাকা আমি আপনার হাতেই দিয়াছিলাম। কোর্ট তাহা জানিত না।

সাহেব। তখন জানিত না, এখন জানে। তুমি জানাও নাই, আমি জানাই-
য়াছি। ইংরাজ চোর নহে।

শ্যামা। আপনি রাগ করিবেন না। ভুলিলাম। আপনি ইন্সপেক্টিভ লইয়া-
ছেন, যদি তাহাই হয়, আমার ৫০ হাজার টাকা, কোর্ট হইতে ৫০ টা
কড়ি পাইবারও আশা আমার নাই।

সাহেব নিঃশব্দে ধরিলেন। বলিলেন—“তাহাই যদি জান, তবে এখানে
কি করিতে আসিয়াছ? ইউ অ্যারাক্ট নেভ! সন্ অক অ্যান ইনকার্ণাল
বিচ্!”

শ্যামা হস্তের যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তখনই একটা
হাতাঘাতি চইয়া যাইত। কিন্তু যে বাঙ্গালী কথা কহিতে নিষিদ্ধাই তাহার
পৈত্রিক বুলি আওড়াইতে অভ্যাস করে—“স্বানত্যাগেন দুর্জনাং”—সেই
বাঙ্গালীর বংশধর হইয়া শ্যামাবাসু যে হঠাৎ অন্যরূপ ব্যবহার করিবেন ইহা
কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তদুত্তরেই সেই মহাবাক্যের অমুদ্রণ করিতেন,
কিন্তু—পকাশ হাজার—অনেকটা টাকা, তাহার মায়া ছাড়িতে পারিলেন না।
শ্রম হইয়া ঝাঁড়াইয়া বলিলেন—“আপনি গালি দিবেন না। দশ টাকা দশ
টাকা নয়, টাকায়, পয়সায়, নোটে, কাগজে বোক পকাশ হাজার টাকা গণিয়া
আপনার হাতে দিয়াছি, আপনি আমার গালি দিবেন না।”

সাহেব সেইরূপ উগ্রভাবে বলিলেন “গালি দিবে না—বোম্বাকে চাবুক
দিবে। কি করিতে আসিয়াছ? আগাকে উপহাস করিবার জন্য? ইউ
অন্থেটেকুল রোগ অফ এ বেঙ্গলি।”

শ্যামা। হাতে দু বা মারার চেয়ে আপনি আমাকে কয়েক মত মারিয়া-
ছেন। দোষাই ধর্ম, আমার অন্য উপায় আর নাই।

শ্যামসুন্দর বোরদামান হইলেন । সাহেব বলিলেন “চোপ, চিপাও মং, সেম নেয়ার হায় ।”

শ্যাম । পকাশ হাজার টাকা গেল, তা এক কোটা চোখের জলও ফেলিতে পাইব না !

সাহেব বলিলেন “তুমি বড় অনুগ্ৰেটফুল । আমি হিসাব করিয়া দেখি-
রাছি, তুমি হুদে আমার নিকট পকাশ হাজারের উপর আদায় করিয়াছ ।
কোর্ট হইতে তুমি আর কিছু পাইতে পারিতে, কিন্তু আমি কোর্টকে লিখিয়া
যাইব হোমায় বেন এক পরমাণু না দেয় Now be gone, or the bearer
will show you the door.

শ্যাম । দোহাই সাহেব, আমার—

সাহেব । I won't hear you—বজ্রাত, নিমকহারাম, বেইমান, শূয়ার ।

শ্যাম । সাভ দোহাই রক্ষা কর—আমি বড়—

সাহেব । One word more, and I shall kick you out.

“হা ধর্ম, তুমি কি একেবারে—” আর শ্যামসুন্দরের কথা কহিতে হইল
না । সাহেবের বুট-শুধ পা আসিয়া শ্যামসুন্দরের পায়ে আঘাত করিল ।
চোয়ার ভীষণ ভাবে নড়িয়া উঠিল । শ্যামসুন্দর পড়িতে পড়িতে রহিয়া
গেলেন । সর্ব শরীর ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল । শ্যামসুন্দর এক পা
ঝামিয়া ফেলিলেন ।

আমরা সত্য বলিব, বাঙ্গালী হইলেও শ্যামসুন্দরের হাত সে সময়ে
আপনা আপনিই লুটমুটিবন্ধ হইল ; দস্তে দস্তে ওষ্ঠে নিষ্পেষিত হইল ;
কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেব কর্কশ কর্তে ‘বেহারী বেহারী’ বলিয়া হাঁকিলেন ।
বেহারী কোড়িয়া আসিলে তাহাকে বলিলেন “বাও, এ বজ্রাতকো নেকাল
দেকে ফাটক বন্ধ কর দেও ।”

সাহেব আর ঠাঁড়াইলেন না । ভিতরে প্রবেশ করিলেন । বেহারী আসিয়া
শ্যামসুন্দর হাত ধরিল । ছুঃখে, ক্ষোভে, গোবে শ্যামসুন্দর মনে মনে
বলিলেন—“হে পৃথিবী, তুমি দোকাব হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ
করি”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

শ্যামসুন্দর বাবু কে তাহা এখনও বলা হয় নাই। তাঁহার অন্য পরিচয়ের কথা না পাড়িয়া আমরা মোটামুটি একটা কথা বলিতেছি ।

এই আখ্যায়িকার আরম্ভে যে বাড়ীর কথা উল্লেখ করিয়াছি—হেমচন্দ্র তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর সহিত যে বাড়ীতে বাস করিতেন, মহামায়া যাহার গৃহিণী—শ্যামসুন্দর সেই বাড়ীর কর্তা। শ্যামসুন্দর বাবুর নাম ডাক খুন ছিল। দশকোষ গুড়িয়া থাকিত। ক্রিয়া কর্তৃ, পাল-পার্কিং তাঁহার বাড়ীতে প্রায় ফাঁক বাহিত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান-ধ্যানের ব্যাপারেও তাঁহার বেশ যত্ন ছিল। মিসপক্ষেরতো কথাই নাই, শত্রুপক্ষীদেরও বলিত, “হাঁ লোকটা মন্দ নয়, শ্যামসুন্দর এক জন দোষেত্তপে মানুষ।” শ্যামসুন্দরের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি কিছুই ছিল না। টাকা কড়ি, ধন ধৌলত, জমি জমা, বা কিছু সকলি তাঁহার সোপার্কিত। “স্বনামা পুরুষো ধন্য” বলিয়া অনেক চাইবে, বাড়ুবে, ঘোষজা, বোণজা তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার তদপান করিত। তাঁহার অর্ধের পরিমাণ লইয়া অনেকে আঁতাতাটি করিত। কেহ বলিত, তিনি লাক টাকা গনিয়া দিতে পারেন; কেহ বলিত, তিন লাক টাকার কাগজ কোম্পানিতে জমা আছে; কেহ বলিত তাঁহার শুইবার ঘরে পাঁচটা সিঙ্ক মোহরে বোকাই করা। যাহা হউক, শ্যামসুন্দর দেশে বিলম্ব গৌরবে কাটাইতেন। অনেকেই তাঁহার দ্বারা অহুগৃহীত, সুতরাং অনেকেই তাঁহার বশীভূত। শ্যামসুন্দরের সকলি হুখের হইয়াছিল, কেবল নিবাহটা হুখের হয় নাই। বড় কুলধে পতি-পত্নীর মিলন হইয়াছিল। সকল হুখের মধ্যে কেবল এক অহুখের কারণ তাঁহার পত্নী মহামায়া। মহামায়া চুঃশীলা, মহামায়া বলবতাবা, মহামায়া অপ্রিয়ভাষিনী। কিন্তু মহামায়া সুন্দরী। কাঁচা সোণার মত বড়, নিখুঁত গড়ন, এক ঢাল চুল। শ্যামসুন্দর সে রূপে মুগ্ধ। তিনি পত্নীকে ভয় করিতেন, অথচ প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। মহামায়ার বাক্যের জালার দূরে পলাইতে চেষ্টা করিতেন, অথচ তাহাকে এক বঁড়ু না দেখিলে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেন। মহামায়া স্বামী-গৃহে আগিয়াই দেখিলেন, মাথার উপর খাত্তা নন্দ কেহ নাই, তিনিই একা-ঘরের একা-গৃহিণী। বৎসর কয় পরে তাইটাকে আপ-

নার সম্মুখে আসিলেন। দেখিবার কেহ নাই, ভাই বড়িয়া যায়। আর এক বৎসর না গিরিতে, কাছেই মাতাও সেইখানে আসিলেন। ছেলেটি মেয়েটি ছাড়িয়া মা একা থাকেন কেমন করিয়া? বিধবা বোন্ সেই বা বায় কোথায়? মার সঙ্গে সঙ্গে সেও আসিল। তার পর ভাইজ-টিকেও কাছেই আনিতে হইল। চির কাশ কিছু বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না। শ্যামসুন্দর ইহা দেখিলেন। ভাবিলেন, সেই তো অন্য পাঁচ জনে নাইতেছে, না হয় ইহারও কিছু বাইল। কিছু বলিলেন না। কিন্তু পরে বৃত্তিতে পারিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। ক্রমে তাহারাই সর্পেসর্পী প্রভু হইয়া উঠিল। তিনি যাহা না খান, না পান, মহামাঝার ভাই ভাই খায়, ভাই পেরে। কিন্তু তাহা কুকরাইবার যো নাই। শ্যামসুন্দর নীরবে তাহা সহিতে লাগিলেন। মহামাঝার গর্ভে তাহার এটিকত পুত্রসন্তান হইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের পাছে অল্প হয় এই ভয়ে শ্যামসুন্দর সদাই অস্থির হইতেন; তাঁহার নিব্বের কথা আর মনে আনিতেন না। এইরূপে ধনে মানে ভয়ে বন্ধনে শ্যামসুন্দর বাবুর সংসার যাত্রা নির্দাহিত হইতে লাগিল। পাঠক ভ্রাতৃগণ, হেমচন্দ্রের নাত্যন মৃত্যুর দিন তিনি বাড়ী ছিলেন না, তাহার সম্ভ্রাতৃ পূর্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখনও বাড়ী কিংবদন্তি নাই। কলিকাতায় তিনি বিষয় কার্যে ব্যাপ্ত ছিলেন। সে বিষয় কার্য কি, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু সম্ভ্রাতৃকাল ধরিয়া কলিকাতায় তিনি কি করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শুনুন।

সেই পামর পামর সাহেব কর্তৃক তড়িত হইয়া ধীরে ধীরে শ্যামসুন্দর বাহিরে আসিলেন। মুখে কথা নাই, শরীরেও বৃষ্টি স্পন্দ নাই। চোখে এক একবার জল বেগে উছলিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ক্রোধের দীপ্ত শিখায় তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। মাঝার ভিতর একটা ঘূর্ণি অগ্নিরত পাক দিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অন্য বাহিরের কিছুই অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছে না। চিহ্নের বিষম দংশনে মর্মের পরতে পরতে ভীত জ্বালা জলিতেছে। নীরবে শ্যামসুন্দর বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইয়া। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসিল “কোথায় যাইবেন?” কোথায় যাইবেন?

এ কথার উত্তর কি দিবেন ! জগতে যে কোথাও বাইবার তাঁহার আর স্থান আছে, ইহা তিনি ভাবিতে পারিলেন না । তাঁহার বিষয়, জমিদারি, সে সংসার, সে বাড়ী, সে স্ত্রীপুত্র, আশ্রয় স্বজন সব যেন এক দণ্ডে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। আর যেন কেহই নাই, কাহাকেও মনে পড়ে না । এ পৃথিবী ইহার সকল সামগ্রী লইয়া এক পা এক পা করিয়া তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া বাইতেছে—তাঁহার দাঁড়াইবার আর স্থান নাই—পৃথিবীর পরই স্বর্গের শূন্য তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য যেন ভীষণরূপে হা করিয়া রহিয়াছে । কোথায় বাইবেন ?—শ্যামসুন্দরের চক্ষে জল আসিল । কোঠার কাপড়ে চক্ষু মাক্‌না করিলেন । পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—“বাবু, আপনার কি কোন অস্থি করিয়াছে ?”

শ্যা। না ।

প। চারিটা বাজিল । আর সময় নাই, তবে কালেক্টারি চলুন ।

কালেক্টারি বাইবে বলিয়া পরমানন্দ ভাগর বাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল । সে এইরূপ প্রতিবারে আসিত । বলিল, “আর সময় নাই—তবে কালেক্টারিতে চলুন ।”

আবার—আবার সেই কথা—সেই কালেক্টারি ! শ্যামসুন্দরের মাথা ঘুরিতে লাগিল ; জ্বরের অন্তস্তলে কে যেন অক্ষুণ্ণ ফুটাইয়া দিল । কি উত্তর দিবেন তাঁহরিয়া পাইলেন না । কলে বলিলেন—“চল ।” পাড়ী সেই দিকে ছুটিল । ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দর বাইতে লাগিলেন । ভাবনা অসীম, মূহূরৎসাহী, মৰ্ম্মচ্ছেদক । পকাশ ভাগ্যের টাকা এক কথায় কোথায় গেল ! কত কষ্টের—কত অনাহার অনিদ্রা মরণাধিক যাতনার—কত প্রাণাত্মিক পরিশ্রমের—সে টাকা দেখিতে না দেখিতে, শুনিতে না শুনিতে কি যাহুবলে কোথায় উড়িয়া গেল । সে কি কম ! টাকায় ঘরে ধরিত না, কাগজে দিচ্চুকে আঁটিত না—রাতারাতি কপূরের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল ! কেমন করিয়া গেল ! কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, কত বৃহত্তম পড়িতে পড়িতে সেই টাকা উপায় করিয়াছেন একে একে সে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল, কীৰ্ত্তিনিধাসে বুকখানা যেন শতহস্ত দমিয়া বাইতে লাগিল । হায় হায়, কেন এমন কর্ম্ম করিয়াছিলেন । বেশি শুদের লোভে কেন তাহা

বাক হইতে তুলিয়া এই সাহেবের আপিয়ে রাখিয়াছিলেন ? আ যদি যদি সে মায়া কি তুলিবার ? শ্যামসুন্দরের কান্না আসিল। শ্যামসুন্দর কাদিলেন। কিন্তু তাই কি দুঃখ কাদিয়া সে দারুণ শোক লাঘব করিবার সময় আসে ? মাহুদের দুর্ভাগ্য একা আসে না। কাপড়ে এক আরগায় একটা ছিড হইলে তাহা কালা কালা হইয়া ছি ডিতে আরম্ভ হয়।

কালেক্টারি খাননার আজ শেষ দিন—স্ব্যাক্ত পর্যাক্ত সময়—তার পর ? তার পর সে ভবিষ্যৎ তাণ্ডিতে শ্যামসুন্দর শিহরিয়া উঠিলেন। বাপুচকের প্রচারাই মাতঙ্গর প্রজা। কালেক্টারির বার আনা শাজনা সেখান হইতে আদায় হয়। এবার তাহার এক পরসাদ দেয় নাই। শ্যামসুন্দরের শ্যালক শশিভূষণ এক জন প্রজার বর জালাইয়া দেওয়ার তাহার সকলে মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। শ্যামসুন্দর শ্যালকের সভাব জানিতেন, নেই অন্য তাহাকে কদাচ জমিদারিতে বাইতে দিতেন না। কিন্তু ভার্য্যা মহামায়ার একান্ত অনুরোধ। বশ্রষ্ঠাকুরাণীও বলেন—“ছোঁড়াটা খারাপ হইয়া গেল, কিছুই কাজ বুঝিল না, আর আপনার অনেক যদি কাজ কর্ম্ম না দেখাবে, তবে শিখিয়েই বা কেমন করিয়া ?” মহামায়াও তাই ধরিয়া স্বামীকে বলিতেন “সেই তো অপর লোককে সাহিযানা দিয়া নাথের রাখিতে হয়, তা আপনার লোক বসিয়া থাকিতে পরসাদ দিয়া অন্য লোক রাখা কেন ?” প্রথম প্রথম শ্যামসুন্দর বাবু ভার্য্যার কথায় “তা হবে—দেখা যাবে” বলিয়া কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু, পুরুষ মাহুদ যে বড় বোকা, অর্থনীতির কিছুই বুকে না মহামায়া স্বামীর দেখা পাইলেই জাতার কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া ইহা তাহাকে “বিধিতে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তাণ্ডাও প্রথম প্রথম শ্যামসুন্দর হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। শেষ, আর হাসি তামাসায় চলিল না। মহামায়া এক দিন সাক বলিলেন, “যদি আমার কথা তোমার এতই অগ্রাহ হয়, আর মনের ভিতর কিছু থাকে তা ভেঙ্গেই কেন বল না, পেটে একখানা মুখে একখানার দরকার কি ? সত্যি সত্যি পেতে পায় না বলে চাট্টি ভাতের জন্য ওহো আর তোমার বাড়ি পড়ে থাকে নি, তাই বল, না হয় শশে আপনার বাড়ী চলে যাক।” শ্যামসুন্দর দেখিলেন, আজ আর সহজে হইবে না। কথাটার ভিতরে

অনেক অর্থ আছে। শশী বাড়ী বাইলেই হুতরাং তাহার থাকেও বাইতে হইবে; যা গেলেই কালেক্ট মহামায়াও প্রায় সেখানে বাইবেন। তা ছাড়া তাঁহাকে ছটা সংসার টানিতে হইবে। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া শ্যামসুন্দর বলিলেন “আমার কি অমত? ওগে ছেলে মানুষ, কোথায় বিদেশে গিয়া থাকিলে গেই চনাই এত দিন বাইতে দিই নাই, তা তোমার যদি একান্ত মত হয়, শশীকে গিয়া বল, তৈয়ার হউক, কালই বাসুচকে বাটবে।” মহামায়া বলিলেন, “তা হবে, তুমি এখন হাত মুখ ধোও, একটু জল খাও।” মহামায়া মাতাকে গিয়া এ সংবাদ দিলেন। শশীকে ডাক পড়িল। ছই জনে তাহাকে অনেক শিখাইলেন পড়াইলেন। পর দিন স্নাতাস উঠিলে শশীভূষণ সাভিয়া অভিয়া নৌকায় গিয়া আরোহণ করিলেন। তার পর বাসুচকে গিয়া শশিবাসু যে সব কীর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, সে অনেক কথা। শ্যামসুন্দর সে সংবাদ পাইয়া শশীভূষণকে নান মাত্রা নায়েব রাধিয়া তথাকার আমিনকে সকল কাজ হদ্যবকের ভাব দিলেন। কথায় কথায় নায়েব আমিনে খুটিনাটি চলিতে লাগিল। আমিন বুড়া; বুদ্ধিশালী শশীভূষণ কর্ত্তার ঘিনি কতী তাঁহার সগোদর—মাপার মণি, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করা অসম্ভব। বুড়া চাকুরি ছাড়িয়া দিল। শ্যামসুন্দর প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারেন না। গোপনে গোপনে নৃতন আমিনের জন্য লোক খুঁজিতে লাগিলেন। তখন লাঠী সম্মুখে, পাকা লোক সন্ধান মিলে না। দিন কয়েক বিলম্ব হইল। এই সময়ে শশীভূষণ এক দিন এক প্রকার একটি যুবতী কন্যার উপর আক্রমণ করিল। প্রভাগীর মোড়লদের জ্ঞানাইল। মোড়লো গিয়া শশীভূষণকে কিছু কড়া কড়া তনাইয়া দিল। তাহার আগে হঠতেই তাঁহার উপর চট্টয়া দিল। রাগে হুট প্রহর রালে শশী তাহাদের এক জনের ঘর জালিয়া দিলেন। প্রাতে শশীকে মানিবান চনা সকলে লাঠি হাতে কাছারি বাড়ীতে ছুটল। কিন্তু তাহার দেখা নহে পাইল না। রাজ্যেই সে স্থান হঠতে সে পলাইয়াছিল। তখন সকলে ধর্ম্মঘট করিল, এ সব এক পরসাপি নহে খাওয়া দিবে না। এসব কথা শ্যামসুন্দর যথা সময়ে জানিতে পান নাই। তাহা হইলে নিজেই বাসুচকে বাইতেন। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভাগ দেখিয়া এক আমিন পাঠাটয়া

বিলেন। আমিন কার্যস্থানে আসিয়া মক্কে পড়িলেন। অনেক তাঁতাকেই
 মারিতে উদাত্ত হইল। অনেক আবার তাঁতাকে নিমণ্যই জানিয়া তাঁতের
 পক্ষ হইল। তখন লাটের কিস্তির হার মণ্ড হ মাত্র থাকি। একটীও
 পরশা চালাম আদিল ন' দেসিয়া শ্যামসুন্দর ভাবিত হইলেন। আমিনের
 কাছে লোক পাঠাইলেন। আমিন সকল কথা শুনিয়া লিখিয়া সেই লোক
 কিরাইয়া পাঠাইলেন। শ্যামসুন্দর পত্র পড়িয়া মাপ'য় হাত দিয়া বলিয়া পড়ি-
 লেন। লোক আসিতে যাউতেও পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন যে তিনি
 নিজে গিয়া আর কিছু করিতে পারিবেন সে উরসা নাই। সে সময়ও নাই।
 কাল লাটের কিস্তি! গায়ে বিবেক জ্বালা রি রি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।
 মহামায়াকে ভৎসনা করিবার অন্য পত্র লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।
 মহামায়া তখন দর্পণের কাছে দাঁড়াইয়া মুখে শব্দ মাখিতেছিলেন, তাঁতাকে
 দেখিয়া বলিলেন “কি—কি হইয়াছে? অমন করিয়া আসিগাছ কেন?”
 শ্যামসুন্দর পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। মহামায়াকে ভৎসনা করিতে
 গেলেন। মহামায়া উচ্চ “ভাইরে—আমার!” বলিয়া ডাক ছাড়িয়া
 কাঁদিয়া উঠিল। নীচে, তাঁতীর ঘরে মহামায়ার মাতা নির সস্ত্র কোন্ডল
 করিতেছিলেন, মেয়ের বোদনশব্দ পাঠিয়া বৌড়িয়া উপরে গিয়া “ওগো
 কি হলো গো—ওগো আমার মা লক্ষী এমন করে কেন গো।” বলিয়া
 চিৎকার আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া শ্যামসুন্দর হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া
 রহিলেন। মহামায়ার কান্না কিছুতেই থামে না। সুতরাং তাঁতার মাতারও
 কান্না অনিবার্য—তাঁতার দ্বির সিদ্ধান্ত হইল, আমাই তাঁতার মেয়েকে মারি-
 য়াছে, সেই সিদ্ধান্তে আমাইকে সহস্র তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তার পর
 মেয়ের চোখ মুছাইয়া বলিলেন, “কেন মা, তোমার কান্না? চল এখনই
 আমরা এখান হ'তে বেরুই, পেটে বখন আরগা গিয়াছি তখন হাঁড়িতেও
 আরগা দিতে পারবো।” এই বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া উঠাইতে
 গেলেন। মহামায়া তখন চোখ মুছিয়া বলিলেন—“আ মরণ, ওকথা তোমার
 কে বলে?” “ওমা, তানা, তবে কি, মা?” বলিয়া মাতা আবার কান্নার
 মুখ মুছাইতে বলিলেন। মহামায়া তখন কাঁদিয়া সব বলিলেন। তখন
 “ওগো আমার বাছা কোথায় গো—আমার পোণার বাড়িকে এনে দাও গো।”

বলিয়া মাতা উচ্চ স্বর তুলিলেন। মহামায়ারও ভ্রাতৃস্বপ্ন উৎপাদিয়া উঠিল। হলদুল পাড়িয়া গেল। শ্যামসুন্দর বলিলেন—“কাদিলে কি হইবে? এখন থাম। এদিকে লাটের কিস্তি, বিষয় যাব।”

মহামায়া বলিলেন—“রাখ তোমার কিস্তি! কামান ভাই এনে দাও—নহিলে তুমি তোমার বিষয় নে পাক—আমি দিস যাব।”

শ্যামসুন্দর বলিলেন—“আজই আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।”

মহামায়া বলিলেন—“তা হবে না। তোমার বিষয় বড় না আমার ভাই বড়? আগে আমার ভাইয়ের পোঁজ কর, তবে যাইতে পাটবে।”

অগত্যা শ্যামসুন্দরের সে দিন কলিকাতায় যাওয়া হইল না। শালকের অজুগন্ধ্যে নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন। রাত্রি গখন হই প্রহর তখন একজন গোপন্য। শশিবাবুকে লটয়া আসিল। শশিবাবু ভালুক হইতে পলাটয়া বিন কষ্টক এদিক্ ওদিক্ করিয়া সেট ঘেঁষেট আসিয়াছিলেন, তবে চঠাৎ বাড়ী যাইতে সাহস না হওয়ায় এক স্থানে গোপনে বাস করিতে-
ছিলেন। সময় সুকিয়া আপনিই ধরা দিলেন। শশিবাবু বাড়ি আসতে তাঁহার যে ভর হইয়াছিল তাহার আর কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। কেহ তৎসমা গল্পনা করিল না। মহামায়া ও মাতা ‘ওগো আমার চারাদন ফিরে এস গো!’ বলিয়া দৌড়িয়া গেলেন। শশিবাবু দেখিলেন যে, মক্ক নব, কোথায় তিরস্কারের ভয় না ও পূর্বাশঙ্ক্য বেশী আদর। মনে মনে বড়ই আশ্চর্য হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, তিনি মেন একটা দিবিজয় করিয়া আসিয়াছেন। সে রাতে সকলেরই আনন্দের সীমা নাই। মহামায়া ও তাঁতার মাতার আনন্দ তো হইবেই, চাকর দাসীদেরও মহা আনন্দ, এত সুযোগে মাঠাকুণের কাছে তাহার বখশিষের আশা করিতে লাগিল। সবারই আনন্দ, কেবল শ্যামসুন্দর নিরানন্দ, সিরযাণ ও চিত্তা-
দত্ত। কোনরূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল। আজ লাটের শেষ দিন। শ্যামসুন্দর গম হাত দুইরাই পরমানন্দকে সঙ্গে লটয়া নৌকারোহণে কলিকাতায় চলিলেন। তাঁহার একমাত্র শেষ ভরসা, পামার সাহেবের নিকট হইতে টাকা লটয়া শেষরের কালেক্টরি খাজানা দাখিল করিবে। সেই শেষ ভরসার ঝুক রাখিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া যাহা গাহা ঘটল তাহা বলিয়াছি । তাঁহার চক্ষে সকলই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তিনি জিজ্ঞাস্তা কি নিশ্চিত এক এক বার তাহা সন্দেহ হইতে লাগিল । এ কি কখন সম্ভব—ইহা কি হইতে পারে—যজ্ঞের এমন কখনও কি হয়—শ্যামসুন্দর এত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না । একমাত্র যে আশালতার তাঁহার প্রাণ বাঁধিয়াছিল, সে আশালতা আর একেবারে নির্মূল—প্রাণও বুঝি আর রহে না । গাড়িতে বসিয়া শ্যামসুন্দর আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন । পরমানন্দকে ডাকিলেন । বলিলেন, “গাড়ি ফিরাইতে বল, কালেক্টারি আর ঘাইতে হইবে না । খিদিরপুরে চল ।” খিদিরপুরে বাসুর এক আট্টায় থাকিতেন । পরমানন্দ গাড়ি সেইখানেই ঘাইতে বলিল । যশাগমনে খিদিরপুরে গিয়া পৌঁছিলেন । আট্টায় পরমানন্দ্রাঘে আহ্বানাদির আয়োজন করিতে গেলেন । শ্যামসুন্দর বলিলেন “বড় অসুখ—আহার করিব না ।” সুতরাং সন্ধ্যার পরই শয্যা হইল, তিনি অনাহারে গিয়া শয়ন করিলেন । অনিদ্রার যন্ত্রণায় দীর্ঘরাত্রি কাটিয়া গেল । প্রভাতে যখন সেই আট্টায় শয্যা হইতে গাতোপান করিয়া শ্যামসুন্দর বাবুকে দেখিতে গেলেন, তখন তাঁহার হই চক্ষু অবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, মুখ ভার, গায় আগুন ছুটিতেছে—প্রবল জ্বরে বিছানায় পড়িয়া তিনি ঠক্কর করিয়া কাঁপিতেছেন ।

বিদায় ভিক্ষা ।

অনুষ্ঠে ভাঙনে, সখি, দুঃখনে পড়িব দূরে
অদয় না স'বে এ বেদন,
সহেনা, কতুনা স'বে, জদয় অ!
খুঁজি তার সমতার ধন !
রহিবে লোহার মত চুপকের গায়,
পরানে পরাণ বাঁধা কায়ার কায়ার !

২

সত্য সখি, সত্যই কি ছেড়ে নেতে হবে
 লগ্ন হবে স্বপ্নময় আনন্দ উচ্ছ্বাস,
 ঢাকিবে উষার রবি বিবাদ বারিমে
 ছুয়াবে কি পরাণের বসন্ত বাতাস ?
 পানীর কুঞ্জে আর মধুরতা পাব না
 চাঁদের অমিয়া হবে বিষ,
 পংগল ফুলের গন্ধে ছুটে ছুটে যাবনা
 সৌরভে তরিলে দশবিশ ।
 প্রকৃতির শোভা হেরি মনে সুখ পাব না
 যেন কি অভাব তার মাঝে,
 একখানি হাসিমুখ— মোহময়, স্বপ্নময়,—
 হবে ফাঁক প্রকৃতির মাঝে ।

৩

হারি সখি সত্যই কি দূরে চলে যেতে হবে
 দেখা আর পাব না তোমার ।
 মধুর বচনে তোর কতু কিরে অভাৱ
 বাজিবে না পরাণের তার ।
 নিরঞ্জে শূন্য মনে হেরি কতু ছবি তোর
 পরাণে কি আঁকিতে পাব না
 অধু দেখা তার মাঝে মূলের মধুর বাণী
 এ পরাণে ধরিতে পাব না ?
 ভাবিতে পারি না আর পরাণ ফাটিয়ে যায়,
 মস্তিষ্ক বিকৃত করি ঘূর্ণিত কটিকা ধার,
 একবার দিও সখি দেখা
 ভাল না বাসিতে পারি, দয়া করে কথা কোয়ো
 ঘুচে যাবে বিষাদের রেখা !

আকুল পরাণ মোর যান! ত'মানে না সখি
বল তার আমি কি করিব ?
যদি কহু হর দেখা করুণা করিও দান,
হর! তিনু হুগরে রাখিব !

৪

গৌরবে তোমার বায়ু সৌরভ বহিবে যবে
আরিক বিনয় আর অধিক পরিমা তরে
ফুলপাণে থাকিবি যখন,
তোর সে হরিষ প্রাণে আঁকিস্ বিধান ছবি,
তোমারি হুগরে সখি তাপিত তোমারি কবি
হতভাণা ছিল একজন ।

৫

কুন্ডি আনন্দে অধীরা যবে
পালে সখা তোমার রবে
সখি ভাবিও যারেক তবে
এট কাতর কবির কথা,
তাপিত দীনের বিষাদের ছবি
হৃদয়ে আঁকিও বাধা !
সখি, যখন সঁকেব বেলা
হেরি নবীন ফুলের খেলা
দেখি গগনে তারার খেলা
সখি, হইবে হরিষ প্রাণ ;—
দেখো তপনি বিষাদ ছবি
দূর গগনে সঁকেব রবি
সুমনা পাখীর বিদায় গান ।
তবে বুঝিবে তোমার কবি
সখি হরেছে সঁকেব রবি
তার প্রতিভা নাইক আর,

ভাব, পর'ণ গাহিছে বিদায়ের গান

যেন কোরে একবার ।

শ্রীশ্রীকাশ্যচন্দ্র ঘোষ ।

যুগধর্ম ।

বর্তমান সময়ের হিন্দু সমাজ তদ্ব-সেন্ত্র নদী-প্রবাহের ন্যায় নানা-পথগামী হইয়া পড়িতেছে । যে সকল কারণে ধর্মসেন্ত্র তদ্ব হইয়াছে তদ্বধো-রাজ ও সমাজ শাসনাভাব যেমন প্রবল কারণ তেমনি শাস্ত্রসম্বন্ধেও যতদোষের-হেতু । সকল প্রকার দোষ হইতে, চেষ্টা করিলে, নিস্তার পাওয়া যায় । শাস্ত্র-সম্বন্ধে দোষ হইতে হঠাৎ উদ্ধার হওয়া কঠিন । যে যুগের জন্য যে যে শাস্ত্র নির্ধারিত আছে সেই সেই শাস্ত্র মতে ক্রিয়া না করিলে শাস্ত্রসম্বন্ধে দোষ ঘটে । যেমন সত্তাবুগে কেবল বেদ মতে ক্রিয়া করিলে, জেতাতে প্রকৃতি মতে, দ্বাপরে পুরাণ মতে, কলিতে কেবল তন্ত্র মতে কার্য্য করিলে ফল লাভ হইবে ; এক্ষণে না করিয়া বেদ ক্ষতি পুরাণ মতে ও তন্ত্র মতে কলি ও প্রবল কলিতে কর্ম্ম করিলে শাস্ত্রসম্বন্ধে দোষ আছে । যে যে ক্রিয়ার সাক্ষ্য দোষ ঘটে সে সকল ক্রিয়া বৃথা হয় । যেমন বৈদ্য ও রোগসম্বন্ধে রোগীর পক্ষে, তেমনি কর্ম্ম কাণ্ড পক্ষে শাস্ত্রসম্বন্ধে ।

মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র এক কোরাণ, খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম কথের শাস্ত্র এক বাইবেল, কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম কথের চারি বেদ ও সহস্রের প্রকৃতি ও স্মৃতি পুৰাণ তদ্ব যাদল ভাষার ও সংহিতা ইত্যাদি অগণ্য শাস্ত্র । এত অগণ্য শাস্ত্রে হিন্দুশাস্ত্রের বিবিধ নিষেধ আছে । এত জন্য হিন্দুশাস্ত্রে সাক্ষ্য দোষ সহজে ঘটয়াছে, এবং জ্ঞান বটিয়াছে বলিয়াই হিন্দুধর্মকথের প্রকৃত ফল লাভ হইতে পারিতেছে না । হিন্দু ধর্মশাস্ত্র যদি কোরাণ আর বাই-বেলের ন্যায় সসীম ও পরিমিত হইত, তবে হিন্দুধর্ম ঠিক থাকিত । কিন্তু অসম্ভব করিয়া দেখিতে পাও যে, বর্তমান কলিযুগের পূর্বে সত্য

যেতা দ্বাপর যুগের হিন্দু ধর্মকর্মের জন্য সত্যো বেদ, ত্রেতায়া শ্রুতি মুনি, দ্বাপরের জন্য পুরাণ, কলির জন্য আগম, এবং কলির জন্য মহানির্দাণ তত্ত্ব নির্দ্ধারিত আছে । একপ শাস্ত্র ভিল বলিয়াই পূর্বে হিন্দুমানির গানি হয় নাই । এই কলিযুগের ২১ শত বংসর পর্য্যন্ত পুরুত কত্রির রাজ্য আর পদধর্মাক্রান্ত ভ্রাক্ষণ ছিলেন, আর তাঁহারা যদাশাস্ত্র যুগধর্ম প্রতিপালন করিতেন বলিয়া তৎকালে হিন্দুশাস্ত্রে সাক্ষ্য দোষ স্পর্শ হয় নাই, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের কলও অব্যর্থ ছিল । পরে কলিযুগ ২২শত বংসর ব্যক্রম প্রাপ্ত হইলে পর বেভরানক এবং জনপ্রাবন হয় তাহাতে ভারত একেবারে প্রজা ও শাস্ত্রশূনা হইয়া পড়ে ও পুরাতন শাস্ত্র সকল বিলোপ প্রায় হইয়াছিল । পরে পার্শ্বতা দেশ হইতে অল্পে অল্পে প্রজা পকন হইতে আরম্ভ হইলে যিনি যেমন বেশে বাস করিতে লাগিলেন সেই সেই বেশোপযোগী আচার ব্যবহার ও শাস্ত্র সকল প্রস্তুত হইল । আধুনিক বৈদিক শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার প্রায় লোপ পাইল । ও কালের শাস্ত্রের নাম কমুহুত হইল । এ শাস্ত্র সকল ভ্রুতি, দ্বুতি, পুরাণ ও তত্ত্ব হইতে সংরচিত হওয়ার লোকসমাঙ্গে আনৃত হইয়া ও ৪ শত বংসর কাল অব্যাহত থাকিল । তৎপর বৌদ্ধ বিপ্রাবন উপস্থিত হইয়া ত্র্যাপক এত কাল বৌদ্ধ ধর্ম এবং হেতুও হিন্দু ধর্ম বিলোপ হইবার উপক্রম হইল । এই সময় হইতে ভ্রাক্ষণ ধর্ম নানা দোষাক্রান্ত হইয়া উঠিল । যোগ যোগ থাকিল না । বৌদ্ধ বিপ্রাবনের পর পুনর্বার হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে এবং হইতে লাগিল । রাজ্য বিক্রমাদিত্য হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ভ্রাক্ষণেরা নিন্তেজ হইয়া পড়ার তত্ত্ব শাস্ত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল । বিক্রমাদিত্য নিজে বেভালমিক ছিলেন । বেভাল, ভৈরব সাধনার প্রকরণ তত্ত্ব শাস্ত্রেই দেখা যায় । তত্ত্বিহ অন্য কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না । ইহা ছাড়া কবিকুলভিলক কালিদাসের জীবনীতে প্রকাশ আছে যে তিনি একরাজি মাত্র সাধনা করিয়া বাধাদিনী সিদ্ধ হইয়া ছিলেন । তাস্ত্রিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়ায় একপ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না ।

পৃথ্বীরাজের পিতা তত্ত্বোক্ত তত্ত্বকালীর উপাসক ছিলেন, ইহা মুহূর্ত্তর ওর্কালকারের কৃত রাজাবলিতে প্রকাশ আছে । তত্ত্ব শাস্ত্র অতি গোপনীয়

শাস্ত্র বলিয়া উহা অশ্রদ্ধাশাস্ত্র হইয়া আছে। শাস্ত্র কেবল মন্ত্রময়। মন্ত্র আর মন্ত্রণা বস্তুই প্রকাশ হইবে ততই অকর্তৃণ্য হইয়া পড়িবে। এই জন্য অগৎওক শিব বলিয়াছেন যে, তত্ত্ব শাস্ত্র অস্বর্ধ্যাম্পন্য। কুলবধূর ন্যায়। আর আর শাস্ত্র সকল বারবিলাসিনীর ন্যায়। ১৯২ ধানি তত্ত্ব ৬ধানি ডায়র আর ৬ধানি যামল মানব দিতার্থ প্রকাশ পায়। এই সকল তত্ত্ব আর ডায়র ও যামল এবং বেদ ও ঋতি স্মৃতি আন্দোলন করত প্রবল কণিকালের মানব-হিতার্থ শিব মহানির্কণে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ তত্ত্বের আশ্রয় নাইলে বেদ পুরাণ ঋতি স্মৃতি ও আর আর তত্ত্বের সোলযোগে পড়িতে হইবে না। ঐ তত্ত্ব অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জীকৃতমকপূর্ণ বা দান্তিক নহে। শিবের সিদ্ধির বৃন্দির বিষয় যে প্রবাদ আছে তাহাই মহানির্কণ তত্ত্ব।

বেদ যে সময়ে প্রকাশ হয় তখন বেদ বৈ আর কোন শাস্ত্র প্রকাশ পায় নাই। আর তখনকার লোক এমনি পূণ্যবান্ তপসী ছিলেন যে অনায়াসে বেদার্থ বুদ্ধিতে পারিতেন ও উচ্চারণক্ষম ছিলেন। এমন কি সত্যতরলে বেদ মন্ত্র ও স্তোত্র সকল হর ও তালমান লর মিলিত গান করিলে স্রীপুরুষ বালবুদ্ধ সকলে মোহিত হইতেন। ইহার নাম সত্যাব্গ। তৎপর ঋতি স্মৃতির সময় উপস্থিত হইলে বেদ সকল সময়ের শুণে কঠিন বোধ হইতে লাগিল বলিয়া ঋতি আর স্মৃতি প্রচার হইল। ঐ ঋতি আর স্মৃতি বেদমূলক। কিন্তু বেদ হইতেও কিছু সহজ হইল। একালের তাবৎ ক্রিয়া কলাপ কেবল ঋতি আর স্মৃতি অহুসারে নির্বাহ হইত। ঐ কালের নাম রেতাঙ্গ হইল। ঐ কালেও শাস্ত্রমন্ত্রর দোষ ঘটে নাই। অতঃপর ঋণ্যব্গ উপস্থিত হইলে তৎকালের রামা ও পণ্ডিতগণ একতা পূর্বক হিন্দুদিগের অবস্থা ও বলাবল ও কৃতি অহুসারে তাবৎ কর্তব্য কাণ্ডের নিমিত্ত বেদমূলক পুরাণ নামক শাস্ত্র প্রচার করার লোকযাত্রা নির্বাহ হইতে লাগিল। ঐ পুরাণ নানা স্থানের জন্য নানা প্রকার গঠিত হইল। শুক ও পুরোহিতের শুণে ঐ কালেও সাক্ষর্য্য দোষ নাই। প্রণালিমত কার্য্য ধর্ম্ম-রাজ যথিষ্টির অধস্তন সত্যত পর্বাস্ত থাকিল। তৎপর প্রকৃত ক্রিয় রামার আর যুনিবির অধর্ষন হইলে সমগ্র দেশ নিশান্ত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ ঐ তীব্র ধর্ম্মপ্রাবিনকে যুগলয় বলিয়া জানেন। ঐ প্রলয়-

বদানের পর ভারতে শাস্ত্র সকলের অর্থাৎ বেদ, পুরাণ প্রভৃতি স্মৃতির নূতন রূপ যেমন হইল, কথাকাণ্ডের পদ্ধতিও তদনুসারে হইয়া উঠিল। ভারতের ক্রিয়া কলাপের যে সকল শাস্ত্র প্রস্তুত হইল তাহা বেদ প্রভৃতি স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র মিশ্রিত হইয়া হিন্দুয়ানি রূপে হইতে লাগিল। এইরূপ ক্রিয়া কলাপের পদ্ধতিতে সাক্ষর্য্য দোষ যে ঘটিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে বেদ সত্য যুগের, প্রাতি স্মৃতি ত্রেতা যুগের, পুরাণাদি দ্বাপর যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র—এক যুগের শাস্ত্র কখনও অন্য যুগে ব্যবহৃত হয় নাই; হস্তাঃ কলিযুগে তাহাদের একত্র ব্যবহার হওয়া যে সম্ভবপর তাহা কখনই বোধ হয় না। বিশেষ, যে যুগের যে শাস্ত্র তাহা যখন পরবর্তী যুগেও প্রচার ছিল না, তাহা যে তাহার এক পরেও সেই যুগশাস্ত্র রূপে প্রচারিত হইবে ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। শাস্ত্রশঙ্কর মানব মঙ্গলের নহে। কলিযুগে যে শাস্ত্রশঙ্কর ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই, তাহা কখনই হইতে পারে না। যিনি মঙ্গলনিগর, তিনি অবশ্যই তাহার অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্রশঙ্কর পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যবস্থানুসারে চলাই আমা-
দের কর্তব্য। তাই তন্ত্রকার বলিয়াছেন,

যুগাদৌ বেদমার্গেণ ত্রেতায়াং প্রতীসম্বর্তং ।

দ্বাপরে চ পুরাণেন কলাবাগমসম্বর্তং ।

আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ ভজ্যেৎ শ্রুতীঃ ।

নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলাবন্য বিধানতঃ ।

[ক্রমশঃ]

ত্রিকালীকমল সর্গভৌম

গৃহ ।

এই গেষ্ট শব্দ-শ্রেম-কাষের রাজধানী গৃহ—আমার কক ভাদী আশার সাধের হীরা বাঁধানো-পাথরে নির্মিত উজ্জীবনের একমাত্র স্রবের জন্ম-ভূমি—আজ অতি পুরাতন, মলিন, ভগ্ন, পরিত্যক্ত! আজ ইহাকে আর

চিনা যায় না! আজ ইহা অন্ধকারের বিপুল রাজধানী! সে সুন্দর প্রাণ-উদাসী বাতায়ন আর চিরকক! ধূলি-মাণে ঢাকা! তাহার মধ্য দিয়া সূর্য-নিরপেক্ষ অবিদ্যাহ জ্বালা-খেলা আর দেখা যায় না! আজ এ গৃহ-পেচক-বাড়-হি-জ্ঞান জন্ত প্রভৃতির বিচরণ-ভূমি! গভীর অন্ধকার রজনীতে কেহ ইহার মধ্যে একা প্রবেশ করিতে সাহস করে না! জনপ্রবাহ, ইহা এখন শ্রুত-নিবাস!—আর হৃৎকের বাকি কি?—হা! প্রকৃতি, তোমার অনন্ত লীলা!!

আজ কত—কত দিনের পর শত-মূর্তিনী বিদ্যাপ্রাণিনী স্মৃতির নীরব মোহময়নর বাঁশী শুনিতে শুনিতে কোথাকার পথ তুলিয়া আবার সেই হৃদয়স্থানী অতীত হৃৎকের অবগান—গৃহে আনিয়াছি। দিবলের কাম্যমে প্রান্ত বিবসনা সন্ধ্যার এই শান্তি প্রদত্ত স্তব্ধতার শিপিলা ফোড়ে বলিয়া এই গৃহ আজ কি ভাবিতেছে? এ গৃহ কি সেই শত হাসি-জ্যোৎস্না-রঙ্গ-রঙ্গের কেন্দ্রভূমি? তবে কিছু আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? সে লতাঘাথা মধুর অক্ষুট গলা আর শুনিতে পাইলাম না কেন? সে হাসি কোথায়? সে জুবনমোহিনী মূর্তি কোথায়? অক্ষুট গোলাপের মতন অবগুণ্ঠনে ঢাকা সে মধুর লজ্জা কোথায়? গভীর অনন্ত সাগরের মতন সে অন্তলম্পর্শ প্রণয় কোথায়? দুঃস্বপ্ন সঙ্কটের মতন সেই সূর্যের উজ্জ্বলময় আন্দোলন কোথায়? সেই সুধামাথা প্রাণ-জুড়ান কথা কোথায়? হৃৎকের অদৃশ্যের সেই প্রাণ-হরা ব্যথা কোথায়? অক্ষুট প্রকৃতির কোমলতার সমষ্টি সেই প্রেম-মর চাঁদ আজ কোথায়? প্রাণের অনন্ত ভূষা-মিটান সেই মধুর স্বপ্নময় নিশি কোথায়? সেই জীবনময় বসন্ত কোথায়? সেই পাখী কোথায়? লতাধ্বনিগের সেই নীরব কোলাহুলি কোথায়? সে লব সুখ দিনের জ্বলি মধুর স্নিগ্ধকর—পুরাতনের সেই মধুর স্নিগ্ধকর বাতাস কোথায়? দিবলের সেই সুখ-হৃৎ-জাগান অক্ষুট বিচিত্র জ্বালা-খেলা কোথায়? জগৎবানীর সে অপূর্ণ প্রাণ-উদ্ভাব কারী বিবিধ তান আর শুনিতে পাই না কেন? কই?—এ কি দেখি? সব শূন্য যে! তাই অমন নীরব! যেন ইহা কাহার সমাধির ভয়াবশেষ! গমাধি? কাহার? সে নহে কি? আজ আমি কি তবে তাহার সমাধি দেখিতে আনিয়াছি! তাই কি গৃহ, আমাকে

দেখিয়া ঐ তর কপাটের অগা দিয়া সমীরণের “হাঃ হাঃ” শব্দে কান্দিয়া উঠিল। জ্বর কাটিয়া যেন বলিয়া উঠিল—“সব অবসান! অজের খেলা সাদ! আর তোমার অত সমতাপূর্ণ আশু-বিস্মরণকারী মধুমাধা সৃষ্টি কেন? কেন চক্ষু অশ্রুপূর্ণ? জাননা কি নির্ভর আপন কার্যে নদা-বাস্ত অঙ্ক অড়-প্রকৃতির এই নিয়ম? তোমার সাধের গৃহ চিরদিনের মতন ভাঙিয়া—তাহার কার্য শেষ করিয়া—শে চলিয়া গিয়াছে!” হাঃ, কে বলিয়া বিবে আমাকে সে কোথায়—কোন্ দেশে—কোন্ সমুদ্রের তীরে চলিয়া গিয়াছে!

কে সে? যে মজীত হৃদের চিত্তব্রূপ কত স্মৃতি-আগাম এই সোণার গৃহের একমাত্র গৃহিণী ছিল! যে এক দিন এই অন্ধকারময় গৃহ রূপে আলো করিয়াছিল! যে এক দিন এই গৃহ নাট্যমন্দিরে কত সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের কত বিবহ-মিলনের অভিনয় দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের মতন মুগ্ধ করিয়া তাহার অভিনয় শেষ করিয়া—তাহার শেষ কথা বলিয়া—চলিয়া গিয়াছে! বাহার লাজমাধা মধুর সৃষ্টির অক্ষুট কিরণ, এই গৃহের চারি দিকে স্মৃতির অশরীরী স্পর্শের মতন মৃত্যু করিয়া বেড়াইত! যে সন্ধ্যাতারার মতন এই কোলাহল-শূন্য গভীর শান্তিপূর্ণ বিঘন গৃহ-আকাশে প্রতিদিন অলিত! যে কত শত দিন এই গৃহের ঐ দক্ষিণা বাতাস-বহা বাতাসনে বলিয়া কবিত্বময় স্মৃতির রক্তভূমি ঐ অনন্তনীল নির্মল আকাশের কোলে প্রেমের কত স্নমধুর কোমল স্বপ্নময় আশার ফুল ফুটতে দেখিয়া ভাবিয়াছে যে, এ দিন কি আমার কুরাইবে! আবার কত বিশ্ব-অন্ধকারকারী স্বত-প্রাণ-কৈদে-ওঠা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাহার বিপরীত দেখিতে পাইয়া লেই ছুখানি বড় বড় নির্মল রেহঙ্কট চক্ষের অনন্ত বারিধারায় ঐ বাতাসন ভাসাইয়া দিয়াছে! যে কত গভীর চির-অগ্রচবিময় শান্তশরদ-স্নো-স্নো-নিমিত্তে দূরগত বঁশীর তানের মতন প্রাণে প্রাণে মিলিয়া আমার হৃদয়ের অস্তঃপুরে কত নীরব প্রেমগীতি চালিত—কত মধুর বিচিত্র উপকথা শুনাইত! যে এক দিন এই গৃহে বলিয়া তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “Is matter certain?” জীবন কি বস্তু? কবি কি দুদিনের জুজু খেলা? মরীচিকা? এক দিন এই হৃদে-তরা আঁধার গৃহ-দিশোপনয়ের উপর রানীর মতন বলিয়া আমাকে কত কল্পনাভীত অগত-ভুলান বেশে সাজাইয়া আশা মিটাইতে পারে নাই।

যে প্রতিদিন এই গৃহ-উপকূলে মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আকুল অন্তরে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত । যে এই মৌজ-তল্ল স্বভূমি-প্রণীড়িত মজুমদার গৃহের চিরশান্তিকাতা চিরচারা ছিল । যে কতদিন মূহুর্তের জন্য অস্থূল হইয়া শূন্য গৃহে আবার ভাব—মূর্ত্তি লুকাইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিব মনে করিয়া—কি জানি কি ভাবিণী—কাঁদিয়া ফেলিত । যে এই গৃহের—এই নিমিত্ত গৃহের চির-আগরণ ছিল । যে আমার এই শুক গৃহের একমাত্র আত্মান ছিল ! কে সে ? কোথায় সে ?

হায়, আজ সেই গৃহের মুখ কি মলিন ! কি শীর্ণ ! কি বিষ্মত ! গৃহ-খানি বেন আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন গৃহ ! আজ আমি সেই গৃহের—আমার অভীতের মোহময় নন্দনকাননের—সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেন স্বপ্ন দেখিতেছি ! বেন আমার আজ আশ্র-বিশ্বস্তি উপস্থিত ! এ কি সেই গৃহ ?

হায়, পূর্বেকার সঙ্গে এখনকার কত খানি প্রভেদ ! আর সে শোভা নাই । সে গাছ নাই ! সে ফুল নাই ! সে পাখীর ডাক নাই । সে উৎসব নাই । সে প্রেম নাই । সে সূর্য্য নাই । স্বর্গের সে বাতাস নাই । আর সে চেউ-খেলা নাই । সব—সব ভূবিয়া—মরিয়া কোণায় চিরদিনের মতন ভাদিয়া গিয়াছে । আছে কেবল অনন্ত অন্ধকার—অসীম শূন্যতা—চির-দিবসের বিরহ—সদা হায় হায়—অভীত-ছায়া—হৃদয়ের ইতিহাস—কুলের গন্ধটুকু—স্মৃতি—গৃহের ভগ্নাবশেষ—মৃত্যু !!!

ঐনগেন্দ্রনাথ বসু ।

৮ রাজকৃষ্ণ যুথোপাধ্যায় ।

চারি মাস হইল রাজকৃষ্ণ যুথোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে । কিন্তু মনে হইতেছে, বেন চারিদিন মাত্র তিনি আমাধিককে ছাড়িয়া গিয়াছেন ।

এখনও যেন তাঁহার সেই চির-প্রসন্ন মুখ, সেই ঐতিহ্যের নৃষ্টি দেখিতে পাইতেছি ; এখনও যেন তাঁহার অমৃতস্রবণ বাণী কাণে বাজিতেছে । তাঁহার জন্য আমাদের দুঃখ অবমান হইবার নহে । তাঁহার জন্য আমরা যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি, ঐশ্বর করুন, এরূপ ব্যথা যেন আর পাইতে না হয় । একাধারে এত গুণের মানুষ এ সংসারে অতি বিরল । তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বিদ্যা সর্বমুখী ছিল, তাঁহার ক্ষমতা অদ্বিতীয় ; তিনি আত্মীবন জ্ঞানচর্চা করিয়া, জ্ঞানে মগ্নিয়া গিয়া, জ্ঞানময়প্রাণ হইয়া জ্ঞানের অমূল্যলেনেই জীবন বিসর্জন করিয়াছেন । কিন্তু এরূপ অগাধ জ্ঞান, অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁহাকে অন্যজনহুলত পক্ষে ক্ষীণ করে নাই । অহঙ্কার বা অভিমান তাঁহার উন্নতচিত্তে স্থান পায় নাই । তিনি সে সকল হীন বৃত্তি হইতে অনেক উচ্চে ছিলেন । ‘স্বাভীর্ষ মানুষ’ বাহ্যকে বলে, তিনি তাহাই ছিলেন । তিনি এতদূর বিনয়ী, এতদূর নম্র ছিলেন, যে অনেক সময়ে আমাদের ভ্রম হইত, তিনি বৃষ্টি তত বিদ্বান্ তত জ্ঞানী নহেন । কৃত-বিদ্যা ব্যক্তির মুখ দেখিলেই যে অনিশ্চিত বলিয়া ধারণা হয়, তাঁহার স্মৃতিতে সে ভাব একাংশ পাইত না । বিদ্বান্ হইলে যে গাত্তোর্য্য অগ্রে সে গাত্তোর্য্য তাঁহার ছিল না ; তিনি যাকের ন্যায় সরল ছিলেন । বোধ হয় তিনি আপনাকে আপনি চিনিতে পারেন নাই । আপনি যে কত বিদ্যা, কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, আপনি তাহা ঠাওয়াইতে পারেন নাই । জ্ঞানের ভাবে ভোর হইয়া, জ্ঞান সমুদ্রে ডুবিয়া রহ্ন আহরণ করিতেছিলেন; দেখিবার অবসর ছিল না, ক্রমোপ ছিল না কত রহস্য সংগ্রহ করিয়াছেন । ইহাকেই নিকাম ভাবে জ্ঞানালোচনা বলে । এরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা । এরূপ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান । আলিঙ্কার এই আড়ম্বর-প্রিয়তার দিনে, এ আদর্শ আমাদের নিকট মহান্ আদর্শ । রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনের এই ভাব হইতে আমরা এক মহাশিক্ষা পাইয়াছি । আমরা—বাস্তাব্য, বিদ্যার ভাণ ভ্যাগ করিয়া বিদ্যালিক্ষা করিতে পারি না । প্রকৃত জ্ঞানী হইতে গেলে নিরহঙ্কারী, নিরতিমানী হইয়া সর্ব্ব প্রকার আড়ম্বর পরিহার করিয়া, যে উন্নততা, যে তত্ত্বময় আবশ্যক, রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবন হইতে আমাদের এই সারলিক্ষা লাভ করা উচিত । আমরা যে কেবল অসারতা, কপটতা, হীনতা শিখিতেছি, দিন দিন মল্লবাস্য হারাইতেছি,

রাজকুমার বাবুকে জগৎ প্রতীতি করিয়ে অচিরে আমাদের সে দুর্দশা মোচন হইবে, আমরা কৃতার্থ হইব ।

জাতীলোকের আরও যে সকল মহৎ ওণ অবশ্যক এবং আগাদের আভিতে বাহা অম বাঞ্ছিতই আছে, রাজকুমার বাবু সেই সমস্ত ওণে ভূষিত ছিলেন । তাঁহার অহংকারশূন্যতা, নিরতিমানিতা, বিনয় ও নম্রতার বর্ণনা করা যায় না । সেই সত্যত্ব, অনলস, নিম্পৃহ, মাতৃভাষাভাষী, ঈর্ষ্যাবিরহিত, প্রীতিমান, প্রসন্ন, নিরপেক্ষ, অসম্প্রদায়িক লোকের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায় না । আমরা অভিমান করিতেছি না, যিনি তাঁহার সহিত দুই দণ্ড আলাপ করিয়াছেন, কি যিনি তাঁহার পুস্তক বা প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে জানিয়াছেন, তিনিই বলিবেন, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বাহুল্য-বর্ণনা হয় না । একাধারে এত ওণ প্রায় থাকে না, দেখা যায় না । এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কি পরিচয় দিব ? তবে সাধারণকে তাঁহার আভাস মাত্র দিবার জন্য আমরা এ স্থলে কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতেছি ।

কেবল সত্যবাদী হইলে 'সত্যত্ব' হয় না । ভিক্ষায়, কার্যে, ব্যবহারে যিনি সত্যচরণ করেন, সত্যানুশীলন বাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্য, সত্যানুসন্ধানে যিনি আত্মবিশ্বাস প্রাপণ যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তিনিই কেবল সত্যত্ব নামে অভিহিত হইতে পারেন । রাজকুমার বাবুর সেই মহৎ ওণ ছিল । বাহারা তাঁহার "বাল্মীকীর ইতিহাস" এবং "নানা প্রবন্ধ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার ও সত্যানুশীলনের পরিচয় দিতে হইবে না । বাল্মীকীর ইতিহাসে তিনি এতগুলি সত্য তথ্য বাহির করিয়াছেন, বাহা ইতিপূর্বে কোনও ইংরেজি ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই । কারণ, সে সকল ঐতিহাসিকের ইতিহাস প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ; একমাত্র সত্য তাঁহাদের গাঢ় অজ্ঞান ও ভক্তি ছিল না । তারপর, তাঁহার নানা প্রবন্ধ নামক পুস্তকের কথা । ইহার সম্যক পরিচয় স্থল ইহা নহে । এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ (anti-quarian) নাম পাইয়াছেন । সত্যাপেক্ষা ইহার যে কিছুই প্রিয় ছিল না, দেশানুরাগ প্রভৃতি অপেক্ষা সত্যানুরাগ যে অধিকতর প্রবল ছিল, বাহার প্রমাণ আমরা "বিদ্যাপুতি," "জ্ঞান ও নীতি" প্রভৃতি প্রবন্ধে দেখিতে পাই ।

বিদ্যাপতির মত উৎকৃষ্ট কবিকে বাঙ্গালা দেশের কবি বলিতে পারিলে যে বাঙ্গালা দেশের মহাগৌরব হইবে, ইহা জানিয়া অনেকে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালা দেশের কবি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অন্ধ বেশভূষির নিকট সত্যকে বলি দেন নাই। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, বিদ্যাপতি মিথিলা দেশীয়। “জ্ঞান ও নীতি” নামক প্রবন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে, সত্যের বলে বলীমান হইয়া প্রাচীন জ্ঞান ও নীতির কতকগুলি দোষ এবং বর্তমান জ্ঞান ও নীতির কতকগুলি গুণ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার সত্যনিষ্ঠার অধিক পরিচয় দিবার স্থান নাই। এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে, তিনি কোনও বিষয় সাধারণতঃ প্রমাণ ব্যতীত লিখেন নাই। যে কথায় তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মিয়াছে, সে কথা সাধারণকে জানান নাই। এই সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হইয়াছিল; এই জন্য ইদানীং তিনি ভারতবর্ষের একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ স্বার্থ ইতিহাস প্রণয়নের অন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন। কত ভাবার কত অশ্রু যে পড়িয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ইহাই তাঁহাকে শেষ দশায় পালিতায়া শিথিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ দেবের সময় ভারতবর্ষের এক প্রধান যুগ। সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য পালিতায়া শিথিয়াছিলেন। অসুবাদে পূর্ণ সত্য মিলিলে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু, সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁহার কাল হইল! সত্যের আলোচনায় অবশেষে তিনি প্রাণ হারাইলেন। আমরা, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অকালে হারাইয়াছি! অকালে আমরা মহান্ আদর্শে বঞ্চিত হইয়াছি। জাতীয় জীবন-পটনের মূলমন্ত্রভাষা অকস্মাৎ আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

ইহার পর তাঁহার অনলসতার অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। পূর্ণ-মেটের অসুবাদকের কার্যে ‘হাড়ভাঙ্গা’ পরিশ্রম করিয়া বহুটা অবসর পাইতেন, কতটা অধ্যয়নে কাটাইতেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক প্রধান ভাষার সাহিত্যের সার গ্রহণাভিপ্রায়ে সেট সফল ভাষার ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইদানীং আবার জ্যোতিষ শিক্ষা আরম্ভ করিতেছিলেন। এজন্য আপনার উচ্চ পরমর্ধ্যাদা তুচ্ছ করিয়া কুটীরে, কুটীরে ভ্রমণ করি-

রাছেন। তিনি এক নৃহর্ষ ও বৃথা ব্যয় করিতেন না। তরুণ বয়সেও যে এ দেশের বপেট বিকাশ পাইয়াছিল, তাহার অধ্যয়নকালের কীর্তি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অলস-প্রধান বাহালীর কি তিনি সামান্য শিক্ষক? অলস বলিয়া আমরা কোন কার্য করিতে পারি না। আমাদের চতুর্দিকে সহস্র সহস্র অভাব, এক আলস্য আমাদের উদ্যম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বিনষ্ট করিয়া আমাদেরকে নিৰ্জীব করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা পূর্বেই তাঁহার নিকামভাবে জ্ঞানানুচিনার উদ্দেশ্য করিয়াছি। আমাদের দেশে জ্ঞান বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে যে কাজ হয় অনেকের মধ্যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বশোভ। কিন্তু তাঁহার সে স্পৃহা ছিল না। তিনি যতটা জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন, ততটা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে বা সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। আমরা তাঁহার জ্ঞানের শতাংশও পাই নাই, বলিলে হয়। তিনি জ্ঞানের জন্য জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন।

তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অহরাগ অকুলনীয়া। সাধারণের শিক্ষা সাধ্য। তিনি যখন বিদ্যালয়ের কাঠমকে বলিয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদেশীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অহরাগ। সহপাঠীগণ কখন তাঁহার নিকট সেই বিদেশীয় সাহিত্যের প্রসংসা করিলে, তিনিও তাঁহাদিগের সহিত প্রসংসা করিতেন বটে, কিন্তু তখনই আবার বলিতেন—

“নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,

বিনে আপন ভাষা পুরে কি আশা?”

নিম্ন বাবুর এই মহৎ ব্যাকার গভীরতা তিনি বাল্যকাল হইতেই বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, কৈশোরের সেই কোমল স্নেহ-কলকে এই অক্ষর কয়টি যে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা এক দিনের ভয়েও মসিনত। প্রাপ্ত হয় নাই। পরে যখন তিনি নানা ভাষায় নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, তখনও তাঁহার সেই একই কথা—একই বুলি। তিব্বতীয় ভাষার পরিমায়, কবিবের মধুরিমায় যখনই তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, মগ্ন হইয়া তাঁহার ভাবন পান করিতেন, তখনই যেন আপনা হইতে স্নেহে সেই কথা আগিয়া উঠিত, তিনি বলিতেন—

“নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে আপন ভাষা পুরে কি আশা ?”

কিন্তু এ কথা তিনি কেবল কথাই রাখিয়া যান নাই। মাতৃ ভাষার উন্নতি-সাধনে তিনি কোনও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। নানাতাষা হইতে নানা-ভাষায় সংগ্রহ করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালার তিনি এক জন প্রধান দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ৷ং কবি। এই দরিদ্র বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে সকল রত্ন সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভুল’ভ সামগ্রী। হার, কণে সকল কৃতবিদ্যা বঙ্গসম্রাজ্য তাঁহার দ্যায় মাতৃভক্ত হইবে, তাঁহার মত মাতৃসেবা করিতে শিখিবে, আপনাত ভাষার সম্যক আদর ও অহুসীলন করিতে যত্নবান হইবে!

তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ, দার্শনিক, কবি ও ভাষাবিৎ ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কি তাঁহার সমকক্ষ কেহ কি ছিল না? অনেকে ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায়-মূলত ঈর্ষ্যা করিতেন না। বরং বাহারা এই সকল গুণে গণবান্ ছিলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহার্দ্য ছিল। কনিকাভায় এমন কোন মূল্যবৎক বা এমন কোন পণ্ডিত নাই, যাহার সহিত তাঁহার প্রণয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত মিশিতেন, সকলের মধ্যে যে সার পাইতেন, তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। সন্ধীর্ণতা, পক্ষপাতিতা তাঁহার উদার, বিশাল হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের বিপক্ষ ছিলেন না; কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতেন না। সকল সম্প্রদায়ে নিঃসঙ্কোচে অবিকৃত হৃদয়ে মিশিতেন; সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, প্রত্যেক লোকের মধ্যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু না কিছু সত্য আছে। সেই মহাধন লাভ করিবার জন্য তিনি সকলের অন্তর খুঁজিতেন। তাঁহার মত সভ্যত্বত না হইতে পারিলে, তাঁহার মত সকলের প্রিয়কারী এবং সকলের প্রিয়ভাজন হওয়া যায় না। তিনি কাহা-কেও ঘৃণা করিতেন না; সকলেরই প্রতি প্রীতিমান্, স্নেহশীলী ও দয়ালু ছিলেন। ঈর্ষ্যা, ঘেব, হিংসা, ঘৃণা, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না বলিয়া তিনি সবা হাস্যময়, সবা প্রসন্ন ছিলেন। তাই

তাঁহার জন্মে চিরশান্তি বিরাজ করিত । তাই তিনি বোধ হয়, প্রকৃত সুখী ছিলেন । এ পাপ সংসারে একপ লোক বড় বেশী অমায় না । একপ মহাত্মা এ সংসারে বিরল । একপ লোকই আমাদের আদর্শ হইবার উপযোগী । তাই সে দিন আমরা সকলে সানিত্রী লাইব্রেরীতে একনে মিলিত হইয়া-
 ছিলাম । আমরা যে কি মগরস্ত হারাইয়াছি, সকলে বোধ হয়, জ্বরজ্বল
 করিয়াছেন । সে শোক জুলিবার নহে । আমাদের দুঃখের অবধি নাই ।
 আশা করি, সকলে তাঁহার অমূল্য স্মৃতি জন্মে দারন করিয়া তাঁহার গুণাবলীর
 অনুকরণ করিবেন । জ্বরমন্দিরে তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে আমরা
 সৎ, উন্নত, মহৎ হইব । আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ।

ত্রিগোবিন্দলাল দত্ত ।

মা ।

জ্বরের সুখা দিয়ে, চুষনে বইয়া মায়া,
 বেহ-বাঁনি বিকাইয়া চরণের ডলে,
 হুখেতে আপনা-দারা—
 ‘মা’ ব’লে লিখাত বলিতে রে ‘মা’
 জননী আলোর ধারা ।

ভুই, কোথা হ’তে এলি, ছোট ফুল-বপু-খানি
 বৃকেতে বাঁধিলি বাসা মায়ার ডোরেতে,
 পদে পদে অভিমানি !
 কোলে এসে খেয়ে—হাসিতে জুলায়ে—
 মা হলে মা কিসে, রাণি ।

ত্রিপ্রিয়নাথ সেন ।

ভারতে ইংরেজাধিকার ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।]

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে কারারোধ করিয়া, ভ্রাতাদিগকে নিহত করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন বাট, কিন্তু রাজদণ্ড গ্রহণের পর তিনি স্থানীয় রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলা কালেই প্রজাদিগের অটল বিবাদের শীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়া উঠেন। যখন সম্রাট শাহজাহাঁ সুরদা দেওয়ানী ধানে অগতে অহুগনীয় হৃদ্যা ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতেন, তখন আওরঙ্গজেব প্রায়ই তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক অটল বিষয়ে আপনার স্বস্থ বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের বয়স দ্বাদশ বৎসর। দ্বাদশবর্ষীয় বালক এক সময়ে রাজকর্মে যে অভিজ্ঞতা ও স্বস্থ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করার পর তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব পাপের গতি নিরোধ করিতে অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তিনি প্রতিদিন বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকের সাহায্যে বিচারকার্য্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহার আদেশে কাবুল হইতে আরম্ভাবধ পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত রাজপথের পার্শ্বে পথিকদের সুবিধার জন্য পাছনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পথিকেরা এই স্থানে রাজকীয় ব্যয়ে কাঠ, পাকপাত্র, চাটল ও অন্যান্য দ্রব্য পাইত। পূর্বতন সম্রাটেরা রাজপথের পার্শ্বে যে সকল অটালিকা নির্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন আওরঙ্গজেব তৎসমুদায়ের জীর্ণ সংস্কার করেন। জুজ্জু নদী পারের জন্য সেতু নির্মাণ করাইয়া দেন এবং বৃহৎ নদীর পার হওয়ার নিমিত্ত নৌকার বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আদেশে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপকদিগের বেতন রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইতে থাকে। সম্রাট নানা স্থান হইতে নানা বিবদের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালোচনার সুবিধা করিয়া দেন। তিনি অল্পঃ শুলেখক ছিলেন, তাঁহার লিখিত লিপি সকল

লালিত্য ও মাদুরাঙণে সযিনেব সসিক্রি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজ-
কর্মচারীদের নিষিদ্ধ নিষি নিজেই সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার
সময়ে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অদূর দক্ষিণাপথ
পর্যন্ত তাঁহার বিজয়-পতাকা উজ্জ্বল হইতে থাকে। রাজপুতশ্রেষ্ঠ জয়সিংহ
ও যশোবন্ত সিংহ তাঁহার প্রাধান্য ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখার জন্য যত্নশীল
হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে দক্ষিণাপথে বিশাল সৈন্য-সাগরের আবি-
র্ভাব হয়। ভারতের মুসলমান রাজত্বে আর কখনও এরূপ দৃশ্যের বিকাশ
হয় নাই। এরূপ বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, এরূপ ঘন সন্মিলির অধিপতি
ও সৈন্য বলের অধিকারী হইলেও আওরঙ্গজেব মোগলের প্রাধান্য রক্ষা
করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি নানা গুণে অসম্পূর্ণ হইলেও সমন্বী বা
উদারশ্রুতি ছিলেন না। সমদর্শিতা ও উদারতার বলে যে, সাম্রাজ্য দৃঢ়-
তর হয় তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার রাজ্যে সকল শ্রেণীর প্রকার
নিষ্করবেগে থাকিতে পারে নাই। তিনি অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে অনুচিত
সম্পূর্ণতার পরিচয় দিয়া, আপনায় বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে আপনিই বিশ্বাসস্থল
করিয়া তুলেন। আকবর যে কীর্তীয়া কর রহিত করিয়া, হিন্দুদের আত্মরক্ষা-
ভাজন-হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের
সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে বিরক্ত করিয়া তুলেন। মিবারের রাজবর্ষবিং রাজন্য-
শ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহ তাঁহাকে এ বিষয়ে সংপরাশ্রম দিলেও তিনি সেই পরা-
শ্রমের মধ্যাক্ষর রাখা করেন নাই। রাজসিংহ কীর্তীয়া কর গ্রহণের বিরুদ্ধে
সম্রাট আওরঙ্গজেবকে যে পত্র লিখেন, তাহার ভাব আমি এখানে প্রকাশ
করিতেছি :—

“সর্বশক্তিয়ান্ অগদৌষের মহিমা প্রসংশিত হইক। স্বর্গ ও চন্দ্রের
ন্যায় গৌরবাধিত আপনায় বাদান্যতা প্রসংশিত হইতে থাকুক। আপনার
ভক্তাকাজী আমি, যথিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি,
তথাপি সন্মুচিত রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।
এই হিন্দুহানের রাজা, রাণ ও সম্রাটগণের, ইরান তুরান, শাণ ও রুসের
ভূপতিগণের, সপ্তাঙ্ক জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও জলপথ
যাত্রীগণের সর্বজনীন উপকারসাধনে আমি সর্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। এ

নিষেধে যোগ হয়, আপনার কোন ক্ষেপে নাই। এই অন্য আমি আমার পূর্ণকৃত কাব্য স্বরণ করিয়া এবং আপনার শীলতা ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের স্বার্থ-সংকষ্টে একটি শুভ্রতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

* “আমি অবগত হইয়াছি, যে আপনার এই তত্ত্বাজ্ঞার বিরুদ্ধে দৃঢ় করিবার জন্য আপনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং আপনার শূন্য মন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

“আপনার বর্গীয় পূর্ণকৃত মহৎ জালাল উদ্দীন আকবর সম্বর্ধিতা ও দৃঢ়তার গঠিত শাসন ব্যবস্থাকাল এষ্ট সাম্রাজ্যের কার্য্য নির্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বের সকল আঁটির লোকই স্বয়ংক্ৰমে ছিল। ঈশা, মুসা বা মহম্মদের শিষ্যই হউক, ব্রহ্মণ্য বা হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতিই অমুগ্রহ ও শীলতা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সম্বর্ধিতার জন্য, তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতার আবেশে তাঁহাকে অগণ্য গুণ বলিয়া অভিহিত করিত।

“বর্গীয় ছবউদ্দীন জাহাঙ্গীর বাইশ বৎসর বয়সিয়সে প্রজাপালন করিয়াছেন। নিরন্তরত্বের প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রকাশন করিতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন।

“মহিমান্বিত শাহজাহাঁ। বহুদিন বৎসর শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া, বহু, ও ধর্ম্মের গৌরবযুগ পুরুষ—অক্ষয় যুগান্তির অধিকারী হইয়াছেন।

“আপনার পূর্ণ কৃতবর্ণনের লোক-চিত্রকর কার্য্য এইরূপ। তাঁহারা এই-রূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদাধিগণ করিতেন, সেইখানেই বিজয়মুখী ও সৌভাগ্য-প্রী তাঁহাদের সমুদয়বর্ত্তিনী হইত। তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার রাজত্বের অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়াছে। এমন অভ্যাচার ও অবিচারপ্রসূত অপ্রতিহতবেগে প্রাহিত হইতেছে, যতদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান এরূপ হস্ত-ভরে হইয়া পড়িবে। আপনার প্রজাগণ পদ-দণ্ডিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ জ্বলদগ্নিহো ভাংক্রান্ত

হইয়াছে। যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হন, তখন সম্রাট লোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে? সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানাক্রম অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জন সাধারণ রাত্রি-কালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উদ্ভত হইয়া, সমস্ত দিন গিরে করাঘাত করিতেছে।

“যে রাজ্যাধিপতি এরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর কর-ভারে নিপীড়িত করিবার জন্য আপনার ক্ষমতা বিনিয়োগ করেন, তাঁহার মহত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দশার সময়ে পূর্বে হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিন্দুধর্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। স্থলগিক তৈমুর বংশের সৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নিরঙ্কন-স্থানবাদী নিরপরাধ তপস্বীদিগের উপর আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতে উদ্যত হই-রাছেন। আপনি যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিখাগ স্থাপন করিলেই বেধিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিরই ঈশ্বর; তিনি কেবল মুসলমানদের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল তাঁহার প্রবর্তিত রীতি মাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বের আদি কারণ। আপনার ধর্ম-মন্দিরে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ষষ্ঠী-ধনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। আপনার লোকের ধর্ম ও অত্যাচারের অবমাননা করা, আর সর্বশক্রিয়ান ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত কাজ করা, উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর সম্ভাবতই আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। এই জন্য কবি ষষ্ঠাংশটো কহিয়াছেন যে, বিশেষ না আনিয়া শুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্যের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক হওয়া উচিত নহে।

“আপনি হিন্দুদিগের নিকট যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়পরতার বহির্ভূত। উহা সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকতর উহা হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি আপনার ধর্ম্মাক্রান্ত আপনাকে ঐ কার্যে প্রবর্তিত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মামুসারে হিন্দুদিগের প্রধান দাবিসিংহের

নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত । পরে আপনাদের এই শুভাকাঙ্ক্ষাকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু পিপোলিকা ও মল্লিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও প্রকৃত মহামুত্তাবকত্বের লক্ষণ নহে । আপনাদের অমাত্যগণ যে ন্যায্যপরতা ও সম্মানের সহিত শাসনকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিবার জন্য আপনাকে সদুপদেশ দিতে উদ্যোগী রহিয়াছেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিতেছে ।”

রাণা রাজসিংহের পত্রে এইরূপ শীলতা অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিষ্কৃত হইয়াছিল । ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা ও এইরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত দিল্লীর সম্রাটকে অপকর্ণে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । রাজনীতির উচ্চতায়, ভাবের গভীরতায়, উদারতার মহিমায় ও প্রকৃত বীরত্বের অপূর্ণমাত্রকতায়, ঐ পত্র পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের, যে কোন সময়ের রাজনীতিজ্ঞের নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পারে । ঐ পত্রের প্রতি অক্ষরে হিন্দু আর্থীর প্রকৃত হিন্দুত্ব পরিষ্কৃত হইতেছে, এবং হিন্দু রাজার প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় পওয়া বাইতেছে ।

কিন্তু আওরঙ্গজেব এই পরামুসারে কার্য্য না করিয়া আপনাদের দুৰ্ব্বন্ধির পরিচয় দেন । এইরূপ নানা দুৰ্ব্বন্ধি প্রযুক্তই তাহার সাম্রাজ্যের বলক্ষয় হয় । তাহার দক্ষিণাপথস্থ বিশাল সৈন্য সমূলে বিক্ষত হইয়া যায় এবং তাহার দৌলত নিজের অকার্য্যজনিত নানা দৃষ্টিভ্রান্ত বার্ব্বিকাজনিত অবসন্নতার আওরঙ্গাবাদে নির্জন গৃহে অতীত কালের অনন্ত সাগরে নিমজ্জিত হয় ।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যে সতর্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন ভারতের এই পরিবর্তনের মূলে হুসতা ত্রিটীশ শাসনেও তাহার আভাস দেখা বাইতেছে । ইংরেজ বাহাদুর সাহায্যে ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছেন, প্রধানতঃ বাহাদুরের সহিত্যায় ইংরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য সুব্যবস্থিত ও সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহাটাই এখন অনেক সময়ে ইংরেজের নিকটে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয় । তাহাদের স্বত্ব, তাহাদের অধিকারের প্রতি অনেক সময়ে ওদাসীনা্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে । ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে আমরা ইহার অগস্ত পরিচয় পাইয়াছি । আওরঙ্গজেবের দক্ষিণতা-মূলক রাজনীতিতে ভারতে যে দূশোর জ্বাবির্ভাব হইয়াছিল,

ইংরেজ রাজত্বে যে তাহার পুনরাবির্ভাব হইবে আমি এ কথা কখনও বলি না। ভারতবাসী যাকতক; ইংরেজ-রাজত্বে তাহাদের অনেক উপকার হইয়াছে বলিয়া তাহারা ইংরেজ রাজত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহারা ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে না। ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিতে তাহাদের কোন ক্ষমতা বা উচ্ছাস নাই। তাহারা নিরাপদে নিশিবাধে ব্রিটিশ অধিকাংশে বাস করিতে ভাল বাসে। শান্তির এই সুখময় রাজ্যের বঞ্চিত হইতে তাহাদের কখন আগ্রহ নহে না। কিন্তু তাহারা ন্যায্যমূল্য পক্ষের প্রার্থী। ইংরেজ ভারতে যে শক্তির বীজ নিহিত করিয়াছেন, তাহা হইতে এখন একটা সন্তান বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মগা বৃক্ষের সুদূরবিস্তৃত ছায়ার সমবেত হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্বাবে মগ্ন হইয়া উঠিতেছেন এবং পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একতার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছেন। এই রমণীয় চিত্র পূর্বে কাহার দৃষ্টিপথবর্তী হয় নাই। ইংরেজের অসাদে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একতা জন্মিতেছে, মুসলমান রাজত্বে তাহার আবির্ভাব দেখা যায় নাই। আশা আছে, সমগ্র ভারতবাসী এক সময়ে এই একতার ধনে বলীগান হইয়া ইংরেজ রাজত্ব সমক্ষে আপনাদের এ ন্যায্যমূল্য পক্ষ রক্ষার সমর্থ হইবে, এবং শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিয়া, শৃঙ্খলা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, আপনাদের কৃতকার্যতার আপনারাষ্ট্র গৌরবাধিত হইয়া উঠিবে। মহানগর যোষণাগত চিরকাল উপেক্ষিত থাকিবে না। সরলজন্ম লব্ধ রীপণ বাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন, পরবর্তী কোন উপায়গ্ৰন্থ ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি হরত এক সময়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবেন। ভারত সাত্তা-জোর শাসনভার গ্রহণ সময়ে মহারাজা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন “ভারতবর্ষের প্রজাবের ঐশ্বর্য্য হইবেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব! প্রজারাই সন্তুষ্ট থাকিলে আমি আপনাকে নিজনক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব।” এই মহাবাক্য এক সময়ে সর্বসাংশে

সার্থক হইবে। যদি নায়ের ক্ষতাপ অক্ষুর বাক্যে, সাবৃত্তার বাজা অটল
রহে, নিরপেক্ষতার শাসন সম্বাদিত নিষ্পেষিত ও বিপর্যস্ত হইয়া না যাব,
তাহা হইলে রাজসিংহ ও জয়সিংহের লীলাভূমিতে, আগলফল ও ভোড়ল
মহের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে এই পরাধীন, পরপীড়িত, ঘোর দুর্গশায়ক ভূমণ্ডে
হঠাৎ এক সময়ে ব্রিটিশ শাসনের অমৃতময় ফলের নিকাশ দেখা যাইবে এবং
ব্রিটেনিয়ার অনন্ত অক্ষর কীর্ত্তি-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে পর্বাকরে অঙ্কিত
থাকিবে।

শ্রীরঘুনীহান্ত তপ্ত ।

হেমচন্দ্র ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

“ত’র পর ?”

পরমানন্দ বলিল—“তার পর সকলে মিলে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।
বলে দিলেন “হা, তোমার ঠাকুরপকে এখানে নিয়ে আস।” বাবুকে তেড়ে
আমার আগ্রহের বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি, সকলে বলতে লাগলেন,
তাই এলেম।”

মহামায়া আবার বিজ্ঞাসিলেন, “ডাক্তারে কি বলে ?”

পরমানন্দ বলিল—“ডাক্তার তো বলে, কোন ভয় নাই, পনের দিনের
ভিত্তর সেরে উঠবেন।”

মহামায়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। নিকটে তাঁহার মাক্তা
দাঁড়াইয়া ছিলেন। “হে মা দুর্গা, হে মা কালী—কি ক’লেন মা” বলিয়া
তাঁহার চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তারকনাথ, কালীঘাটের
কালী, মা মঙ্গলচণ্ডী, শুভচিনি, একদীল, পোরাচাঁদ—হিন্দু মুসলমান বহু
দেবতার নাম দে জানিত একে একে সকলের কাছে বাবুর কল্যাণে পুজা

মানিতে আরম্ভ করিল। চক্ষের জল বিন্দু বিন্দু হঠাৎ বড় বড় ফোঁটার পরিণত হইল, ক্রমে স্রোত বহিতে লাগিল। মহামায়া দেখিয়া বলিল—“আ মরণ, অমন করে মরুচো কেন? হয়েছে কি, একটু অস্থির বৈ তো নয়। অমন কার না হর? ও যেমন বাবু-সোহাগে চাকর, তাই দৌড়ে বাবুর উপর সোহাগ জানাতে এসেছে।” বুড়ী খতমত খাইল। তবু চক্ষের জল বহিয়া কেলিল। একটু নাক কাড়িয়া, একটু কান্নিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—“তা কি জানি, বাছা, ও মিনে এমনতর তা কি জানি! কি আকল, বাবু, অবাক করেছে, ও মা, শুধু শুধু কাঁদিয়ে দিলে কি না।”

পরমানন্দ বড়ই ব্যাকুব বনিয়া গেল। ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া একবার মহামায়ার ও একবার মধ্যমায়ার মাতার মুখ পানে চাহিল। শেষে বলিল—“তা দেখুন, যা ভাল বুঝেন করবেন; আমাকে কাল সকালেই আবার চলে যেতে হবে।”

মহামায়া বলিলেন “আচ্ছা—আচ্ছা—তুই যা; কি করি না করি সে পরামর্শ তোকে দিতে হবে না।”

পরমানন্দ আর কিছু বলিল না। বলিতে তাহার সাহস ফুলাইল না। দীরে দীরে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

তখন, না মেয়েকে বলিলেন, “সত্যিই যদি বাবুর অমন অস্থির হয়ে থাকে!”

মহামায়া ক্রুদ্ধ পরে বলিলেন, “হয়ে থাকে তো আর কি হবে!”

“সে কি কথা মা! অস্থির হওয়াই সম্ভব। নহিলে তিনি বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় কখন এতদিন তো থাকেন না;”

“তুনি যেমন নেকী; জান না, এবার বাড়ী থেকে কি ক’রে বেরিয়েছে। ও কেবল আমাকে জ্বল করা। তা আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি যদি বাপের বেটা হই, যেখানে কে করে জ্বল করে।”

“সে বড় মিছে নয়, তাঁর ঐ এক কেমন রকম। থাকেন থাকেন কি হয়ে পড়েন। কিন্তু মনে নিজে, তাঁর যেন সত্যিই বড় অস্থির করেছে।”

“করে থাকে, তোর কি কর্তে হবে?”

“বলি, একবার গেলে ভাল হতো না।”

মহামায়া রাগিল। বলিল—“উঃ বড় বে মোহাশ! হাঁ, যদি আর কি। আমার এই শরীর—আমার দেহে কে তার ঠিক নেই। শুনেছি, কলকাতা নাকি বড় কুখ্যা জায়গা, গলি ঘুঁঝি ময়লা—রাগা ঘরের কাছে পাই-খান্না—মা! শুনেলে আমি আসে—সেখানে কি আমরা থাকতে পারি! তার পরের বাড়ী—কোথায় বসবো, কোথায় শোবো তাও ঠিক নেই। এই বিজ্ঞানায়ই ঘুম হয় না, সেখানে দিয়ে কি ঘুতে পার! পেলে নিশ্চয়ই একটা উৎকট রোগ হয়ে পড়বে। আর রোগেরই বা বাকি কি? তা কাকে বা বলবো, কেই বা বুঝবে? আমার শরীরের উপর কার তো আর দরদ নেই। ভগবানই যখন বিহুশ তখন মাঘুবে না হবে কেন? নতিলে আমার এই শরীর দেখেও মা হ'য়ে কি কখন এমন কথা বলতে পারে?”

মহামায়া আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। চক্ষের জলে মুখশানা ভাসিয়া গেল, গলাটা ধরিয়া আসিল।

মাতা বলিলেন “ও মা তুই কাঁদিলি বাছা, আমি তো মল কিছুই বলি নি।”

মহামায়া বলিলেন—“আবার কপালই যখন মল, তখন তুমি আর মল বলে কি করবে।”

মা বড়ই অপ্রতিভ হইল। একটু ভয়ও হইল। অথচ তাহার কাবল যে কি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু মনে মনে স্থির করিল—মেরের কাছে আর কখন কলিকাতার যাওয়ার কথা পাড়িবে না। প্রকাশ্যে বলিল—“আমার ম'খা ধা, চূপ কর মা। আমি আবাগী না বুকে কি বলেছি, তা বলে মার উপর রাগ করিস্ নে বাছা।”

তখনও মহামায়ার চক্ষের জল একেবারে শুকাই নাই, তখনও তাঁহার নাকের ফোঁস ফোঁস ফোঁত ফোঁত শব্দ ধামে নাই, এমন সময়ে বিরাজ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল “কি, দিদি কাঁদচ কেন? মুখখো মশাই ভাল আছেন তো?”

মা বলিলেন, “বালাই, ভাল আছেন বৈকি, তবে পরম'নন্দ বলে একটু অসুখ হ'য়েচে।”

বিরাম। না মা, একই অর্থ হ'লে তিনি অবশ্য বাণীতে আসতেন। আমার বোধ হয় বেশি অর্থ করেছে, পরমানন্দ বলে নি।

মা। কি জানি মা, কালী কখন, ভাল থাকুন, আর শিগ্গির বাড়ী আসুন।

বি। তা, চল না কেন, আমরা কল্কেতায় যাই। তাঁকে নিয়ে আসি। বিবেশ, না জানি কত কষ্টে হচ্ছে, পরমানন্দ তাঁকে চেড়ে এস কেন?

মা। ও এক হতভাগা চাকর। তাইত বলি, ভুই বাপু ফেলে এলি কেন? যদি আমাদের যেতেই বলে থাকে, ডাকে একথানা চিঠি পাঠালেই তো হ'তো।

বি। তবে কি, পরমানন্দ আমাদের নিতে এসেছে? সে কি বলে মা? যথুয়ো মন'ই কেমন আছে, মা?

বালিকার স্বভাবসুলভ কোমল হৃদয়খানি আকুল হইয়া পড়িল। মহা-মাথাকে নীরব ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে বেশিয়া আগ্রহে বলিল “দিদি, কি ভাবত দিদি? চল না তবে আজই রাত্রে আমরা কল্কেতায় যাই।”

মহামায়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, বিরামের কথা শুনিয়া কক্ষপরে বসিয়া উঠিলেন—“ধাম্—ধাম্—তোমার এত ছেলে মুখে বুড়ো কথা কেন গ্যা ছুঁড়ি?”

বিরাম উত্তর শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। দিদিকে সে বড়ই ভয় করিত, সেই দিদির উগ্রমূর্তি বেশিয়া বালিকা ভয়ে জড়নড় হইয়া গেল। মাতা ঈতিপূর্বেই মেয়ে কর্তৃক যুগ্মমল ভৎসিত হইয়াছিলেন, মনের ভিতর একটু দুঃখ বা রাগ হইয়াছিল। এখন বিরামকেও সেইরূপ অকারণ কটুক্রিয়ায় কিছু অসহ্য হইয়া উঠিল। মহামায়াকে বলিলেন—“ভূমি বাবা, বচন রাগ কর, কিন্তু আজকাল কেমন খিটখিটে হয়েছ, ভাল মন্দ বলে কিছুই তনুবে না, অথচ লোককে বা না বলবার তাই বলবে।”

মহামায়া রাগিল। বলিল—“কি তোমার বাবা বলবার তা বলেছি!”

মাতাও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন—“না বলেই বা কি! এই আমাকে ব্যর্থ, ভাব পর বিরামকে বলে। কেন, আমাদের দোষটা কি?”

মা মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম সমান জবাব করিলেন। কিন্তু এই প্রথমেই যে শিক্ষা পাইলেন, তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে এমন কণ্ঠ আর রূপন করিবেন না। তাঁর হৃৎগায়, তাঁর সেদিন যুগ দিয়া এতটা কথা বাতির হইয়া গিয়াছিল। তাহার মুখের কথা নাকড়াইতেই মহামায়া স্বাকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন “তা জানি গো জানি, কোষ কাবও নয়, কোষ কেবল আমার, আর আমার অন্তরে। তোমার যেরকম বালতি তাই গায় বড় লেগেছে। তা বুঝি। আমি তো তোমার কেহ নই, যে আমার উপর দরদ থাকবে। আমি মলেই তোমাদের হাতে বাতাস লাগে। তা ভালইত। থাক তোমার বাঁড় মেয়ে নিরে, আমি দূর হই।”

দলিতকণা কালনাগিনী আততায়ীর প্রতি যখন গর্জন করিয়া উঠে, সেই-রূপ আক্রোশে মহামায়া গর্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ৰ লাল হইয়া উঠিল, নাসিকা ক্ষীত হইল, কপালে বড় বড় রেখা সকল দেখা দিল। মাথার চুল ওচ্ছে ওচ্ছে হুলিতে লাগিল। বসিয়া ছিলেন, হাত নাড়িয়া মহামায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চুড়ি গলা বন্ বন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। দৃষ্টপদে গৃহের বাহির হইতে গেলেন; দ্বার স্কেলান ছিল, জোরে তাহা বুলিয়া ফেলিলেন, দেয়ালে লাগিয়া কপাট দুখানা বিষম বাজিয়া উঠিল; মহামায়া গৃহের বাহির হইয়া বারাণস গিয়া রণরসিনীবেশে দাঁড়াইলেন। অবাঙ্ হইয়া বিবাক ও তাহার মা সেই কনকনারমান কপাট দুখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া আসিতেছিল, অস্তাচলশিখরাবলম্বী সূর্য্যের চূর্ণ রশ্মি যেখানে সেখানে পড়িয়া স্বক স্বক করিতেছিল। পশ্চিমাঙ্গা বারাণস কিল্মিলের উপর পড়িয়া তাহা খেলা করিতেছিল; রশ্মির উপর রশ্মি পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে তাহা শিলমিনি হইতে উঠিয়া যেখানে ক্ষুরিতাধরা জকুটীকুটিলানমা রোষবিকলিতদেহা মহামায়া রেলিভের উপর বক্ষ স্থাপন করিয়া তির্ঘ্যাক্ নয়নে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে পড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। রশ্মিওলা মহামায়াকে দেখিয়া উজ্জ্বলে মধুরে মিলিমে বলিয়া লাফালাফি করিয়া তাহার কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্তম্ভি দেখিয়া চুটিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে উপরে উঠিয়া পড়িল। বাস্তবলীল ধীরে-সমধীর এমনই

দেবীমূর্তি যে তাহা দেখিলেই সব কেনিয়া তাহারই অহুগরন করিতে ইচ্ছা বাগ, কিন্তু সময়বিশেষে তাহার। এমন বাহুগরন রূপ ধারণ করে, দেখিলে আতঙ্কে অস্থব্যা কঁপিয়া উঠে, ভয়ে শত যোজন দূরে পলাইয়া আপনাকে বক্ষা করিতে হয় ।

মহামায়া বারাণসী সেই ভাবে দাঁড়াইয়া । কথিনী যেমন নিরুপস্থ হইয়া উগ্রতমমূর্তিকে আকৃষ্টবীর্যে দেহ ফুলাইয়া সরল ভাবে দাঁড়াইয়া শিকারের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালিত করে, মহামায়া সেইরূপ দৃষ্টিতে সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া । বিধাতার কেমন বিচার জানি না এমন ক্রুর কাল মর্পেরও নিরীহ-প্রাণ শিকার জুটাইয়া যেন, কাননাসিনী মূর্ত্ত মণ্ডো তাহার সকল বিষ সেই হতভাপোর গায় ঢালিয়া দেয়, ক্ষুদ্র প্রাণ ভেদে যন্ত্রণার ছটফট করিতে থাকে । ভগবান উপরে বসিয়া তাহা দেখেন । তাহার অনন্ত খেলা । তাহারই খেলার মেদিন সেই উগ্রতকণা কথিনী সপুষ্ট মহামায়াধারও এক নিরীহ-প্রাণ শিকার জুটিয়া গেল ।

নীচে মনোরমা তাহার মাতার জন্য রোদন করিতেছিল । আর তিন দিন তাহার মা তাহাকে ডাড়াইয়া গিয়াছেন ; এ তিন দিন বালিকা আগার নিম্না ক'হাকে বলে জানে নাই, তবে দিবার বড় পোড়াপোড়ি করিত, তাই বালিকা দিনান্তে একবার উঠিয়া হাতে মুখে আল দিয়া আসিত । তিন দিন — তিন দিন কেন, তিন বৎসর বালিকা এই ভাবে আগার নিম্না ভাগ করিয়া ফুলার পড়িয়া কঁাদিয়া কাটাইতে পারে, কিন্তু সে মা — সেই ইহ সংসারে হতভাগিনীর মূণের দিকে চাহিবার, বড় কষ্টে আগা বলিবার একমাত্র জন — সেই চির-আনন্দ-প্রবাহিনী ত্রেহাশ্রুয়ময়ী বৎসলো-আপনা-হারা সে মা আর কি আসিবে ? কেন এমন হয় ? যে এত ভালবাসিত, কখন চখের আড় করিতে পারিত না, সে কেন না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যায় ? — যায় তো একবার গেলে আর আসে না কেন ? বালিকা তিন দিন ধরিয়া কঁাদিয়া কঁাদিয়া ভাদিয়া দেখিয়াছে কিছুই দৃষ্টিগোচরে উঠিতে পারে নাই । তবে, সম্ভাই কি সে মা আর আসিবে না ? মা যদি না আসে, তাঁর কাছে কি যাওয়া যায় না । সে কোন দেশ, তাহার কোন পথ ? বালিকা ভাবিত, আবার উচ্ছে 'মা মা' করিয়া কঁাদিয়া উঠিত । বিরাম বুঝাইত, চক্ষের জল বুড়াইয়া দিত, সাস্থনা

করিতে আপনি কাঁদিত। মনোরমা তাহার কাছা দেখিয়া মহতের জন্য আপনাতর কান্না ভুলিত। বিরাজ ভিন্ন আর কেহ সে দিক্‌ মাড়াইত না। বিরাজও প্রায় তাহার কাছছাড়া হইত না। হবে, মা বোনের তাড়না—কাজেই মাঝে মাঝে ফেলিয়া বাইতে হইত। এখন বিরাজ নীচে নাই, মনোরমা একা পূণ্য পড়িয়া, মার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দাণ্ডা কথা মনে পড়িল। তিনি আশ্রয় আসিলেন না কেন—কাল চতুর্থের দিন, মনোরমা চতুর্থ দিবসে মাতার জাক করিবে, কিন্তু সে তো কাল—মাঝে একটা রাত্রি মাত্র—তাহার কোন উপযোগ নাই—কেই বা করে? দাণ্ডা কেন আসিলেন না? তাহার কি হইল? মনোরমা আবার ভাবিল, কোন সন্তোষ তো আজও ফিরিয়া আসে নাই, অনেক পথ—তাই দূরির দেরি হইতেছে। আবার মনে হইল, অথবা দাদার কি চাইয়াছে তাই তাহাকে পথে ফেলিয়া কেহ আসিতে পারিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে বালিকা অস্থির হইয়া পড়িল। উল্কে ‘মা মা’ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই রোজন শব্দ বারাতার দাঁড়াইয়া মহামায়া শুনিলেন। ইতস্ততঃ বিকিণ্ণ-দৃষ্টি কবিনীর শিকার মিলিল। তখন সেই উগ্রমূর্ত্তি উগ্রতর হইল, মাথার চুল গোছায় গোছায় চলিয়া উঠিল, ঘন ঘন হাত নড়িতে লাগিল, হাতের বালা ও চুড়ি একত্রে লাগিয়া ধন ধন, ধন, ধন, শব্দ করিয়া উঠিল। মুখখানা বৈশাখী আকাশের ন্যায় অকস্মাৎ অন্ধকারময় হইয়া আসিল। রেল ধরিয়া উন্নত গ্রীবা বক্র করিয়া মহামায়া বলিয়া উঠিলেন—“আ মর মর! রাত দিন চৈতানি—রাত দিন চৈতানি, এতে কি আর গৃহস্থের ভালাই হইবে থাকে। মা ঘেন আর কারো মরে না। মনে করি কিছু বলবে না! তা না বলিও তো বাটিনে। ভুগুতে হয় তাই বলি। ঐ ছুঁড়িই তো কেঁদে কেঁদে এই অমঙ্গলটা ঘটালে। দূর হয়ে যা—দূর, হয়ে যা। মার জন্যে এত টপ্‌ পড়ে থাকে, তো, আপনার কোনো চুলো থাকে তো সেখানে যা না। সেখানে গিয়ে চৈতানে মর না।” মহামায়ার সেই ভীমকণ্ঠের ভীম আওয়াজে বলিকার সে ক্ষীণ রোজনশব্দ কোথায় ডুবিয়া গেল। সমস্ত বাড়িটায় সেই শব্দ বাজিতে লাগিল।

মনোরমা সে গর্জন শুনিল। চোখের অল চোখে রহিয়া গেল।

বালিকা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল । বালিকা আজও সংসারের কিছুই জানে নাই; এখনও আপনার পরে কত তফাৎ তাহা ভাল করিয়া বুঝে নাই । তবে, এ বয়সেও সে অনেক সহিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে; মাতার কষ্ট দেখিয়া পনের সংসারে পাকা কি প্রকার তাহাও কতক বুঝিয়াছে ; কিন্তু তাই বলিয়া এত মনস্তাত্ত্বিক শোকের সময়ও যে এণ্ড ভরিয়া একটু কাঁদিয়া জুড়াইবার, কি দু কোঁটা চক্ষের জল ফেলিবার ঘো নাই তাহা সে বুঝে নাই । মাতা যে সন্মুখা বলিতেন “বাছা, পরভাতি হইও তো পরশ্বরি কখন চইও না” বালিকা আজ সে কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিল । তখনও মহামায়ার সে ভীষণ পর তাহার কানের কাছে বাজিতেছিল । মুহূর্তের জন্য শোক ভুলিয়া গেল, ভয়ে বালিকা কাঁদিয়া উঠিল ।

তোমরা কেহ বিশ্বাস কর বা না কর, কিন্তু আমি খুব ভাল ভাল স্ত্রী তুমিয়াছি, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নাড়ীর সংখ্যা একটা বেশী । তাহার কাঁধাও খুব বেশী । সচরাচর তাহাকে “কঁদুলে নাড়ী” বলে । ‘পাড়ী কঁদুলী’ বলিয়া ঐহাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে তুমি-রাছি যে সে নাড়ীর গতি অতি বিচিত্র । অলৌকিক ন্যায় । সহজে অতি সঙ্ক-চিত্ত ভাবে অবস্থান করে ; কিন্তু অলৌকিক গোপিত গন্ধের ন্যায় কোমলের গন্ধ পাইবা মাত্র তাহা আপনা আপনি ফুলিতে থাকে, ক্রমে কোমলের বতাই শব্দ পাগ ততই ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া উঠে । সেট নাড়ীর নাচনিতে সর্ব শরীর নৃত্য করিতে থাকে । তার পর, দুগা পোকা যেমন কামড়াইয়া কামড়াইয়া রোগীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে, সে তখন বিকৃত ভাবে কি করে না করে কিছুই ঠিক থাকে না ; তেমনি সেই নাড়ী নাচিয়া নাচিয়া সেই স্ত্রীরীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে ; তখন তিনি বিকারীর ন্যায় কি করেন না করেন কিছুই ঠিক থাকে না । এমন কি, সহজ অবস্থায় যে ভালবের শব্দে দেড় লাভ ঘোমটা টানিয়াও বাহির হইতে লজ্জার হুড়মুড় হইয়া পড়েন, এ অবস্থায় সেই ভালবের পৃষ্ঠে সম্যজ্ঞানীর প্রচণ্ড আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না । তবে, সবারই যে এ অভিরিক্ত নাড়ীটা আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । সে সন্দেহের কথা বলিলে, তাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোক মাতেরই উহা আছে, তবে কিছু কম আর বেশী । কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না ।

তার মাফ্য বিবাহ ও তাহার মতো । মহামায়ার এই তৃত্বতন পর্যন্তই তিনি
বিরাজ একেবারে হতভান হইয়া পড়িল । বালিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খানি মনে-
রমার অন্য শব্দায় আকুল হইয়া উঠিল ; নীচে নামিয়া তাহার কাছে বাইবার
অন্য ব্যবস্থা খুঁজিতে লাগিল । বিবাহের সেট নাড়ীটা খুব কম ছিল, কি আদৌ
ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না । কিন্তু তাহার মাতার বাহা ছিল তাহা
বড়ই প্রবল । মহামায়ার কোন্‌লের শব্দ পাইয়া তাহার সেই কুঁচলে নাড়ীটা
একেবারে ধড়কড় করিয়া উঠিল, যেন গুম্বস্ত বায়ুতে কে খোঁচা মাঝিয়া আণো-
ইয়া দিল । আর কি সে ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারে ? মেয়ের উপর
তাহার সকল দ্রুপ অভিমাম যুহর্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল । লাকা-
ইয়া গৃহের বাহির হইয়া সেই বরাণ্ডার মতানায়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল ।
বলিল—“কোনো চুলো থাকিলে তো সেখানে যাস, ওরা নিজে যেমন হাবাতে
লক্ষীছাড়া, তেমনি তোমাদেরও চাবাতে লক্ষীছাড়া না করে ছাড়বে না ।
মা গো মা ! দিন নেই রাত নেই—ঘান ঘান প্যান প্যান, আমরাই
জালাতন হ'য়েছি, তা এতে কি আর লক্ষী টিকিতে পারেন !”

সেই এক কথায় মায়ের মিয়ে মিল হইয়া গেল । মেয়ে দেখিলেন, মা
তাঁহার পক্ষ হইয়াছেন । মা এ সব বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অনেক পটুতরা ।
তখন বর্জিতবলা মহামায়া আরও উচ্চৈঃ বলিলেন—“দেখ না আশ্চর্য্য । যার
খাবে তারই বুকে ব'লে দাড়ি উপড়াবে । আ ম'লোরে । দূর হ—দূর হ ।”

মা বলিলেন—“আর এমন বেহায়া নিম্নে নিলজ্জ লোকও তো দেখিনি ।
তাই হবে না ? যেমন পেটে জ্বর । হাজার বল কত, গাটা নাড়া নেই । গলায়
দড়ি—গলায় দড়ি ।”

মহামায়া বলিলেন—“সেই আকলখেণো অপ্পেয়ে মিলেই তো যত
আস্কারা ! তখনই আমি বলেছিলাম গো, যে ওদের এনো না ; তা হতভাগ্য
তখন শুনে না । তার কি ? তাকে তো আর ভুপ্তে হয় না ।”

মা বলিলেন—“আমি যদি এমন সংসার জানুডেম, তা হলে এ ঘরে কি
আর তোর বিয়ে দিই । কটা ছেলে হয়েছে, তা আমার কি বুক পুরে
আজ্ঞাদ করবার ঘো আছে ; সবাই আশঙ্কা, আবাসীদেবর ঘ্যান ঘ্যানানির
আলার কোন্‌ দিন কোন্‌টার কি হবে পড়ে ।”

মহামায়া বলিলেন—“আমিও আর যাতির রাধিনে। এখন দুকোছি কথাও ওদের কিছু হবে না। যেমন কুহুর তেমনি মৃত্যুর চাই। আলোক আগে শেষে বাড়ী, কাল কাটা মেরে সব পাণ নিদার করবো।”

মাতা যখন দেখিলেন কোমলের শেষ সীমায় আসিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু এমন এক তরফ। সঙ্গে তাঁহার আশা তেমন পূরিল না। বিপক্ষও কোমর বাঁধবে, হাত মুখ নাড়িবে, কথার জবাব কাটাকাটি করিবে, তবেই তো সেই কোমলে হৃৎ। সমানে সমানে হইল না বলিয়া মহামায়া মাতার ততটা মনের স্থল ঘটিল না। তবে মহামায়া এত দিন পরে উহাদিগকে যে কাটা। মারিয়া বিদায় করিয়া দিতে সংকল্প করিয়াছে, ইহাতেই তাহার মন্য আনন্দ। সে আনন্দের চিহ্ন চাপিয়া রাখিয়া মহামায়ার সেই দৃঢ় সংকল্প আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিলেন “না বাপু, তোমার কিছু বলে কাজ নেই, আবার তিনি বাড়ী এসে কার্তে খেড়ে আঙুন লাগাবেন!”

মাতার কথা শেষ হইতে না হইতে মহামায়া গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“উঃ সেট ভয় করে চলতে হবে নাকি। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি যদি বামনের মেয়ে হই, তবে কাল সকালেই ওদের এ বাড়ী থেকে বিদায় করবো। যদি কথা না হয়, কাটা মেরে তাড়াব। দেখি, সে এঁগে আমার কি ক’ত্তে পারে।”

সে প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মাতাও গীহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু মনে মনে বড়ই অজ্ঞান হইল। তখন মেরেকে বলিলেন—“তা যাও, সন্ধ্যা হ’লো, কাপড় কেচে এস পে।”

মহামায়া বলিলেন—“যাব এখন, বিরাক কোথায়?”

মা বিরাককে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। ঘরের ভিতর আসিয়া দিলেন, বিরাক সেখানে নাই। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া মনোরমার কাছে গিয়া বসিয়াছিল।

বিশ্ব পরিচ্ছেদ ।

শেষ রাত্রি বলিতে হয় বল, কিন্তু ঠিক উষা বলিও না। এখনও তাহার দিলব আছে। গোটাকত কাক একবার ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মৌঃমালোক কি দিবালোক ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। দোয়েল এখনও তাহার প্রথম ডাক ডাকে নাই। আকাশের নক্ষত্র এক একটা করিয়া ডুবিয়া যাইতেছে বটে চাঁদও পাঃশুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু শুকতারা অল্ অল্ করিয়া এখনও আকাশের গায় জ্বলিতেছে। নীচে অটালিকার ধারে ধারে, কুটীরের পাশে পাশে, গাছের তলায় তলায় অশ্লষ্ট অন্ধকার স্বপ্নে স্বপ্নে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই আঁধার ভেদ করিয়া একটা বালিকা গ্রামের প্রান্তলয় হুঃ পথ বাহিয়া একাকিনী কোথায় চলিয়াছে। পথের ধারে কোথাও ঝোপ, কোথাও টিপি, কোথাও হুই ধারে বড় বড় বাগানে বড় বড় গাছ ওলা পথ অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোথাও বাশে বাশে অডালড়ি করিয়া রাস্তার উপর নোয়াইয়া পড়িয়াছে—মাঝার উপর কেবল বাশের চত্রাতপ, অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না। সে পথ দিয়া যাইতে বালিকা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িতেছে। বাশে বাশে লাগিয়া থক হইতেছে, গাছের গলিত পত্র পড়িয়া শব্দ হইতেছে, কখন বা বাতাস আসিয়া কোঁচের গাছ ওলাকে সর সর করিয়া নাড়িয়া দিতেছে, বালিকার নুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিতেছে। হুই চক্ষে জলের দাগ বহিতেছে। জদয়ে দাক্ষণ শোক, দাক্ষণ হুঃ, কিন্তু সকল অশোকা ভয় তখন আরো দাক্ষণতর। বালিকার হাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, পায়ে পায়ে অড়াইয়া যাইতে লাগিল। প্রাণপণ সাহসে পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। বাগান পার হইয়া গেল। তখন হুই ধারে মাঠ। জনহীন, শব্দহীন—যু ধু করিতেছে কেবল মাঠ। সেই মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট খড় বন। সেই বন হইতে হুই একটা শূন্য বালিকার পদশব্দ পাইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িয়া গেল। ভয়ে বালিকার অন্তরায় শুকাইল। বিছা টানিতে লাগিল। এক ঘটি জলের তৃকা পাইল। ভয়ে একবার চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই। কেবল মাঠ; আর উপরে সেই অনন্তবিস্তারি নীরব নিস্তক আকাশ, মধ্যে বালিকা

একেলা । যেখানে দিবা দিপ্রহরে আদিত্যেও লোকে ভয় পায়, সেই মাঠে এই রাত্রিকালে বালিকা একেলা । আর পা নড়ে না । সর্গাদ শিথিল হইয়া আসিল । চক্ষু বুজাইয়া বালিকা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল । “মা গো, তুমি কোথায়, মা ।” বলিয়া সেই বিজন প্রান্তরে বসিয়া বালিকা তাহার অচিরমৃত্যু মাতার জন্য রোদন করিতে লাগিল । সেই মাতৃহীন বধন তাহার মাতার তমা কাঁদিল, তখন জনয়ের অনেকটা ভয় কমিয়া গেল । ভয় ভুলিয়া, আপনার বর্তমান অবস্থা ভুলিয়া, বালিকা সেই পথের ধূলায় পড়িয়া একাকিনী অজ্ঞানভাবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল । সে বালিকা, মনোরমা ।

ক্রমে রাত্রি পোহাইল । সকাল হইল । রোদ উঠিল । বিরাজ উঠিয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইল না । হাত মুখ দুইতে গিগাচে ভাবিয়া অনেক অপেক্ষা করিল । আর আর সবাই আসিল, মনোরমা আসিল না । ঘাটে খুঁজিতে গেল, মনোরমা নাই । পাড়ার হুই এক জনের বাড়ী অমূলকান করিল, মনোরমা সেখানে ঘায় নাই । তখন সন্ধ্যা হইল, সন্ধ্যা হইতে আশঙ্কা হইল, মনোরমা তবে কি রাতারাতি কোথাও চলিয়া গিয়াছে । তাহাই সম্ভব । যে কি আগে উঠিয়াছিল সে বলিল যে, সে উঠিয়া খড়কির দ্বার খোলা দেখিয়াছিল । তবে ডে; সত্য । বিরাজ তাৎক্ষণিক অস্থির হইয়া পড়িল । আহা ! এই দারুণ শোক, আশ চারি দিনও হয় নাই, ইহার উপর এই বেদনা সে কেমন করিয়া সহিব ? যে বাটের বাহির হয় নাই, সে কেমন করিয়া পথ চলিবে ? আশ চারি দিন তাহার মা মরিয়াছেন, আশ চারি দিন তাহার পেটে ক্ষাত নাই—সে কি এই করে বাঁচিবে ? রাত্রি হইলে বাহাকে ঘাটে আদিত্যেও ঝাঁড়াইতে হইত, সে গভীর রাত্রে একেলা কেমন করিয়া চলিয়া গেল ? বালিকার ভাবিতে ভাবিতে ভয় হইল । মনোরমা ডো আত্মহত্যা করেন নাই ? প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল । তখন মাতা ও ভগ্নী কেহ বিছানা হইতে উঠেন নাই । বালিকা আর বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিল না । নিজে বতদূর পারিল, আত্মপাতি করিয়া খুঁজিল । সকলের আগে ঘাটে ঘাটে অন্বেষণ করিল, কোনও সন্ধান পাইল না । ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, বালিকার আত্মলতাও বড় বাড়িতে লাগিল । কিন্তু সন্ধান

যতই নিষ্কল হইতে লাগিল, ততই তাহার মূখখানি শুকাইয়া বাইতে লাগিল ।

বিরাজ বৃত্তিতে গুটিতে বাইতেছিল, পথে নীলময়ী তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কোথা যাক গা, মাসিমা ?” বিরাজকে ত্র্যমের অন্ধনকে ‘মাসিমা’ বলিয়া ডাকিত । বিরাজ আপনার চিন্তাতে মগ্ন ছিল, নীলুর কথা শুনিতে পার নাই । নীলু বালিকাকে শুকনুখ ও নিরুত্তর দেখিয়া বলিল “আগা, মা, এ কি মানানি কলা ! শুনে অবগি আনাদেবই হাত পা পেটের দিতর দে’দিরেছে, তা তোমরা কি আর তোমাতে আছ !”

এবার কবটা কতক বিরাজের কানে গেল । বলিল “কি, নীলমণি ।”

নীলমণি বলিল “ভাট বলি মা ; আহা অমন বাবুরও এমন হয় গা ।”

বিরাজ অবাক হইয়া গেল । কিছু বৃত্তিতে পারিল না । বলিল—“ক’র কি হ’য়েছে, নীলমণি ?”

তখন নীলমণি আকাশ হইতে পড়িল । বলিল “তবে কি মা তোমরা শোন নি । বাবুর যে বড় বিপদ—”

বিরাজ চমকিয়া উঠিল । বলিল “বাবুর—আমাদের বাবুর !—কি বিপদ, নীলমণি ?”

নীলমণি আমুতা আমুতা করিতে লাগিল । বলিল “তা, মা, এখন তোমরা শোন নি, তখন আর নাই শুন্লে ।”

বালিকা আশ্রয়ে আহুল হইল । বলিল “তা হবে না, কি হইয়াছে, বলিতে হইবে, বল ।”

তখন নীলমণি বলিল “কে জানে, মা, শুন্লেম, বাবু নাকি কল্কেতার যে সাহেবের কাছে টাকা পছিত রেখেছিলেন, সে কেল হ’য়ে গেছে, এক পয়সাও পান নাই । সেখান থেকে টাকা নিয়ে লাটের কিস্তি দিতে ন কাপেই সে কিস্তি দেওয়া হ’লো না । এ বিকে তাপুক নিলাম করে গেল । সে লোক সামলাতে না পেরে বড় ব্যামোর পড়িয়াছেন । এখন আপ নিয়ে টানাটানি পড়েছে । কেন, পরমানন্দ কিছু বলে নি ?”

শুনিবামাত্র বিরাজ হতভান হইয়া পড়িল । কে যেন অকস্মাৎ তাহার মাথায় লোহার একটা প্রকাণ্ড মৃত্তর মারিল । তাহার সংজ্ঞা লোপ হইয়া

আসিতে লাগিল। সহসা নীলমণির সকল কথা শুনা বিবাস করিতে পারিল না। অলচ অবিবাস করিবারও কিছুই নাই। বালিকা কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল, পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল, জ্বিত বৃণা পিটিল, কপার শক্তি হরিয়া গেল। একবার নীলমণির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল, যে বল চোখের কোণে টলটল করিতেছিল তাহা ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। শিশিরসিক্ত স্থলপঙ্ক্তের ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে যেমন ঝর ঝর করিয়া সে শিশির-জল পড়িয়া যায়, তেমনি সেই দুটী ফুটন্ত পল্ল সদৃশ আরও চক্ষু হইতে অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া নীলমণির চক্ষে জল আসিল। বলিল “কেন না, মা, ভগবান একেবারে দিমুখ হবেন না। চল, মা, বাড়ী চল।”

বিরাজ তখন জানি তারাইয়াছিল, তাহার শাণ্ডের ভিতর যে কি করিতেছিল তাহা সে বালিকা সুক্লিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, অলচ বাতনায় ছট্‌কট করিতেছিল। মনোরমার চিন্তা তখন তাহার মনে ছিল না। সে নিজে ভাগ্যত কি নিজিত তাহাই তাহার ঠিক ছিল না তখন অন্য চিন্তা করিলে কি প্রকারে? বালিকা জানিত, ভগবান তখন কাহাকেও একেবারে মারেন না। তিনি যে দয়াময়। তবে কেন ঠাণ্ড এমন সর্বনাশ হইল? ভগবান কেন এমন করিলেন? বিরাজ শাণ্ডে শুনিয়াছিল, তিনি দয়াময়, কিন্তু পানীর দণ্ডকর্তা। এ কি তবে পানের দণ্ড? সুখ্যে মশাই তো কোন পাপ করেন নাই। তিনি যে মাতীর মাছব। তবে কি ইহা তাহার দিবির পাশে হইল? বালিকা তাহা ভাবিতে নিহরিয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিদির সেই কটু বচন, সেই উগ্রমুর্তি, মাতার সেট বলস্বভাব, দ্বাধার সেট অবনয় নীচ চরিত্র—সব কথা মনে পড়িল। বালিকা আর ভাবিতে পারিল না। মনে মনে বলিল “হে ভগবন, “তোমার এ কি বিচার, প্রভু? একজন পাপ করে, আর একজন তাহার ফল ভোগে. কেন ঠাণ্ড?” বালিকার মাথা ঘুরিতে লাগিল। ঘির হইয়া আর ঠাড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

দেখিয়া শুনিয়া নীলু বড়ই বিপদে পড়িল। সে সুক্লিল, পরমানন্দ এ কথা বাড়ীতে বলে নাই। কিন্তু পরমানন্দ যদি বাড়ীতেই না বলিলে তবে বাড়ীর দাণী বামোন্দরী কেমন করিয়া এ কথা জানিল, তাহা সে সুক্লিয়া উঠিতে

পারিল না। তাহা ভাবিতে নীলু গোল পড়িল। পরমানন্দ যদি জানিত যে নীলুয়ের এ কথা শুনিয়াছে, তবে সেও ঐরূপ গোলে পড়িত। বাবুর বাড়ীতে কতীর নিকট সেইরূপ ভংসিত হইয়া পরমানন্দ মনটাকে একটু চরিত্ত করিয়া লইবার জন্য সন্ধ্যার পর বামাতুল্লরীর গৃহে গমন করিল। বামা সন্ধ্যা হইলেই তাহার ঘরে বাইত, রাতে বাবুর বাড়ী থাকিত না। দাসী-সহলে সেজন্য কানাপানি চলিত। বামা তাহা গ্রাহ্য করিত না। গৃহিণী কিছু বলিলে সে নানা রকম কারণ দর্শাইত। বামা কিছু মথরা, এক কথা বলিলে দশ কথা শুনাইয়া দিত, কাজেই কেহ বড় তাহার সঙ্গে লাগিত না। বামার আরও অনেক ঘোষ ছিল। সে বালবিধবা, তথাপি গোড়ে গোড়ে পাড়-ওয়ারা ধুতি পরে, হাতে কাচের চুড়ি দেয়, পান খায়, মিশি দাঁতে দেয়। পাড়ার কয়েকটা ত্রিপণ্ডু ছেলে বামার গালিতেও ভয় না করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে ঠাট্টা বিক্রম করিত। কিন্তু ইদানীং শশীবাবু বামার সহায় হওয়ার কোন ছেলে আর বড় কিছু বলিত না। শশীকে সকলে বড়ই ভয় করিত। হাতে ভাগা, গলায় দানা, ঠোঁটে মিশির হোপ—বামা হাত দোলাইতে দোলাইতে পথ দিয়া বাইত, দেখিয়া অনেকে হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত; অনেক ভট্টাচার্য্য আত্মিকের মত ভুলিয়া বাইত; পোড়ামুখী বামা তাহা দেখিয়া টিপি টিপি হাসিত। বামার একটা পুত্র গুণ ছিল। তাহার গলা বড় মিঠা। বাসরঘরে তাহার অশ্রুতিমন্ডিত প্রভুত্ব। যে বাসরে বামা গান না গাহিত সে বাসর বুঝা বাইত, সে বর মন্দভাগ্য বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত হইত। এ-হেন বামাতুল্লরী যখন সন্ধ্যার পর গৃহে আসিয়া প্রদীপ জালিয়া গৃহকর্ম করিতেছিল ও গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল, সেই সময়ে পরমানন্দ স্বয়ং গিয়া ওখায় দর্শন দিলেন। দেখিয়া বামা একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। তার পর উভয়ে কত কথাবার্তা চলিল। পরমানন্দ জানিতেন, তখনও বুঝিলেন, বামা তাহারই—তখন তিনি মন বুলিয়া বামার কাছে বাবুর কথা পাড়িলেন। কথাটা এতক্ষণ তাহার মনের ভিতর ভোলপাড় করিতেছিল তুমিয়া বামা শোহরিয়া উঠিল। কথা বাহাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য পরমানন্দ বামাকে অজুরোধ করিল। বামাও প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু কথাটার

কখন দৌব, পরমানন্দ পূর্ব হইয়াও সে যখন তাহা হস্তম করিতে পারে নাই তখন বামা সামান্য স্তম্ভাতি হইয়া কি প্রকারে জীব করিতে পারিবে ? রাতি দশটার সময় পরমানন্দ উঠিয়া গেল । বামারও বদহস্তি বড়ই বাড়িয়া উঠিল । পরমানন্দ জানিত না যে তাহার ন্যায় অনেকে বামাকে অনুগ্রহ করে অথবা আপনাতা অনুগ্রহীত হয় । দৈবক্রমে নীলমণির সহিত বামার সাক্ষাৎ হইল । বামা তখন অজ্ঞানের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল । টিগিয়া টিগিয়া নীলমণি কথাটা সব বলিল । তনিয়া নীলমণি শবীর রোমাঞ্চ হইল বামা কিরূপে জানিল, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিল না । জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও ছিল না । এখন, নীল যখন জানিতে পারিল যে, বাড়ীর কেহ এ কবার বিন্দু বিসর্গও শুনে নাই, অপচ নামা সব চিকিৎসা ক্রম বলিল, কাজেই নীল কিছু গোপনে পড়িল । কিন্তু সে চিকিৎসা অবসর তখন নাই । সমুখে পরবিত্তা কুরঙ্গিনীর ন্যায় বালিকা কাদিতেছে । নীলমণি বুঝিল, এ পর সেই নিষ্কেশ করিয়াছে । মনে মনে আপনাকে সহস্র দিক্তার দিল । কেন তাহার যথ দিয়া এ কথা বাহির হইল ? সে না বলিল, উহারও এখন তো এ কথা কেহ শুনিতে পাইত না । নীলমণি আপনাকে গালি দিল । কি বালিয়া বালিকাকে সাম্মান্য করিবে তাহার কথা বুঝিয়া পাইল না ।

দূরে কে 'বিরাজ বিরাজ' করিয়া ডাকিতেছিল । বিরাজ ও নীলমণি দুই জনেই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন ছিল, সে ডাক কেহ শুনিতে পার নাই । যে ডাকিতেছিল, সে নিকটে আসিল । বিরাজকে দেখিতে পাইয়া উচ্চ ডাকিল । বিরাজ ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল । দেখিল, মা । তখনও বালিকার চক্ষে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল, বালিকা সেট অত্রপুত মুখখানি তুলিয়া মাতার দিকে চাহিল । কোন কথা বলিতে পারিল না । মা বলিলেন, "ওমা ! তুই এখানে দাঁড়াইয়া কাদিতেছিস ! আমি তোরে খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছি—তা, এখানে কেন, আয়, বাড়ী আয় ।"

বিরাজ কোনও উত্তর করিতে পারিল না । ধীরে ধীরে মার সঙ্গে চলিল । নীলমণি আপন স্থানে চলিয়া গেল । তখনও বালিকার সর্কাজ ঘুরিতেছিল, নীরবে মার সঙ্গে সঙ্গে বাইতে লাগিল । বাড়ী আসিয়া বিরাজ বাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল । দেখিল, পেটাকা,

বাক্স ও গাটবোত উঠান ঘোঝাই হইয়া গিয়াছে, দুইখানা গাট গাটের
 পাড়াইয়া রছিয়াছে, চাকরেরা একে একে সেই সব পেটারি বাক্স গাট
 তুলিয়া দিতেছে । সবারই চোখে জল, কেহ ফোঁপাইতেছে, কেহ নাক
 কাড়িতেছে, কেহ বা কাপড়ে চোখ রগড়াইতেছে, বাড়ীমর কোঁস কোঁসানির
 একটা বড় বৃষ পড়িয়া গিয়াছে । কেহ বলিতেছে, ‘হা ভগবন’ কেহ
 বলিতেছে, ‘হে মা কালী কি করে মা’ কেহ বলিতেছে, ‘এমন মানুষেরও
 এমন হলো না—’ তাহারই টীকা করিয়া কেহ বলিতেছে ‘ইত্যাকেই বলে ধোর
 কলি ।’ বিরাজ মুখিল, বাড়ীর সকলেই সেই সন্দর্শনের কথা ভনিয়াছে ।
 কিন্তু দিদি কোথায় ? এ বাড়ী কেন ? এ সব বাক্স পেটারি কিসের জন্য ?
 মাতাই বা এ অবস্থায় তাহাকে খুঁজিযেছিলেন কেন ? তবে কি আমাদেরকে
 কলিকাতায় যাঁতে হইবে ? আহা, ভগবান্ বিদীর এমন সন্তি কি করিবেন ?
 বালিকা হৃদয়ের মধ্যে শ্যামসুন্দরের চর্চনার কথা চিন্তা করিল ; তাঁতান শুক
 মুখ, শীর্ণ দেহ, অবমানের অবনত দৃষ্টি—সব যেন চোখের উপর
 দেখিতে পাইল । সেই তপ্তকাকদণ্ডের কাড়ি কানি মাড়িয়া গিয়াছে,
 সে গম্বর বদন চিত্রার হৃৎথে লজ্জার এতটুকু হইয়া গিয়াছে, সে উন্নত দেহ
 হুবিনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, রোগের
 বস্ত্রণয়, তদধিক চিত্রার বিষম হংশনে শব্দ্য পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন ।
 বালিকা যেন সম্মুখে সব দেখিতে পাইল । সর্গশরীর শীহরিয়া উঠিল ।
 আহা, দুটা সাস্ত্রনার কথা কয় এমন আপনার জন ও কাছে কেহ নাই—
 বালিকা কতকণে ঘাইতে পারিবে তাহার জন্য আহুল হইয়া পড়িল । কত-
 কণে দিদি আসিবেন সে অন্য উপরের দিকে চাহিল । তখনও মহামায়া নামে
 না । বালিকার আর অপেক্ষা সহিল না । আশ্বে আশ্বে উপরে উঠিল ।

মহামায়া তখন গহনীর বাক্স খজাইতে ছিলেন, বিরাজকে দেখিয়া
 বলিলেন “বিরাজ, আসিয়াছ ?” বিরাজ আর কোন উত্তর দিতে পারিল
 না । কাঁদিয়া কেলিল । মহামায়া বলিলেন “কঁদ না, চুপ কর ।”

বিরাজ তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “ভা, আর দেরি করিতেছ
 কেন ? চল, বাই । আহা না জানি, তাঁর কত কষ্টই হইতেছে, তবু ছেলেদের
 দেখলে মনটা অনেক ভাল হইতে পারে ।”

মহা। সে কি ! আমরা তো কলিকাতায় বাইব না ।

বিরাজ বেন আকাশ হইতে পড়িল । বলিল “আমাদের কলিকাতায় যাওয়া হবে না ! তবে এ সব উদ্যোগ কিসের ?”

মহা। কলিকাতায় কোথায় যাব ? চল. আমাদের বাড়ী যাই ।

বির। সে কি ! — কলিকাতায় যাবে না, বাড়ী যাবে ! কেন ? কলিকাতায় না যাও, তো এখানে থাকিবে না কেন ? যদি তিনি একটু সারিগা বাড়ীতে আসেন, এ সময়ে আমাদের অন্য জায়গায় যাওয়া কি উচিত ?

মহামায়া রাগিলেন ! বলিলেন “কি উচিত অযুচিত তা তোর অপেক্ষা আমি বেশি বুঝি । তোকে আর আমার শেখাতে হ’বে না ।”

বিরাজ কাঁদিল । বলিল, “রাগ করিও না, কিন্তু তাঁর কথা একবার ভাব দেখি, দিদি ।”

মহা। সে তো গিয়াছেই । এখন ছেলে কটাকটে কি তার সঙ্গে যেতে হবে ।”

বিরাজ । বালাই, অমন কথা মুখে আনিতে নাই ।

মহা। মুখে আনিতে নাই কিন্তু কাজে হবে । যা ছিল, সব তো গিয়াছে এখন থাকিবার মতো বাড়ী থানা আর কয় থানা গহনা ।—তা, এখানে থাকিলে তার কিছুই থাকিবে না । বাবুর নাকি আবও দেনা ছিল, যারা পাওনাদার তারা ডিক্রি করিয়াছে । এখন যা আছে বেচিয়া কিনিয়া লইবে । হয়তঃ কালই পুলিশের লোক এখানে আসিবে । তা—

বিরাজ ভুনিয়া অবাচ্ হইয়া গেল । সে আবার কি ? তে ভগবন কি করে ঠাকুর ? বালিকা ভয়ে অড় সড় হইয়া গেল । কিন্তু তাহার মনে পড়িল, নীলু তো এ কথা কিছু বলে নাই, দিদিকে কেহ মিথ্যা বলিয়া থাকিবে । বালিকা সাহস করিয়া বলিল—

“না না, এ কথা তোমায় কে বলিল ! আমি নীলুর মুখে সব শুনিয়াছি, সে কোঁইসা বলিল না ।”

বিরাজ তখন নীলমণির মুখে যাহা শুনিয়াছিল তাহা বলিল । ভুনিয়া মহামায়া বলিলেন, “তবে সে তোমাকে সব বলে নাই । আমিও উহা শুনিয়াছি, তা ছাড়া যা বলিলাম তা, আর—“এই বলিয়া মহামায়া বর

অত্যন্ত খাট করিয়া চুপে চুপে বলিলেন “আর, ব্যামস্যাম সব মিছে, বাবু এখন ভেলে আছেন।”

“অ্যা—কি সর্পনাশ!”—বিরাজ বুরিরা পড়িবার উপক্রম হইল। তখন মাতা সেখানে আসিয়াছিলেন, তিনি বিরাজকে ধরিলেন। বালিকার সর্দি-গন্ডমি হইবার লক্ষণ হইল। সামলাইতে অনেককণ গেল। কাল, ক্যান্, করিয়া বালিকা মা ও নোনের দিকে চাহিয়া রহিল।

হে রচনাকুশল ঘোষকগণ! ধন্য তোমাদিগের বিচিত্র রচনাপটুতা, ধন্য তোমাদিগের মহৌষমী কচনা শক্তি! তোমরা না করিতে পার, এমন কাজ দেখি না। কখন ক্ষীণরূপে মারিয়া ফেল, কখন বা মরাকে বাড়াইয়া পাও তোমরাই ভারতীর বরপুত্র; তোমাদিগেরই কিছ্রায়ে সরগতী সদত বিরাজ করিতেছেন। আমি ক্ষুদ্র লেখক তোমাদিগের অপার মতিমা কেমন করিয়া বর্ণিব? তোমাদিগেরই কৃপায় এষ্ট কথাটা যখন মহামায়ার কানে উপস্থিত হইয়াছিল তখন এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল।

বিরাজ বালিকা, প্রভাবতঃ ভয়শীলা ও পরহঃস্বকাতরা, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার লবয়ে সভ্যের বল ছিল। প্রথম কাতরতা দূর হইলে, লবয়ে সেই বলের সঞ্চার হইল। সে বলে সে কোন যত্নে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। এত যে ভয়—এত যে আকুলতা, তবু যেন কিসের বলে সে কথাটাকে লবয় হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। কে যেন পাণের তিত্তর চুপি চুপি বলিতেছে, ‘না, ইহা কখনই নয়।’ সাহসের কাছে ভয় স্থান পায় না। বালিকার কিসের বল—কিসের সাহস, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, তবু এ ভয়ানক কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—“না, দিদি, তুমি কি ভুলিতে কি ভুলিয়াছ, ঠহা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা। সত্য কি মিথ্যা, ভাল, চল না কেন, কলিকাতায় গিয়া আনিয়া আসি।”

মহামায়া বলিলেন “তুই বড় বুঝিস্! আর যদি তাই হয়, তবে কোণায় গিয়ে দাঁড়াব? আর ছেলেগুলোই বা কি উপায় হবে? শুন্ডি, আজি নাকি রাত্রে পুণিশের লোক আসিবে, তখন ধালাধানা ঘটটা পর্য্যন্ত—”

মা বলিলেন ‘সত্য, বাছা, না, আর একদণ্ড এখানে থেকে কাণ নেই। চল গাড়িতে গিয়ে উঠি।’

বিরাজ। তা বাই হউক, এ সময় নিশ্চয় হ'য়ে আমাদের সেখানে গিয়া থাকাকি ভাল ?

মহা। আঃ এ ছুঁড়ির রকম দেখে যে আর বাচিলে না ? তা মশটাই বা কি ? আর যদি কথাটা সত্যই না হয়, শবর পেলেই আবার এখানে তখন সকলে চলে এগেই হবে। বাপের বাড়ী বাব—আর কোথাও নয়—এর আবার ভাল মন্দ কি ?

মা বলিলেন—“আমি মিথো মনিষ্যি; তা নৈলে আঃ আমিই যে এ শবর পেলে কোর ক'রে তোমাদের নিয়ে যেতাম, তোমাদের এমন ক'রে সেজেগেজে বেতে হবে কেন বল। তা ভগবান মেরেছেন—” মাতা আর কিছু বলিতেন, কিন্তু বহুদিনের শোকটা একেবারে হস্ করিয়া উধলিয়া উঠিল। কাজেই নাকের জলে, চোখের জলে, ফোঁত ফোঁত শব্দে কথাটা বাধিয়া গেল। মাতা কাঁদিলেন।

শেখিয়া শুনিয়া বিরাজ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সতস্য কিছু বলিতে পারিল না। বলিলেন,—“আয়, বাছা, নেমে আয়।”

বিরাজ নড়ে না।

মা আবার বলিলেন, “ঐ গাড়োয়ান হাঁকিতেছে, আর বেরি করিস্ নে।”

বিরাজ নড়ে না।

মহামায়া এক হাতে গহনার বাক্স ও অন্য হাতে কনিষ্ঠ পুত্রের হাত ধরিয়া नीচে নাগিবার উপক্রম করিলেন। বিরাজকে ডাকিলেন “আয়, বিরাজ, আয়।

তবু বিরাজ নড়িল না। চুপ করিয়া সেই একই স্থানে বসিয়া রহিল। মহামায়া মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—“ও আবার কি ঢং ! চুপ ক'রে বসে রহিলি যে।”

মা বিরাজের হাত ধরিলেন। বলিলেন “উঠ, চল বাই।”

বিরাজ বলিল—“তোমরা যাও, আমি যাইব না।”

শুনিয়া মা অবাক হইয়া গেলেন ! মহামায়া বলিলেন, “যাবি নে তো থাকবি কোথায় ? থাকি কি ?”

বিরাজ কাঁদিল। বলিল—“বাবার ডিম্বা করিয়া ধায়, তাহাদেরও দিন

কাটে, আমার না কাটিবে কেন? তোমরা বাও, যুবুযো মশাইর ঠিক খবর না পেলে আমি যাব না।”

মহামায়া রাগিয়াছিলেন। যুগ ঘুরাইয়া ঠোঁট উন্টাইয়া বলিলেন “ওরে আমার টসি!—তবে থাক্।” রাসে ছেলেটাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া মহামায়া নীচে নামিতে লাগিলেন। ছেলেটার প্রাণ অস্ত হইবার বে। হইল। মহামায়া নীচে নামিতে লাগিলেন। কিন্তু মা পারিলেন না। ছাত্তর হটুক, মার প্রাণ। বিরাজকে কখন ভাল কথা। কখন “তোমার গোড়ীর পারে পড়ি” বলিয়া কত অমুনর বিনয়ে, কখন বা “হতভাগা মেয়ে” বলিয়া কড়া কথার, যাইবার জন্য এত বলিলেন, তবু সে ‘হতভাগা মেয়ে’ ভুলিল না। যেখানে বসিয়া ছিল, সেখান হইতে উঠিল না। বিরাজ তখন মাতা ও ভগ্নীর ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিল, তখন তাহার চক্ষে জলও ছিল না। ভাবিতে ভাবিতে সে নিশ্চল হইয়া দিয়াছিল। ওদিকে মহামায়া নীচে নামিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। মা তখন বড়ট বিপদে পড়িলেন। শেষ কি করেন, বিরাজ যখন একান্তই উঠিল না, তখন কাজেই তাহাকে গালি দিয়া নীচে নামিলেন। বাহিরে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, সকলে গিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ছেলেটা আপে হইতেই গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিয়াছিল। শশীবাবু আজ কয়েক দিন বাড়ীতে ছিলেন না। তখন সরকার, চাকর, দাসী সকলে আসিয়া গৃহিনীকে প্রণাম করিল। মা সরকারকে সেই “হতভাগা” মেয়েটাকে দেখিবার জন্য অহরোধ করিলেন। পাড়োয়ান পাড়ী হাঁকাইয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মা পাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া বাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর, পাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে, সরকার বাড়ীর ঘরে ঘরে চাৰি বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দুই একঘন ছাড়া সকল চাকর দাসীই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। মহামায়া পূর্বেই তাহাদিগকে অস্বাধ দিয়াছিলেন। যতই মধ্যে সে কোলাহলপূর্ণ প্রকাণ্ড পুরী শূন্যত্বন হইয়া পড়িল। কেবল সেই শূন্যঘরে তখন রহিল—একেলা বিরাজ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।

স্বপ্ন সংগীত ।

চুপ্ চুপ্ ফেল না নিশাস,
অনগে আলুয়া সখাটেরে
লহরীর বিমল আঁচলে
ধীরভ'বে সূক্ষ্ম দেহ পানে
ম'ধুর্যা গোপনে করে বাদ,
আত্মনিতে পারে সেইজন,
চন্দ্রকরে প্রাণপে আকাশে
লিখে যেন বিগাছে সে জন
মাক্ষধানে অকুল অভাব,
আর পারে বসিচা আমরা
বিশ্বমাত্র অস্ত্র বিরসণে
বালকের ক্ষুদ্র ভবে মত্ত
রোদনের গীমার বাতির
অবাস্তব জড়িম। হেণা মন,
হরে গেছি অস্ত্রের আকর,
চারিদারে ভ্যাণ্ডিতের লহরী
হৃদয়ের অঙ্গজল সখে
এমন অভাবে ঘিনিয়াছে
মরণের অটুট মিলন—
ছায়াতেথারহেতে পড়িয়া
ছায়াতে মিশাগে হেথা ছায়া
মমতার ক্ষুদ্র দীপ শিখা
এণ্ডের কোমল, প্রাণপে

তুলিও না রোদনের রোল ;
ভাগীরথী দিগাজেন কোল ।
স্থলদেহ রেখেছেন ঢাকি ;
অনিমিবে এস চেয়ে থাকি ।
রসভ্রাহী নয়ন ঘাহাব,
সুধাগাথা আত্মদন তার ।
অনিভেছে সৌন্দর্যের শিখা,
আপনার লবনের লিখা ।
এক পারে গিয়াছে সে জন,
করিতেছি অস্ত্র বরিষণ ।
অভাব যে লবু হয়ে যাবে,—
এ জালা কি ক্ষুদ্রতাকে পাবে ।
এসেছি যে আমরা ভাসিনে,
অমৃতবে আছি জড়াইয়ে ।
চেয়ে আছি পবিত্রতা পানে,
ঢালে শান্তি আঁধার পরাণে ।
তুই দণ্ডে ঘাণ শুকাউয়া ;
মরণের তরে কাঁদে হিরা ।
বন্ধনেতে শিথিলতা নাই ।
আলো রানি হুঁজিয়া না পাই ।
অনীভূত করি অন্ধকারে,
নিবাইয়া দেই অস্ত্র ধারে ।
সাজনার লৌহ চূর্ণ রানি

অতি দীরে জড়াইয়া দিয়া
 লুপ্ত রে হস্তো না পাষণ
 ভালবাসা পান করিবারে
 তার মুখে অলকার কথা,
 দিন রাত করিয়া ভ্রমণ
 মরণ তো পানোনতা-ময়
 জীবিত মরণ দিগে ঘিরে
 আলাপনে কুসুম-চয়নে,
 যত চিত্তা জন্মেছিল প্রাণে
 প্রাণময় বেড়াইছে ছুটি
 জগতের আবরণ-ভেদী
 জীবিত এ ভাবনা তলিকে
 প্রবেশ পাষণে বীধি মন
 দুই বিন্দু নয়নের জলে
 নৃতন আমোদ যেন আসি
 সীমাহীন বিচ্ছেদের আলা
 মিশাইয়া হইবে থাকিতে
 বিন্মুতিরে করাল বদনা
 লুপ্তয়েতে বদিয়া আমার
 পুত্রহীনা মার মনে পশি
 প্রণয়ীর ছিন্ন কুণ্ড মাকে
 মৃতের ভাবনা তলি ল'য়ে
 পদতলে দলিয়া এদের
 গন্ধতরা ঘেহেরি কুসুম,
 বস্ত্র করি সঞ্চার কারণ
 প্রাণ পূজা প্রকৃতি ধরম—
 নৃতন আমোদে মাতি পুনঃ
 প্রকৃতি গো জননী আমার,

পাষণ হইতে অভিলাষী ।
 চেয়ে থাক কোমলতা পানে ;
 আত্ম তার আসিবে এখানে ।
 তার মুখে অমরের পান,
 জুড়াইব তপিত পরাণ ।
 প্রাণে করে শ্যামিকা বিহীন,
 জীবনের করে বিমলিন ।
 রোননে যতনে শুভ্রদার
 হাসে তারা জীবন শোভায় ;—
 বিভেদকারিণী দৃষ্টি দিয়া,
 দেব মূর্তি দেখিছে চাহিয়া ।
 পান করাইয়া হলাহল
 ফেলিব কি দুই বিন্দু জল ?
 এ যন্ত্রণা যেন না ফুগায় ।
 যন্ত্রণার কুখির না ধায় ।
 জীর্ণ নীর্ণ বধি হ'য়ে দায়,
 ধীন ধীন কুণ্ড নীচতায় ।
 অতঃপর গন্ধর গভীর
 ঢালিও না জাগ্রির মদির ।
 শোক তার লঘু ক'রে দিস্,
 নিজ হাতে বিছানা পাতিস্ ।
 চিরদিন তুমি হ'য়ে র'ব,
 করিস্ না আমারে নীরব ।
 জীতিমাথা নিখল আদর,
 রাধিয়াছি ভরিয়া অন্তর ।
 বেহ দিগে পূজেছি দ্বাদশ,
 কেমনে তৈলিও ভাংরে পাশ ।
 পূর্ণ করা অত্যাশ ভোমার,

নিবেদন, এ মণি বিবর
 হৃদয়তর চয়েছে বর্শন
 স্রোতঃস্রব্য পরিমলভরা
 বহুবার তেজোময় লিখা
 বর্ণ হতে আসে গো নামিয়ে
 গ'ড়েছিহু যে মহা অগত
 নেহে তাহা ধুলির মতন
 অগতের বার হ'য়ে গিয়ে
 মরণে কি সৌন্দর্য্য তাহার
 বিজসি-হিরোলে সঙ্গ প্রাণ
 প্রাণের সহিত আলিসনে
 দ্বারীর মরণে নাহি ভয়,
 হবে বলি বিনষ্ট অদ্বারী
 প্রণয়ের নির্মল স্রুতি,
 হৃদয়ময়ী বিধবা বালায়
 আপনার উত্তপ্ত নিশ্বাসে
 রেহ ল'য়ে রহেছে বসিয়া
 এ সকল রেহ-উপহার
 ভালবাসা পান করাইতে
 আশীর্ভূত জনক তোমার
 বাহ্যসংজ্ঞা নাহিক তাঁহার
 পূর্ণবাসী অশ্রুরী সবে
 মুদ্র হস্তে ক'রে ষাও দূর
 মুক্ত আত্মা জীবিতের সনে
 সঙ্কাপীর জন্ম-আবেগ
 চূপ্ চূপ্ ফেল না নিশ্বাস,
 নিদ্রাময়ী শান্তিদেবী আহা
 দেখ যেন ঘুম নাহি ভাঙ্গে

পরিপূর্ণ ক'রো না আমার ।
 চারি ধারে করি বিলোকন
 প্রাণময় সখার বদন ।
 নির্দোষিত জন্মে কেবল
 জন্মেরে করিতে উজ্জ্বল ।
 মিলে গুণে সখার সখায়
 অকিঞ্চন এ ছার ধরায় ।
 গ'ড়েছিহু অগত হৃদয়
 অকারণ চাইবে অতর ?
 ছুটে গিয়ে গৃহে আপনার
 প্রাণ করে প্রণয় প্রচার ।
 অদ্বারীর অনয়ে সংসার,
 কাঁপে তার মরণে জন্ম ।
 মেহের ললিত ফুলদল,
 শোকের প্রথম অশ্রুফল,
 বিধাবিত মলিন শোভয়
 তোমাকে হে করিতে আদর ।
 আসিবে না ল'তে কি হেথায় ?
 আমরা কি পাব না তোমায় ?
 হ'য়েছেন শোকে জ্ঞানহারা
 বহে মাত্র নয়নের ধারা ।
 এ সময়ে আসি একবার
 তাপিতের জন্ম-বিকার ।
 আসে না কি করিতে আলাপ
 তবে কি গো নিতান্ত প্রলাপ ?
 তুলিও না রোগনের রৌপ
 স্বজনেরে দিয়াছেন কোণ ।
 আমরা তো অবোধ স্বপন

সবে মিলে যাই ধীরে ধীরে	নিজাম'কে হইতে মগন ।
যত দিন না পারিব আশা	ও নিশ্চিহ্ন করিতে পরশ ,
সংসারের কঠোর আশ্রয়	হ'য়ে সব নিভান্ত অবশ ।
ধর্মের নির্মূল পথ দিয়া	দুমাইতে চণ যাই সবে
প্রভু করুণা-এবে সধা	অবশ্যই আমাদের হবে ।

নিবেদন ।

অবজ্ঞার বিষয় বিষণ্ণে	সধা হুমি নিখেছ আমার,
করুণা করিয়া আর কেন	বিষণ তুলিতে এলে হয় !
এলেপের নাহি প্রয়োজন,	মর্মে চর্মে বিধেছে এ বাণ,
তুলিলে কুখির ধারাসনে	প্রাণের হইবে অবসান ।
গেমের কি এই পরিণাম	একেই কি বলের নিবাস —
ভাল করে বাসি প্রাণ ভোরে	সেই কি খটার সর্পনাশ !
যদি হুঃখ হ'য়ে থাকে মনে	যদিবা বাসনা আছে জীরে,
তারে সধা অহুগ্রহ ক'রে	শেষ বাণে যাও হে বধিছে

ঐবেণোয়ারিলাল গোস্বামী ।

সাহিত্যের অবস্থা ।

ফুল শুকাইলে ফুলে আর গন্ধ থাকে না । বৃক্ষ মরিলে ফলের আশা করা বৃথা । জীবন যাইলে শত্রুরের জিত্রা, গতি একেবারে বন্ধ হয় । আমাদের বাকী সাহিত্যেরও কি আজ ঠিক সেই অবস্থা নয় ? সাহিত্যটা অদম্যে বার্কক্য-প্রাপ্ত হইল !—অর্থাৎ মারা গেল । সকলেই না পড়িয়া পণ্ডিত । এক ছত্র না লিখিয়াও গ্রন্থকার । মুখে-মুখে সমালোচনা । কেহ কোন কথা শুনিতে চায় না । বুঝে না । সকলেই বণিবীর জন্য বড় ব্যস্ত ।

যেন আমার মতন পণ্ডিত আর নাই ! এই অন্ধ আশ-বিশ্বাস-প্রিয়তাই আমাদের এই নবীন সাহিত্যের কাল হইয়াছে । আর কালের কারণ—বাল্য-নির নিষ্ঠাবৃত্তা । ভোগ-পরায়ণতা । যুরোপীয় সাহিত্যামূল্যবোধের বিশেষ অভাব । সাহিত্যের গুরুতর দায়িত্ব-বোধ কাহার নাই । সাহিত্যের প্রতি এত অবহেলা আর কোন দেশে দেখি না ।

বলিবে—সে ত হুখের কথা, আশার বিষয় । বলিতে তোমাকে ত কেহ বাধা করে না । বলিতে পারিলে ত আম'দেরই গৌরবের কথা । কিন্তু বলিবে কি ? বলিবার ক্ষমতা কোথায় ? বলিবার জন্য কবে কি করিয়াছ ? বলিবার ফলে যে আত্মবিশ্বাস কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছে । কালভেদে, সমাজের বয়সের সহিত নিকারও পরিবর্তন হইতে থাকে । অর্থাৎ জ্ঞান ক্রমে বাড়িতে থাকে । এ বাঙ্গালায় তাহা কৈ ? বাঙ্গালায় যে, তাহার বিশদ্রুত ভাব । হায়, কি নিভ্রুত ! কথার অভুততা ভাবিতে না ভাবিতেই Shelley, Tennyson'র উপর গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছে । কখন তাহা পড়িয়াছ কি ? জ্ঞানের এই উন্নতি-দিনে বাহা-তাগা একটা বকিলেই হইল কি ? Ruskin, Mathew Arnold'র সেই অনিশ্চিত ফল-ফোটার নিয়মে প্রকৃতিত ও হৃদয় নূতন art'র মধ্যে কখন প্রবেশ করিয়াছ কি ? তবু যোড়ার সমুদ্র পার হইবার আকাঙ্ক্ষা কেন ? কেন এ প্রগলভতা ? George Elliot ত কিছুই নয় । কিস্বাসা করি, আজ পর্যন্ত কর জন তাহার মতন মানবচরিত্র বিশ্লেষণে এমন হৃদয় চাহুর্গাময়ী অভ্যন্তরিকা দৃষ্টি দেখাইতে পারিয়াছে ? জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রকল্প ভাবগুলি এমন হৃদয় হৃদয়-সঙ্গত করিয়া আঁকিতে পার কি ? চরিত্র গড়িবার এমন দোরস্ত হাত তোমাদের নয় কেন ? কেবল কতকগুলো অশ্রুতিকর সন্দেশ-জ্ঞান পুরাতন উপদেশ-বোল, কতকগুলো শুক্ল অমর হীন তর্ক অন্ধ স্বপ্ন-ভঙ্গির অকৃতিকর কতকগুলো "হিন্দু-ধর্ম," "হিন্দু-শাস্ত্র," "হিন্দু পণ্ডী," "আর্য্য," "আর্য্য-সমাজ" প্রভৃতি কাঁপা মোটা মোটা কগাই কি সাহিত্য ? সাহিত্যটা কি কেবল কতকগুলো শব্দের যোজন ? নীরস শুক ফলের মালা ? না, তা কখনই নয় । সাহিত্য, সমুদ্র-ভাট লইয়া । মানবীয় হৃদয়-ভাট লইয়া । মানবীয় হাসি-কান্না, জোয়ার-ভাটা লইয়া । সাহিত্য মিথ্যা নহে, সত্য

করা নহে। সাহিত্য সত্য, খাটি সোণ। ছায়া নহে, গ্রাণ। সাহিত্য, প্রভাতের স্বৰ্ণ। রক্তনীর চন্দ্র। সাহিত্য, ফুলের হাসি। বসন্তের বাতাস। প্রকৃতির অলঙ্কার নিয়ম। জীবনের উদ্দেশ্য পাকিতে পারে। খুঁজিলে সাহিত্যের উদ্দেশ্যও পাওয়া যায়। তাহা বলিয়া জীবনের সকল কার্য তত্ত্ব করিয়া, আগে পেকেই তাহার উদ্দেশ্য কি আনিবার জন্য হাঁ করিয়া বলিয়া ভাবিলে কি জীবন চলে ? না, টিকে ? ফুল-কোটার উদ্দেশ্য কি এই ভাবিয়া যদি ফুল ফুটিত, তাহা হইলে কি কখন আমরা ফুলের সুখ সান্ত্বকর সৌরভ পাইতাম ? না, ফুলের মালা গাধিয়া প্রিয়জনকে গলায় পরাইয়া কি কখন মানস উপভোগ করিতাম ? ফুল লইয়া কাণের জীপিকানির্দ্বার চলিত ? আরও এক কথা, সাহিত্যের অঙ্গপুট হইতে না চাইতেই এই সময় থেকেই অত “উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য” করিয়া চীৎকার করিলে ঠাণ্ডার অঙ্গ আর কখন পুট হইবে কি ? আপনারা এক একজন নিজ-রাজ বলিয়া কি সাহিত্যটিকে এই অম বয়সে বিক্র হইয়া পড়িলে ? দেখিতে পাই, কেহ কেহ এই বালক-সাহিত্যের মুখ হইতে একেবারে সকল কথা—সকল প্রকারের ভাব—বাহির করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহার জ্ঞানে না যে, তাহাদের সে উদ্দেশ্য—ভারাক্রান্ত প্রাণচীন কান, প্রকৃতির পরিবর্তনশীল নিয়মের বিরুদ্ধে। তাহাও কি কখন চর ? দীর্ঘ চির দিন হইয়া আসিতেছে, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে, বড়ই কঠিন নিয়ম কর না কেন, অন্তরে প্রথমেই ফল ফলিবে না। ফলিলেও, তাহার পরিণাম বিশ্বাসিকের অগতির সঙ্গে এক ! প্রকৃতির উপর তেঁকা দেওয়া চলে না। অত্যন্তরিক দৃষ্টি কাহার নাট। অস্তরঙ্গ লোণ পাইতেছে। বাধ্যজন্য প্রধানা লাভ করিতেছে। সাহিত্যটা দিন দিন ছোট হইয়া আসিতেছে, সরিয়া বাইতেছে। পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলেই কি সাহিত্যের উন্নতি হয় ?

আমি এই স্থানে আগমনের বর্তমান সাহিত্য-পতির সহপ্রকাশিত “নীহারাম” গ্রন্থ সম্বন্ধে দু-চার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঠাণ্ডার সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে সাহস করি না। বর্তমান বাঙালী সাহিত্যের তিনি শরীরা—জীবন্ত সমষ্টি। তাকে ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালী

সাহিত্য দাঁড়াইতে পারে না। আমি তাঁকে গণ্ডে ডাকি কবি। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা লইয়া সঙ্গীতই গৌরব করি, কিন্তু আন আন্যকৈ সত্যের অল্পরোধে, বাঙ্গালী সাহিত্যের ভাবী মঙ্গলের দিকে চাহিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। আশা করি তিনি আগার এই সত্যাদিষ্ট অসৌজন্যতা কমা করিবেন। আমি মনেব কথা খুলিয়া বলিলাম।

কর্ত্তার দোষে, কর্ত্তার অতি-পাতিত্বোত্তে গুণ ভাঙ্গে। নেপোলিয়নের কার্যের ফল আজও ফলস্বে ফলিতেছে। সঙ্গীত এই রূপ। আমাদের এই সাহিত্যটো বেশিলেই কপাটা সূক্ষ্ম মাটেবে। আজ কল বঙ্গের দরিদ্র সাহিত্য-পতি মর্দ লইয়া মাত্ৰিরাছেন। জানি না, কেবল ধর্ম-প্রচারকের পক্ষে সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দাওয়া কতটা। ধর্মের দ্বারা বঙ্গের দুঃস্থই মুচিবে ভাবিয়াছেন। সেই জন্য তিনি এখন কাগজে-কলমে ধর্মের পুচার করিতেছেন। তাঁহার শেষের পুস্তক তিন খানিট ধর্ম-সম্বন্ধীয়। কেবল ধর্মই তাহার উদ্দেশ্য। আমি তাঁহার তিন খানি পুস্তকই পড়িয়াছি। আজ তাঁহার শেষ পুস্তক সীতারামের উপর কিছু বলিব।

সাহিত্য-পতি, সীতারামকে উপন্যাস বলিয়াছেন। আমি সীতারামকে উপন্যাস বলিতে পারি না। সীতারাম উপন্যাসাকারে ধর্মব্যাখ্যা—তত্ত্ব। গ্রন্থকারের ধর্মসম্বন্ধীয় মতের চিত্র। বুদ্ধি বা ইহা বঙ্গের ধর্ম। বুদ্ধি জীবনের সঙ্কাকাল আসিবারে দেখিয়া কবি ধর্ম-কথা আরম্ভ করিয়াছেন। উপন্যাস কি করিয়া বলিব? উপন্যাসের সে স্বতঃস্ফূর্তি নাই কোথায়? চরিত্রের সে বৈচিত্র্য কোথায়? সীতারামে পুরুষ কৈ? বাঙ্গালি চরিত্র গঠন করিবার আদর্শ-চরিত্র কোথায়? ধর্মের জন্য সে আকাঙ্ক্ষা কোথায়? কিংবদন্তী জন্য ধর্ম? সীতারামে ধর্ম বড়ই অস্ফূট। গ্রন্থকার যে কথটি বলিতে চান, সেটা যেন এখন ফুটে নাই। চরিত্রগুলিকে শু মাহুদ বলিয়াই বোঝ চর না! যেন কতকগুলি জশরীরী মানবীর বৃত্তি চোখের লগ্নুখে খুলিয়া বেড়াইতেছে। ইহা কি উপন্যাস? সীতারামের স্বাভাবিক মতই হইত। সীতারাম যে, তাহার ধর্ম এখন পরিণাক করিতে পারে নাই। সীতারাম পুস্তকে ধর্ম-জীবন প্রকৃত। কেবল কতকগুলি ধর্ম-কথা মাথা উর্দ্ধ করিয়া আসিয়া আছে। আমরা ধর্মের তত্ত্ব, নিয়ম,

শুনিবার আগে, ধর্মময় জীবনের কার্য, চিত্র দেখিতে চাই। তবে-অপেক্ষে মিশে, ধর্মের সঙ্গে চরিত্রের প্লেটন মিশান চিত্র সীতারামে কোথায়? বক্তৃৎসব, চরিত্রের সঙ্গে ধর্ম প্লেটন মিশাতে পারেন নাই। সীতারামে ধর্ম—সকল স্থানেই—চরিত্রের আগে দাঁড়াইয়াছে। চরিত্রের সঙ্গে মিশে নাই। সাহিত্যে এই ধর্মের এত বেশী স্থান বড়ই অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক—নারায়ণের নিগূঢ় বিচ্ছেদ। ধর্মের এই অস্বাভাবিক ভাবে ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাহিত্য মর-খর। ইহান মধ্যেই সাহিত্যে ধর্ম চুপ্ত।—কেহ যেন না মনে করেন আমি ধর্মের নিন্দা করিতেছি। ধর্মের নিন্দা, আমার উদ্দেশ্য নহে।—আমি এট বলিতেছি যে, আমাদের আত্মীয় সাহিত্য যে এখন গঠিত হয় নাই। আত্মীয় চরিত্র কোথায়? ধর্মের ভিত্তি নাই সে ধর্ম দাঁড়াইবে কাহার উপর? আমরা এখন ধর্ম চাই না। চাই, সাহিত্য। চরিত্র চাই। জীবন চাই। বাস্তবিক মাহুৎসব। অপর-তলে যে বাস্তবিক স্থান নাই।

বনিয়াজি, কর্তার দোষে সংসারে যত নিঃশ্রমের আনির্ভাব। সাহিত্যেও তাই। আজ যে সাহিত্যে এত গোলমাল, এত যে তাহার অপেক্ষিত, কেবল কি তাহা সাহিত্য-পত্নির কার্য-নিপুণতার অভাবে নহে? সেই অন্য সাহিত্যে সকলেই “গায়ে মনে না আগনি মোড়ন।” সেই জন্য একটা কথাও কাহার শুনিবার যোগ্য নহে। কথা কহিতে কেহ জানে না। কে তাহাদের নিষেধে? দেশে মাষ্টারের অভাব। মাষ্টার-আট তাহারা কি করিয়া দেখাবে? মাটি যথেষ্ট আছে। পাকা পটুয়া নাই। সেই জন্য একটা পুতুল স্বপ্ন হইতেছে না। পুতুল গড়িবার শক্তি কাহার নাই। সে শিল্প-কৌশল তাহারা জানে না। তাই সকলেই এক একটা বাঁধের গড়িয়া বসিতেছে। হার, বাস্তবিক কি হ্রস্বপুট!

আর তাই বাস্তবিক, তোমাকে একটা কথা বলি। বলি, সে দিন গিয়াছে। অন্ধতা, মিথ্যা, গোঁজামিলনের দিন আর নাই। এখন যুগান্তর উপস্থিত। সকল জিনিসের উপরে ভাসিয়া বেড়াইবার দিন গিয়াছে। চির দিনের মাহি-স্বভাব পরিভাগ কর। অন্তরে প্রবেশ করিবার এখন দিন আদিরাছে। বাস্তবিক, তাহা বল। অসুখানের উপর নির্ভর কখন

করিবে না। তাহা কখন টিকিবে না। যাহা কৃষি দ্বারা নাষ্ট, অপরে তাহা কি বুঝিবে? অনাদি চির দিবসের সত্য-পথে চল, আশো পাইবে। অল্পমানের অঙ্ককারময় পথে চিরজীবন গুরিষা বেড়াইলেও আশো কখন মিলিবে না। এমন মালা গাঁথ, যাহা বাজালির হৃদয়ে যুগযুগান্তর ধরিয়া শোভা পাইবে।

যত দিন বঙ্কিম বাবু সাহিত্য লইয়া ছিলেন, ততদিন তিনি আমাদের শরের কাছে, আমাদের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া ছিলেন। “বঙ্গদর্শন” এ কথার সুন্দর প্রমাণ। ততদিন বাজালা সাহিত্যে কোন গোলই ছিল না। কাজ বেশ চলিতেছিল। যে দিন হইতে তিনি যথেষ্ট ভাঙ দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। আজ আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি না। তিনি যেন সুদূরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত, বিবর্তক, কি কেবল বক্তৃতা—বেদীর উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ? না। তাহার এক একটি জীবন। চিরপ্রবাহিত প্রাণের বিচিত্র খেলা। মরীচিকানুহে। জীবনের অনন্ত তৃষা-নিবারণের চির-নিঃসৃত প্রবাহিনী। টানাপাথর বাতাস নহে। স্বাভাবিক দক্ষিণ বাতাস। ধর্ম-স্রোতের অস্বাধী তৃণ নহে। তাহার পৃথিবী-বেটনকারী শক্তির সহিত একত্রে, এক নিয়মে এত্বে। সেট শক্তি বলে তাহার অবিনশ্বর। সে শক্তি, বাঁচিয়া থাকিবার সে অসীম আত্মনির্ভর বল, শীতায়ের কোথায়? আজ আমি সাহিত্যপতির নিন্দা গাহিতে বসি নাই। হুঃখের কান্না কাঁদিতেছি। সাহিত্যপতির কাছে আমাদের সত্যের অভাব জানাইতেছি। সাহিত্যের এ দুর্ভিক্ষ দিনে তিনি কেন অবসর লইলেন? এ দুর্দশার হাত হইতে তিনি ভিন্ন আমাদের আর কে রক্ষা করিবে? এ সাহিত্যের আর কে আছে? এ সাহিত্য তাঁহারই। এ সাহিত্যের ভার কে লইবে? সাহিত্যের মর্যাদা কে রাখিবে? একদিন তিনিই না “উত্তরগামচরিত্ত” সমালোচনার সময় বলিয়াছিলেন যে, “কবির ভগতের শিক্ষালাভ—কিন্তু নীতি নির্মাচনের দ্বারা (কখন) শিক্ষা দেন না। কথাগুলো নীতি শিক্ষা দেন না। তাঁহার সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ স্বভবের দ্বারা ভগতের চিত্তভক্তি বিধান করেন।” তাই কবি-

দের স্থান, সকলকার উপরে। তা, এ কথা কি তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন ?
এঁ'র পরও কেন আজ তিনি কেবল ধর্মের উপদেশ, ধর্মের theory
খাড়া করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তকে তন্ময় চেষ্টা করিতেছেন ? সেই জন্যই
ত সীতারামের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। সেই জন্যই ত সীতারামে
স্বজন-কৌশলের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় না। সেই জন্যই সীতারাম
রক্তমাংস-বর্জিত। রসোদ্ভাবনের যোহিনীমন্দির অতীত। তা, সীতারাম
বাহাই হউক, আমরা সীতারাম চাই না। সীতারামের দায়ও চাই না
বাঙ্গালী সাহিত্য। যিনি স্বজন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই চাই। বাঙ্গালী
সাহিত্যে যার। তিনি আগিয়া রক্ষা করুন। তিনি অবশর লইয়াছেন
বলিয়াই ত চারিদিকে এত তর্ক, এত গোলমাল। বাঙ্গালী সাহিত্যের সিংহা-
সন শূন্য। তাঁহার স্থান তিনি আগিয়া পূর্ণ করুন। সে স্থানের অধিকারী
আর কেহ নাই

ত্রিণগেশ্বর

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ পুস্তক সকল বজুর্কেদের পর
হইতেই বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। কারণ, দুর্কোষ বৈদিক মন্ত্রাদির
বাধ্যতার নিমিত্তই ব্রাহ্মণিকদের ক্ষতি। সকল বেদের মধ্যে বজু-
র্কেদের মন্ত্রাদির বিশেষ বাধ্যতার আবশ্যক ; কাজেই ঐ সময় হইতেই
ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকলের বিশেষ পারিপাট্য হওয়াই অধিক সম্ভবপর বলিয়া
বোধ হয় ।

আরও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে, আমরা কেবল শুক্ল যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণকে (বদ্বিও উহা অতীত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়) ব্রাহ্মণ গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই। শুক্ল যজুর্বেদ ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ, এবং শুক্ল যজুর্বেদের মত ইহাও যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংহিতার মত ইহা মাধাদিন এণ্ড কণু এই দুই শাখায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে মাধাদিন শাখা চতুর্দশ কাণ্ডে বিভক্ত এবং সমুদায়ে একশত অধ্যায় সম্পূর্ণ। ইহাতে আটটি প্রাথমিক, চারিশত আটত্রিশ ব্রাহ্মণ এবং সাত হাজার ছয় শত চন্দ্রিকা কাণ্ডিকা আছে। কণু শাখা সমুদায়ে বিভক্ত এবং সমুদায়ে একশত চার অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার ব্রাহ্মণ সংখ্যা চারিশত আটত্রিশ এবং কাণ্ডিকা পাঁচ হাজার অষ্টশত ছেষটি। এই ব্রাহ্মণের প্রথম নয় কাণ্ড মূল সংহিতার প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যেক সম্পূর্ণরূপে অন্তর্গত করিয়াছে, অর্থাৎ যথাক্রমে এক একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞীয় ব্যবহার দেখাইয়াছে। অবশিষ্ট নয় কাণ্ড একশত সম্পূর্ণ নয়, ইহা মধ্য মধ্য হইতে অংশবিশেষের ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। ইহাতে বোধ হইতেছে ইহা পর সময়ে বর্জিত হইয়া থাকিলে। শতপথ ব্রাহ্মণ নয় টীকা দ্রুপ এবং আধুনিক হইলেও সায়নাচার্য্যের টীকা ব্যতীত ইহার সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ইহাও অনেকাংশে সংহিতার অন্তর্গত।

সায়নাচার্য্য সামবেদের ব্রাহ্মণ আটটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (১) প্রোত, তাত্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, (২) বড়বিংশ ব্রাহ্মণ, (৩) সামস্কিক, (৪) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, (৫) দেবতাপ্যার ব্রাহ্মণ, (৬) উপনিষৎ বাহ্য অধ্যাপক মূলদের (Am. Sank. Lit. p. 349) ছানোগ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছু নয়। উপরি-উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণদ্বয় অতিশয় উপকারী। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একশত দিন সম্পাদ্য সোম যজ্ঞের বিবরণ উক্ত হইয়াছে। বড়বিংশ ব্রাহ্মণে নানাবিধ বশীকরণাদি সাধক যজ্ঞকর্মের উক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার শেষ অধ্যায়ে জরাদি রোগের শান্তিকর্ম উক্ত হইয়াছে। কেবল তাহা

নহে, ভূমি কল্লাদি ভৌতিক বা অন্য কোন গ্রহাদি অন্য উপলব্ধ পাত্রের
কথাও নৃষ্ট হয় ।

অধর্মবাদের আক্রমণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ । কৃষ্ণ এবং যজুর্শ্রৌত
ব্রাহ্মসম্প্রদায়ী এবং চরকদিগের বিবাদ দৃঢ় রূপে আনক হইলে পর এবং ব্রাহ্ম-
সম্প্রদায়ী সংহিতার সম্পূর্ণ রচনা হইবার পর এই গোপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়া
থাকিবে বলিয়া বোধ হয় । কারণ, যেখানে এই গোপথ ব্রাহ্মণে অন্য বেদ-
বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে সেইখানেই বেশির ভাগে প্রথম ভক্ত যজুর্শ্রৌত হইতে
উদ্ধৃত, তাহাও আবার কৃষ্ণ যজুর্শ্রৌত হইতে, নয় ব্রাহ্মসম্প্রদায়ী সংহিতা হইতে ।
অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ইহাতে আকস্মিক ঘটনার উক্তিটা কিছু বিস্তৃত রূপে ।
অন্যান্য ব্রাহ্মণ নিচয়ে যেমন যাগ যজ্ঞের বিবরণ উক্তি আছে, গোপথ ব্রাহ্ম-
ণেও সেইরূপ ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সংহিতা এবং মন্ত্র উভয় ভাগ একত্রিত
হইয়া হিন্দুদিগের নিকট বেদ নামে অভিহিত হয় । এই উভয়ের আর
একটি সাধারণ নাম ঋগ্বেদ । বেদের কথা বলিতে ঐ সকল প্রণীত পুস্তক যাহা
ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ, তাহাদের নাম পরিভাষণ করা আমাদের
কেবল অসুবিধিত নয়, পদ্ধতিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে
কতকগুলি বেদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রূপে সম্বন্ধ, আর কতকগুলি কিছু
অঙ্গ অঙ্গ ভাবে । যে গুলি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ তাহারা বেদীয় বলিয়া
প্রসিদ্ধ ।

বেদের সহিত সম্বন্ধ পুস্তকের মধ্যে উপনিষৎ প্রধান । উহা বৈদিক জ্ঞান-
কাণ্ডের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মার মূখ হইতে নির্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ । আজকাল
যুরোপে উপনিষদের অত্যন্ত প্রচার ।

[কমলা:

শ্রীমদ্বৈকেশ শাস্ত্রী ।

কানন ।

কানন একেলা বসে কেন মদীতীরে,
 সংসারের দূরে এসে ভবিছে গম্ভীরে !
 কি তার মনের কথা, কি তার প্রাণের ব্যথা,
 কাউন হ'তে খান ফেলে ধীরে ধীরে ।
 কানন একেলা বসে কেন মদীতীরে !

কল কল কমলিনী গায়িত্তে গান,
 অকির গিয়াছে কি সে শুনি সেই তান !
 লহরে লহরে নীল। তরঙ্গিনী করে
 আনমনে ব'সে বা কি দেখিতেছে তাই,
 কানন কি ভাবে একা সুকিয়া না পাই ।

দূর গ্রামে কোলাহল ওঠে অনিবার—
 বায়ু তার ধীরে ব'য়ে আনে সমাচার,
 কোন দিকে নাহি কান, কে জানে তাহার দ্যান
 একাকী সে ব'সে ব'সে করে নিরালায়,
 নীরব নিম্ন মূর্তি দেখে স্তম্ভ পায় ।

না জানি অপেক্ষা তার করে ব'সে ব'সে—
 যত তরী আসে যায় দেখে অনিমেঘে ।
 দূর তরী আসে কাছে, কেলে পুন যায় পাতে,
 শুভ্র আসে না তার বাসনার ধন ;—
 সবে আসে, সবে যায়,—সে কেন এমন !

তার কি গো আদিবার না হয় সময়,—
 শুধু অপেক্ষায় প্রাণ তার কত রয় ?
 দূরে পদশব্দ হয়, কানন চমকি' চাপ,
 দেখে জল লয়ে যায় ধীরবরষা ;
 হায় হায় সত্য সে তো আদিবে না জানি !

দেখিতে দেখিতে বেলী ফুরাইয়া যায়,
 গোপলি নামিয়া আসে গগনের গায় ।
 বসে বসে পথ চাহি কত যুগ গেল বাহি,
 আসিবার নয় শে যে, রথায় আবাস,—
 নীরবে নয়ন দুছি ফেলে দীর্ঘ বাস ।

গোপলি ও চলে গেল, সন্ধ্যা আসে পিতে,
 প'খিরা ডাকিয়া বলে 'আর ভাণা মিছে ।'
 শরীর শিহরি উঠে, স্বপ্ন তার যায় টুটে,
 স্নান যুগখানি আরো স্নান হ'য়ে যায়,
 শূন্যে চেয়ে একা বসি করে হায় হায় ।

তবু ত নদীর ধার, ছাড়ে না কানন !
 সেই সে একই স্থানে বসিয়া তেমন ।
 থেমে গেল লোকশব্দ বায়ুটিও হলো স্তব্ধ
 তরীঘের ঘাওরা আসা গেল বন্ধ হয়ে,
 আঁধারে বিজনে একা তবু বসে চেয়ে ।

ক্রমে রাত্রি ঘোর বেশে নামে ধীরে ধীরে,
 আঁধারেরা চারি দিকে আসে ঘিরে ঘিরে ।
 কিছুতেই লক্ষ্য নাই, বসে আছে শূন্যে চাই,
 না জানি কেমন সে যে শব্দা নাহি লাগে,
 বাসনাটি বৃকে ক'রে সারা নিশি জাগে ।

এত প্রেম কোথা পেলো নাহি কি অবধি !
 এত কি বাসনা তার বার এ সমাধি !
 কে তার প্রাণের ধন, সব দিয়ে বিসর্জন,
 নিশি দিন পথ চেয়ে ব'সে নদীতীরে,
 সে তো জ্বলে এক দিনো নাহি বেধে ফিরে ।

কছু আসিবে না সে ত জানে ভাল মনে,
তবু বড় সুখ তার আসার কল্পনে ।
না না কিছু বলো নারে, সে কি ও ছাড়িতে পারে,
হৃদয় তা হলে এাণ রবে না শরীরে,
কানন শুকায়ে যাবে অই নদীতীরে ।

শিবস্তোত্র ।

ঐতৌ সংক্রয়ন্তে মরুদনলভাংসিতরুচি-
বিদ্যংপৃথ্বীপাথোহবননিপুণা মূর্তয় ইমাঃ ।
যদীয়া লোকানামবিমলধিযাং জ্ঞানবিষয়া
কহুনাং দেবোহসৌ ভবতু তুবি ভবায় ভজতাম্ ॥ ১ ॥

অবিমলবুদ্ধি মানবগণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত মরুৎ, অনল, সূর্য্য, চন্দ্র,
আকাশ, ও পৃথিবী, যাহার এই অষ্টবিধ মূর্তি আমরা ঐতিতে ভজিতে পাই,
সেই দেবদেব পৃথিবীতে ভক্তবৃন্দের মঙ্গল সাধন করুন । ১ ।

ত্রয়ীময়ো যো দ্বিজবর্ষ্যদত্তান্
পুষ্পাঞ্জলীনামৃত আনদাতি ।
বিশেষ্যু বৈবশানরমূর্ত্তিরীশো
ভূষাং স ভবায় ভবার্তিহারী ॥ ২ ॥

যিনি ত্রয়ী স্বরূপ, যিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের দত্ত পুষ্পাঞ্জলি সমাদরে গ্রহণ
করেন, যিনি বিশেষণে অধিক্রমে বিরাজমান আছেন, সেই সংসারহঃস্বহারী
দেব শুভ সংসাধন করুন । ২ ।

তমো বিদলয়ন্ মনঃকমলসংযমুদ্রীলয়ন্
মুনীশ্রুতদয়্যাস্বরং করুণয়া সমুদীপয়ন্ ।
হ্যাতিকগরয়ন্ নহোহহিমসিতাং শুসপকিনীং
মহেন্দ্রমহিতো মহোদয়বপূর্মহেশোহবতু ॥ ৩ ॥

যিনি মুনীশ্রগণের অজ্ঞানতিমির বিদলিত ও মানসরূপ কমল সমূহ উন্মূলিত করিয়া করুণাপূর্বক জ্ঞানপ্রকাশ প্রকাশিত করেন, বাহ্যর জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্যের জ্যোতিঃ প্রবর্ধিত হয়, মহেশ্বরপুজিত সেই তেজোময় মূর্তিধারী মহেশ্বর আমাদের পক্ষে রক্ষা করেন । ৩ ।

লীলাধেননকং নিভাতি নিধিলং বদ্য প্রকাশং জগৎ

মায়াভীতমনস্তবিশ্বনিলয়ং মায়াপতিং মাননম্ ।

উগ্রঃ বোরজটাধরং কনকট্টরভীমং মনোজাতকং

বিদ্যাভীপিতমঙ্গনার্জয়চলং দেবেশমীশং ভজ ॥ ৪ ॥

এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অধিল বিধমণ্ডল বাহ্যর লীলাধেননক পরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, যিনি স্বয়ং মায়াপতি হইয়াও মায়াভীত, বাহ্যতে এই বিধমণ্ডল বলীন হইবে, যিনি একমাত্র জ্ঞানালোকে প্রকাশিত এবং শীঘ্র সৃষ্টিকর্তৃৎ স্থাপনের জন্য স্ত্রী-পুরুষ মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই উগ্র, ভীষণ জটাধারী ভূজলভূষিত কামহত্যা দেবাদিদেব মহাদেবকে আমি ভজনা করি । ৪ ।

ধ্যায়ন্তস্তসমস্তদোষমণ্ডলং ক্লিষ্টাত্ত বা কর্মভিঃ

বিদ্যাভিবিবদন্ত বা বহুমতৈস্তজ্ঞানসা ম্মো বয়ম্ ।

লীলালীনজগৎপটে স্মরহরে দাক্ষায়ণীব্রজভে

সর্কে বিবভ্রাপহরিণি মনোবিশ্রামমাশাস্থহে ॥ ৫ ॥

লোকে সমস্ত দোষশূন্য নিষ্ঠুর ব্রহ্মকে ধ্যান করুক, নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্রেশ পাক, বিদ্যা বা বিবিধ মত লইয়া, পরস্পর বিবাদ করুক, আমরা সে বিষয়ে দৃকপাতও করিব না ; যিনি অবলীলাক্রমে আপনাতে এই জগৎপটলীন করিতেছেন, সেই কামহত্যা দাক্ষায়ণীব্রজভে বিভ্রাপহারী দেবদেবে আমাদের মন বিশ্রামলাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । ৫ ।

য়ে রে মানস মে প্রদীপ্তমহমো জ্ঞানস্য জ্ঞেয়স্য চ

দেহানমপি দৈবতস্য ধনুতে পুস্ত্রস্য বিবেচিনঃ ।

পাদান্তোকহনায়নাককরিপোঃ সংসারগর্ভে হৃদা

কিং মাং কিপ্যসি পুস্ত্রন্তকৃচভবতো নৈতাবতা যাস্যতি ॥ ৬ ॥

য়ে মন প্রদীপ্ত তেজঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ দেবদেব স্নানক রিপূর পানপদ্ম

ধ্যান কর, তুমি কি তাঁহাকে তোমার পুত্র মনোভূর বিনাশ কত্তা ভাবিয়া
তাঁহার ধ্যান বিরূপ হইয়া আমাকে সংসারগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছ ? তোমার
সে আশা নিষ্ফল, ইহার দ্বারা তোমার পুত্রশোক দূর হইবে না ॥ ৬ ॥

বাহি আধরতুঙ্গশেখরমকুপারং তথা সংতর

দেশাং তত্র লাবিরাজ্যমকুলং কীর্তিং লভসাত্ত্বলাম্ ।

আশা তে নতু শান্তিমেবাতি নহু ক্ষেমে তবেচ্ছান্তি চে

দন্তে ভীমকৃতান্তকৃতনয়নঃ শ্রীপার্কটীশং ভজ ॥ ৭ ॥

তুমি মহীধরের উত্তম পিতর দেশেই আরোহণ কর, সমুদ্রই উত্তীর্ণ হও,
দেশ দেশান্তরেই বা বাও, অকুল রাজ্যই বা শাসন কর অথবা বিপুল কীর্তিই
লাভ কর, তোমার আশার শক্তি কোথায়, যদি অস্তিম কালে খীর কুল প্রার্থনা
কর, তবে সেই করাল কালের হস্তা শ্রীপার্কটীপতিকে ভজনা কর ॥ ৭ ॥

শ্বমে স্বমরসে সদা পরবশে ক্রেশোত্তরে ভজুরে

শূন্যেহমিন্ মরুকাননাভবিষয়ে তৃণাতুরো ধাবসি ।

আনন্দং পরিপূর্ণমগ্রহিতং স্বান্ধানমেকং শিবঃ

চিত্তে স্বীকরুষে ন কিং নহু মহামোহং বিদূরীকুর ॥ ৮ ॥

মন ! সামান্য ও স্বভাবাদবিশিষ্ট, সর্বদা পরাধীন, ক্রেশ-প্রধান, লগ্নস্বাদী,
শূন্য, মরুভূমি-সদৃশ এই বিষয়বাসনার আকুর হইয়া প্রধাবিত হইতেছ, সেই
আনন্দময় পূর্ণ-অনন্ত শিবস্বরূপ আত্মাকে কেন অবলম্বন করিতেছ না।
তোমার মোহাককার বিদূরিত কর ॥ ৮ ॥

মিত্রৈশ্চিত্রকথৈঃ সদা বিহরসি জীভিঃ শূতৈঃ ক্রীড়সি

হস্তাত্যস্তমুহূর্জয়ং ন সহস্বে কালং করালং রিপুম্ ।

শ্রীমত্যাঙ্করপাদপদ্মশরণঃ বাপ্তস্য জীবাতয়ং

ত্রক্ষেত্রাদিশূর্জলং নহু পদং হস্তাবচেয়ং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

হে জীব ! চিত্তালাপী মিত্রবর্ণের সহিত সর্বদা বিহার করিতেছ—ক্রী ও
পুত্রগণের সমভিবাহারে ক্রীড়া করিতেছ, কিন্তু কি হুঃখের বিষয়। অত্যন্ত
মুহূর্জয় করাল কালকে শত্রে বলিয়া গণ্য করিতেছ না। দেখ বাহারা
শ্রীমত্যাঙ্করের পাদপদ্মের শরণাগত হইয়াছেন, অস্ত্রা, ইস্র প্রভৃতি দেবগণের
শূর্জল পদও তাঁহাদিগের হস্তলভ্য ॥ ৯ ॥

ত্রিসন্ধ্যান্তিমাননা অপি জপত্রি যং ত্রাস্ফাঃ

মদ্রং প্রণবপূর্বকঃ সপদি ত্রেজয়াঃ বর্দ্ধকম্ ।

সতর্গ ঐতি-বিশ্রুতঃ ঐতিমু যন্ত দেবোহব্যয়ঃ

স এষ স্তবদ্বারবরে ক্ষুব্ধ কোপি কঠেনিতঃ ॥ ১০ ॥

* ত্রিসন্ধ্যান্তিমাননা হইয়া ত্রাস্ফগণ সন্ধ্যাতেজোবর্দ্ধক প্রণব উচ্চারণ পূর্বক যে যন্ত্র ঐতিদিন জপ করিয়া থাকেন, যে অবিনাশী দেব তর্গ অর্থাৎ তেজোপূর্ণরূপে ঐতিতে বিশ্রুত আছেন, এবং যাহার কঠদেশ নীলবর্ণ, সেই দেবদেব আমার স্তবদ্বারকাশে ক্ষুণ্ণ হউন ॥ ১০ ॥

নয়দ্বাণং শীঘ্রং রবিবির তমোজ্ঞানিচয়ং

সদা চিত্তাস্তোজ্ঞে মম তু বিতর ভ্যোতিরমলম্ ।

প্রগাত্বঃ কীর্তিং তে মনসি মম বাহ্যাতিমহতী

দয়া ভূতে নিত্য তবহি বিদিতা ভূতনিলয় ॥ ১১ ॥

হে ভূতনিলয় ! তুমি রবির ন্যায় সমস্ত অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার জন্ম-কমলে বিমল ভ্যোতিঃ বিতরণ কর, আমার একান্ত বাসনা যে তোমার কীর্তি পান করি, সর্বভূতে তোমার দয়া নিত্য বিদিত আছে ॥ ১১ ॥

ভগ্নিকৃণাং মৃত্যুং জয়সি সততং পাতকমিব

ততো বেদা মৃত্যুঞ্জয় ইতি সমাশ্রায়তি হি ।

কদা বাম্বাকীনং হরসি চ পুরা মৃত্যুমনস

বয়ং স্থাং জানীযো অনিমৃতিজরাহেতুমচলম্ ॥ ১২ ॥

হে দেব ! তুমি ভগ্নশীল ব্যক্তিগণের যেমন সর্বদা পাতক হরণ কর, সেইরূপ মৃত্যুও জয় করিয়া থাক, সেই জন্য বেদ তোমাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, হে নিম্পাণ ! তুমি কবে আমাদের মৃত্যু হরণ করিবে, আমরা তোমাকে জয় মৃত্যু ও জরা একমাত্র কারণরূপে জানি ॥ ১২ ॥

রবিস্তম্রস্তারানিশিরশরদাধ্যান্ত ঋতব

উদযচ্ছয়া ভূঃ প্রিয়কসমুদী দেব সততম্ ।

সদা মার্গে য়ে য়ে জমতি গগনে যম্মিয়মতো

মহিয়ন্তে শক্তি ত্রিপুরহর সা বিশ্বনিলয় ॥ ১৩ ॥

রবি, চন্দ্র, তারা, শিশির, শরৎ প্রভৃতি ঋতুগণ ও সমুদ্র মেঘলা কদম্ব

কুসুম-সদৃশ এই ভূমণ্ডল আকাশ পথে সর্ব কালে নিরন্তর যে নিয়মিতরূপে
সঞ্চরণ করিতেছে, হে ত্রিপুরহর দেব ! তাহাও তোমার বিশ্বনিরন্তর মহিমার
শক্তি ॥ ১০ ॥

ন ন্যূনং নহি চাধিকং নিয়মতো যাতেষ বদ্ভাস্তবঃ

কালস্য প্রণয়ন্ অণপ্রভৃতিকান্ ভাগান্ প্রভাদীপিতঃ ।

সাপি শুভ্রিজকার্যসংস্থিতিরিয়ং যামাপ্রিতা মানবাঃ

স্বং স্বং নিক্রিয় কার্য্যজাতমনিশং কুর্ন্তন্তি মৃত্যুজয় ॥ ১৪ ॥

তেজঃপ্রদীপ ভাস্তর যে কালের অণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহ প্রণয়ন
করিয়া নিয়ম হইতে না ন্যূন না অধিক গমন করিতেছেন, হে নিয়ম মৃত্যুজয় !
সেও তোমারই কার্যের নিয়ম, মানবগণ সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বীয়
স্বীয় কার্য্য সর্বত্র করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

নো দেবা নচ দানবা ন ভুজগা নো বা বিদিনো বিদুঃ

কেবা তে মহিমানমাকলয়িতুং শক্তান্তথা কীর্ত্তিভূম্ ।

মৃতং মাং মৃগরীকারোতি ভগবন্ সংসারতাপত্রয়-

কুর্ন্ত-ক্রেমপরম্পরা জনিতদ্বাদ্ভীতং কৃপাবারিধে ॥ ১৫ ॥

কি দেবগণ, কি দানবগণ, কি ভুজগনিচয়, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু তোমার
মহিমা বর্ণন বা কীর্ত্তন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। হে স্বরাময় ! আমি মৃত
পুনর্জন্মে ভীত, আমাকে এই সংসারের আধ্যাত্মিক আধিতৌতিক ও আধি-
দৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ সমুদ্রত ক্রেমপরম্পরা তোমার তণ কীর্ত্তনে
মুগ্ধ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

সপ্তদ্বীপসমুদ্রশৈলনিবহাক্রান্তাঃ কণামণ্ডলেহ-

খণ্ডাঃ ধারয়তে ধরাং গিরিশ যঃ সর্ভামিমাং লীলয়া ।

শেষঃ নোপি ভবন্তুজাগদপৰং লেভে ভূজঙ্গাসদ

কিং জমো মহিমানমাকলয়িতুং কেবা বরাকা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

হে ভূজঙ্গভূষণ হিমালয়শায়ী দেব ! যে শেষ সপ্তদ্বীপ সমুদ্র ও পর্বত
সমূহাক্রান্ত এই অখণ্ড ধরামণ্ডল অবলীলাক্রমে স্বীয় কণামণ্ডলে ধারণ করি-
তেছেন, তিনিও তোমার বাহ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছেন, আমরা কি
বলিব, আমরা তোমার মহিমা আকুলন করিবার কে ? ॥ ১৬ ॥

ভৈরবঃ ভক্ত্যামহো বিভূষণমহির্বাসো গজানানং স্বচং
সম্পদন্তনরান্নিরাজিরচিতা মালা শাশানং গৃহম্ ।
বুদ্ধোক্ষা তব বাহনং ন চ কুলং চিত্রং চরিত্রং তব
দেবা কিত্ত নমস্তি নাথ নিখিলান্তুৎপাদপক্ষরহম্ ॥ ১৭ ॥

হে দেব! ভিক্ষালব্ধ অন্ন তোমার ভক্ত্য, সর্প তোমার ভূষণ, গজচর্চ্ছ
তোমার পরিধেয়, চিত্রাত্ম্য তোমার সম্পদ, তোমার মালা নরান্নি নির্মিত,
শাশানি তোমার গৃহ, বুদ্ধ রূপ তোমার বাহন, তোমার কুল নাই, তোমার
চরিত্র অত্যাশ্চর্য্য, কিত্ত সমস্ত দেবগণ তোমার পাদপদ্মে প্রণত ॥ ১৭ ॥

এতেতে বিভবা ময়া হি কথিতা সংসারতাপাপহ,
পূর্ণজ্ঞানময়শ্চ যোগনিধিভিনির্ভ্যো ভবান্ ঘৃষ্যতে ।
ঐশ্রাদীনি পদানি দেবনিবহৈর্লঙ্কানি তে তোষতঃ
নো আনে ভুহিনাচলে চ তবভা কিন্মা তপস্তপ্যতে ॥ ১৮ ॥

হে সংসারতাপহারী দেব! তোমার সমস্ত বিভব তো বলিলাম,
যোগীগণ তোমাকে পূর্ণজ্ঞানময় ও নিত্য বলিষ্ঠা ঘোষণা করেন, দেবগণ
তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া ঐশ্রব্যাদি পদলাভ করিয়াছেন, তথাপি তুমি হিমালয়ে
কি জন্য তপস্যা কর, তাহা আমার বোধগম্য নহে ॥ ১৮ ॥

সপ্তরূপমহীপতিত্বমপি যল্লগ্নেতে দশাস্যঃ পুরা
ব্রহ্মজ্ঞাদিশ্রুতৈশ্চ যং ত্রিভুগভ্যং পূজ্যত্বমাসাদিতম্ ।
পারং বাহ্নি মুহুক্ষবন্ড যং সংসারবারাংগিধেঃ
হেতুস্তত্র ততৈব বণ্ডপরশো কারুণ্যলেশোদরঃ ॥ ১৯ ॥

হে বণ্ড পরশু ! পূর্বে যে দশানন এই সপ্তরূপ মহার অধীশ্বর হই-
য়াছিল, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ যে ত্রিভুবনের পূজ্য হইয়াছেন, মুহুক্ষগণ যে
এই সংসার সমুদ্রের পারে গমন করিতেছেন, ইহার কারণ একমাত্র তোমার
কারুণ্য কণার বিকাশ ॥ ১৯ ॥

স্বঃ মূলপ্রকৃতির্মহানপি তথাহকারূপঃ পুমান্
ভগ্নাত্মানি তথেষ্ট্রিয়ান্যপি ভবান্ স্থলানি কৃতান্যপি ।
যৎকিঞ্চিৎ সমবারিকারণতয়া পণ্যানি বিশ্বস্য চ
স্বতোহন্যরহি ভাতি দেব হৃদয়ে পূর্ণং ত্রেয়দং জগৎ ॥ ২০ ॥

হে দেব ! তুমিই মূল প্রকৃতি, তুমিই মহৎ, তুমি অহংকার, তুমি পুরুষ, তুমি পঞ্চতন্ত্র, তুমি ইন্দ্রিয়, এবং তুমিই স্থলভূত । আমি এই বিধমণ-
লের বাহা কিছু সমবাগিকারণ রূপে দেখিতে পাই, তোমা ভিন্ন আমার স্বদয়ে
আর কিছুই প্রতিভাত হয় না, হে দেব তুমি সমস্ত জগৎ পূর্ণ করিয়া আছ ॥ ২০ ॥

অদ্বৈতো জননাবনপ্রপঞ্চে নরুঃ স্বয়ম্বৃতবান্

বেদান্তেহু পরাশ্রবোধওরুণা বাসেন মৌমাংসিতঃ ।

যোগে যোগফলপ্রদন্ত মুনিনা যোগীশ পক্ষে ভবান্

যজ্ঞানাক ফলপ্রদাননিপুণং ত্বমাজগৌ জৈমিনিঃ ॥ ২১ ॥

হে দেব ! বেদান্তে পরমাত্মজ্ঞানওরু ভগবান্ ব্যাস তোমাকেই অদ্বৈত
স্বষ্টিস্থিতিপ্রলয়সমর্থ স্বয়ম্বু বলিয়া মৌমাংসা করিয়াছেন, হে যোগীশ !
পতঞ্জলি মুনী তোমাকেই যোগের ফলপ্রদানকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
ছেন, এবং মৌমাংসা-প্রণেতা জৈমিনি তোমাকেই যজ্ঞফলদাতা বলিয়া ব্যাখ্যা
করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

পূর্ণানন্তবিশেষ-শূন্যমহমো গোমাহনোমো গুণঃ

সোহপি ব্রহ্মময়স্ততো দগদিবঃ জাগতক সংজ্ঞরতে ।

স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসৌ ধর্মার্গহিতৌ নেত্রারমানৌ চ তে

লোকানাঃ সদস্যং প্রপশ্যত ইমৌ কার্যং হি গৌরীপতে ॥ ২২ ॥

হে গৌরীপতি ! তুমি পূর্ণ অনন্ত নির্বিশেষ, তেজোময়, আকাশ স্বরূপ ;
তোমার যে গুণ শব্দ, সেও ব্রহ্ম স্বরূপ, শুনিয়াছি তাহা হইতে সমস্ত জগৎ
উৎপন্ন হইয়াছে । আকাশমার্গনিহিত চন্দ্র ও স্বর্ঘ্য তোমার নেত্র ; ইহারা
লোকের সদস্য কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

মায়্যা তে পরপুরুষে পরিপতা পট্টৈব স্ততে স্ততান্

কৃতান্ ভূতপতে শুক্লী মিলনাং ভূতং মমেদং বপুঃ ।

চিন্তাদৃশ্যময়ং শাশানসদৃশং শুক্ল শাশানপ্রিয়

নিভ্যং সবিহিতোহত্র মুচ্ছমনস্য সংদৃশাগেনো কথম্ ॥ ২৩ ॥

হে ভূতপতি ! তোমার মায়্যা পরপুরুষে উপপতা হইয়া ভূতস্বরূপ পাঁচটি
পুরু প্রসব করিয়াছে, আমার শরীর সেই পঞ্চভূত নির্মিত, এবং ইহাতে চিন্তা
রূপ দৃশ্য নিরন্তর উদ্ভিত হইতেছে, স্ততরা শাশানসদৃশ, শাশানপ্রিয় তুমিও

এই দেখে সর্দঙ্গা সম্বিহিত রহিয়াছ, তবে মুগ্ধচিত্ত আমি তোমাকে দেখিতে পাই না কেন ? ॥ ৩ ॥

নেত্রং ন চ ব্রহ্মতাং নহি পরং বিষ্ণোঃ পদং প্রার্থ্যতে

নো বা নন্দনকাননে ছয়রবসু সার্থৈরিরংনা মম ।

গচ্ছামো ভবদন্তিকং হি প্রকৃতিং জ্ঞাপ্যৈব পৈশাচিকী-

মিত্যেভদ্ ক্রহিণাদিবলিতপাদে তে নাথ নাথামহে ॥ ১৪ ॥

হে নাথ ! আমি ইন্দ্র ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর পরম পদ প্রার্থনা করি না, কিবা নন্দন কাননে অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিবার আমার বাসনা নাই, ব্রহ্মাদি-দেবগণের বন্দনীয় তোমার চরণে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন অন্তকালে পৈশাচিক প্রকৃতি লাভ করিয়া তোমার নিকট যাই ॥ ১৪ ॥

শ্রমধাধিপ তে চরণৌ ভজতাং

ন ভবন্তি ভবপ্রভবাম্বুগদাঃ

অভিদীনবদ্রালুতয়া স্তময়ে

পরিপাদি অনান্ তত্ততোহি সদা ।

জনতাপরিপালমতংপর হে

পরিতাপহরো ভব মে চ দুখা

ভভমন্ত সতাং ত্রি যে শ্রণতা

সততং ধলুতে স্মৃতনামগদাঃ ॥ ১৫ ॥

হে শ্রমধগণের অধিপতি ! বাহার তোমার চরণ ভজনা করেন, তাঁহার কখন সংসার জন্য রোগ ভোগ করেন না ; তুমি স্বীয় দীনদয়ালুতা ওপে সর্দঙ্গা সকলকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেছ । হে অগঙ্কনপালক ! তুমি আমার পরিতাপ হরণ কর, বাহার নিরন্তর তোমার নিকট শ্রণত ও তোমার নাম ও চরণ মূল অরণ করেন, সেই নাথক ব্যক্তিগণের ভভ হউক ॥ ১৫ ॥

শ্রিকানাই লাল শাস্ত্রী ।

সাবিত্রী ।

বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ত্রয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার-প্রাপ্ত নারী-রচনাগুলি লইয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে । প্রকাশক, সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক, বাবু গোবিন্দলাল দত্ত । সাবিত্রী লাইব্রেরী বা গোবিন্দলাল বাবু কলনার পার্শ্বকদ্বিগের নিকট অপরিস্ফুট নহেন । নানা কারণে তাঁহাদের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার সাধারণ পুস্তকালয়ের মধ্যে এই সাবিত্রী লাইব্রেরী কিরূপ সর্বোচ্চ আদান অধিকার করিয়াছে । আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, শরীতে পল্লীতে যে সাধারণ পুস্তকালয়ের কথা শুনিতে পাঈ, তাহার অধিকাংশই এই লাইব্রেরীর অনু-করণে ও আদর্শে গঠিত । বাঙ্গালার এই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য, অমুঠান ও কার্যপ্রণালী যেমন নূতন, সর্বোৎকৃষ্ট ও উচ্চাধর্মের ; এ পুস্তকখানিও তেমনি নূতন, সর্বোৎকৃষ্ট ও উচ্চাধর্মের হইয়াছে । নূতন—কেন না, লাইব্রেরীতে পঠিত প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে এরূপ ভাবে বাঙ্গালার আর কখন প্রকাশিত হয় নাই । সর্বোৎকৃষ্ট—কেন না, সাহিত্য, কি সমাজ কথা, কি রাজনীতি, কি ধর্মতত্ত্ব সকল বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে ; আমরা জানি, এই সকল বিষয় লইয়া এক এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে একটা ছলমুল পড়িয়া গিয়াছিল । উচ্চাধর্মের—কেন না, বর্তমান বাঙ্গালার সাহিত্যে যে সমস্ত লেখক জানী, বহুদর্শী ও চিন্তাশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁগদিগের দ্বারা এই সকল প্রবন্ধ লিখিত ; এতগুলি উৎকৃষ্ট লেখকের এতগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ একত্রে কোমণ্ড পুস্তকে আমরা দেখি নাই । সাবিত্রী লাইব্রেরী যদি বাঙ্গালার গৌরবের সামগ্রী হয়, এ পুস্তকখানিও অবশ্য সাবিত্রী লাইব্রেরীর গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে ।

পুস্তকে যে কয়েকটি বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা একে একে সংক্ষেপে সেগুলির আলোচনা করিতেছি ।

১। বাঙ্গালা সাহিত্য (বর্তমান শতাব্দীর)—লেখক শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ।
 ইংরেজ ভাষার ওজস্বিতা, লেখার মনোহারিত্ব ও বর্ণনার বিদ্যুৎকরিত গতি
 অতি চমৎকার । বাঙ্গালা ভাষা সেই Transition period হইতে আরম্ভ
 করিয়া শতাব্দীঃ শতাব্দীঃ ক্রিষ্ণ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাই এই প্রস্তাবে দেখান
 হইয়াছে । দেখান হইয়াছে, বহু বংসর পূর্বে মহামতি বীণা সাহেব যে
 বলিয়াছিলেন, "That the Bengalis possess the power, as well as,
 the will to establish a national literature of a very sound and
 good character cannot be denied." সেই মহাবাক্য আজিকার দিনে
 কেমন সুন্দররূপে, অসংখ্য লেখকে, অসংখ্য পুস্তকে, বর্ধার্য কাব্যে পরিণত
 হইয়াছে । এত অল্প দিনের মধ্যে আর কোন দেশের কোন সাহিত্য
 এমন উন্নতিলাভ করে নাই । কিন্তু একটা কথা এই, আজ কাল যে কেহ
 সাহিত্য লিখিতেছেন, সকলেই amateur ; সাহিত্য যতদিন না ব্যবসায়
 হইতেছে,—profession হইতেছে, ততদিন ইহার উন্নতির মূল হৃদয় হই-
 তেছে না । তাহাই বাহাতে হয়, এখন তাহা করা কর্তব্য হইয়াছে । সে
 যে দিন হইবে, সে দিন হরপ্রসাদ বাবুর নাম সকলেই দিবা চক্রে দেখিতে
 পাইবেন যে, "একটি গৌরবাধিত মহা শক্তিমাতৃ মহাজাতি সুপ্রোথিত সিংহের
 নাম উত্তীর্ণ হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে বর্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়ের
 ভগ্ন গান করিতেছে ; আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ঝিনুবে বর্তমান নিঃশব্দ
 বেশহিটৈতরী মহোদয়বিশ্বকে পূজা করিতেছে ।"

২। আমাদের অভাব—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু এই প্রবন্ধের রচয়িতা ।
 আমাদের অভাব অসংখ্য—কি ধর্ম, কি সামাজিকতায়, কি রাজনীতিতে
 সকল বিষয়েই অসংখ্য অভাব । এ অভাব যতদিন না পূরণ হইতেছে,
 ততদিন আমরা প্রকৃত মানুষ হইতে পারিতেছি না, প্রকৃত জাতি বলিয়া
 পরিগণিত হইতে পারিতেছি না । এই প্রবন্ধে কেবল রাজনৈতিক অভাবের
 বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে । সেই অভাব কিদে মোচিত হইতে পারে,
 তাহারও উপায়ের কথা বলা হইয়াছে । ইহার লেখায় পূর্ণ বাবুর প্রগাঢ়
 চিন্তাশীলতার আশ্রয় বিশেষ পরিচয় পাই । স্থানে স্থানে আমাদিগের সচিত
 মতের অর্টনক্য হইলেও আমরা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া প্রীত হইরাছি । পূর্ণ

বাবু বলেন, আমাদের প্রধান অভাব আমাদের জাতীয় চরিত্র-বল। সেই জাতীয় চরিত্রবল সৃষ্টি করিতে হইলে যুরোপীয় সমাজের মধ্যশ্রেণীর ন্যায় ভারতে একটা মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি নিত্য আবশ্যক। জ্ঞান ও শিক্ষার রাজ্য বিস্তার করা বিশেষ প্রয়োজন। “আমাদিগের অভাব মোচনের হৃদ্যপাক-মাত্র হইয়াছে। যে দিবসের আলোকে আমরা প্রভাপিত হইব, তাহার প্রভাত-রশ্মি দেখা দিয়াছে।”

৩। হিন্দুপত্নী

৪। বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য।

} লেখক—খ্রীষ্টকাল চন্দ্রনাথ বসু।

একরূপ সরস, সারগর্ভ, সূক্ষ্মপূর্ণ ও ভাবুকতাময় প্রবন্ধ আমরা অল্পই পাঠ করিয়াছি। আশ্চর্যের কথা, শুনিতে পাই, অনেকে ইহাতে কবিত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। বাহারা হিন্দু হইয়াও হিন্দু নহেন, বাহারা সংসারে থাকিয়াও সংসারের ধার ধারেন না, কেবল কল্পনার পাখার চাপিয়া বাহারা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ান, কলেজের উচ্চ মস্তিষ্ক সংসার-বাহুহিম্মোলে আলো বাহাদের শীতল হয় নাই, তাহারা বাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন; কিন্তু যে হিন্দু, যে সামাজিক, যে সংসারী, সে ইহা পড়িবারাত্র নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে, লেখকের তীক্ষ্ণ শীর্ষাঙ্গী ও গভীর আলোচনাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ভগবান সমুদ্র বচন উদ্ধৃত করিয়া, চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাস্রমকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়া, গৃহস্থাস্রমের অসংখ্য শালিনীর কর্তব্য রক্ষার জন্য ভার্য্যাগ্রহণের বিরূপ বিশেষ আবশ্যকতা, এবং যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র সেই বিবাহে পত্নী কি বস্তু, লেখক তাহা সুন্দররূপে সরল ভাষায় ধীরে ধীরে বুকাইয়াছেন। তাহা বুকাইতে গিয়া, ইংরাজী কোর্টসিপ্ প্রথা হইতে হিন্দু কন্যা-নির্দোষ প্রণালী কত উচ্চতরের তাহা দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, ইংরাজ-বিবাহ যেমন চুক্তি—contract মাত্র, হিন্দু-বিবাহ তাহা নহে, হিন্দু-বিবাহের অর্থ খ্রীষ্টপুঙ্খবে একীকরণ। “ধর্ম্মচর্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। * * * সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে

অপরিমেয় দয়া, পর্য, শক্তি, এবং সহিত্বতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ
জ্ঞাতীন চিন্তা গৃহস্থান্ত্রমেব ভিত্তিকরূপে ভাষ্যাক্রপা মগদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া
গিয়াছেন । হিন্দু-ভাষার অর্থ তাই । হিন্দু-ভাষায় কি সামান্য জিনিস ।
যে হিন্দুপতীর এতদূর মহিমা, সামান্যতঃ তর্ক পাড়িয়া তুচ্ছ স্বাধীনতার
স্বনিম্নে বাহ্যিক তাহাদিগের সেই দেবর লোপ করিবার চেষ্টা পায়, হে
রমণীগণ, তাহাদিগের জন্য কি ভোমাদিগের অভিশাপ নাট ?

হিন্দুপতী যখন এমনই জিনিস, তখন যাহাতে সে ইহার উপযোগী হয়
তাহা করা উচিত । তাহার কর্তব্যের ক্ষেত্র দূর বিস্তৃত ; বিবাহ-সম্বন্ধে যে
দিন সে স্বামীর সহিত মিলিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার মস্তকে কর্তব্যের
বোকা চাপান হইয়া থাকে । সে কর্তব্য পালনের জন্য শিক্ষা আবশ্যিক ।
সকলকে জানেন, বেশী বয়সে শিক্ষা ভাল হয় না । শিক্ষার আরম্ভ কাল
শৈশব সময় । তখন প্রকৃতি নরম এবং কোমল থাকে, যেরূপ ছাঁচে ঢালা
যায় সেইরূপ গঠন প্রাপ্ত হয় । নহিলে, “কাঁচায় না মুখালে দাঁশ, পাকার
করে ট্যাস ট্যাস ।” শিশুর স্বাভাবিক দুরের ক্রন্দন, যে কন্যার অধিক বয়সে
বিবাহ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাহার ট্যাস ট্যাসানির জ্বালায়
তাহার স্বামীকে পর্যন্ত অগ্নির হুঁতয়া উঠিতে হয় । হিন্দুপতী ইংরাজ-পত্নী
নয়, শুধু স্বামীকে লইয়া তাহার গৃহধর্ম নয়, বিবাহ কালে তাহাকে মন্ত্র পাঠ
করিতে হয়—

ওঁ সত্ৰাজ্ঞী শত্রে তব, সত্ৰাজ্ঞী শত্ৰাঃ তব ।

ননন্দরি চ সত্ৰাজ্ঞী তব, সত্ৰাজ্ঞী অদিপদেবু ।”

আর বরের সহিত কন্যার কি সম্পর্ক ? বর কন্যাকে বলেন,

“প্রাণৈশ্চ জ্ঞানান্ সন্দধামি অস্ত্রিভিরস্বীনি

মাহুসৈরমাঃসানি তুচা বচম ।”

—পতি পত্নীর এমন মিলন—এমন একত্ব আর কোন দেশে কোন শাস্ত্রে
কল্পিত হয় নাই । হুতরাং যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, আপনার
পরিবার মধ্যে মিশাইতে হইবে, তাহার শিশু হওয়া আবশ্যিক ; আর যে
তাহাকে এই সব মহৎ বিষয় শিক্ষা দিবে, তাহার জ্ঞানবান ও পরিণতবয়স্ক
হওয়া উচিত । তাই শাস্ত্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কন্যার শৈশবাবস্থায় বিবাহ

দিয়ে, কিন্তু পুরুষ লক্ষ্যের্য ব্রত সারিয়া জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবে। ইহা শাস্ত্রের কথা। উড়াইয়া দিবার ইহাতে কিছুই নাই। চন্দ্রনাথ বাবু তাহাই একে একে বুঝাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবুর পুর্ণে মান-নীয় ভূদেব বাবুও তাহার “পারিবারিক প্রবন্ধে” এ কথাটা অনেক করিয়া বুঝাইয়াছেন। কিন্তু যে বুকিলেও বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবে কে? আজকালের অনেক ইংরাজিনবীণ শাস্ত্র মানেন না, মানিলেও দেশকাল পাত্রের যুক্তি পাড়িয়া এ কথাটা মানিতে চাহেন না। না মামুন, কিন্তু তর্ক পরিভ্যাগ করিয়া আমরা একবার তাহানিকে আজকালকার হিন্দুর পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া তাহার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে অহরোধ কবি। কি দেখিবেন? গৃহে গৃহে কলহ, গৃহে গৃহে অশান্তি—পত্নী পতিকে মানে না, বো খাণ্ডী ননরের উপর কর্তৃত্ব করে, আত্মীয় স্বজন কেহ বাড়ীতে হান পায় না, কথার কথায় ভাই ভাইয়ে বিবাহ বাধে। দেখিবেন, সে পাল পার্শ্বগ উঠিয়া গিয়াছে, সালগ্রাম শিলার পূজা হয় না, ভিখারী ভিক্ষা পায় না, অতিথি অভূক্ত কিরিয়া যায়। সে স্বর্ণের দৃশ্য আর নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে আছে কি? আছে, সভ্যতা, স্বাধীনতা, শিক্ষাভিমান বাতির চটক, আর রোগ! আছে, নরকের আবর্জনা ও পুরীষগন্ধ। সকল ঘরেই যে এইরূপ তাহা বলি না। কিন্তু ইহা ঠিক, যেখানে এ দৃশ্য নাই সেদূর সংসার অতি বিরল। যাহা দেখা যায় তাহার তুলনার নগণ্য মাত্র। জিজ্ঞাসা কবি, কেন এমন হয়? এখন বেটা বিয়ে করিয়া আসিলেই কেন মা পর হইয়া যায়? দোষ কাহার? ভাব দেখি, বুক দেখি, তর্কের কচুকি তুলিয়া রাখিয়া একবার সত্যের আলোচনা কর দেখি। একটা সত্যের কথা বলি। আর রুদ্ৰমাবাইয়ের আশ্চর্য্য ব্যাপার লইয়া দেখে কি না আন্দোলন চলিতেছে! কেন এমন হইতেছে? সার লেপেল গ্রিফিন এই সূত্র ধরিয়া বাল্যবিবাহ দোষাবহ বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিতে মত্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শোন দেখি, যে অন্য তাহারই স্বজাতীয় একজন তত্ত্বতরে তাঁগকে কি বলিতেছেন,—

—“We regret to see that the abolition of infant marriage is being mixed up with Rukhmabhai's grievance, *most unwisely*. * * * The evils that attend it are so conspicuous to foreigners and even to Englishmen themselves that to attempt to introduce it by law into India, would be

absolute insanity. We know well also that the unfettered choice of young persons in selecting their wives and husbands, as practised in England and America, is regarded by the Continental nations as attended with so much evil, that in Italy, Spain, France and even Germany, it is regarded as an abuse.

STATESMAN—13th April, 1887.

ইহুর পর আরও কি কিছু বলিতে হইবে ? অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হিন্দুরা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, তোমার আঘাত তাহা হঠাৎ উপেক্ষা করা উচিত নহে। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে কিছুই বলেন নাই, তিনি সেই শাস্ত্রের কথাই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাই তাঁহার প্রবন্ধ এত সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ হইয়াছে। উপহাস না করিয়া—উপহাস করিবার ইচ্ছাতে কিছুই নাই, কেবল কবিতা নয়, সকলই সহজ সত্য—উপহাস না করিয়া আভিকার দিবে এ প্রবন্ধ দুইটা সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্তব্য।

৫। অকালকুম্ভাও

৬। হাতে কলমে

} শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভাশালী কবি,

তাঁহার লেখনী রসময়ী, কবিতাময়ী। এ দুইটা প্রবন্ধ তাঁহার রচিত, দুইটা প্রবন্ধই রস ও কবিতা পূর্ণ। তিনি বাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা তাহা তিনি যে ভাষায় বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার সর্বত্রই কবিত্বের সৌরভ বহিতেছে ; রসের লহরী ফৌড়া করিতেছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলেন, আমাদের আভিকারকার সাহিত্যটা আর কিছুই নয়, অকাল কুম্ভাও যাত্রা, অসময়ে কন্দিয়াছে, অসময়ে মরিবে। বলেন, “আমাদের এ সাহিত্য প্রতিফলিত রূপে হইয়া উঠিতেছে ! চারিদিকে একটা আওয়াজ ভেঁ।ভেঁ। করিতেছে যাত্রা, কিন্তু তাহা মাহুষের কর্তব্য নহে, জগতের কথা নহে।” সাহিত্যে যোগান দেওয়ার পদ্ধতিটাকেও তিনি বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর কবিত্বের মূর্ত্ত হইলেও আমরা তাঁহার সকল কথায় সাহায্য দিতে পারি না। যে সাহিত্যে “পুষ্পাঞ্জলি” জন্মিয়াছে, যে সাহিত্যে “কপাল কুণ্ডলা” “বিষকৃক” “চন্দ্রশেখর” ও “কৃষ্ণকান্তের উইল” কল্পিয়াছে, যে সাহিত্যে “সারস্বতচরিত” ও “ভানুসিংহের পঞ্চাবলী” গীত হইয়াছে, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ও অক্ষয়কুমার বাহার

কবি, বর্তমান সমালোচ্য পুস্তকের মনীষাদম্পন্ন লেখকগণ, এবং আরও অনেক চিত্রাশীল কৃতবিদ্যা ব্যক্তিগণ যে সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আমরা একেবারে তাহাকে অকালকুয়াণ্ড বলিতে পারি না। তবে, অনেক আবর্জনা ঢুকিয়াছে বটে। আশা আছে, তাহা সময়ে সংস্কৃত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু দেখাইতেছেন, আমাদের দেশে কাজ নাই কিন্তু কাজের ভাণ খুব আছে। আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়ই বাড়িয়াছে! কথার কথার সভা, সমিতি, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন। কিন্তু কাজের বেলা সব ফকিকার। সকলেই বলিতেছেন agitate কর—publicকে সব জানাও। কিন্তু কেবল agitate করার কি ফল তাহা জানি না। public কে—পব্লিকের অস্তিত্ব কোথার তাহা বুঝি না। আমাদের দেশে পব্লিক বলিয়া কেহ নাই, ভোগার agitationএ মাতিবে কে? কিন্তু পব্লিকের অস্তিত্ব আবশ্যক। আগে তাহা গঠন করা প্রয়োজন। তাহা গঠিবে কি উপায়ে? “সে কেবল পরস্পরকে সাধায়া করিয়া। হাতে কলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া” লোকে কাজ দেখিরা লিখিবে, কথার লিখিবে না। কথার কোন কালেই চিড়া ভেঙ্গে না। “আর কিছু না, সেই গহপ্রতিষ্ঠা, বদেনে সেই বদেন-প্রতিষ্ঠা, বদেনীয়েই প্রতি বদেনীয়েই বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ভ্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।” নচেৎ, বাক্য-সম্পাদক স্বার্থট বলিয়াছেন—“যেখানে কেবল বাবদুকতার প্রভাব, সেখানে সাধনা নাই, দিকি নাই”

৭। সোণার কাটি রূপার কাটি

৮। সোণার সোহাগা

} শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জন

উচ্চতরের দার্শনিক, সমাজতত্ত্বেও তিনি বিশেষ পটু—সেই পটুতার ফল এই দুইটা প্রবন্ধ। ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা তাঁহার বিলক্ষণ আছে। তিনি বৈরাগ্য ব্যঙ্গোক্তিভে এই দুই বিষয় লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকলের বিশেষ শিক্ষা লাভ করা উচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবু কেবল ব্যঙ্গ করিবার জন্যই এ প্রবন্ধ দ্বয়ের অবতারণা করেন নাই, তাঁহার লক্ষ্যে যে গভীর বেদনা তাড়াই জানান তাঁহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কি সকল হইবে না? বাদালী আর্জও

কি আভিষ্ম ভুলিয়া, মাতৃভাষা ভুলিয়া, আপনার পোশাক ছাড়িয়া পরেব অঙ্কুরণ করিবে, পরের বুলি বলিবে, পরের পোশাক পরিবে ? বাঙ্গালী কি বাঙ্গালী চাইবে না ? বাহারা নিতান্ত অসভ্য, পণ্ডসহচর, বনবাসী, মৃগশাজীবী তাহাদিগকে আর কতকগুলি বাঙ্গালীকে একত্র একজন বিদেশীয় আগন্তকের নিকট দাঁক করাও দেখি ; সে সেই অসভ্য বনাদিগকেও একজাতি বলিয়া মনেই বৃদ্ধিতে পারিবে, কিন্তু বাঙ্গালীদিগকে কখন একজাতি বলিয়া চিনিবে না। কিসে চিনিবে ? পিতা পুত্রকে লিঙ্কাসা করিতেছেন, “কেমন আভ বাবা ?” পুত্র উত্তর দিতেছেন “all right, papa” পিতার পরণে সাধা ধুতি, পায়ে নানাবলি মাথায় আর্ককলা ; পুত্রের পরিধানে পেটোলুন, গারে কোট, মাথায় হ্যাট ! তবে বাঙ্গালী জাতি কি প্রকার জীব সে কেমন করিয়া চিনিবে ! এক জন চীনেম্যানে ও একজন ইংরাজে যে প্রভেদ, ভাষার, পরিচ্ছদের, চলনে, বলনে পিতা পুত্র সেই প্রভেদ। হি হি ! অনেকে আবার ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে বান ! ইংরাজি অনেকেই শিখিতেছে, কিন্তু এমন করিয়া আর কেহই চলায় না। সে দিন Congress উপলক্ষে নানা দেশের নানা জাতীয় অসংখ্য কৃতবিদ্যের মহাসমিলন হইয়াছিল। ভাষানিগের মধ্যে কত অগাধবিদ্যা মহা মহা পণ্ডিত আদিরাহিলেন। বাঙ্গালার বাহারা গ্যারিবল্ডি ভাষারা ইংরাজিতে বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা ভাষানিগের সম্বন্ধে ইংরাজিতে ভেদন করিয়া কথা কহিতে পারেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই সব পণ্ডিত আপনাদের জাতীয় পরিচ্ছদেই ভূষিত। কাহারও পরণে সেই চুড়িদার পাগড়ীয়া, কাহারও মাথায় সেই প্রকাণ্ড পাগড়ি—কাহারও পায়ে সেট লকাবার জুতা। ভাষারা কি হ্যাটকোট পরিতে পারেন না ? না, ভাষানিগের অপেক্ষা বিদ্যার ও সভ্যতার কিছু কম ? হুটা ইংরাজি শিখিয়া যে আপনার আভিষ্ম ভুলিতে চায়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে ? হি ! ইহার উত্তরে আর যুক্তির কথা পাড়িও না। যিনি বেকরপ বুদ্ধি বলিবেন, দ্বিপেন্স বাবু তাহা সকলেরই স্মরণ যীমাংসা করিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া কি ইংরাজের দেখিবা অঙ্কুরণ করিবার কিছুই নাই ? আছে বৈ কি। পর প্রবন্ধে তাহারই কথা এনি আলোচনা করিয়াছেন। তাহাই ভিনি বলিয়াছেন, “আমরা যদি স্বদেশের জন্ম, স্বজাতির স্বভাবিত

অপ্যাহত রাশিরা তৎকাল-শক্তি আগ্রসাহ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের জনের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোণার লোহাগা করিয়া তুলে।” “তাহা হইলে আমাদের আত্ম-গৌরব বজায় থাকিবে, তন্ত্রি আমদের দেশের মস্তকে ও বাহ্যে শক্তির সফার হইয়া তাহার মুখমুখী নৃতন হইয়া উঠিবে।”

২। হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ তত্ত্বা উচিত কি না—লেখক খ্রীস্টীয় অক্ষর চন্দ্র সরকার। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। অধিক বলা নিম্নবোধন। এক দিন টহা লটরা দেশময় মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। কাগজে কাগজে, পত্রিতে পত্রিতে অনেক তর্ক, অনেক বিচার, অনেক শাস্ত্রমীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলিতে ভাল। বিষয়টা অতি গুরুতর, বিচার করিতে গিয়া অনেক সময়ে মহা মহা পণ্ডিতও নিরীক হইয়া যান। অক্ষর বাণু নায়ে হতদূর পণ্ডিত নহেন, কিন্তু শাস্ত্রের পল অনুসরণ করিয়া অতি সোজা কথায় এমনি ভাবে তিনি ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে পড়িলে আর কোন পণ্ডিতের কোন বৃত্তিই মনে লাগে না। অক্ষর বাণুব মতে মত ভিত্তেই হয়। লেখকের ইহা সামান্য কথ্যতা নহে। অক্ষর বাণুর ভাষায় আমরা চিরকাল প্রবণতা করিয়া থাকি, তাঁহার ভাষায় যোহিনী শক্তি; সেট যোহিনী ভাষায় এ প্রবন্ধ লিখিত। সুতরাং পাঠক সতর্কতাই মুক্ত। তিনি দেশ-ভিত্তিক, হিন্দুধর্মের বিবাহ যৌতুর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। বিবাহকালে কন্যা ক্রন্দনকৃত্তকে সাক্ষী করিয়া বলেন—

“ক্রবমসি ক্রবাসং।

পহিকূলে ভূতাসম্ ॥”

—যে হিন্দুপত্নীকে পতিকূলে অচলা থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, সে কি কখন পতিকূল ত্যাগ করিতে পারে। যে বিবাহের অর্থ, জন্মে জন্মে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মার আত্মার মিল, স্বাধীর পরলোক গমনে কখন সে বিনাহবন্ধন কি ভিন্ন হইতে পারে? তবে, অনেক পরামর্শের “নটে নৃত্যে” মোকের গোড়াই দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বৃত্তা উচিত, সে স্বেচ্ছা যেমন আছে, তেমনি টহাও আছে যে,

“প্রসুতিরেবা কৃতানাং নিবৃতিস্ত মণাকলা।”

এখন দেখিতে হইবে কোনটা শ্রেয়? অবশ্য, মুখ্য ব্যবস্থার কাছে গৌণ ব্যবস্থা কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে পুনর্নির্বাচন করে, সে শুধু কেবল আপনার জন্যই বিব্রত, নিকট বৃত্তির ঘোরতর বশীভূত, আর যে নারী মৃত স্বামীর অলুপ্তান করিয়া, বিনামূল্যে সংসারের সেবা করিয়া অশ্রুচর্য্য অঙ্কন করিতে পারেন, তিনি নারী হইয়াও দেবী। বল দেখি, কোন মূর্ত্তি ভাল? যে স্বার্থ সত্যী নারী, সে কি কখন পুনর্নির্বাচনের নাম মুখে আনিতে পারে? “চিন্তানারী জ্ঞানেন, কেবল একং এবং অধীযং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী, সেই পতি স্বধন ত্রক্ষেণীন হইবেন, কাজেই তিনি অশ্রুচারিণী।” স্মৃত্যঃ অশ্রুচর্য্য ভিন্ন হিন্দুবিধবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর নাই। অশ্রুচর্য্যের কঠোরতার কথা কেহ কেহ তুলিতে পারেন। অক্ষয় বাবু দে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, বলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার উত্তরে মোটামুটি এই বলি যে, সকল কাজেই সাধিলে সিদ্ধি। আমরা যদি রমনীদিগকে পোড়া হইতে তাহার উপযোগিনী করিতে পারি তাহা হইলে আর একদা ভাবিতে হয় না। নচেৎ যে পিতা কন্যাকে মেয়ের পোশাক পরাইয়া, চা কুটী খাওয়াইয়া, গড়ের মাঠের বায়ু সেবন করাইয়া তাহার শৈশব হইতেই তাহাকে ঘোর বাবু ও বিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন, সে পিতাকে অবশ্য সে কন্যার জন্য একটু ভাবিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু দোষ কন্যার না পিতার? যিনি সকল দোষ কন্যার খাড়ে চাপাইয়া আপনি সাক্ষী হইতে চান, তিনি ঘোরতর অধর্ম্মী। তাই বলি, শৈশব হইতেই কন্যাগণকে অশ্রুচর্য্যের উপযোগিনী করিলে ভবিষ্যতে আর কোন ভাবিতে হয় না। যে হস্তাধিনীদিগের একবার কপাল পুড়িয়াছে, তাহা-দিগকে পোড়ার উপর আর পুড়িতে হয় না।

১০। হিন্দুস্তানীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে। লেখক শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে। তিনিয়াছিলাম, বীরেশ্বরবাবু যখন এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তখন তাহাকে অনেকের ভ্রূকুটী, অনেকের অসন্তুষ্টি, অনেকের গালিগালাচি সহিতে হইয়াছিল, বীরেশ্বরবাবু এ প্রবন্ধ লিখিয়া কি এমন মহৎ অপরাধ করিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দেখিরা আশ্চর্য্য হইলাম, পরিকার সরল লেখক, পরিকার সরল সত্য,

তবে কেন তিনি অগ্রসরভাবনাইলেন বৃষ্টিতে পারি না। নানা বিষয়ে হিন্দু জাতির অধঃপতন ঘটনাছে; কিন্তু তাহার কারণ বাহাই হউক, হিন্দু জাতি-নীতি নহে—অনেকে তাহা না বুঝিয়া হিন্দু জাতি-নীতি ওলাকে একেবারে ঘুণে ধরা কালের ব্যতির বলিয়া দেখাইতে নির্দোষন দিবার জন্য কত সংকল্প হইয়াছেন, এবং তাহার স্বপ্নে বিগত হইতে ভাল ভাল ঐতিহ্য-নীতির আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিতেছেন—বীরেশ্বর বাবু তাহাই তাহাদের জুল দেখাইয়া গোটাকতক গভী কথ্য বলিয়াছেন। তবে ইহা সত্য, যে কাণা তাহাকে কাণা বলিলে রাগে, যে জুল করে তাহার জুল দেখাইয়া দিলে জলিয়া উঠে; বৃষ্টি, তাই বীরেশ্বর বাবু কতকগুলি লোকের বিষমজরে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যিনি বাহাই বলুন, তাহার বুঝা উচিত, তাহার অপেক্ষা সমাজ অনেক বড়, দেশ অনেক বড়। সমাজের কাছে—দেশের কাছে তিনি উনি কে? যে সেই সমাজের হিতের জন্য—সেই দেশের হিতের জন্য কিছু বলিবে, সে যাব-তার ব্যক্তি বিশেষের তুষ্টি অতুষ্টি উপর নির্ভর করিবে কেন? বীরেশ্বর বাবুর কথা দুই এক জনের পক্ষে ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু তাহা সমাজের পক্ষে—এ অধঃপতিত দেশের পক্ষে বড়ই হিতকরী। তিনি হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রথা, অপরোধ-প্রথা, জাহাজে প্রথা প্রভৃতি কুট সমাজতত্ত্বগুলি একে একে মীমাংসা করিয়াছেন। মীমাংসা করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহা কখন অবাস্থ্যকর ও অপ্রতজনক নহে, হিন্দুজাতিরই তাহা প্রতিপাদ্য—পরিত্যজ্য নহে। নবায়ন যখন এই সকল চিরশাস্তিপ্রদ নিয়ম তুচ্ছ করিয়া বিলাতী প্রথার অনুবর্তী হইতেছেন, কাণেই এই বিষয় তলিত মীমাংসাকালে তাহাকে সেই বিলাতী প্রথারও কথা পাড়িতে হইয়াছে। না পাড়িলে চলে না। তুলনার সমালোচনা না করিলে কে ভাল, কে মন্দ তাহা লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা এই, বীরেশ্বর বাবু তুলনার সময়ে বিলাতী প্রথার ঘোষ সম্বন্ধে কিছু বেশী বলিয়াছেন। মাত্র John Bull পুস্তকখানি অবলম্বন করিয়া কেবল ঘোষভাঃগেরই বর্ণনা করা ততটা ভাল হয় নাই। কোন বিষয়ের দুই দিক্ত ভালরূপ আলোচনা না করিলে তাহার ঠিক বিচার হয় না। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কথা। নচেৎ শ্যামকে রান অপেক্ষা ভাল বলিতেই হইবে, বলিয়া, কেবল কি শ্যামের গুণের কথা, আর রাজ্যের

দোষের কথা উল্লেখ করিতে হইলে ? উভয়েরই দোষ এতের কথা না বলিলে ঠিক বিচার হয় না। বীরেশ্বর বাবু সেইরূপ করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী আঃ ও সর্দার-হন্দর হইত। তাঁহার আলোচনাক্রমে আমরা সম্যক্ প্রসংসা করি।

১১। বালাবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা

• ১২। প্রাচীন ও আধুনিক শ্রীশঙ্কর প্রভেদ

হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না

শ্রীমতী শ্যামা-
সুন্দরী দেবী
এই তিনটি
প্রবন্ধের রচ-
য়িত্রী। এই

কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রতিবারেই বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন লেখিকা প্রবেশ
প্রতিবারেই ইহার রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার ইনি লাইব্রেরী হইতে ২৫
করিয়া পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ কয়টি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা অধিক
বলিতে চাহি না। যে দেশের রমণী এই সকল জটিল সমাজরহস্য এমন
সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া এমন গবেষণা, চিন্তাশীলতা, আলোচনাক্রম
ও লিপিচাক্ষুর্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধ-
কারময় নহে, আশা রৌদ্রলগ্নের মৃগতৃক্ষিকা নহে, তাহার উন্নতি অন্বয়বর্ত্তিনী।

পুস্তকখানি বাস্তবিক রত্নভাণ্ডার বিশেষ। যিনি এতগুলি উচ্চ শ্রেণীর
লেখকের এতগুলি উৎকৃষ্ট জ্ঞানপত্র ও উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ একত্রে পাঠ করিতে
ইচ্ছা করেন, বাঙালী সাহিত্যে যাহার অনুরাগ আছে, তাহাদিগের প্রত্যেক
কেই এই পুস্তকখানি এক একবার পাঠ করা কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবে-
শিকা পরীক্ষার জন্য প্রতি বৎসরেই এক এক খানি বাঙ্গালী কোর্স নির্ধারিত
হইয়া থাকে; অধ্যাপকগণকে সিজ্ঞাসা করি, সেই এ-ও-তা হাবড়াহাটির পরি-
বর্ত্তে এই সারগর্ভ—সকলের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ—পুস্তকখানি
নির্বাচন করিলে কি ভাল হয় না ?

১২৯৩—বিদায়।

শেষ ।

১২৯৩'র আজ শেষ যাদ। তাগাও যার—যার। বৈশাখের কি জামি
কিসের এক জ্ঞান-পূর্ণ মধুর বাতাস, যুগান্ত সুন্দরীর মোহমত্তমাণা

স্বকোমল অকুট হাসির মতন, কতদিনের হারান স্মৃতির কোমল
 স্পর্শের মতন, স্বপ্ন-পক্ষ-সঞ্চারেণ এক একবার আসিয়া, আবার কি ভাবিয়া
 কেঁধার চলিয়া যাইতেছে। অগতের মহাপুণ্ডে—চারি দিকে—আজ কি
 মত্ততার তরঙ্গ—কি গীত-উচ্ছ্বাস! আজ যেন প্রকৃতির নব বেশ। চারিদিক
 হইতে কেমন এক নূতন কল্পনা—নূতন দীপ্তি—নূতন অক্ষর—নূতন জীবনের
 মধুর আনন্দময় কনক-কিরণ ফুটিয়া উঠিতেছে। জ্ঞান-কঠোর শীতের
 সেট মৃত-প্রাণ, ক্ষুধি-হীন, উত্তেজনা-রহিত, পীড়িত ভাব—দিন—মরিয়
 আসিতেছে। পৃথিবী সুড়িয়া বোধাতীত এক বিরাট সংগীত আরম্ভ হই-
 য়াছে। নববিবাহ-উৎসব—অগতে আজ যেন নববিবাহ-উৎসবের মহাদুম
 পড়িয়াছে। নূতন বধূকে সাধরণস্তাষণ করিবার জন্য আজ যেন অগতের
 সকল নোকের সাজগম্ভা—এত দোঁড়াদোঁড়ি—এত জ্বর-উচ্ছ্বাস—এত
 আতুল নিশ্বাস। বুকিয়াতি, প্রকৃতি-রহস্য বুকিয়াতি। বুকিয়াতি, বৃদ্ধ
 পুরাতন ১০ আণের চামি-খেলা লাগ করিয়া—তাহার স্মৃতি মাত্র রাখিয়া—
 অনন্ত অতীত-দেশে চিরদিনের মতন বিদায় লইয়া যাউতেছে। নূতন '১৪,
 আনন্দের আকুলতা—স্বপ্নের কোলাহল—প্রাণের বাসনা ও পিপাসা লইয়া,
 প্রকৃতির চারি দিকে মাহার জাল পাতিয়া, হাস্যমুখে আসিতেছে। বুকিয়াতি
 পুরাতন '২০-ফুল, শুকাইয়া, প্রেমের হাসি অসম্পূর্ণ রাখিয়া, নীরবে করিয়া
 অদৃশ্য হইতেছে। নূতন ২৪-ফুল, ফুটিয়া আবার সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া,
 আলো করিতে, অক্ষরবারি মুছাইতে, অগ্রসর। মরি কি স্বন্দর,—কাধার
 মুখে হাসি।—বিরহের ভিতরে প্রেম। কি স্বন্দর। ইহা প্রকৃতির নিয়ম।
 Nature abhors vacuum—শূন্য কিছুই থাকে না। প্রকৃতি কণ্ঠাঙ্কিত—
 কণ্ঠরূপিনী। প্রকৃতি, মাতা। প্রকৃতির অদৃশ্য গর্ভে রাসায়নিক আকর্ষণ
 বিশ্লেষণ-কার্য অবিরাম হইতেছে। প্রকৃতির কার্য-বিবাহ নাই। কার্য
 চলিতেছে। তাহার ফল কি, তাহা কে জানে? কে বলিতে পারে? এ
 প্রকৃতি-কার্যের নিবৃত্তি কবে হইবে? কখন হইবে কি?

আজ, মগেন্দ্র-২০'রও শেষ। আজ মগেন্দ্র, ১৪। আজ তাহার নূতন
 বংশর। জীবন পুষ্টকের পাতা আর একখানি বাড়িল। শেষের সিঁড়িতে
 একদল অগ্রসর হইল। শুক ২০'র পাতাখানি, দেখিতে দেখিতে, ৩৬৫ দিন
 পূর্ণ করিয়া—কত ফুল ফুটাইয়া আবার কত ফুল চিরদিনের মতন খরাইয়া—
 কত বসন্ত-মুকুলের অক্ষরবারি চিরদিনের মতন স্তম্ভন করিয়া, কত গৃহে
 আনন্দের বাণীর তান তুলিয়া, অগতের চোখের উপর দিয়া, অতি ক্রীণ
 পদক্ষেপে, বিরতিবির পপ্পজাত উৎসাহ ছায়াময় মুখ চকিত হাসির
 ম্যায়, অনীম অতীত গর্ভে মিলাইল। আগ! সে বড় সুখে গিয়াছে।
 তাহাকে অগৎ বিদায় করিয়া দিয়াছে। অগৎ সেই নির্বাপিত, স্মৃতি-

অবশিষ্ট গত অতীত দৃশ্যের উপর এক অজ্ঞকারনর শাষণ বহনিকা ফেলিয়া তাহা পৃষ্ঠে নৃতনের শত-চিত্রমণী দ্যোতিধর পট হাসিতে হাসিতে আঁকিতেছে। দেখ, বৃদ্ধ ৯৩ দিন দিন ক্ষয় পাপ্ত হইয়া ক্রমে, ৯৭ এ মিলিয়া গেল। আর নগেন্দ্র ? তাহার কি ? তাহার সমস্তই বিপরীত তাহার জীবন-পুস্তকের অতীত পাতার সঙ্গে পূর্বের এষ্ট নূতন পাতার মিল কিছুই নাই ! যেন ইহা একখানা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পুস্তকের পাতা। তাহার জীবন-পুস্তক এইরূপই বটে। দেখ, ইহার মিল কোথাও নাই ! সে জীবন সহস্র প্রকারের। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীপূর্ণ। তাহা আগা-গোড়া গোলমালে ভরা—শূন্যবাহিত—ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গ পূর্ণ ! যেন একটা অজ্ঞ-আলোচনার কতকগুলো জ্বলের সমষ্টি। হায় ! তোমরা কেহ কি তাহার জ্বল মিলাইয়া দিতে পার ?

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর সমাপ্ত হইল। আবার বৎসরে বৎসরে আস্ত হু বৎসর। সেই আদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—শূন্য ! আশার আশোক নির্মলিপিত ! হায় ! কে বলে জীবন স্রবের ? জীবন ধ্রুবের ! যে একটি তারকা, হুই বৎসর পূর্বে জীবন-আকাশ উজ্জ্বল করিয়া, শত দ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া হাসিতেছিল, আজ তাহা কোথায় গেল ? কেমন করিয়া গেল ? ঐ নীলিমাগদী শত হুগ-মাথা চিরহাস্যময় নীরব আকাশের কোলে কি—সমস্ত রাত্রি কাগিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ? কৈ, আর কোন তারকা ত ঘুমায় নাই ! সব তারাই ত কাগিয়া ! কেবল আমার তারকাটিই অদৃশ্য হইল ? সে পরতের প্রেমমগ্ন তারা, আমার এই শূন্য প্রাণে কত নূতন স্বপ্ন, কত নূতন সৌন্দর্য্য, কত নূতন গান, কত নূতন কবিতা, হাসিতে হাসিতে, হৃদয় করিতেছিল ? তার ! সে যে আমার জীবন ছিল ! ১২৯১ আমার সে তারা ! সেই '৯১-তারকাই আমার এ জীবন ফুটাইয়াছিল ! সে '৯১-তারকা আজ কোথায় গেল ! হায় ! এইরূপ, একটর পর আর একটি করিয়া, আমার সব তারাই ত ধগিয়া ঘাইতেছে ! হায় ! জগতে আমার পরিসর কমিয়া আসিতেছে কেন ? আমার সব মেহের বাড়ী ভাঙিয়া পড়িতেছে কেন ? আমি জগৎ-তরুতলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি কেন ?

১২৯১, কখন বুঝিতে পারি নাই। তাহা একটা স্বপ্ন ছিল। তাহা আমার জীবনের দৃষ্টি—ভুল। যেন একটা হাবান পরিচিত গলার দূরগত সম্পূর্ণ গান। নব বলন্ত। অপরিচিত মেহের স্পর্শ। বাগালির হুগোৎসব। Shelly'র Epipsychidion'র "sweet spirit" এমিলি। হায়, বৎসর বহু ঘাইতেছে—অগস্ত হইতেছে, ১১ ও ১২ পিছাইয়া দূরবর্তী হইতেছে। তবে কি, ১১, ১২'র জন্য গিয়াছে ? ১১, ১১'র নহে। তাই গিয়াছে ? ১২ হইয়া থাকা তাহার সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাও কি হু ? পুরাতনের নূতনত্ব—

মৃতের জীবন—কোথায়? নির্দোষিত প্রদীপ আলো কবে দেখিরাছ? শুক করে-পড়া কখন কি কখন কোটে? মৃত্যু-বশিষ্ট তব্বের মধ্যে সে সূক্ষ্ম দেহ—
সে রূপ—সে আলো—আব নাই। '৯১-দিন চলিয়া গিয়াছে। তাজি
আদিয়াছে। এ অকারণের তাজিতে সে দিনের সূর্য্য-মুখ কোথায় দেখিব?
আর কি তাই দেখা যায়!

১২৯৪, ১২৯০'র মৃত্যু। সূর্যের সূর্য্য আলোর অকারণ। অন্ধ
আমার? কি? তব্বের নূতন অধ্যায়—অমাবস্যা'র অমাবস্যা, প্রতিপদ।
সংসারে সাধের পূর্ণ চাঁদ প্রতিপদে উদয় হয় না। জীবন কাননে সূর্যের
চুল কটা? আমার এই ঘর-দুলা, ফলপুষ্পহীন তব্ব জীবন-কাননে যে
একটি স্থান-ত্রি—আশার অতীত—পারিজাতের—পারিজাতেরও শোভার
অদিক সে—কি সে—কি বলিব? বলি, স্বপ্নবৃত্ত মোহময় গানের আভাস—
গদ্য পাঠ্য-ভিলাম, বাণী, '৯১-রঙ্গভূমির একমাত্র অভিনয়, যে '৯১ নগেন্দ্র-
নগের নূনের একমাত্র পুষ্ট-পুষ্ট এক ছিল, সেই ফল, সেই গান, সেই
মোহ, সেই অভিশপ্ত অঙ্গণ, সেই কি?—সময় '৯১'র কাজ সমাপ্ত করিয়া,
আমার কানন শূন্য করিয়া, তাহার কি জানি কি এক অদৃশ্য অঙ্গণে
রাখিয়া, সেই '৯১'র হাত ধরিয়া—অগৎ হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া—
অনন্ত অজ্ঞের পথে মিশিয়া গিয়াছে। কর্ণধার-বিহীন তরুনীতে চাপিয়া
ভাসিয়া গিয়াছে।

আজ এই ধূলিময় পোড়ো বাগানেও নূতন ৯৪'র মধুর প্রভাত-কিরণ
প্রবেশ করিল। আমার হাত ধরিয়া ডাকিল। প্রেমের মালা গলায় দিল!
হায়, কার গৃহে কে রে? মিলন আর কি হয়! মৃতের মুখে আর কি হাসি
কোটে। নূতন আদিয়া ডাকিতেছে—সাবিত্তেছে। হায় সে কেন এল।
তাঁহার কথা কে শোনে? কে তাহাকে আঁর করে? চিনেট বা কে?
নূতনে পুরাতনে প্রণয়—বিবাহ—কখন হয় না। ছুটো বিভিন্ন অগৎ।
ছুটোর প্রকৃতি, এণ এক নহে। নূতনে-নূতনে মিলে, পুরাতনে-পুরাতনে
মিলে। প্রকৃতির নিয়ম, অগতঃ মূলা ঢেকে রাখা। তাই, কান্না কখন
হাসে না। হাসে অগৎ। অগৎ হাসি দিয়া কান্না চাপা দেয়। বিরহেরও
প্রেম নাই। প্রেম অগতঃ। অগতঃ বিলাল প্রেমের মধ্যে বিরহ ছুঁয়া
থাকে। বিরহের পর মিলন নাই। থাকিলেও তাহার সেই পূর্ণ স্মৃতির
মুষ্টি আর দেখা যায় না। মৃত ব্যক্তির নূতন জীবন অসম্ভব। জীবন থাকিতে
পারে। কিন্তু সে আকার আর থাকে না। ও ৯৪ আমার নচে। উহা
অগতঃ। আমি পুরাতনের,—'৯১'র। আমি অতীত—মৃত। ৬ '৯১।